অলৌকিক রহস্য।

১ম সংখ্যা।] দ্বিতীয় ভাগ। [বৈশাখ, ১৩১৭।

দ্বিতীয় বর্ষের মন্তব্য।

ভগবানের আশীর্ব্বাদে আমাদের "অলৌকিক রহস্য"-প্রচার-ব্রত এক বৎসর সম্পূর্ণ হইল। এইবার আমরা দ্বিগুণ আনন্দ, উৎসাহ, যত্ন ও পরিশ্রমের সহিত ইহার দ্বিতীয় বার্ষিক অনুষ্ঠান আরম্ভ করিলাম।

বাঙ্গালা ভাষায় এরূপ বিষয়ের মাসিক পত্রিকার প্রচার আমাদের দেশে প্রথম ও নূতন প্রয়াস। গভীর তত্ত্ব সমূহের আলোচনার জন্য দুই এক খানি মাসিক পত্রিকা বা কতকগুলি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইলেও সহজ-বোধ্য ভাবে ও দৃষ্টান্ত প্রদর্শনাদি দ্বারা সেই সকল তত্ত্বের ভাব সাধারণের মনে উন্মেষিত করিবার চেষ্টায় আমরা এই কার্য্যে ব্রতী হইয়াছি। ব্রত গ্রহণের সময় মনে মনে বড়ই ভয়ের সঞ্চার হইয়াছিল, —মনে হইয়াছিল, হয়ত আমাদের উদ্দেশ্য সফলতা-লাভ করিবে না, সাধারণে আমাদের ভাব গ্রহণ করিতে অগ্রসর হইবেন না,—এই স্বাভাবিক অবিশ্বাস-প্লাবিত যুগে স্থূল দৃষ্টির অবিষয়ীভূত ব্যাপারে আমাদের

শাস্ত্র-সম্মত উক্তি সকল কেহই গ্রাহ্য করিবেন না—আমরা গ্রাহক সংগ্রহ করিতে পারিব না, সুতরাং পত্রিকার জীবনস্বরূপ গ্রাহকের অভাবে কার্য্যসাধনে পশ্চাৎপদ হইয়া আমাদিগকে পত্রিকা প্রকাশে হয়ত নিরস্ত হইতে হইবে। এইরূপ নানা চিন্তা করিতে করিতে বাস্তবিক ভয়ে ভয়ে আমরা কার্য্যারম্ভ করিয়াছিলাম। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়—আমাদের আনন্দের বিষয়—প্রচার-সম্বন্ধীয় আমাদের প্রকাশিত কোন প্রকার বিজ্ঞাপন না থাকিলেও লোক-পরম্পরায় যিনি একবার কোন প্রকারে আমাদের পত্রিকার একখণ্ড দৃষ্টি-গোচরীভূত করিয়াছেন, তিনিই আগ্রহ সহকারে আমাদিগের গ্রাহক-শ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন এবং নানা প্রকারে আমাদিগকে উৎসাহিত করিয়া আসিতেছেন। এইরূপে অল্প সময়ের মধ্যেই অনমুভবনীয় গ্রাহক সংখ্যাধিক্য দেখিয়া আমাদিগের দৃঢ় ধারণা হইয়াছে যে, "অলৌকিক রহস্যের" জীবন এখন সম্পূর্ণ নিরাপদ।

সূক্ষ্মতত্ত্ব সকল সম্বন্ধে আলোচনা ও তাহা সাধারণের সহজে বোধ-গম্য করিয়া দেওয়া একান্ত দুরূহ ব্যাপার। এই ইংরাজী-শিক্ষা-প্লাবিত কালে প্রত্যক্ষ প্রমাণ ব্যতীত কোন তত্ত্ব সাধারণের বিশ্বা-সের অন্তর্ভুক্ত করা বড়ই কঠিন কার্য্য। বিশেষতঃ এ পর্য্যন্ত অধিকাংশ সূক্ষ্মতত্ত্ব সম্বন্ধে যন্ত্রাদির আবিষ্কার হয় নাই; সুতরাং তাহাদের সাহায্যে তত্ত্ব সকল প্রত্যক্ষ-প্রমাণ-সিদ্ধ করিবার উপায় নাই। দৃষ্টান্ত স্বরূপ দেখুন—এই স্থূল জগতেই স্থূল হইতে উত্তরোত্তর সূক্ষ্ম সাত প্রকার ভৌতিক পদার্থের অস্তিত্ব আছে; ইহা যোগ-শক্তি-সম্পন্ন ব্যক্তি দ্বারা নির্ণীত হইলেও এক্ষণে পণ্ডিতগণ সাধারণকে বুঝাইবার নিমিত্ত কঠিন (বরফ বা মৃত্তিকাবৎ), জলীয়, বাষ্পীয়, ইথিরিক (Etheric) এই চারি প্রকার সূক্ষ্ম ভৌতিক পদার্থ ভিন্ন অবশিষ্ট তিন প্রকার উত্তরোত্তর সূক্ষ্ম ভৌতিক পদার্থেরই বিষয়ে যখন প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বারা উপলব্ধি করাইতে

পারেন না, তখন অন্যান্য সূক্ষ্ম জগতে—যথা ভুবর্লোক, স্বর্গলোক ইত্যাদিতে স্থিত সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর ও সূক্ষ্মতম পদার্থ নিচয়ের কথা ত দূরের কথা। বাস্তবিক সূক্ষ্মতর ভৌতিক পদার্থের প্রত্যক্ষ প্রমাণোপযোগী স্থূলচক্ষুর গ্রাহ্য যন্ত্রের সৃষ্টি হইতে পারেনা। এইরূপ অবস্থায় সূক্ষ্মতত্ত্ব সকল বুঝাইবার ব্যাপার কিরূপ কঠিন, একবার অনুধাবন করুন।

বাস্তবিক এতাবৎকাল পর্য্যন্ত সূক্ষ্মতত্ত্ব সকলের উপলব্ধি যোগসাধনায়ত্ত আছে,—যোগানুশীলন ব্যতীত তাহাদের উপলব্ধি সুদূর-পরাহত। কিন্তু এখনকার কালে সাধারণের সেই যোগাভ্যাস আদৌ নাই—তাহার ক্ষমতা একবারে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। মনকে যোগানুশীলনক্ষম করা এখন একান্ত কষ্টকর ও সময়-সাধ্য হইয়া উঠিয়াছে। আচার, ব্যবহার, ক্রিয়া কর্ম্ম, খাদ্য ইত্যাদি অনেক বিষয়ের বিশুদ্ধিতা সাধন না করিলে মন তদনুরূপ হইতে পারে না। সুতরাং সকলেই এক্ষণে প্রত্যক্ষ প্রমাণ ভিন্ন অন্য কিছুতেই কোন বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপন করিতে চাহেন না। কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, তৎসাধনোপযোগী যন্ত্রে সৃষ্টি এখনও হয় নাই এবং পণ্ডিতগণ বলেন যে, তাহার সৃষ্টি হইবেও না। যেরূপ জাতীয় সূক্ষ্মতত্ত্ব সকল বুঝিতে হইবে, সেই জাতীয় সূক্ষ্ম যন্ত্র ভিন্ন অন্য স্থূল যন্ত্র দ্বারা তাহা কোনরূপেই বুঝিতে পারা যায় না। সুতরাং উত্তরোত্তর যত সূক্ষ্ম বিষয় অবধারণা করিতে চেষ্টা করা যাইবে, ততই তদনুরূপ সূক্ষ্ম যন্ত্রের আবিষ্কার করিতে হইবে। কিন্তু স্থূল ভৌতিক পদার্থ দ্বারা সেরূপ সূক্ষ্ম যন্ত্রের সৃষ্টি হইতে পারেনা। এই জন্য সূক্ষ্মতত্ত্ব অনুশীলন করিবার পূর্ব্বে তাহার প্রতীতির অভিপ্রায়ে মনের সূক্ষ্মভাব ও শক্তির বিকাশ একান্ত আবশ্যক এবং এই রূপেই পূর্ব্বোক্ত সূক্ষ্ম যন্ত্রের সৃষ্টি হইবে, এইরূপ মনের সাহায্যেই স্বপ্ন,

সুষুপ্তি ও তদতিরিক্ত অবস্থা সকলের উপলব্ধি করিবার ক্ষমতা হইবে। সুতরাং সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর তত্ত্ব সকল বুঝিতে হইলে মনকেই তাহার প্রত্যক্ষ-প্রমাণ-সিদ্ধির উপযোগী যন্ত্র-স্বরূপ করিয়া লইতে হয়, চিত্ত-শুদ্ধি দ্বারা যোগাভ্যাস-ক্ষম হইয়া, সেই যোগ-শক্তির বলেই তাহা জানিতে সক্ষম হওয়া যায়। একজন ব্যক্তি কেবল মাত্র বাক্য-প্রয়োগ দ্বারা অপরকে তাহা বুঝাইতে পারেন না, যিনি বুঝিবার চেষ্টা করিবেন, তাঁহাকে নিজের শক্তিবলে বুঝিতে হইবে। তবে যেরূপ পথাবলম্বী হইলে তাঁহার উদ্দেশ্য সহজে সিদ্ধ হইতে পারিবে, অপর ব্যক্তি কেবলমাত্র সেই পথের নির্দ্দেশক হইতে পারেন।

এই সকল কারণে আমরা বড়ই বিপদে পতিত হইয়াছি। যখন যন্ত্রাদি-সাহায্যে কিছু প্রমাণিত করিতে পারিতেছি না এবং সাধারণের তত্ত্ব উপলব্ধি করিবার উপযোগী মনও প্রস্তুত নাই, তখন আমরা কেমন করিয়া বুঝাইতে পারিব? সেই জন্য আমরা ধীর পদ-বিক্ষেপে অল্প অল্প করিয়া সত্য ঘটনার উল্লেখ করিয়া—দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া সময়ে সময়ে তত্ত্ব সমূহের মূল সত্যগুলি প্রতীতি করাইবার চেষ্টা করিতেছি। "সন্দীপনী" শীর্ষক প্রবন্ধে তাহার সার আভাস দিতেছি, "দাদাম'শায়ের ঝুলিতে" ভৌতিক ও তদানুষঙ্গিক তত্ত্ব সকল সহজ-বোধ্য ভাবে বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছি এবং "যমালয়ের পত্রাবলীতে" আমাদের স্থূল দেহ-পাতের পরের অবস্থা বিশিষ্ট-বর্ণনাচ্ছলে দেখাইয়া দিতেছি। বর্ত্তমান বৎসরেও উক্তরূপে আমরা উদ্দিষ্ট পথে চলিতে থাকিব।

এতদ্ভিন্ন উহার সঙ্গে সঙ্গে বর্ত্তমান বৎসরে আমাদের বহু উদ্দিষ্ট বিষয়ের আরও দুই একটী নূতন তত্ত্ব আলোচনা করিতে চেষ্টা করিব। বস্তুতঃ সমস্ত বিষয়ই শনৈঃ শনৈঃ সহজভাবে সকলে নিজ নিজ বিশ্বাসের গণ্ডির মধ্যে রাখিয়া যাহাতে আমাদের গৌরবান্বিত "সনাতন ধর্ম্মের

দিকে পুনঃ আসক্তিবান্ ও ধর্ম্ম-নির্ভরতায় অভ্যস্ত হইতে সমর্থ হয়, তদ্বিষয়ে সম্যক্‌ভাবে যত্ন ও পরিশ্রমের সহিত উদ্যোগী হইতে আমরা বিরত থাকিব না। আর ইহাও নিশ্চিত যে, কঠিন তত্ত্বের কাঠিন্য নিবারণে আমরা যথোচিত রূপে চেষ্টা করিতে ত্রুটী করিব না।

যমালয়ের ফর্দ্দ।

এক বন্ধুর সহিত আমার কথাবার্ত্তা ছিল, আমাদের উভয়ের মধ্যে যে অগ্রে মরিবে, সে-ই যমালয়ের ব্যাপারটা কি জানিয়া আসিয়া অন্যকে বলিবে। এ কথা জানিবার জন্য আমাদের উভয় বন্ধুরই বিশেষ আগ্রহ ছিল, তবে এজন্য যে আমরা উভয়ে উভয়ের মৃত্যু কামনা করিতাম, এমন নহে। বন্ধু এক জন দোকানদার। তাঁহার দোকানে বসিয়া অধিকাংশ সময়ই অতিবাহিত করিতাম। পুস্তকাদি পাঠ বা অন্য কার্য্য বা গল্পামোদে সময় অতিবাহিত হইত। আমরা উভয়েই যুবা। যৌবনের ঔদ্ধত্যও ছিল। প্রায়ই আমরা আমাদের প্রতিশ্রুতি দৃঢ় করণার্থ সময়ে সময়ে তাহা স্মরণ করিতাম।

একদিন বন্ধুর জ্বর হইল। তাঁহার নাম নগেন্দ্র নাথ চন্দ্র। নিবাস —মেদিনীপুর জেলার ক্ষেপুত গ্রামে। কয়েকদিন পরেই তাঁহার বসন্ত দেখা দিল। তাঁহার জ্যেষ্ঠতাত তখন মাস কতক হইল মারা গিয়াছেন, জেঠা তাঁহাকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। এখন তাঁহার সমস্ত সম্পত্তির এক মাত্র উত্তরাধিকারী নগেন্দ্র। জেঠার মৃত্যুতে নগেন্দ্র বিশেষ দুঃখিত। নগেন্দ্র তাঁহাদের সংসারের একমাত্র পুত্র সন্তান। যাহা হউক, তাঁহার বসন্ত বাড়িয়া উঠিল। কয়েক দিনের মধ্যেই তাঁহার জীবন সঙ্কটাপন্ন বলিয়া প্রকাশ পাইল। বসন্তের সহিত জ্বর বাড়িল, নানারূপ প্রলাপ

বকিতে লাগিলেন। প্রত্যহ তাঁহাকে দেখিতে যাইতাম, ক্রমেই তাঁহার মূর্ত্তি ভীষণ হইয়া দাঁড়াইল। ঈশ্বরের নিকট তাঁহার আরোগ্য কামনা করিতাম। কিন্তু আমি নিজে একজন ডাক্তার। অবস্থা দেখিয়া বুঝিলাম, বন্ধুর জীবন শেষ হইয়া আসিতেছে। নানারূপ চিকিৎসা বা দেবতা-পূজন কিছুতেই কিছু হইল না। একদিন বন্ধুর জীবন-দীপ নিবিয়া গেল।

বন্ধুর জীবন-বিয়োগে বড়ই মর্ম্মাহত হইলাম। পরিশেষে মনকে প্রবোধ দিলাম—বিধাতার উপর হাত কাহার? আমার এই মর্ম্মপীড়া হয়ত বন্ধুর পক্ষে কষ্টকর হইতেছে। বন্ধু হয়ত আমার চক্ষে জল দেখিয়া কষ্ট হইতেছেন। বিধাতার ইচ্ছাই যদি হইয়া থাকে, তবে আমি বৃথা মানসিক পীড়ায় শরীর ও মনকে পীড়িত করিতেছি কেন? ইহা ভাবিয়াও বন্ধুর মৃত্যুর পর প্রত্যেক মুহূর্ত্তেই তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভের জন্য অপেক্ষা করিতাম। ভাবিতাম, আমাদের মধ্যে যে প্রতিশ্রুতি ছিল, তাহা কি তিনি ভুলিয়া গেলেন? অথবা পরলোকটা কিছুই নয়? সকলই ভোজবাজি!—নতুবা মৃত্যুর পর যমালয়ের বিষয় জানিয়া আসিয়া তিনি আমায় কিছু বলিলেন না কেন? যমালয় কি নাই? পাপপুণ্যের বিচার কি হয় না? মৃত্যুর পর আত্মা তবে কোথায় যায়? সে স্থানটা কি? মৃত্যুর পর কি মানব-জীবনের সব সম্বন্ধ ঘুচিয়া যায়? এতদিনের বন্ধুত্ব, বাল্যের সাহচর্য্য তিনি কি ভুলিয়া গেলেন? না—না, তাহা হইতে পারে না। রামায়ণে পড়িয়াছি, দশরথ মৃত্যুর পর রামচন্দ্রকে দেখা দিয়াছিলেন—আপনার মনের কথা বলিয়াছিলেন। তবে বন্ধুর আত্মাও আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবে না কেন? আমাদের সে প্রতিশ্রুতি কি ভুলিবার?—এইরূপ কত চিন্তাই প্রত্যহ মনে মনে উদিত হইত। দিনের পর দিন চলিয়া যাইতে লাগিল, তথাপি বন্ধুর দর্শন নাই।

একদিন হঠাৎ আমার জ্বর হইল। জ্বর হওয়াতে চিন্তিত হই-

লাম। যাহার ভয় করিলাম, তাহাই হইল—পরদিন বসন্ত দেখা দিল, কয়েক দিনের মধ্যে সর্ব্বশরীরে ছাইয়া গেল! এমন কি "ন স্থানং তিল ধারণং!" গায়ের জ্বালায় অস্থির হইলাম। দিবা রাত্রি নিদ্রা নাই—অসহ্য যন্ত্রণা! কিন্তু এখন জ্বর নাই, জ্ঞানের ব্যত্যয় ঘটে নাই। একদিন সন্ধ্যার পর যেন একটু তন্দ্রা আসিল। তন্দ্রার সঙ্গে সঙ্গেই যেন বোধ হইল, বন্ধু নগেন্দ্রনাথ আসিয়া আমায় ডাকিতেছেন। আমি চাহিলাম, দেখিলাম সম্মুখে বন্ধুই বটে। আমি কোন কথা কহিতে পারিলাম না—তিনি যেন কিছু শীর্ণ, হাতে একটা কি কাগজ। তিনি তাঁহার প্রতিশ্রুতি পালনে বিলম্বের কৈফিয়ত দিয়া বলিলেন, "কোন কারণে আমি আসিতে পারি নাই, বিশেষ চেষ্টা করিয়াও আসিবার সামর্থ্য ছিলনা। আমার জেঠা মহাশয় আমায় অত্যন্ত ভালবাসিতেন, তিনিই আমাকে এখান হইতে লইয়া গিয়াছেন; নতুবা আমার যাইবার আরও কিছু বিলম্ব ছিল।" আমি তখন আত্মবিস্মৃত, বলিলাম "কৈ আমাদের মধ্যে যে কথা ছিল, তাহার কি করিলে?" তিনি বলিলেন "সেই জন্যই আমার বিলম্ব হইল, তাহা একে একে বলিতেছি। এস্থানে বলার সুবিধা হইবে না, আইস, আমরা দোকানে যাই—দোকান নির্জ্জন।" আমি এতক্ষণ চাহিয়াছিলাম এবং বেশ জ্ঞানও ছিল বলিয়া বোধ হইল। পরক্ষণেই যেন আমার আবার তন্দ্রা আসিল,—আমরা উভয়ে যেন দোকান ঘরে গিয়া বসিলাম। বন্ধু বসিয়াই একখানি খাতা বাহির করিয়া বলিলেন "আমি যমরাজের খাতাঞ্চি চিত্রগুপ্তের নিকট হইতে আমার মানব জীবনের কর্ম্মাবলীর জমা খরচের একটী নকল তুলিয়া আনিয়াছি, তাহাই তোমাকে দেখাইব। ইহা হইতেই তুমি যমালয়ের হিসাব নিকাশ বুঝিতে পারিবে।" ইহা বলিয়াই তিনি একে একে সমস্ত দেখাইতে আরম্ভ করিলেন। দেখিতে দেখিতে আমার সর্ব্বাঙ্গ কম্পিত হইতে লাগিল।

তিনি বলিলেন, "এই দেখ, চিত্রগুপ্তের খাতা হইতে যে নকল তুলিয়া আনিয়াছি, একে একে সে সব দেখ। আমি অমুক দিন অমুক সময় মিথ্যা কথা বলিয়া-ছিলাম বলিয়া, আমার জন্য এই পাপ লেখা হইয়াছে। আমি অমুক দিন অমুক সময় দাঁড়িবাজি করিয়া খরিদদারকে কম জিনিস দিয়াছিলাম বলিয়া আমার জন্য এই পাপ লেখা হইয়াছে। আমি অমুক দিন অমুক রমণীর প্রতি কুদৃষ্টিতে চাহিয়া-ছিলাম বলিয়া, আমার জন্য এই পাপ ভোগের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। আমি অমুক দিন অমুক সময় অমুক রমণীর গৃহে লোকচক্ষুর অগোচরে তাহার সহিত যে পাপানুষ্ঠান করিয়াছিলাম, তাহার জন্য এই ভীষণ প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা! অমুক দিন অমুককে ফাঁকি দিয়া কিছু হস্তান্তর করিবার চেষ্টা করায় এই পাপ-ভোগ লেখা হইয়াছে। আমি "মুখে এক, মনে আর" হইয়া অমুক কায করিয়াছিলাম বলিয়া, আমার জন্য এই পাপের ব্যবস্থা হইয়াছে।" এইরূপে তিনি একটী একটী করিয়া দৈনন্দিন কার্য্যের—পাপপুণ্যের হিসাব দেখাইতে লাগিলেন। সেই হিসাব দর্শনের সঙ্গে সঙ্গে আমার যেন কেমন একটা আতঙ্ক উপস্থিত হইতেছিল। কতক্ষণ পরে তিনি বলিলেন "আরও দেখিবে?—এ অফুরন্ত!" আমি অতি কষ্টে বলিলাম, "আর প্রয়োজন নাই।" তিনি বলিলেন "যমালয়ের ফর্দ্দ দেখিলে? পরলোকের ব্যাপার বুঝিলে?—এখনও সাবধান হও। মনুষ্য-জীবন পাইয়াছ, দুষ্কর্ম্মের জন্য নয়—আলস্যে অতিবাহনের জন্য নয়—এ দুর্লভ জীবনে কর্ত্তব্য করিয়া যাও—বিবেক-প্রণোদিত পথে প্রধাবিত হও—আমার মত পাপ-পঙ্কে লিপ্ত হইও না—তুমি এখনও মানুষ, তোমার ক্ষমতা অসীম—তুমি স্বর্গরাজ্য অধিকার করিতে পার! তোমাকে এই কথা বলিবার জন্যই আমি ছুটী লইয়া আসিয়াছি। আর সহসা আমার

সাক্ষাৎলাভ ঘটিবে না, আমার কর্ম্মভোগের জন্য আমি প্রস্তুত হইতে চলিলাম।” তিনি চলিয়া গেলেন। দেখিলাম, যেন শত সহস্রটা যমদূত ভয়ঙ্করমূর্ত্তি অগ্নিতপ্ত লাক্ষালোহিত শূল হস্তে লইয়া সেই সূচ্যগ্র সদৃশ তীক্ষ্ণাগ্র শূল দ্বারা তাহাকে বিদ্ধ করিতে করিতে টানিয়া লইয়া গেল! আমি ভয়ঙ্কর চীৎকার করিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলাম। এতক্ষণ আমার সংজ্ঞা ছিল কি না জানি না। বুঝিলাম, চীৎকারের পরই আত্মীয় স্বজনগণ চোখে মুখে জল দিয়া আমার সংজ্ঞা আনয়ন করাইলেন। ভয়ে আমার শরীর কম্পিত হইতে লাগিল।

ক্রমে আমার অবস্থাও শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইল। আত্মীয় স্বজনগণ চিন্তিত হইলেন। আমার স্ত্রী শীতলার গৃহে ধর্‌ণা দিলেন। অবিলম্বেই পদ্মাসনা ভুবন-মনোরমা জ্যোতির্ম্ময়ী শীতলমূর্ত্তি একটী রমণী আমায় দর্শন দিয়া আশ্বস্ত করিলেন এবং আমায় ঔষধ খাওয়াইয়া গেলেন। ইহাও অতীব আশ্চর্য্য-জনক যে, আমার স্ত্রী পনর মিনিট মাত্র ধর্‌ণা দিবার পরই মা শীতলা তাহার হস্তে ঔষধ দিয়া, তিনি যে আমায় ঔষধ খাওয়াইয়া গিয়াছিলেন, তাহাও বলিয়া দিয়াছেন। তখন বেলা প্রায় ৪ চারি ঘটিকা। বুঝিলাম, আমার স্ত্রীর অতীব দৃঢ় বিশ্বাসে তাহার এই আশু-ফল-প্রাপ্তি। সে সকল কথা বলিবার প্রয়োজন নাই। বিশ্বাসই মূল। যাঁহার অবিশ্বাস হয়, তিনি আমায় মার্জ্জনা করিবেন। যাহা হউক, আমি আরোগ্য লাভ করিয়া বন্ধুর পুনর্দ্দর্শনের আশায় আছি।

যিনি আমায় এইসব কথা বলিলেন, তিনি এক জন বিশেষ পরিচিত, সম্মানার্হ ও বিশ্বাস-ভাজন।

শ্রীমন্মথনাথ নাগ।

সম্পাদক—“মেদিনীপুর হিতৈষী।”

প্রেতের উপদেশ।

সে আজ প্রায় চারি বৎসরের কথা। আমার মনে হয়, সে দিবস পূর্ণিমা রজনী। আমার কোন আত্মীয়ের বাটীতে যাওয়াতে সে দিবস নিজের বাটী ফিরিতে বিলম্ব হয়। নিতান্ত ক্লান্ত শরীরে প্রায় রাত্রি এগার টার সময় বাটী ফিরিতেছিলাম।—কিন্তু যে কথা বলিতে আমি উদ্যত হইতেছি, তাহা নিতান্ত অমূলক বা স্বপ্নের খেয়াল নহে। আমার বিশ্বাস যে, উহা কোন দৈবশক্তি-কৃত। কারণ, পরে সে বিষয়ের বিশেষ প্রমাণ পাইয়াছিলাম এবং সেই প্রমাণই আমার বিশ্বাসকে দৃঢ়ীভূত করিয়াছে। যাহা হউক, সমস্ত কথাই ক্রমে এখানে বিবৃত হইতেছে।

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, প্রায় রাত্রি ১১ টার সময় আমি বাটী ফিরিতেছিলাম। যদিও সে সময় কলিকাতা মহানগরী একবারে নিস্তব্ধতার কোলে শায়িত হয় নাই, তথাপি রাস্তা ঘাট, বিশেষতঃ সহরের উত্তরাংশ, যে স্থলে আমার নিবাস, প্রায় জনশূন্য হইয়াছিল। তাহার কারণ, সে সময় শীতের প্রকোপ কিছু বৃদ্ধি হইয়াছিল। আমার ঠিক মনে হয় না, ঠিক সে সময় আমার মন কি চিন্তায় অভিভূত ছিল ; তবে এ কথা বলিতে পারা যায় যে, সে দিবস আত্মীয়ের বাটীতে দুই একটি লোকের জীবন-কাহিনী শ্রবণ করাতে সেই চিন্তাই বোধ হয় মনকে অধিকার করিয়াছিল। সেইরূপ কি ভাবিতে ভাবিতে আমি বাটীর দিকে অগ্রসর হইতেছিলাম এবং ক্রমে যখন সিমলার নিকটবর্ত্তী কোন এক রাস্তার মোড়ের নিকট উপস্থিত হইলাম, তখন আমার দৃষ্টি কেমন আপনা-আপনি আমার বাম দিকে নিক্ষিপ্ত হইল এবং দেখিলাম, যেন অদূরে কোন একটি লোক হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া আছে। ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কোন কারণ নাই। বস্তুতঃ এরূপ ঘটনা প্রত্যহ মনুষ্যের দৃষ্টি-

পথে কত আসে, তাহা নির্ণয় করা দুরূহ। ইহাতে কৌতূহলেরও কোন কারণ ছিল না। তবে সে স্থানটি নির্জন বলিয়া আমার স্বতঃই চিন্তা আসিল,—ও লোকটি কে এবং কেনই বা সে ওখানে ওরূপ ভাবে বসিয়া আছে? এরূপ ভাবিবার দুইটি কারণ নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ যে স্থানটিতে সেই মনুষ্যটি বসিয়াছিল, সে স্থানটি কোন একটি নাতি-বৃহৎ অট্টালিকার পার্শ্বদেশে অবস্থিত থাকাতে গ্যাসের আলো তথায় পতিত হইতে পারে নাই এবং সে স্থান অপেক্ষাকৃত অন্ধকারময় বলিয়া বোধ হইতেছিল। কিন্তু এ কথা বেশ বলিতে পারা যায় যে, সে স্থানটিতে কোন আলোক-রশ্মি না থাকিলেও, তথাকার সমস্ত বস্তু একরূপ প্রায় স্পষ্টতঃ অবলোকন করা যাইতেছিল এবং সেই কারণেই আমি অতশীঘ্র মনুষ্যটিকে দূর হইতে দেখিতে সমর্থ হইয়াছিলাম।

আমার ঐরূপ মনে হইবার দ্বিতীয় কারণ এই যে, যে স্থলে ওই লোকটিকে আমি দেখিতে পাইয়াছিলাম, তাহার অনতিদূরে আমার কোন বন্ধুর বাটী এবং সেই স্থলের আরও দুই একটি লোকের সহিত আমার পরিচয় থাকাতে আমার মনে হইল, যেন আমার বন্ধুবর্গের মধ্যে কেহ তথায় বসিয়া আছে এবং সেই জন্যই বোধ হয় ওই লোকটি সম্বন্ধে আমার উক্তরূপ চিন্তা হয়। রাত্রি অধিক হওয়াতে আমি দ্রুতভাবেই বাটীতে ফিরিতেছিলাম; কিন্তু ওই লোকটিকে দেখিবামাত্র কেমন স্বতঃই সেই দিকে আমার যাইবার ইচ্ছা হইল এবং অনতি-বিলম্বেই আমি তথায় উপস্থিত হইলাম। তখন দেখিলাম যে, তাহার স্কন্ধদেশে একখানি চাদর স্থাপিত এবং সেই চাদরের কতক অংশ মুখের উপর পড়াতে মুখটি ভাল করিয়া দেখা যাইতেছিল না। ওরূপ শীতে তাহার গাত্র অনাবৃত ছিল এবং তাহাতেই দেখিতে পাইলাম যে, লোকটী গৌরবর্ণ।

আমার পদশব্দে সেই লোকটি মুখ খুলিয়া দিল এবং চাদরের যে অংশ তাহার মুখটি ঢাকিয়া রাখিয়াছিল, তাহা যথাস্থানে নামাইয়া রাখিল। ইহাতে লোকটির মুখ বেশ দেখিতে পাইলাম এবং তাহাতে বোধ হইল, যেন সে মুখ শ্মশ্রুবিহীন ও অতি সুন্দর। আমার বোধ হয়, সেরূপ মুখ আমি অতি অল্পই দেখিয়াছি। তাহার চক্ষে আমার দৃষ্টি পতিত হইবামাত্র আমার অনিচ্ছা স্বত্বে তাহার দিকে একদৃষ্টে তাকাইতে হইয়াছিল; তাহার কারণ তাহার চক্ষুদুটি অত্যুজ্জ্বল এবং সেই প্রায়-আলোক-শূন্য স্থানেও যেন বিশেষ ভাবে জ্বলিতেছিল। তবে এ কথা বেশ বলিতে পারি যে, সে দৃষ্টি ভীতি-ব্যঞ্জক নহে, অথবা তাহাতে কোন কঠোরতা প্রকাশ করিতেছিল না, কিম্বা সে দৃষ্টির প্রত্যেক পলক মধুরও নহে, তবে সে যেন কি এক প্রকার—যেন অতীব করুণার ছবি, যেন প্রতি মুহূর্ত্তেই স্পষ্ট বোধ হয়—অনন্ত যাতনা-প্রকাশক; তাহার দিকে চাহিলে কেমন আপনা-আপনি একটা আকর্ষণ আসে এবং সে আকর্ষণ এরূপ শক্তিশালী যে, নিজের অস্তিত্ব ভুলাইয়া দেয়। সেই কারণেই বোধ হয় মনুষ্যকে সময় সময় নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কার্য্যে কি এক অজানিত শক্তি প্রভাবে লিপ্ত হইতে দেখা যায়। যদিও সে ঘটনা আজ কয়েক বৎসর ঘটিয়াছে, কিন্তু তাহার কিছু মাত্র ভুলি নাই। আমার এখন প্রতি মুহূর্ত্তেই মনে হয়, যেন তাহা কয়েক ঘণ্টা পূর্ব্বের দৃশ্য। যাহা হউক, সে সময় তাহার দিকে আমাকে পলকহীন দৃষ্টিতে চাহিতে বাধ্য করিয়াছিল। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে হঠাৎ আমার মনে হইল যে, সে লোকটী ত আমার পরিচিত নহে, কিম্বা তাহাকে যে পূর্ব্বে কোথাও দেখিয়াছি, তাহাও ত বোধ হয় না। তবে এরূপ ভাবে কোন এক অপরিচিত ভদ্রলোকের প্রতি উৎসুকভাবে দৃষ্টি ভদ্রতার পরিচায়ক নহে। আমি সেই মুহূর্ত্তেই তাহার দিক হইতে দৃষ্টি ফিরাইলাম; কিন্তু সেই ক্ষণে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইল, যেন আমার

চক্ষুকে তাহার দিক হইতে টানিয়া লওয়া হইতেছে। ইহাতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, আমি অল্প সময়ের মধ্যে তাহার দৃষ্টিশক্তির কিরূপ অধীন হইয়া পড়িয়াছিলাম। এস্থলে ইহাও বলা উচিত যে, যতক্ষণ আমি তাহার দিকে চাহিয়াছিলাম, ততক্ষণ তাহার দৃষ্টিও আমার মুখের উপর নিপতিত ছিল।

হঠাৎ কোন এক অপরিচিত ব্যক্তির প্রতি এরূপ কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকাতে আমি নিজে কিছু লজ্জিত হইয়াছিলাম। তখন আমি সেই ব্যক্তির দিকে পুনরায় ফিরিয়া বলিলাম "মহাশয় আমি দূর হইতে আপনাকে ভাল করিয়া দেখিতে পাই নাই এবং আপনাকে আমার কোন বন্ধু বলিয়া মনে করিয়াছিলাম, সেই কারণেই বোধ হয় আমাকে ওরূপভাবে আপনার দিকে চাহিতে হইয়াছিল।" ইহাতে সেই লোকটি যেন ঈষৎ হাস্য করিল, এবং যেন কি উত্তর করিল এইরূপ বোধ হইল। কিন্তু তাহার কিছুই আমি শুনিতে পাইলাম না। আমি তাহার মুখপানে তাকাইয়া রহিলাম এবং সেই লোকটি যে কি বলিল, তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলাম। আমার নে হইল যে, তাহার দিকে পূর্ব্বে ওরূপভাবে অতক্ষণ চাহিয়া থাকাতে নের কিছু চাঞ্চল্য ঘটিয়া থাকিবে এবং সেই কারণেই বোধ হয় কিছু ণ করিতে পারি নাই। কিন্তু পর মুহূর্ত্তে শুনিলাম যে,সেই লোকটি বলিছে "আপনার ইহাতে লজ্জিত হইবার কোন কারণ নাই, যেহেতু ইহা মার ইচ্ছাতেই ঘটিয়াছে এবং মনুষ্য সূক্ষ্মদর্শী নহে বলিয়া তাহাদের জীবনে রূপ ঘটনা প্রায় প্রতিমুহূর্ত্তে ঘটিয়া থাকে অথচ তাহা বুঝিতে পারে না। রও এ বিষয়ে আপনার কোন দোষ নাই। আমি পূর্ব্বেই জ্ঞাত ছিলাম , এই স্থান দিয়া অদ্য এরূপ সময়ে আপনাকে যাইতে হইবে এবং সেই রণেই আপনার প্রতীক্ষায় ছিলাম।" আমি শুনিয়া বিস্মিত হইলাম। স্মিত হইবার অনেক কারণ ছিল। এ ব্যক্তি আমার সম্পূর্ণ অপরিচিত,

ইহার সহিত পূর্ব্বে কখনও সাক্ষাৎ হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। ইহার পক্ষে আমার গতিবিধি সম্বন্ধে পর্য্যবেক্ষণ করা কি প্রকারে সম্ভব এবং কেনই বা সে আমার জন্য প্রতীক্ষা করিবে? ইহার মনে কি কোন দুষ্ট অভিপ্রায় আছে? আর কেনই বা সে দুষ্ট অভিপ্রায় পোষণ করিবে? এইরূপ চিন্তা আমার মনে তখন উদয় হইতে লাগিল। কিন্তু কলিকাতা সহরে ওরূপ সময়ে কোন ব্যক্তি কাহারও বিশেষ অনিষ্ট করিতে পারে বলিয়া সম্ভব হয় না। তবে এই দৃশ্য যদি কোন পল্লীগ্রামে ঘটিত, তাহা হইলে ওই ব্যক্তিকে নিশ্চয়ই কোন দুষ্ট লোক বলিয়া প্রতীয়মান হইত। আশ্চর্য্য হইবার আর এক কারণ যে, তাহার কণ্ঠস্বর যেন আমাদের স্বর হইতে কিছু বিভিন্ন। বিশেষভাবে লক্ষ্য করিলে বোধ হয়, যেন তাহা মনুষ্য কণ্ঠ-নিঃসৃত নহে। ইহার স্বর যে খুব কঠোর বা মধুর অথবা অবজ্ঞাসূচক,তাহা নহে,ইহা স্নেহ-ব্যঞ্জক বা কর্কশও নহে। ইহার প্রত্যেক অক্ষরের উচ্চারণ শব্দ যেন কি একভাবে পরিপূর্ণ, যেন প্রত্যেক কথাই প্রকাশ করিতেছে "মনুষ্যের অন্তর ঈর্ষায় পরিপূর্ণ, নিজের অস্তিত্ব লোপে উদ্যোগী,পর পীড়া দিতে সিদ্ধহস্ত এবং বাসনার ক্রীতদাস।" তাই বলিতে-ছিলাম যে, তাহার কণ্ঠস্বর কি এক অপূর্ব্ব ভাব-প্রকাশক এবং সে স্ব অনুকরণে মনুষ্য অতি অল্পই সমর্থ।

কিছুক্ষণ পরে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম "মহাশয়! আপনি আমা অপরিচিত অথচ কিরূপে আমাদের সমস্ত সংবাদ জানেন, ইহা বুঝিতে পারিতেছি না; ইহা অত্যন্ত বিচিত্র। আশা করি, যদি বিশেষ আপত্তি না থাকে,আমাকে সবিশেষ জানাইয়া বাধিত করিবেন।" লোকটী বলিতে লাগিল "আপনাকে বাটী ফিরিতে উদ্বিগ্ন ও নিতান্ত ক্লান্ত বলিয়া বো হইতেছে। আমি আপনার সমস্ত বিষয়ই অবগত আছি, শীঘ্রই সাক্ষা করিয়া সমস্তই বলিব। তবে এক কথা বলিয়া রাখি, মনুষ্য যে সক

বিষয়ে অনভিজ্ঞ, সে সকল বিষয়ের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত, এবং নিজের প্রভাব সর্ব্বস্থানে অক্ষুণ্ণ রাখিতে সদাই যত্নবান। ইহাতে তাহারা বুঝে না যে, তাহারা নিজের পদে নিজেই কুঠারাঘাতে উদ্যত।" এই বলিয়া সেই লোকটী ফিরিয়া দাঁড়াইল এবং আমার কিছু বলিবার পূর্ব্বেই দ্রুতপদে সেস্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। আমার একবার মনে হইল যে, সেই ব্যক্তির অনুসরণ করি; কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই রাত্রি অধিক হইয়াছে এবং বাটী ফিরিতে হইবে, এই চিন্তায় তাহা হইতে নিবৃত্ত হইলাম।

সেস্থান হইতে বাটী ফিরিয়া আসা পর্য্যন্ত যে সময় টুকু অতিবাহিত হইয়াছিল, সে সমস্ত সময় আমার মন চিন্তায় পরিপূর্ণ ছিল। একবার মনে হইতেছিল যে, লোকটি সম্ভবতঃ পাগল, তাহা না হইলে ওরূপ কত কি কেন বকিয়া যাইবে। যে সব বিষয় উত্থাপিত হয় নাই, উহাকে কিছুই জিজ্ঞাসা করা হয় নাই, সেই সব বিষয়ের উত্তর প্রদান করিতে যাইবে কেন? যাহাহউক, লোকটী যে সৎ, সে বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ রহিল না।

কিন্তু আবার ভাবিলাম যে, লোকটি যে বলিল, আমার সহিত পরে সাক্ষাৎ করিবে, তাহা কিরূপে সম্ভব? আমি ত উহাকে আমার ঠিকানা বলি নাই। তবে কি আমার ঠিকানা জানে? যাহা হউক, তাহার বিষয়ে আর অধিক চিন্তা করিতে ইচ্ছা হইল না। আমি শীঘ্রই বাটীতে ফিরিলাম এবং অন্য বিষয়ে মনোনিবেশ করিতে প্রয়াস পাইলাম; কিন্তু সে চিন্তা একবারে মন হইতে দূরীভূত হইল না।

এস্থলে আর এক বিষয় বলিয়া রাখি যে, ভূত প্রেতাদি সম্বন্ধে আমার বিশেষ বিশ্বাস ছিল না। তবে একবারে তাহাদের অস্তিত্ব নাই, এ কথাও বলিতে সাহসী হইতাম না। যে সময় বাটীতে ফিরিয়া আসি, সে সময় একবার কেমন মনে হইয়াছিল যে, বোধ হয় যে মূর্ত্তি আমি দেখি-

য়াছি, তাহা কোন প্রেতাত্মার। কিন্তু পরক্ষণেই মনে মনে আপনা-আপনি হাসি আসিল ও সে চিন্তা হইতে নিবৃত্ত হইলাম।

অবশেষে কিছুক্ষণ পরে সামান্য জলযোগ করিয়া শয়ন করিলাম এবং যদিও মন নিতান্ত চিন্তাযুক্ত ছিল, তথাপি শরীর অত্যন্ত ক্লান্ত থাকাতে শীঘ্রই নিদ্রাভিভূত হইলাম। নিদ্রাকালে যে অদ্ভুত স্বপ্ন দর্শন করিয়াছিলাম, তাহা বলিতেছি।—

আমার ঠিক মনে হয় না যে, নিদ্রার পূর্ব্বে কতক্ষণ ধরিয়া ভাবিতেছিলাম। তবে হঠাৎ আমার বোধ হইল, যেন আমি সুদূর প্রান্তরস্থিত কোন এক বৃক্ষমূলে শায়িত। বিশেষ পীড়াগ্রস্ত হইয়া যে তথায় সেরূপ ভাবে শায়িত ছিলাম, তাহা নহে। তবে এটা আমার বেশ অনুমান হইতেছিল যে, আমার ইচ্ছাসত্ত্বেও আমি উঠিতে অসমর্থ। কেন যে হঠাৎ এরূপ ভাবে ক্ষমতাশূন্য ও নিস্তেজ হইলাম, তাহা বলিতে পারিতেছিলাম না। ইহা এখনও বেশ স্মরণ আছে যে, আমি কয়েকবার দণ্ডায়মান হইতে প্রয়াস পাইয়াছিলাম, কিন্তু তাহাতে কোন ফল দর্শে নাই। আমার শরীর যে তখন বিশেষ কৃশ হইয়াছিল, তাহাও নহে, তাহ পূর্ব্ববৎ দেখিতে সবল ও সুস্থ ছিল; কিন্তু কি জানি কি শক্তিপ্রভাবে নিস্তেজ। যখন দেখিলাম যে, আমি প্রকৃতই অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছি তখন যেন কিরূপ হইয়া গেলাম; আমার মাথা ঘুরিতে লাগিল ও চক্ষে ধোঁয়া দেখিতে লাগিলাম। বোধ হইল, সমস্ত পৃথিবী যেন আমার চক্ষের সম্মুখে ঘুরিতেছে। কতক্ষণ যে এরূপ ভাবে কাটিয়াছিল, তাহা ঠিক বলিতে পারি না; তবে অকস্মাৎ কোন দূরস্থিত অস্পষ্ট মধুর সঙ্গীতে আমার মোহ যেন অপনীত হইল। ক্রমে সেই সঙ্গীত স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর হইতে লাগিল। আমি ঐকান্তিক মনে শ্রবণ করিতে লাগিলাম। বোধ হইল যেন কেহ গাহিতেছে :—

যাই যাই চলে যাই—অশেষ যাতনা !
না হেরি কোনও জনে, যে শিখায় সযতনে, নিবাতে গো এ জ্বালা—
তাড়াতে এ ভাবনা।
কাঁদায়েছি কত প্রাণ, তাই কাঁদে নিজ প্রাণ,
ঘুরিতেছি মহাশূন্যে, না পাই করুণা।
না লভি কোথাও শান্তি, সদা বেড়েছে অশান্তি,
জ্ঞানে অজ্ঞানে আছে যেয়েও ত যায় না॥

একবার, দুইবার, তিনবার সঙ্গীতটি উপর্য্যুপরি শ্রবণ করিতে লাগিলাম। কিন্তু যতই সে করুণ স্বর শুনিতে লাগিলাম, ততই যেন শ্রবণাকাঙ্ক্ষা বলবতী হইতে লাগিল। গায়কের কণ্ঠস্বর অতি মধুর এবং সেই কারণেই হউক বা অন্য কোন কারণেই হউক তাহাকে দেখিতে ইচ্ছা হইতেছিল। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, সঙ্গীতটি যেন বহুদূর হইতে আসিতেছিল, কিন্তু দুই তিন বার শ্রবণ করিবার পর আমার বোধ হইল, যেন উহা পশ্চাৎ স্থান হইতে গীত হইতেছে। আমি তৎক্ষণাৎ সে দিকে মুখ ফিরাইলাম এবং যাহা দেখিলাম, তাহা অত্যন্ত আশ্চর্য্যজনক ; কিন্তু অতি অল্পক্ষণেই সে আশ্চর্য্যভাব আনন্দে পরিণত হইল। আমি দেখিলাম যে, যে ব্যক্তিকে আমি অট্টালিকা পার্শ্বে আঁধারে বসিয়া থাকিতে দেখিয়াছিলাম সেই ব্যক্তি—আমার দিকে প্রফুল্লমুখে চাহিয়া আছে। পূর্ব্বে তাহার গাত্রে একখানি চাদর দেখিতে পাইয়াছিলাম, কিন্তু এক্ষণে তাহার পরিধানে কেবল মাত্র একখানি শুক্লবস্ত্র। আমি তাহার দিকে সতৃষ্ণ নয়নে চাহিলাম এবং কিছু বলিবার পূর্ব্বেই সেই লোকটি তাহার পূর্ব্ব-স্বাভাবিক স্বরে বলিতে লাগিল।

"তুমি হয়ত আমাকে দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া থাকিবে, কিন্তু আমি আমার পূর্ব্ব কথামতই কার্য্য করিয়াছি। তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে

আমাকে কিছু কষ্ট করিতে হইয়াছে এবং আমি হয়ত সাক্ষাৎ করিতে আসিতে পারিতাম না; কিন্তু কথামত কার্য্য না করিলে যে, শাস্তিভোগ করিতে হয়, সেই স্মৃতি মানস-পথে উদিত হওয়ায় আমি না আসিয়া থাকিতে পারিলাম না। আমি আর তোমার নিকট সঙ্গোপনে থাকিতে ইচ্ছা করি না। আমি যাহা বলি, তাহাতে ভয় না পাইয়া মনোযোগের সহিত শ্রবণ কর।" আমি তাহার দিকে শূন্যদৃষ্টিতে চাহিয়া কেমন আপনা আপনি বলিয়া ফেলিলাম—"আপনাকে এ স্থলে দেখিয়া প্রথমে কিছু আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া ছিলাম বটে কিন্তু এক্ষণে আহ্লাদিতও হইয়াছি। আপনার যাহা বক্তব্য আপনি বলুন আমি শ্রবণে বিচলিত হইব না।"

আমার কথা শুনিয়া সে ব্যক্তি স্মিতমুখে বলিতে লাগিল, "আমার নিজের কথা বলিবার পূর্ব্বে তোমাকে একটি কথা জানাইয়া রাখি। তুমি যে এ স্থলে বিশেষভাবে শক্তিহীন হইয়া পড়িয়া আছ—ইহা আমার শক্তিকৃত। ইহাতে জানিও যে দৈব বলের নিকট মনুষ্য শক্তির এক প্রকার অস্তিত্ব নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইহাতে অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ নাই, কারণ তুমি চেষ্টা করিয়া বুঝিয়াছ যে তুমি উঠিতে অসমর্থ। তোমাকে এরূপ অবস্থায় রাখিবার আর একটি উদ্দেশ্য আছে। ইহাতে মনুষ্যকুল জানিতে পারিবে যে, যে সকল বিষয় এক প্রকার তাহাদের বুদ্ধির অগম্য ও যাহাতে তাহাদের একপ্রকার আস্থা নাই, সেই সকল বিষয়ের দ্বারা অনেক সময়ে অনেক দুঃসাধ্য কর্ম্ম অতি সহজে সাধিত হইয়া থাকে, এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহারা অতি সুন্দররূপে বুঝিতে পারে যে, যে দেহ ধারণ করিয়া, তাহারা ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছে, তাহা ক্ষণভঙ্গুর, ও মুহূর্ত্ত মধ্যে তাহাদের কর্ম্মের ফলাফল জন্য অনন্তকাল অশান্তি ভোগের নির্দ্দিষ্ট সময় আগত হইতে পারে, এবং সেই সময়ের পূর্ব্বে তাহারা নিজেকে সেই সকল বিষয় হইতে রক্ষা করিয়া, আত্মচেষ্টায়

নিজেদের আভ্যন্তরিক বৃত্তিগুলি পরিস্ফুট করিয়া, তাহাতে উচ্চ শক্তি প্রদান করিয়া নিজেদের দুর্লভ মানব জন্ম গ্রহণের সার্থকতার পরিচয় দিতে সমর্থ হয়।

আমি নিজের বিষয় বিশেষ বলিতে প্রয়োজন বোধ করি না। তবে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি, আমি পূর্ব্বে একজন গায়ক ছিলাম এবং সেভাব এখনও ভুলিতে পারি নাই এবং সেই জন্যই মাঝে মাঝে গান গাহিয়া থাকি। আমি প্রায় তিন বৎসর পূর্ব্বে তোমার ন্যায় একজন মনুষ্য ছিলাম; কিন্তু সে দেহ আর নাই—এক্ষণে যাহা তুমি সম্মুখে দেখিতেছ, তাহা কেবল পূর্ব্বের ছায়ামাত্র। আর একটি কথা স্মরণ রাখিও যে, মনুষ্যকে সদা সর্ব্বদা সামান্য ঐহিক লাভের জন্য যেরূপ ছুটাছুটি করিতে দেখা যায় তাহা তাহাদের একরূপ বিকার। তাহারা বুঝে না যে, যে মনোরম আশার ছবি তাহাদের নয়নের সম্মুখে উদ্ভাসিত হয়, তাহা কেবল তাহাদিগকে বিপথগামী করে, এবং নিজেরা নিজেদের জন্য নানারূপ কষ্টের সৃষ্টি করে। আমার আর কিছু বলিবার নাই। আমার দর্শন নিদ্রার স্বপ্ন বলিয়া অনুমান করিও না। মনুষ্য সহজেই অবিশ্বাসী এবং তুমিও একজন মনুষ্য এবং যাহাতে তোমার অবিশ্বাস দূরীভূত হয় সে কারণে তোমার দরজার পার্শ্বে তিনটি কাল দাগ টানিয়া রাখিলাম ও তাহার নিম্নে "আমি" এই শব্দটি লিখিলাম। প্রাতে উঠিয়া দর্শন করিও। যাইবার সময় আবার বলি যেন কথা গুলি ভুলিও না।"

এই বলিয়া সেই মূর্ত্তি সহসা অন্তর্হিত হইল এবং সঙ্গে সঙ্গে আমার বোধ হইল যেন পূর্ব্ব শক্তি ফিরিয়া পাইলাম। আমি তাহার দর্শনের জন্য প্রান্তরের নানাস্থানে খুঁজিলাম; কিন্তু কোথাও দেখিতে পাইলাম না। কিছুক্ষণ পরে হঠাৎ আমার নিদ্রাভঙ্গ হইল এবং দেখিলাম যে সেরূপ শৈত্যেও আমার সমস্ত শরীর দিয়া ঘর্ম্ম বহির্গত হইয়াছে। প্রাতে উঠিয়া

তাড়াতাড়ি দরজা খুলিয়া পার্শ্বে দেখিলাম যে যথার্থ পূর্ব্ব কথামত সেখানে তিনটি কয়লার দ্বারা লিখিত রেখা ও তৎনিম্নে বড় বড় অক্ষরে লিখিত রহিয়াছে "আমি।"

"পুনরাগমন।"

(২৭)

আমার আর দেশে যাওয়া হইল না। ছোট ঠাকুর দা ও বেচুকে সঙ্গে লইয়া আমি কলিকাতায় ফিরিলাম।

পূর্ব্বরাত্রে দস্যুর আক্রমণের যতটা গুরুত্ব অনুভব করিয়াছিলাম, এখন দেখিলাম তাহা নয়। হরিয়া ও দরোয়ানের আঘাত সামান্য, বেহারারা সকলেই অক্ষত দেহে ফিরিয়াছে। পালকীর উপরে আঘাতটা গুরুতর হইলেও তাহার সামান্য ক্ষতি হইয়াছে। বুঝিলাম, আমরা সকলে ভয়েই মৃতপ্রায় হইয়াছিলাম। আরও বুঝিলাম যদি আমরা সকলে কিঞ্চিৎ পুরুষোচিত সাহস দেখাইতে পারিতাম, তাহা হইলে আমাদিগের এতটা লাঞ্ছনা হইত না। দস্যুদল যদি বলবান্ হইত তাহা হইলে এক শীর্ণকায় ব্রাহ্মণের আগমন দর্শনে ভীত হইয়া পলায়নপর হইত না। চিন্তা করিতে গিয়া বিপদটা আমার কাছে ছোট হইয়া গেল, পূর্ব্বরাত্রের সমস্ত ঘটনা ছায়াবাজীর মত মনে হইতে লাগিল।

যাই হ'ক, মনের কথা মনেই বিলীন করিয়া কলিকাতায় যাত্রা করিলাম। পিতামহের একান্ত অনুরোধে পালকীতে উঠিলাম। স্থানে স্থানে বিশ্রাম লইয়া বেহারারা সহযাত্রীদের সঙ্গ লইতে লাগিল।

যে পথ অবলম্বন করিয়া দেশে যাইতেছিলাম, সে পথে আমাদের

ফেরা হইল না। খুল্লপিতামহের আদেশে আমরা চণ্ডীতলার পথ ধরিয়া উত্তরপাড়া অভিমুখে চলিলাম। কেন যে সে পথ অবলম্বন করিলাম, তাহা আমার সম্যক বোধগম্য না হইলেও আমার মনে হইল পথশ্রমের অনেকটা লাঘব হইবে বিবেচনা করিয়া তিনি আমাদিগকে এই পথে চলিতে আদেশ করিয়াছেন। কেননা উত্তরপাড়ায় পৌঁছিলে, সেখান হইতে সকলে নৌকাযোগে কলিকাতায় উপস্থিত হইতে পারিব।

চণ্ডীতলা অতিক্রম করিয়া আনুমানিক আধক্রোশ পথ আসিয়া একটা বটবৃক্ষতলে বসিয়াছি, এমন সময় দেখি সেই দস্যুটা একটা গ্রাম্য পথ অবলম্বন করিয়া আমাদের দিকে আসিতেছে।

প্রথমে সে আমাকে দেখিতে পায় নাই। সুতরাং নিঃশঙ্কচিত্তে সে বটবৃক্ষের দিকে অগ্রসর হইতেছিল। আমি প্রথমে তাহাকে দেখিবামাত্র চমকিত হইয়াছিলাম। কিন্তু সে ভাব ক্ষণমধ্যেই দূর হইয়া গেল। আমি প্রতিশোধ লইবার জন্য উৎসুক হইলাম। আমার পালকী দেখিবা-মাত্র তাহার দ্রুতগতি মন্দীভূত হইয়া আসিল; তৎপরে আমাকে দেখি-য়াই সে অগ্রগমনে বিরত হইল। আমি বুঝিলাম সে পলায়নের উদ্যোগ করিতেছে। বুঝিবামাত্র উচ্চকণ্ঠে ছোট ঠাকুর দাদাকে ডাকিলাম। বেহারারাও তাহাকে চিনিল। কিন্তু এক পদও অগ্রসর না হইয়া, পর-স্পরে জড়াজড়ি করিয়া আমার সঙ্গে চীৎকার জুড়িয়া দিল।

তুলাসিং, হরিয়া প্রভৃতি আসিতে না আসিতে দস্যু অদৃশ্য হইল। তুলাসিং নিকটে আসিয়া যেমন সমস্ত কথা শুনিল, অমনি লাঠী কাঁধে ডাকাতের উদ্দেশে গ্রামাভিমুখে ছুটিল, এবং অল্পক্ষণ পরেই ফিরিল। তাহার কাঁধের লাঠী কাঁধেই রহিল, পাপিষ্ঠ ডাকাতের পিঠে পড়িবার অব-কাশ পাইল না। হরিয়া ডাকাতের কথা শুনিবামাত্র কাঁপিতে আরম্ভ করিল। সে ভাবিয়াছিল, দস্যু এখনও তাহাদের পিছু ছাড়ে নাই।

আমি তাহাকে আশ্বাস দিয়া তাহার ভয় দূর করিতেছি, এমন সময় ঠাকুরদাদা এক ব্রাহ্মণকে সঙ্গে লইয়া উপস্থিত হইলেন।

ব্রাহ্মণ আসিয়াই তাঁহার গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করিতে আমাকে অনুরোধ করিল। তখন বেলা দ্বিতীয় প্রহর অতীত হইয়াছে। শরতের রৌদ্র প্রখরতায় নিদাঘমার্ত্তণ্ডতাপকেও পরাস্ত করিয়াছে। তৃষ্ণায় আমি বিশেষ কাতর হইয়াছিলাম ; এবং সেই জন্য স্নানাদি কার্য্য ও বিশ্রামের আমার বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছিল, কিন্তু ঘটনা-পরম্পরায় আমার চিত্ত তখন এতদূর ব্যাকুল যে, আমি মনে করিলাম, বাড়ীতে পৌঁছিতে না পারিলে কিছুতেই সুস্থ হইতে পারিব না।

আমি ব্রাহ্মণের নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করিলাম। ব্রাহ্মণের সাগ্রহ আবেদন, পিতামহের অনুরোধ সমস্তই উপেক্ষা করিলাম। বিফলমনোরথ হইয়া ব্রাহ্মণ বিষণ্ণমনে ফিরিয়া গেল। এমন সময় বেচু আসিল : বেচু উৎফুল্ল হইয়া আসিতেছিল। ঠাকুরদাদা ও বেচুর ভাবে বোধ হইল, তাহারাই পূর্ব্ব হইতে আমার আহারাদির ব্যবস্থা করিতেছিল। ব্রাহ্মণকে ফিরিতে দেখিয়া, এবং দাদার কাছে আমার যাওয়া হইল না শুনিয়া বেচু ক্ষুণ্ণ হইল। বলিল—"শুনিবামাত্র ব্রাহ্মণ সমূহ আয়োজন করিয়াছে।"

আমি বলিলাম—"আমিত তোমাদের আগে আগে আসিতেছি। তোমরা বরাবরই আমার পশ্চাতে আসিতেছিলে। এরই মধ্যে ব্রাহ্মণ কখন সংবাদ পাইল যে 'সমূহ' আয়োজন করিয়া ফেলিল!

বেচু বলিল—"আমি ব্রাহ্মণকে সংবাদ দিবার জন্য অনেক আগে পথ ছাড়িয়া গ্রামে প্রবেশ করিয়াছিলাম।"

আমি। কিন্তু আমিত তার সংবাদ রাখি নাই। আমি যদি এখানে বিশ্রাম না করিয়া বরাবর চলিয়া যাইতাম ?

বেচু। কেমন করিয়া যাইবেন! আমি যে বেহারাদের এই গাছ-তলায় অপেক্ষা করিতে বলিয়াছি।

আমি। তথাপি আমি এটা বিশ্বাস করিতে পারি নাই যে, এই অল্প সময়ের মধ্যে ব্রাহ্মণ 'সমূহ' আয়োজন করিয়া ফেলিয়াছে।

বেচু। আপনি ওই ব্রাহ্মণকে কি দেখিলেন বাবু? হাঁটু পর্য্যন্ত কাপড় আর শুধু পা দেখিয়া আপনি হয়ত উহাকে রাঁধুনি বামুন মনে করিয়াছেন।

আমি। তাইত করিয়াছি। তাহা ছাড়া ও ব্যক্তি আর কি হইতে পারে?

ছোট ঠাকুরদাদা কথায় বাধা দিলেন। বলিলেন—"যাক্, যখন যাওয়া হইল না তখন আর বাগ্বিতণ্ডায় প্রয়োজন কি?"

বেচু ঈষৎ রুক্ষকণ্ঠে বলিল—"যাওয়া যখন আপনার হাত নয় জানি-তেন, তখন এ গরীব ভৃত্যকে ব্রাহ্মণের বাড়ীতে পাঠাইয়া কেন অপ্রস্তুত করিলেন। ব্রাহ্মণ ইহারই মধ্যে পুকুর হইতে রাশীকৃত মাছ ধরাইয়া রন্ধনের আয়োজন করিয়া দিয়াছে। দুধ ক্ষীর ভারে ভারে আসিয়াছে।"

ঠাকুরদা' বলিলেন—"ভয় নেই বেচু, ও অতিথেয় ব্রাহ্মণের গৃহে অতিথির অভাব হইবে না। তবে ভাইজীকে যে উদ্দেশ্যে এই পথে আনিয়াছিলাম, তাহা পণ্ড হইল। গঙ্গাতীরে পৌঁছিতে তৃতীয় প্রহর হইবে, বাটী পৌঁছিতে সন্ধ্যা। সুতরাং পথের কোনও স্থানে আহারের ব্যবস্থা না করিলে যে চলিবে না। আমরা বিশ্রামযোগ্য স্থান পরিত্যাগ করিয়া প্রায় একক্রোশ চলিয়া আসিয়াছি। এখন উত্তরপাড়া ভিন্ন পথের মাঝে অন্য কোনও স্থানে হাট বাজার নাই। তা হ'লে উপায়?"

আমি বলিলাম—"আমার আহারের প্রয়োজন নাই।"

দুধ ক্ষীরের কথা শুনিয়া তুলাসিং বিশেষ আকৃষ্ট হইয়া পড়িল। সুতরাং সেই সঙ্গে সে আমার শারীরিক মঙ্গলচিন্তায় বিশেষ ব্যস্ত হইয়া, আমাকে আতিথ্যগ্রহণে অনুরোধ করিল। আমি তাহাকে ভোজনপটু বলিয়া তিরস্কার করিলাম। বলিলাম—"কাল তুমি পেটের জন্য আমাকে বিপদে ফেলিয়াছ, আজ আবার সেই খাওয়ার কথা তুলিতে তোমার লজ্জা করে না? তোমার ও প্রকাণ্ড লাঠী আজ গঙ্গাতীরে যাইয়া গঙ্গাজলে ভাসাইয়া দাও।"

লাঠী ফেলার কথা শুনিয়া তুলাসিংএর বড়ই অপমান বোধ হইল। সে তখন সেই অনুদ্দিষ্ট শ্বশুরাত্মজকে প্রিয় সম্বোধন করিতে করিতে তাহার অন্ধকারের গোপন রহস্যের উপর যথেষ্ট কটূক্তি প্রয়োগ করিল; এবং আজ তাহাকে ধরিতে পারিলে, তাহার সঙ্গে সম্বন্ধের যে একটা পূর্ণ মীমাংসা করিয়া লইত, তাহা ভূমিতে বার কয়েক লাঠীর আঘাতে প্রমাণ করিয়া দিল।

আমি তাহাতে বড় আশ্বস্ত হইলাম না। আমি চলিতে দৃঢ়সঙ্কল্প হইলাম।

পিতামহ বেচুকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"বেচু, ভাইজীর কথায় আর প্রতিবাদ করিওনা—সঙ্গে চল।"

সেই দ্বিপ্রহরের রৌদ্রে সকলেই আমার অনুগামী হইল।

বটবৃক্ষমূল হইতে রশীখানেক পথ চলিয়াছি, এমন সময় পথের পার্শ্বের গুল্মকুঞ্জবহুল এক আম্রকাননের ভিতর হইতে পূর্ব্বরজনীর সেই সুপরিচিত কর্কশ কণ্ঠ আমাদিগকে অগ্রগমনে বিরত হইতে আদেশ করিল।

লোকপূর্ণ পল্লীর সন্নিকটে আসিয়া যথেষ্ট সাহস, যথেষ্ট লোকবল সত্ত্বেও মন্ত্রাদিষ্টের মত আমরা চলিতে বিরত হইলাম। আমার

ভোজনবিশারদ শরীররক্ষীর স্কন্ধ হইতে নিরীহ বংশশিশু ভূপতিত হইল।

আমি পালকীর ভিতর হইতেই তুলাসিংএর অবস্থা দেখিলাম। দেখিয়াই তাহার উপরে জীবন নির্ভরতা পরিত্যাগ করিলাম। অনন্যোপায় হইয়া খুল্লপিতামহকে ডাকিলাম—“দাদা মহাশয়!”

পিতামহ উত্তর করিলেন—“ভয় কি ভাই, নিকটেই আছি।”

বেচু পাল্‌কীর কাছে আসিয়া বলিল—“ভয় কি দাদাবাবু! যেখানে দাদাঠাকুর আছেন, সেখানে যম পর্য্যন্ত আসিতে পারিবে না। কে আসিতেছে, আর কেনই বা আসিতেছে দাঁড়াইয়াই দেখা যাক্।”

নিরুপায়ে আমাকে আশ্বস্ত হইতে হইল। হরিয়া তুলাসিংএর পশ্চাতে দাঁড়াইয়া কাপড় আঁটিয়া পরিতেছিল। অন্তরালস্থ দস্যুর চীৎকারে তাহার বসন স্রস্ত হইয়াছিল কিনা তাহা জানা যায় নাই, কিন্তু তাহার হৃদয়কবাটটা যে খুলিয়া গিয়াছে, তাহা বেশ বুঝা গেল। বেচু যখন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল—“কি হ'র! মালকোচা করছিস্ ডাকাতের সঙ্গে লড়াই দেবার জন্য, না, ছুট দেবার জন্য।” হরিয়া মাতৃভাষার স্রোতের উপর দিয়া কতকগুলা মনের কথা এতদ্রুত ভাসাইয়া দিল যে, আমার কর্ণরন্ধ্রের খুলি দিয়া শত চেষ্টাতেও তাদের একটাকেও ধরিতে পারিলাম না।

একটা শৃগাল একদিক্ হইতে রব তুলিলে যেমন সহস্র শৃগাল চারিদিক্ হইতে বিষম কোলাহলে নৈশ সমীরণ কাঁপাইয়া তুলে, হরিয়ার কথায় আমার আটটা বেহারাও সেইরূপ করিয়া তুলিল। তাহারা আমার পালকী ভূমিতে নামাইল। ভাবে বোধ হইল, এইবার তাহারা আমাদের ফেলিয়া পলাইবে। এমন সময়ে দস্যু তাহাদের গন্তব্য পথের মুখে উপস্থিত হইয়া তাহাদিগকে আটক করিল।

আমি সাহসে ভর করিয়া পালকীর বাহিরে আসিলাম। দস্যু ধীরেধীরে আমাদের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। তাহার হাতের লাঠী তাহাকে ছাড়াইয়া হাতখানেক ঊর্দ্ধে উঠিয়াছিল। সে সেই লাঠী পথের পার্শ্বের একটা খেজুর গাছে ঠেসদিয়া রাখিল। তারপর রিক্ত হস্তে আমার কাছে উপস্থিত হইল। তাহার কার্য্য দেখিয়া সকলেই অবাক, তাহার সাহস দেখিয়া আমরা সকলেই বিস্মিত। বেহারা হইতে আরম্ভ করিয়া পিতামহ পর্য্যন্ত সকলেই স্থিরভাবে যে যাহার স্থানে দাঁড়াইয়া রহিল। কাহারও মুখে কথা নাই। সেই দ্বিপ্রহরে রবিকরতপ্ত পথে নিশ্বাস পর্য্যন্ত বন্ধ করিয়া আমরা সেই বৃদ্ধের গতিবিধি দেখিতেছিলাম। সমীরণ পর্য্যন্ত নিস্তব্ধ।

বৃদ্ধ আমাদের কাছে আসিয়াই আমাকে প্রণাম করিল। তারপর বলিল—"আমার মনিব তোমাদের জন্য আহারের উদ্যোগ করিয়াছেন, তোমরা আহার না করিয়া কেহই এখান হইতে যাইতে পারিবেনা।"

কোথা হইতে কি হইল! কি ব্যবহার প্রত্যাশা করিতে একি ব্যবহার প্রাপ্ত হইলাম! মনে মুহূর্ত্তের ভিতরে নানারূপ তর্ক উঠিল। একবার মনে করিলাম, লোকটা যাহা বলিতেছে তাহা সত্য; আর বার মনে হইল, হয়ত এ আমার সঙ্গে প্রতারণা করিতেছে। একা এত-লোকের সঙ্গে যুঝিতে পারিবেনা, কৌশলে আমাদিগকে আয়ত্ত করিবার চেষ্টায় আছে।

আমার সাহস হইল, কথা ফুটিল। আমি বলিলাম,—"তুমিইত কাল আমাদিগকে মাঠের মাঝে আক্রমণ করিয়াছিলে!"

বৃদ্ধ হাসিয়া উত্তর করিল—"আক্রমণ করিলে কি তোমরা কেউ প্রাণ লইয়া ফিরিতে পারিতে হজুর! আমি একটু তামাসা করিয়াছিলাম।

বিনা অপরাধে তোমার এই ভোজনদড় ভোজপুরীটা আমার অপমান করিয়াছিল। তাই তাকে একটু শিক্ষা দিয়াছিলাম।"

আমি বলিলাম—"যে কার্য্য করিয়াছ, জান, তারজন্য তোমাকে জেলে যাইতে হইবে?"

বৃদ্ধ পূর্ব্ববৎ হাসিয়াই উত্তর দিল—"মান রাখিতে হইলে জেলের ভয় করিলে চলেনা। সে যা হইবার পরে হইবে, এখন আমার মনিবের ঘরে পায়ের ধূলা দিবে চল।"

"আমার যাওয়া চলিবেনা।"

"চলিতেই হইবে।"

দস্যুর ব্যবহার দেখিয়া ও তাহার কথা শুনিয়া তুলাসিংএর সাহস ফিরিল। সে বলিল—"হুজুর নেহি যাগা।"

বৃদ্ধ একটু ঘৃণার সহিত বলিল—"তুই থাম্ বাবু, আর বড়াই করিসনা।" তাহার উত্তরের ভাবে বোধ হইল, তুলাসিংএর উপর তাহার রাগ মরে নাই।—সে বলিতে লাগিল—"তুইত তোর মনিবের লাঞ্ছনার কারণ। তোর জন্যইত এই পঁচাত্তর বৎসর বয়সে আমাকে ব্রাহ্মণের গায়ে হাত তুলিতে হইয়াছে।" তৎপরে সে আমার দিকে ফিরিয়া বলিল,—"হুজুর! আর দেরি করিয়োনা, বেলা অতিরিক্ত হইয়াছে।"

আমি তখন তাহার পঞ্চসপ্ততিবৎসর বয়সের দেহ-সৌষ্ঠব ও বিক্রম দেখিয়া বিস্ময়বিমুগ্ধভাবে চিন্তা করিতেছিলাম; সুতরাং তাহার কথার কোনও উত্তর দিলাম না। আমার পরিবর্ত্তে তুলাসিং রুক্ষস্বরে উত্তর করিল—"কভি নেহি যাগা।"

"আলবৎ যাগা" বলিয়াই বৃদ্ধ আমার দিকে চাহিয়া বলিল,—"কি হুজুর! যাবে কি না যাবে বল।"

তুলাসিং এই উত্তর শুনিয়াই নিরুত্তর। হরিয়া ও বেহারারা আবার পলায়নোন্মুখ হইল। বৃদ্ধ নয়নের ইঙ্গিতেই তাদের গমনে নিরস্ত করিল।

খুল্লপিতামহ ও বেচু উভয়েই নীরব। তাহাদের নীরবতায় আমার মনে অভিমান আসিল। একটিমাত্র কথার সাহায্য না করায় আমার মনে হইল খুল্লপিতামহ আমার এ অপমানে বৃদ্ধের সাহায্য করিতেছেন। আমি একবার তাঁহার দিকে চাহিলাম, দেখিলাম তিনি মাটীর দিকে চাহিয়া আছেন। জিজ্ঞাসা করিলাম—"দাদা মহাশয়! কি করিব?"

ঠাকুরদাদা মুখ তুলিয়া উত্তর দিলেন—"আমি কি বলিব, তোমার যা অভিরুচি।"

"এরূপভাবে অপমানিত হইয়া আমার আতিথ্য গ্রহণ করিতে অভিলাষ নাই।"

"কিন্তু উহারা যে ছাড়িতে চাহিতেছে না!"

"আমার বিশ্বাস আপনি বলিলেই ছাড়ে।"

"বেশ, বলিয়া দেখি।" এই বলিয়া ঠাকুরদাদা গ্রামাভিমুখে গমনোদ্যত হইলেন। দুই চারিপদ অগ্রসর হইতে না হইতে সেই ব্রাহ্মণ আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাকে দেখিবামাত্র দাদা মহাশয় বলিলেন,—"মুখুজ্যে মহাশয়! অনিচ্ছুক ব্যক্তিকে বলপূর্ব্বক অতিথি করিয়া গৃহস্থের ক্ষতি ভিন্ন লাভ নাই। আপনি ধার্ম্মিক ব্রাহ্মণ,—আপনি এ ধর্ম্মবিরুদ্ধ কার্য্য করিতে যাইতেছেন কেন?"

ব্রাহ্মণ বলিল—"বেশ, বাবু যদি এ গরীব ব্রাহ্মণের ঘরে পদধূলি দিতে ইচ্ছা না করেন, আমি সামগ্রীগুলা উঁহার সঙ্গে পাঠাইয়া দিই।"

আমি তাই শুনিয়া বলিলাম,—"আমি আজই যে কোন উপায়ে গৃহে ফিরিব। পথে কোথাও বিশ্রাম করিব না। সুতরাং আপনার সামগ্রী লইয়া কি করিব?"

ব্রাহ্মণ বলিল,—"বেশ, বাড়ীতেই লইয়া যান।"

আমি বলিলাম,—"প্রয়োজন নাই।"

ব্রাহ্মণ বলিল,—"তবে কি আমার আয়োজন পণ্ড হইবে?"

দাদা মহাশয় বলিলেন—"আজ মহাষ্টমীর দিন। মুখুজ্যে মহাশয়! আপনার ন্যায় পুণ্যশীল গৃহস্থের আতিথ্যের আয়োজন পণ্ড হইতে পারে না।"

ঠিক এমনি সময়ে একটী বালিকা সেখানে ছুটিয়া আসিয়া বলিল,—"দাদা মহাশয়! চলিয়া আসুন। আমাদের গৃহে এক চমৎকার অতিথি আসিয়াছেন।" শুনিবামাত্র ব্রাহ্মণের চক্ষু হইতে আনন্দাশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল। সে তখন দাদামহাশয়কে সভক্তি নমস্কার করিয়া বলিল—"আপনি সাধু, আপনার বাক্য মিথ্যা হইবে কেন? মহামায়া এ অধম সন্তানের প্রতি কৃপা করিয়াছেন। আপনি তবে শুনুন—"আমি লোক ডাকিয়া এ বয়স পর্য্যন্ত অতিথি করি নাই। অতিথি যদি ইচ্ছাপূর্ব্বক আমার গৃহে পদধূলি দেন, তবেই তাঁর সেবা করি। এ বয়স পর্য্যন্ত একদিনও আনন্দময়ীর কৃপা হইতে বঞ্চিত হই নাই। তৃতীয় প্রহরের মধ্যে যেখান হইতেই হউক, মা আমার অতিথিরূপে আসিয়া আমাকে কৃপা করিয়াছেন। আজ আপনার এই সেবক আপনাদের আগমন-বার্ত্তা আমাকে শুনাইয়াছিল। আমি উহার কথামত উৎফুল্ল হইয়া ইহাদের জন্য আয়োজন করিয়াছিলাম। না আসার কথা শুনিয়া মর্ম্মাহত হইয়াছিলাম, জ্ঞান হারাইয়াছিলাম। তাই এই দুষ্কর্ম্ম করিয়াছি। এই বলিয়া ব্রাহ্মণ আমার দিকে ফিরিল, এবং করজোড়ে বলিল—"বাবু! তোমাকে অনর্থক কষ্ট দিয়াছি। আমার মনের কথা শুনিলে, আমার অপরাধ লইবে না।"

আমি যে কিরূপ অপ্রস্তুত হইলাম, তাহা আপনারাই অনুমান করিয়া লউন। হায়! পদে পদে লাঞ্ছনার শিক্ষা পাইতেছি, তবুও আমার

জ্ঞান হইল না! আমি একবার মনে করিলাম ব্রাহ্মণের ঘরে অতিথি হই। কিন্তু অসদ্ব্যবহারে আমি অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছিলাম, সুতরাং ফিরিতে আমার সাহস হইল না। আর একটী বিশেষ কারণে আমার ফিরিবার ইচ্ছাছিল, তাহা পরে বলিতেছি। আমিও করজোড়ে ব্রাহ্মণের কাছে ক্ষমা চাহিলাম। বলিলাম—"বিশেষ প্রয়োজন না থাকিলে আপনার গৃহে অতিথি হইতাম। আতিথ্য গ্রহণ করিতে পারিলাম না বলিয়া আমি দুঃখিত।"

অবশ্য আপনাদের এটা বুঝাইতে হইবে না, এটা ইংরাজী আদব-কায়দা; আমার বিশেষ প্রয়োজনও ছিল না, এবং দুঃখটাও যে কি, সম্যক্ তাহা অনুভব করিতে পারি নাই। আমরা ইংরাজীভাবের অনুকরণে আজকাল হাসিতে হাসিতে শোক-সভা করিয়া থাকি। শোক-সভা আজ-কাল একটা উৎসবের স্থান অধিকার করিয়াছে। আমিও কালের মর্য্যাদা রাখিতে দুঃখ প্রকাশ করিলাম। ব্রাহ্মণ আমার কথায় সন্তুষ্ট হইল।

দাদামহাশয় বলিলেন -"আপনার গৃহে অতিথি হইয়া ধন্য হইব মনে করিয়াছিলাম। কিন্তু মহামায়ার ইচ্ছা নয় বলিয়া হইল না। অতিথি হইবার ইচ্ছা রহিল, ভাগ্যে থাকে হইব"

ব্রাহ্মণ সেই কথা শুনিয়া জোড়করে ভক্তিগদগদস্বরে বলিল—"সে শুভ ভাগ্য কি আমার হইবে?"

দাদামহাশয় বলিলেন,—"ভাই জাউর সঙ্গে যাইতে প্রতিশ্রুত হইয়াছি, —না যাইলে বাক্য মিথ্যা হইবে। আমিও আজ হইতে সে শুভ ভাগ্যের প্রতীক্ষা করিতে রহিলাম।"

আমিও দাদার দেখাদেখি বলিলাম,—"আমারও আপনার গৃহে অতিথি হইবার ইচ্ছা রহিল। প্রতিশ্রুত হইতেছি, যদি কখন এদিকে আসি, আপনার আতিথ্য গ্রহণ করিব।"

এই সময় সেই বৃদ্ধ দস্যু ভূমিষ্ঠ হইয়া আমার পদে মস্তক অবনত করিল, এবং বলিল—"হুজুর! কাল রাত্রের বেয়াদবী মাপ করিতে আজ্ঞা হয়।"

বৃদ্ধকে শাস্তি দেবার আমার বলবতী ইচ্ছা হইয়াছিল। মনে করিয়াছিলাম যখন তাহার আবাসস্থানের সন্ধান পাইয়াছি, তখন ঘরে ফিরিয়া পুলিশকে সমস্ত ঘটনা জানাইব। কিন্তু ঘটনাস্রোতে পড়িয়া বৃদ্ধকে ক্ষমা করিতে হইল।

ব্রাহ্মণী একবার বৃদ্ধকে জিজ্ঞাসা করিল—"কাল রাত্রে কি করিয়াছিলে নিতাই?"

আমি বলিলাম—"জানিবার প্রয়োজন নাই।" দাদা মহাশয়ও বলিলেন, "জানিবার প্রয়োজন নাই।" ব্রাহ্মণ আর জিজ্ঞাসা করিল না। দাদা মহাশয়কে নমস্কার করিয়া—পৌত্রী কি দৌহিত্রী জানি না—নাতিনীর হাত ধরিয়া ব্রাহ্মণ প্রস্থান করিল। বৃদ্ধ দস্যু ব্রাহ্মণের অনুগামী হইল। দাদা মহাশয় বলিলেন,—"আর কেন বিলম্ব ভাই, পালকীতে উঠ। এস আবার চলিতে আরম্ভ করি।"

আমরা আবার চলিতে আরম্ভ করিলাম। চলিতে চলিতে বেচু একবার দাদাকে জিজ্ঞাসা করিল,—"হাঁ, দাদাঠাকুর! "চমৎকার অতিথি" কি রকম বুঝিতে পারিলে?"

দাদা বলিলেন—"বোধ হয় কোন সন্ন্যাসী আসিয়া আতিথ্যগ্রহণ করিয়াছেন।"

বেচু। তা হইতে পারে। কিন্তু চমৎকার অতিথির যে সংবাদ লইয়া আসিল, সেরূপ চমৎকার কন্যা আর কখন দেখিয়াছ কি?"

দাদা। তুমি দেখিয়াছ কি?

বেচু। না, দাদা ঠাকুর, আমি দেখি নাই।

দাদা ক্ষণেক নীরব রহিলেন, তার পর বলিলেন—"সাক্ষাৎ দেবীমূর্ত্তি ; যে উহার স্বামী হইবে সে শিবতুল্য ভাগ্যবান্।"

"শড়া বড় ভারী"—কাব্যরস-সম্পন্ন আমার বাহক প্রণয়ীদিগের মধুর আপ্যায়ন-কোলাহল দাদা মহাশয়ের কথা ডুবাইয়া দিল। বেহারাদের গতি ও কথা রোধ করিতে আমি সাহসী হইলাম না। মুহূর্ত্ত মধ্যে তাঁহার নিকট হইতে দারুণ নিয়তি কর্ত্তৃক আমি অপহৃত হইলাম।

যাইতে যাইতে আপনাদের বলি—' ওই বালিকাটীকে দেখিয়া আমার ব্রাহ্মণগৃহে যাইবার ইচ্ছা হইয়াছিল। বালিকার বয়স অনুমান দশ-বৎসর। কলিকাতার বহুধনাঢ্যের সহিত সংস্রবহেতু আমি অনেক সুন্দরী বালিকা—ব্রাহ্মণ কায়স্থের কন্যা দেখিয়াছি, কিন্তু এরূপ নয়নাভিরাম কোমল-মূর্ত্তি আমিও আর কখন দেখি নাই। বনান্তরাল হইতে বাহির হইয়া যখন বালিকা প্রথম আমার দৃষ্টিপথে পতিত হয়, তখন মনে হইয়াছিল যেন শ্যামা প্রকৃতি মূর্ত্তি ধরিয়া আমাদিগকে স্নিগ্ধচ্ছায়ায় সুশীতল করিতে নিমন্ত্রণ করিতে আসিয়াছে।

কিন্তু কেমন করিয়া নিমন্ত্রণ রক্ষা করিব ! (খ) পালকীর ভিতরে বসিয়া ছোট ঠাকুরদাদাকে লুকাইয়া, বেহারাদের উচ্চমধুপ্রিয়সম্বোধনের অন্তরালে একবার গাহিলাম—"দোষ কারও নয়গো মা ! আমি স্বখাদ সলিলে ডুবে মরি।"

শ্রীক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ।

(খ) হায় ব্রাহ্মণ ! জুতা, জামা ও নির্ম্মলবস্ত্র না পরিয়া, এমন অমূল্যরত্নের অধিকারী তুমি, রাঁধুনি বামুনের বেশে আমাকে প্রতারিত করিলে কেন ?

দাদা ম'শায়ের ঝুলি।

(১ম ভাগ, ৫৭৬ পৃষ্ঠার পর)

২

বৈশাখ মাস। বেলা অবসান হইয়া আসিয়াছে। পশ্চিমাকাশের এক কোণে ক্ষুদ্র মেঘ-খণ্ড দেখা দিয়াছে। দেখিতে দেখিতে উহা বর্দ্ধিতাকার হইয়া গগন-প্রান্ত ছাইয়া ফেলিবার উপক্রম করিল। বিধাতাও বুঝি কাব্যকলা ভালবাসেন, তাই কোথা হইতে বলাকারাজি আসিয়া সারি দিয়া সেই নবীন মেঘের তলে ভাসিতে লাগিল। সে কি শোভা! জীবনে যে একবার দেখিয়াছে, সে কি আর ভুলিতে পারিবে? ব্যোমকেশ করতলে কপোল বিন্যস্ত করিয়া এই প্রাকৃতিক মাধুরী উপভোগ করিতেছিল। ক্রমে সে যেন ভাবসাগরে ডুবিয়া গেল। বৃদ্ধ ভট্টাচার্য্য আসিয়া যে তাহার নিকট দাঁড়াইয়া, তাহার সেই ভাবাবেশ লক্ষ্য করিতেছিলেন, সে জ্ঞান তাহার কিছুমাত্র হয় নাই।

কিয়ৎক্ষণ এই ভাবে কাটিলে পর ভট্টাচার্য্য প্রথমে কথা কহিলেন। বলিলেন "আহা দ্যাখ্, প্রাণ ভরে দ্যাখ্। মার আমার এই নবঘনশ্যাম রূপ বড় মধুর! শ্রীমতী এইরূপ দেখে আত্মহারা হ'তেন। তাঁর নবনটবর শ্যাম-সুন্দরকে মনে হ'ত।"

ভট্টাচার্য্যের কথায় ব্যোমকেশের ধ্যান ভঙ্গ হইল! সে তাঁহার চরণ-রেণু মস্তকে গ্রহণ করিয়া উত্তর করিল "দাদা ম'শায়, যথার্থই ব'লেছেন। যদি রূপতৃষ্ণা মিটাইতে হয়, তবে সে এইরূপ ধ্যান ক'রে। এর কাছে কি ছার রূপ-লাবণ্য!

ভট্টাচার্য্য। সবই সেই তাঁরই রূপ। যার চক্ষু আছে, সেই দেখ্‌তে

পায়। অর্জ্জুনকে স্বীয় বিভূতির কথা বলবার সময় শ্রীভগবান্ ব'লেছেন যে, তাঁর দিব্য বিভূতির অন্ত নাই। আরও ব'লেছেন :—

যদ্‌যদ্বিভূতিমৎ সত্বং শ্রীমদূর্জ্জিতমেব বা।
তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোংশসম্ভবঃ॥

অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ডে যাহা কিছু বিভূতিমান, শ্রীমান্ ও উর্জ্জস্বল বস্তু দেখিতে পাওয়া যায়, সে সমস্তই শ্রীভগবানের তেজাংশ-সম্ভূত। অতএব সব শ্রী, সব সৌন্দর্য্য তাঁহাতেই। তাই তিনি শ্রীপতি। হঠাৎ সোঁ সোঁ শব্দে ঝড় উঠিল এবং সেই সঙ্গে প্রবল বেগে বৃষ্টিপাত ও মুহুর্মুহু বজ্র-নিনাদ আরম্ভ হইল। আকাশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত বিদ্যুদ্দাম ক্রীড়া করিতে লাগিল। বাত্যা-বিতাড়িত বৃক্ষরাজি এই যেন ধরাশায়ী, আবার পরক্ষণেই নভোমণ্ডল ভেদ করিয়া স্ব স্ব মস্তক সঞ্চালিত করিতে লাগিল। যেন অন্তরীক্ষ-মণ্ডলে দেবাসুর-সংগ্রাম বাধিয়া গেল। আর তাহাদের ঘন ঘন হুহুঙ্কারনাদ ও ক্রোধদীপ্ত জ্যোতি যেন বজ্র ও বিদ্যুৎরূপে বিশ্ববাসিগণের হৃদয়ে প্রলয়-ভীতি উৎপন্ন করিল।

মুহূর্ত্ত মধ্যে প্রকৃতির এই পরিবর্ত্তনে ভট্টাচার্য্যের মুখমণ্ডল গম্ভীর ভাব ধারণ করিল। তিনি যেন উর্দ্ধনেত্র হইয়া কাহার ধ্যান করিতে লাগিলেন। তাঁহার এই ভাবান্তর দেখিয়া ব্যোমকেশ কহিল "দাদা ম'শায় এ কি রূপ?"

ভট্টাচার্য্য। দেখিতেছিস্ না যে, ভূতমণ্ডলী সঙ্গে করিয়া ভূতভাবন ভূতনাথ ভৈরব মূর্ত্তি ধরিয়া তাণ্ডব নৃত্যে মগ্ন হইয়াছেন। প্রকৃতি দেবীর এই ছবি খানা হৃদয়পটে ভাল ক'রে এঁকে নে। এই ছবি হৃদয়ে ধ্যান করতে পারলে মহাকালীর তত্ত্ব কতকটা বুঝ্‌বি। ওরে, বিশ্বরাজ্যের সকল ভাবের সকল লীলার মধ্যেই তাঁর প্রকাশ হচ্চে। এ মহান্ তত্ত্ব হিন্দু ভিন্ন আর কোন জাতির মধ্যে খুঁজে পাবি না। হিন্দুর যে এত দেব-

দেবী মূর্ত্তি আছে, যে সব মূর্ত্তির পূজা করে ব'লে হিন্দু আজ কাল্ তোদের ন্যায় পাশ্চাত্য শিক্ষাভিমানী নব্য যুবকদের কাছে হীন পৌত্তলিক ব'লে অনাদৃত ও ঘৃণ্য জীব হ'য়ে প'ড়েছে, সে সব দেব দেবী মূর্ত্তির ভিতরের কথার মধ্যে কি কখন প্রবেশ কর্‌বার চেষ্টা ক'রেছিস্? তা' যদি কখনও করিস্ তা, হ'লে বুঝ্‌তে পারবি, হিন্দু যে ভাবে তাহার ঈশ্বরকে দেখেছে,—সেই বিরাট উদার, মহীয়ান, সর্ব্বব্যাপী ভাব বোধ হয় পৃথিবীর আর কোন জাতের মধ্যে দেখা যায় নি। কিন্তু, ভায়া! জিনিসগুলো বুঝ্‌তে হবে, এবং সেই বোঝবার জন্য জীবনব্যাপী সাধনা কর্‌তে হবে। নচেৎ খালি উপক্রমণিকা পড় এবং তার সঙ্গে দু চারজন ইয়ুরোপীয় সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতের পবিত্র গোমুখী-প্রসূত জ্ঞান-মন্দাকিনী ধারা দু-চার গণ্ডূষ পান ক'রে কৃতার্থ হ'য়ে ভাব্ "হাঁ, মন্দ নয়, শিশু মানবের উদ্দাম কল্পনা, প্রাকৃতিক শক্তিসমূহের ক্রীড়া দেখে যে ভীত চকিত হৃদয়ে নানাবিধ অপরূপ দেবদেবীর সৃষ্টি ক'র্‌বে এ আর বিচিত্র কি! আর একে সরল চাষাকুল, তাতে এসে প'ড়েছিল একটা গরম দেশে, এতে যে কল্পনার বাহুল্য হবে, তাতে আর আশ্চর্য্য কি?" আর ঝাঁ ক'রে সাব্যস্ত ক'রে ফেল্ যে, বেদগুলো "চাষার গান" মাত্র ও দেবদেবীগুলো কল্পনা-দেবীর পুত্র কন্যা; সে কালের মুনিঋষি গুলো—"হ্যাঁ লোক মন্দ ছিলনা বটে, একটু আধটু সভ্যতার উপকরণও সংগ্রহ ক'রেছিল, তবে আমরা"—এইরূপ ভাব্‌তে ভাব্‌তে পকেটে হাত দিয়ে পা ফাঁক ক'রে দাঁড়াও ও গরিমা-স্ফীত-বক্ষে সিগারেট্ ধূমে আত্মারামের তৃপ্তি সাধন কর্।

ব্যোমকেশ। দাদা ম'শায় বেশ বল্‌তে বল্‌তে হঠাৎ এমনতর চটে উঠ্‌লেন কেন বলুন দেখি। আমাদের গালাগালি কর্‌লে বড় সুখ হয়,না? ভাল, দোষটা কি ষোল আনা ইংরেজী-নবীশদেরই? তা' রা যা' শুনছে

তা'ই শিখ্‌ছে। আপনারা যদি ভাল ক'রে বুঝিয়ে সুজিয়ে দেন, তা' হ'লে কি আমরা শুন্‌তে অনিচ্ছুক? দেখুন দেখি, এই এমন মেঘের কোলে সৌদামিনীর খেলা, এসময় আমি কিনা এখানে একলা ব'সে আপনার গালাগালি খাচ্ছি। তবুও আমাদের দোষ!

ভট্টাচার্য্য। ভায়ার বুঝি বিরহ-বিধুরা নাৎবৌটীকে মনে প'ড়েছে! তা থাক্ থাক্, রাগ করিস না। বুড়ো মানুষ মনের আবেগে কখন কি ব'লে ফেলি। তা এখন কি আলোচনা হবে বল্।

ব্যোমকেশ।—দাদা মহাশয়! আপনি যে দেবদেবীতত্ত্ব ও মূর্ত্তি-পূজা-তত্ত্বের কথা একটু আগে বল্‌ছিলেন, সে সম্বন্ধে সবিশেষ শোন্‌বার জন্য মনটা বড়ই উৎসুক হচ্ছে। কিন্তু বোধ হয় আপাততঃ ও সমস্ত বিষয়ের আলোচনা নূতন করে না আরম্ভ ক'রে আমরা যে প্রেত তত্ত্ব ও ভুবর্লোক তত্ত্ব নিয়ে এতদিন নাড়াচাড়া কর্‌ছিলাম, তারই পরিসমাপ্তির চেষ্টা করা ভাল। আপনি কি বলেন?

ভট্টাচার্য্য।—হাঁ ঠিক ব'লেছিস্। আমাদের আলোচ্য বিষয়টা আমি ভুলেই গেছ্‌লুম। সেইটা আগে শেষ করা যাক্। দেবতত্ত্ব, মূর্ত্তিপূজা ইত্যাদি বিষয়ের কথা এর পরে হবে এখন। আমরা কতদূর এগিয়ে ছিলাম বল দেখি?

ব্যোমকেশ।—ভুবর্লোকেও যে প্রাণিকুল থাকতে পারে, আপনি সেই কথাটা বুঝিয়ে, ভুবর্লোকবাসী জীব সম্বন্ধে কিছু বল্‌তে যাচ্ছিলেন।

ভট্টাচার্য্য।—হাঁ? ভুবর্লোকের অধিবাসি-বর্গকে আমরা সাধারণতঃ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত কর্‌তে পারি। এক হচ্ছে যারা যথার্থ মানুষ, কিন্তু আপাততঃ ভুবর্লোকের অন্তর্গত কামলোকবাসী; দ্বিতীয় শ্রেণী হচ্ছে ভুবর্লোকবাসী দেবযোনি ইত্যাদি; আর তৃতীয় হ'চ্ছে এক

শ্রেণীর কৃত্রিম সৃষ্টি, যে গুলো না মানুষ না অপর কিছু, অথচ সে গুলোকে এক হিসাবে জীব না বলিলেও চলে না।

ব্যোমকেশ।—মানুষকে আবার ভুবর্লোকবাসী ব'লে ধর্‌ছেন কেন? মানুষ ত ভূলোকবাসী।

ভট্টাচার্য্য। আমরা মানুষের জীবন ও গতি সম্বন্ধে যে আলোচনা ক'রেছি, তা'হ'তে এটা বেশ বোঝা গিয়েছে যে, পার্থিব জীবনই মানব-জীবনের শেষ সীমা নয়। মৃত্যুর সময় শুধু স্থূল শরীরটাই নষ্ট হয় মাত্র, আসল মানুষটা তখন সূক্ষ্ম দেহ আশ্রয় ক'রে কামলোকে চ'লে যায় এবং কিছুকাল সেখানে অতিবাহিত করে। এই কামলোকবাসী যাতনা-দেহ-ধারী মানবকে ভুবর্লোকের সাময়িক অধিবাসী ব'লে অবশ্যই গণ্য করতে হবে। আর সেত বড় অল্পকাল নয়, অনেক সময় শত বৎসরাধিক কাল পর্য্যন্ত এই অবস্থা স্থায়ী হ'তে পারে। এমন কি লোককে ব'লতে কখনও শুনিস্‌'নি যে, লোকে তিন পুরুষ ধরে ব'লে আস্‌ছে, অমুক ছাতিম গাছটায় একটা ভূত থাকে? ওকথা গুলো সকল সময় ভিত্তিহীন নয়। উৎকট পাপের শাস্তি ভোগ করবার জন্য অনেক সময় দীর্ঘকাল ধ'রে প্রেতাবস্থা-প্রাপ্ত জীবকে কামলোকের কোন অংশ-বিশেষেই আবদ্ধ থাকিতে হয়। সেটা যেন তার জেলখানা স্বরূপ। সেই দীর্ঘকালের মধ্যে সময়ে সময়ে তা'র জীয়ন্ত মানুষের ইন্দ্রিয়-গোচর হওয়া একেবারে যে অসম্ভব নয়, তাহা ইতিপূর্ব্বে আমরা যে আলোচনা করেছি, তা হ'তেই বুঝ্‌তে পারা যায়। অতএব এইরূপ যে একটা একটা পুরুষানুক্রমিক প্রবাদ বা বিশ্বাস সময়ে সময়ে লোকসমাজে প্রচলিত দেখ্‌তে পাওয়া যাবে, সে আর বিচিত্র কি? কিন্তু এ ছাড়া যথার্থ জীয়ন্ত মানুষও, অর্থাৎ যাদের এখনও পার্থিব মৃত্যু ঘটে নাই, এ রূপ ব্যক্তিও ভুবর্লোকে উপস্থিত থাকৃতে পারে।

ব্যোমকেশ। এ আবার কি রকম কথা হ'ল? এ পর্য্যন্ত বলে আস্‌-

ছিলেন, মৃত্যুর পরে মানুষ সূক্ষ্ম শরীর নিয়ে ভুবর্লোকে যায়। তাই যদি হয়, তা' হ'লে আর স্থূল শরীরধারী জীবন্ত মানুষ সেখানে কি ক'রে যেতে পারে? এ যেন কেমন গোলমেলে কথা মনে হচ্চে।

ভট্টাচার্য্য। গোলমাল কিছুই নেই, একটু ধৈর্য্যাবলম্বন ক'রে কথাটা বোঝ্‌বার চেষ্টা কর্। মৃত্যুর সময় স্থূল শরীরটা যখন অন্যান্য শরীর থেকে পৃথক্ হ'য়ে পড়ে, তখন স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীর এই দুয়ের সংযোজক-গ্রন্থি একেবারে সম্যকরূপে ছিন্ন হয়ে যায়। কাজেই মানুষ আর স্থূল শরীরে ফিরে আস্‌তে পারে না। একশারে চিরদিনের জন্য সেটাকে ছেড়ে চ'লে যেতে বাধ্য হয়। কিন্তু যে সমস্ত মানুষ যোগের পথে কিয়দ্দূর অগ্রসর হয়েছেন, তাঁরা গুরুর কৃপায় আপনাদিগের সূক্ষ্ম শরীরটা পূর্ব্বোক্ত সংযোজক-গ্রন্থি অটুট রেখে স্থূল শরীর থেকে পৃথক্ করতে সমর্থ হন এবং স্থূল শরীরটাকে এক জায়গায় ঠিক যেন ঘুম পাড়িয়ে রেখে সূক্ষ্ম শরীর অব-লম্বন ক'রে ভুবর্লোক ইত্যাদিতে বিচরণ করেন। এঁদের সঙ্গে আমাদের আলোচ্য বিষয়ের বিশেষ কোন সম্বন্ধ নাই। কারণ এঁরা উচ্চ শ্রেণীর জীব, তবে এইটুকু সম্বন্ধের কথা বলা যেতে পারে যে, এঁরা কিংবা এঁদের শিষ্যেরা অনেক সময় করুনা-পরবশ হ'য়ে কামলোকবাসী প্রেতদেহ-ধারী মানব যাতে শীঘ্র শীঘ্র তাহার সেই যন্ত্রণাময় অবস্থা হ'তে মুক্তিলাভ করতে পারে, সেই বিষয়ে বিশেষ সহায়তা করেন। এখন বুঝ্‌লি জীবন্ত মানুষ কি ক'রে ভুবর্লোকে যায়? তারা স্থূল দেহটা সেখানে নিয়ে যায় না। কেননা সেটা প্রাকৃতিক নিয়ম-বিরুদ্ধ। আসল কথা হচ্চে, স্থূল শরীর যে জগতের উপাদানে গঠিত চিরকালই সেই জগতের অংশ হয়ে থাকে, আর তদ্রূপ সূক্ষ্মশরীরও চিরকাল সূক্ষ্ম জগতের অংশ-বিশেষ হ'য়ে সূক্ষ্মজগতেই অব-স্থান করে। আত্মা আপনার প্রকাশের জন্য যখন যে শরীরটা অব-লম্বন করেন অর্থাৎ যে শরীরের সাহায্যে আপনাকে যে লোকে প্রকাশিত

করেন, তখন তিনি সেইলোকবাসী জীব বলিয়া প্রতীয়মান হন, এবং তৎকালে তাঁহার অন্য লোকের সহিত বিশেষ কোন সম্বন্ধ থাকে না। কাজেই মানুষ যখন ভুবর্লোকে যায়, তখন তাহার স্থূল শরীরটা ফেলে যাওয়া অবশ্যম্ভাবী সে সময়ে স্থূল শরীরটা ঠিক যেন মড়ার মত পড়ে থাকে। কারণ তার মধ্য দিয়া আত্মার প্রকাশ থাকে না। আত্মা তখন সূক্ষ্মশরীর অবলম্বনে সূক্ষ্ম জগতে প্রকাশিত হয়। আত্মা ও শরীরের সম্বন্ধ বিষয়ে এই গুহ্য কথাটা যদি হৃদয়ঙ্গম করতে পারিস্, আর একটা বড় রহস্য অতি পরিষ্কার রূপে বুঝ্‌তে পারবি।

ব্যোমকেশ। আচ্ছা দাদা মহাশয়, মানুষ যখন অজ্ঞান হ'য়ে ঘুমোয়, তখন তা হ'লে কি হয়? আত্মা যদি নিজে প্রকাশ-শীল হন তা'হ'লে তখন তাঁর প্রকাশ কিরূপে কোথায় হয়?

ভট্টাচার্য্য। দেখ্‌ছি তোর একটু বুদ্ধি শুদ্ধি আছে। আমি তোকে রহস্যের কথায় বল্‌তে যাচ্ছিলুম। আমাদের ঘুমন্ত অবস্থাটা যে কি রহস্যময়, সেটা বড় কেহ একবার ভেবে দেখেন না। কিন্তু এই ঘুমের ব্যাপারটা বুঝতে পারলে, অনেক জটিল তত্ত্ব পরিষ্কার হয়ে আস্‌বে। যে সমস্ত কথা পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও দর্শন অনেক মাথা ঘামিয়েও বুঝে উঠ্‌তে পারেনি,সে গুলি জলের মত বুঝ্‌তে পারবি। বেশ ক'রে মন দিয়ে শোন।

তুই ত নিজেই বল্‌লি, আত্মা প্রকাশ-শীল। কথাটার মানে বেশ ভাল ক'রে বুঝেছিস্ ত? না হয় আর একটু ভাল ক'রে বোঝ্। আত্মা কি বস্তু? না, যার ধর্ম্ম জড়ের ধর্ম্মের সম্পূর্ণ উল্‌টা। জড়ে আমরা কিসের অভাব দেখ্‌তে পাই? জ্ঞানের; আর আত্মাতে এই জ্ঞানের সম্ভাব। অর্থাৎ, জ্ঞানের সহিত আত্মার অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ, আত্মা জ্ঞানময় জ্ঞানরূপী। জ্ঞানই আত্মার স্বরূপ, আত্মা আছে অথচ জ্ঞান নাই, এরূপ কথা মোটেই হ'তে পারে না।

ব্যোমকেশ। ইংরাজীতে এ:ক Contradiction in terms বলে।

ভট্টাচার্য্য। তা হ'লে এখন বোঝ, আত্মা অজ্ঞান হয়েছেন, এরূপ একটা কথা হ'তেই পারে না। মানুষ যখন অজ্ঞান হয়, তখন বুঝ্‌তে হবে যে স্থূল শরীরটা অজ্ঞান হ'য়েছে অর্থাৎ, জ্ঞানরূপী আত্মা তখন আর সেই শরীরটাকে অবলম্বন ক'রে আপনাকে প্রকাশিত কচ্ছেন না।

ব্যোমকেশ। তা হ'লে তিনি কোথায় কিরূপে প্রকাশিত হ'চ্চেন? কিংবা তাঁর অস্তিত্বের লোপ হোল?

ভট্টাচার্য্য। কথাটা একটু পণ্ডিতী হয়ে পড়েছে, একটু বোঝ্‌বার চেষ্টা কর। জ্ঞানই যার স্বরূপ, তার কি কখনও লোপ হ'তে পারে? কারণ লোপ মানেই ত অজ্ঞান। জ্ঞান কখনও অজ্ঞান হ'তে পারে না। সে চিরকাল জ্ঞানই থাকে। জ্ঞান যে আছে, আমাদের নিজেদের আত্মবোধই তাহার প্রমাণ। আমি আছি, আমি জ্ঞানী, আমি দেখি, এই জ্ঞান-ধারা নিজের মধ্যে প্রবাহিত হচ্চে। ইহারই নাম আত্মবোধ। অতএব যখন জ্ঞানের অস্তিত্ব সাব্যস্ত হ'ল, তখন তার চিরস্থায়িত্ব সম্বন্ধে কোন সন্দেহই হ'তে পারে না। কারণ আমি এই মাত্র ব'লেছি, জ্ঞান চিরকাল জ্ঞানই থাক্‌বে। সে কখনও অজ্ঞান হ'তে পারে না। অজ্ঞান তাঁর স্বরূপের বিরোধী; কাজেই আত্মা অবিনশ্বর। আবার জ্ঞান থাক্‌লেই তার প্রকাশ থাকা চাই। অতএব শরীরটা যখন জ্ঞান-শূন্য হ'য়ে প'ড়ে থাকে, তখন নিশ্চয়ই বুঝ্‌তে হবে যে, আত্মা বা জ্ঞান অন্য রূপে প্রকাশিত হচ্চে।

ব্যোমকেশ। কিরূপে প্রকাশ হ'তে পারে? আপনি ত এই বল্লেন, শরীরটা অজ্ঞান হ'য়ে প'ড়ে আছে, তবে আবার প্রকাশ হ'ল কিরূপে?

ভট্টাচার্য্য। আমি স্থূল শরীরটা অজ্ঞান হয়ে থাকার কথা বল্‌ছিলাম; কিন্তু পূর্ব্বেই ব'লেছি, আরও ত শরীর আছে, আর বিভিন্ন লোকে আত্মার

প্রকাশ-সাধন ব্যাপার বা তৎ-তৎ-লোকে ভোগ-কার্য্য সাধন করবার জন্যই যে এই শরীর গুলোর অস্তিত্ব, তাও তোকে বুঝিয়েছি। সূর্য্যরশ্মি ত আর আপনি প্রকাশ হয় না, কোন একটা বস্তুর উপর প্রতিফলিত হ'য়ে, অর্থাৎ সেই বস্তুর আশ্রয়ে, প্রকাশিত হয়, সেইরূপ আত্মাও শরীরের আশ্রয় ভিন্ন প্রকাশ-শীল হন না। সেইজন্য যতদিন সৃষ্টি, ততদিন চিৎ ও জড় এই দুইয়ের সম্বন্ধ অচ্ছেদ্য। পুরুষ ও প্রকৃতি দুইয়ে চিরকাল মাথা-মাখি হ'য়ে আছেন! একজন চিৎস্বরূপ, অপরটী তাহার আশ্রয়-ভূত এবং তদীয় প্রকাশ ব্যাপারের সহায়-স্বরূপিণী অচিৎ বা জড়-প্রকৃতি। তার উপরে যিনি স্বয়ং-প্রকাশ চিৎ-জড়ের অতীত, তাঁর তত্ত্ব আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধির অগম্য। তাই শাস্ত্রে তিনি "অবাঙ্‌মনসো গোচরঃ"

ব্যোমকেশ। দাদা মশায় অত চড়িয়ে বাঁধবেন না। গরিব মারা যায়। আপনি ত ব'লে খালাস, আমায় ত সেটা উদরস্থ করতে হবে।

ভট্টচায্য। ওরে হিঁদুর ছেলে, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ঘরে জন্মেছিস্, তোর পেটের ফাঁপ যে বড় বিশেষ কম ব'লে আমার ধারণা হয় না। দু দিনই না হয় ইংরাজী পড়ছিস্ তা ব'লে কি যুগ যুগান্তরের সংস্কার গুলো পুঁছে যেতে পারে। একটু উদ্বোধনের অপেক্ষা। সব আপনি ফুটে উঠবে। সিংহীর বাচ্চা কখনও শেয়াল হয় না তোদের ও পোষাকী কাপুরুষতা আমার ভাল লাগে না যে দেশের হাওয়ায় বেদান্ত উড়্ছে, যে দেশের ছেলে পিলে হরিবোল ব'লে, নেচে হাত তালি দিয়ে খেলা করে, ভিখারী কৃষ্ণনাম ক'রে ভিক্ষা করে, রাস্তার মুটে মজুরও জগৎ-টাকে একটা মায়ার খেলা ব'লে বোঝে, রাস্তার* ম্যাথরও ব্রহ্মতত্ত্বের

* লেখক একদিন স্বকর্ণে একজন ম্যাথরকে অপর একজন নীচলোকের সহিত বহুক্ষণ ধরিয়া ব্রহ্মতত্ত্ব আলোচনা করিতে শুনিয়া এবং জ্ঞান ও বিশ্বাসের গভীরতা দেখিয়া অতিমাত্র বিস্মিত ও মুগ্ধ হইয়াছিলেন। ভঃ মঃ সঃ

আলোচনা করে, তোতা পাখীতেও "রাধাকৃষ্ণ" বুলি বলে, সে দেশের ব্রাহ্মণ সন্তান তুই, দার্শনিক তত্ত্বের আঁচ একটু গায়ে লাগা'লেই ভয়ে আঁৎকে উঠ্‌বি, এ দুঃখ রাখবার জায়গা নেই। তোরা—

ব্যোমকেশ। দোহাই দাদা ম'শায়, অপরাধ হ'য়েছে, মাপ করুন। আপনার "ঝুলি" ঝেড়ে আমার মাথার উপুড় ক'রে ঢেলে দিন, আমি যদি আর কথাটী কই! আপনি আত্মা ও শরীরের কথা কি বল্‌-ছিলেন তাই বলুন।

ভট্টাচার্য্য। তুই মেজাজটা খারাপ ক'রে দিয়েছিস্, আজ এই খানে থাক্। কাল আর অন্য কথা না পেড়ে একেবারে এই জায়গাতেই সুরু করা যাবে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীমলয়ানিল শর্ম্মা।

যমালয়ের পত্রাবলী।

৫ম পত্র।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

তোমরা বুঝিলে,—আমি আমার জীবন-নাটকের পুনরভিনয় আরম্ভ করিলাম,—ইহার অর্থ কি? ইহাতে আমার শান্তি আসিবে, ইহাতে তৃপ্তি হইবে,—এই আশায় যে করিলাম, তাহা নহে। এই ব্যাপারে প্রাণে তীব্র বিরক্তিজ্বালা আসিতেছে, কিন্তু তাহা হইলে কি হয়? জীবদ্দশায় প্রবৃত্তিপুঞ্জকে বাধা দিবার আমার শক্তি কোথায়? পৃথিবীতে যাহা-দিগের সহিত মিশিতাম, যাহাদিগের সহিত বিহার করিতাম, যাহারা আমার পরিচিত ছিল, তাহাদিগেরই অনেকের সহিত আমার সাক্ষাৎ হইল; আবার এখানে তাহাদিগের সঙ্গ পাইলাম। তাহাদিগের অধিকাংশই তোমাদিগের বিশিষ্ট ও সম্ভ্রান্ত লোক। যদ্যপি আমি তাহাদিগের নাম বলিতাম,—আমার এই অসমীক্ষ্যকারিতায় তোমরা একেবারে স্তম্ভিত হইয়া পড়িতে। তাহার যে কি পরিণাম, আমি এখন সমস্তই বুঝিয়াছি। আমি তাহাদিগের নামোল্লেখ করিব না, কোনও বিশেষ পরিচয় দিব না; সাধারণ ভাবে সহচরবর্গের কথা বলিয়া, কেবল আমার আত্মযাতনা-রাশির ভীষণ ছবিখানি তোমাদিগের নয়নের সমীপে ধরিতে চেষ্টিত থাকিব। এখানে যে কত সম্ভ্রান্ত লোকের সহিত সাক্ষাৎ হয়, তাহা যে না ভুক্তভোগী, তাহার কিছুতেই প্রত্যয় হয় না। তাহারা পৃথিবীতে যে, যেইরূপ ভাবে সমাজে নেতৃত্ব করিয়া আসিয়াছে, এখানেও তাহাই করে। বস্তুতঃ, তাহাদিগকে শক্তি-কেন্দ্র করিয়াই, এখানে নরক-সমাজ গঠিত হয়। একি, আমি কি বলিতেছি! বুঝি-

তেছি, তোমরা বিস্মিত হইতেছ। বুঝিতেছি, তোমরা ভাবিতেছ,—একটা কিছু ঘোর পাপ না করিলে কি নিরয়ে বাস সম্ভব। তোমরা ভাবিতেছ,—আমি এখানে যাঁহাদিগকে দেখিতেছি, বা যাঁহাদিগের সহিত মিলিত হইতেছি, তাঁহারা প্রকাশ্যেই হউক, অপ্রকাশ্যেই হউক, একটা কিছু গর্হিত কর্ম্ম করিয়াছেই করিয়াছে, একটা কোন সমাজ-নীতি ভঙ্গ নিশ্চিতই করিয়াছে। সেটা তোমাদিগের বিষম ভ্রম। যে অপরের কোনও অনিষ্ট হউক, এইরূপ চিন্তা না করিয়াও, ইচ্ছাপূর্ব্বক অপরের গ্রাসাচ্ছাদন অপহরণ না করিয়াও, যে আপন স্বার্থের জন্য কার্য্য করিয়া আসিয়াছে, আপনি কিসে ধনী হইবে, কিসে আপনার সুখসচ্ছন্দতা আসিবে, কিসে লোকের নিকট আত্মসম্মান প্রতিষ্ঠিত হইবে, ইহারই চিন্তা করিয়া আসিয়াছে,—তোমরা তাহাকে কি বলিবে? সে যদ্যপি কোন দূষণীয় উপায় অবলম্বন না করিয়াও জগতে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া থাকে, তাহা হইলে তোমরা কি তাহাকে পাপী বলিয়া অভিধান করিবে? কিন্তু হায়, ওরূপ লোকেরও নরকবাস হয়। এখন বুঝিলে কি,—আমি কেন বলিলাম, "অনেক দেশপূজ্য ও সম্ভ্রান্ত লোকের সহিত আমার দেখা হইয়াছে?" একবার তোমরা তোমাদিগের চারিধারে জগৎখানা দেখ। তোমাদিগের জগতের অধিকাংশ বরণীয় লোকের কার্য্যকলাপ সমালোচনা কর,—দেখিতে পাইবে, তাহাদিগের প্রকৃতি কিরূপ? কেহ কেহ, নিজ অদৃষ্টের উপর সন্তুষ্ট থাকিয়া, বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে,—কে অনাহারে জীবন বিসর্জ্জন করিতেছে,—অথবা কে নিকট আত্মীয় বা সহোদর ভ্রাতা অন্ন-বস্ত্রাদির অভাবে দুঃখে কালাতিপাত করিতেছে, তাহা ভাবিবারও অবসর পায় না। ওখানে ওই ধার্ম্মিক গৃহস্বামী কেমন ধর্ম্মজীবন অতিবাহিত করিতেছে। সেই সন্তান-সন্ততির স্নেহময় পিতা

এবং পরিবারবর্গের কর্ত্তব্যপরায়ণ আশ্রয়দাতা, কিন্তু নিজ পরিবার-বর্গ লইয়াই ব্যস্ত, তাঁহার অপরের জন্য ভাবিবার সময় নাই, অপরের দুঃখ দেখিবার চক্ষু নাই, রোদন শুনিবার কর্ণ নাই বা অপরের কষ্ট অনুভব করিবার হৃদয় নাই। এইরূপ আরও কত বলিব। অধিকাংশ লোকেই "আত্ম" "আত্ম" করিয়া ব্যস্ত ;—আপনার পুত্র কলত্র, আপনার ধর্ম্ম-সাধনা, আপনার যশ প্রভিপত্তি লইয়া ব্যস্ত। তাহারা কি একবারও ভাবে, এই "মমতাই" তাহাদিগকে মরণের পর নরকে টানিয়া আনিবে। পৃথিবীতে "মমতা" পাশ ছিন্ন করিতে পারে না বলিয়াই এখানকার এই ঘোর যাতনার ব্যবস্থা। এখানকার তীব্র যাতনার ভীষণ পীড়নে এই মায়া-ঘোর কাটিয়া যায়, মমতা-ব্যবধান অপসৃত হয়, জীব অনন্তে মিশিয়া অনন্ত আনন্দের অধিকারী হয়। কিন্তু হায়—ধার্ম্মিক অধার্ম্মিক, ধনী নির্ধনী, সংসারী সন্ন্যাসী ইত্যাদি পৃথিবীতে আসিয়া করে কি? কেহ আমোদাবর্ত্তে সংসারমাঝে অতি দ্রুতবেগে ঘুরিতে থাকে ; অলসপ্রকৃতির কেহ বা আলস্যে ও নিদ্রায় অমূল্য সময় অতিবাহিত করে ; কেহ তুচ্ছ সুখাবহ সংসার-স্রোতে দেহ ভাসাইয়া দেয়, কেহবা জীবন-আহবের ভীষণ অঙ্গবিক্ষেপে আত্মজীবন অনর্থক অপচয় করে। তাহার পর যখন কালের করাল-ভেরী বাজিয়া উঠে, যখন মৃত্যু আসিয়া দেখা দেয়, তখন তাহার মোহ ভাঙ্গিয়া যায়,—সে মরণের পর চক্ষু উন্মীলন করিয়া দেখে,—সে নরকে। কোথায় ছিল আত্মহারা সে, আশা-কুহকিনী-মুখরিত পৃথিবীর সুখ-উপবনে, এখন দেখে আসি-য়াছে, তুষানল-আচ্ছন্ন উত্তপ্ত নিরাশ-মরু-প্রান্তরে।

হায়! এখন যদ্যপি আর একটী বৎসর মাত্র কাল আবার পৃথিবীতে বাস করিতে পাইতাম—আমি কেবল নিজের জন্য বলিতেছি না—আমি তাহা হইলে অনেক সৎলোককে পূর্ব্ব হইতেই সতর্কিত করিতে

পারিতাম! তাঁহারা দেখিতেছি কেবলই দুইটী চিন্তা লইয়াই আত্মহারা, —একটী আত্মকল্যাণ নিজের ঐহিক পারত্রিক মঙ্গলকামনা,—অপরটী পুত্র-কলত্র, স্বজন-পরিজনের কল্যাণ চিন্তা। আহা! যদ্যপি তাঁহাদিগের মধ্যে দুজনকেও তাঁহাদিগের বিষম ভ্রম হইতে মুক্ত করিতে পারিতাম! জানি, তোমরা আমার কথা বিশ্বাস করিতে না। শত শত জ্ঞানী মহাজন মানব-দুঃখে কাতর হইয়া, তোমাদিগের মাঝে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। পর-হিতব্রতী তাঁহারা মানবকল্যাণের জন্য আত্মবিসর্জ্জন করিয়াছেন। কিন্তু, তোমরা কি তাঁহাদিগের কথা শুনিয়াছ? যাহাদিগের জন্য তাঁহাদিগের এই আয়াস স্বীকার, তাঁহাদিগেরই দ্বারা তাঁহারা লাঞ্ছিত ও বিধ্বস্ত হইয়াছেন। তবুও কি মানব কিছু শিখে? তবে কেন আমার আবার জন্মাইবার সাধ? তাহা জানিনা;—তথাপি বৃথা আশা আমার মনে আসিতেছে,—আমি হয়ত একজনেরও উপকার সাধন করিতে পারিতাম।

সাধারণ-মানব-অভিধানে যাঁহাদিগকে লোকহিতৈষী বলে, তাঁহা-দিগের মধ্যে কোন কোন ব্যক্তিকে—মনে থাকে যেন আমি কোন নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তিকে বলিতেছি না—আমি এখানে দেখিতে পাইয়াছি। তাঁহারা জীব-দ্দশায় কোন না কোনও রূপে সহস্র সহস্র লোকের উপকার সাধন করিয়া আসিয়াছেন, কিন্তু,হায়! এত উপকার করিয়াও তাঁহারা ঘোর নরক-যাতনার পেষণ হইতে আপনাদিগকে রক্ষা করিতে পারেন নাই। কোন কোন ক্ষেত্রে তাঁহাদিগের পরোপকারই, তাঁহাদিগের নরকবাসের কারণ হইয়াছে। স্বর্গ-ক্ষেম দিবার সুগমপন্থা, পরার্থে আত্মোৎসর্গ। ইহাকেও তাঁহারা ঘোর অজ্ঞানতা ও মোহবশতঃ নরক-পন্থায় পরিণত করিয়াছেন। পৃথিবীর লোক কি তাহা বুঝে? দেখনা সহস্র মুখে তাঁহাদিগের বিমল স্বর্গসুখ-ভোগ প্রচার করিতেছে। লোকের প্রশংসা বা নিন্দা শুনিয়া কখনও কাহাকে বিচার করিও না। মানুষ কার্য্য দেখে, কাহারও অন্তর দেখিতে

জানেনা। পরোপকাররূপ মহাব্রত লইয়াছিলেন বলিয়া, তাহার জন্য তাঁহাদিগের অন্তে স্বর্গভোগ হইবে সত্য, কিন্তু তাঁহারা মোহ-আবরিত ছিলেন বলিয়া,—বাসনাঅভিভূত ছিলেন বলিয়া,—তাহার ফল—নরক-যাতনা অপরিহার্য্য।

দুষ্ক্রিয়ান্বিত না হইলে নরকবাস হয় না,—এই বিচিত্র সংস্কারটা তোমাদিগের মানব-সমাজে অতিশয় প্রচলিত। হে আমার ভ্রান্ত পাঠকপাঠিকাগণ! আমার কথায় প্রণিধান কর। অতি সামান্য কারণেই এখানে আসিতে হয়। একটু সামান্য মোহ, একটু অজ্ঞানতা, সামান্য বহুত্বজ্ঞান, ঈশ্বর যে সর্ব্বভূতস্থ—এই মহাবিদ্যার ঈষৎ অভাব থাকিলেই নিরয়গামী হইতে হয়। এ কথায় তোমাদিগের প্রতীতি হইতেছে না। কিন্তু, কি করিব, যাহা প্রকৃত, তাহাই তোমাকে বলিতেছি—জ্ঞানবিজ্ঞানবান্ পরমভক্ত তোমাদিগের ভ্রান্তবিচারে পাপক্রিয়াশীল হইলেও, তাঁহাকে নরকে আসিতে হয় না। জ্ঞান ও ভক্তিরূপ দুইটী পক্ষ বিস্তার করিয়া তিনি সানন্দে পরা গতি প্রাপ্ত হ'ন। নরক তাহার কালিমাময় বদন লইয়া তাঁহার প্রতি নিরীক্ষণও করিতে পারে না। তুমি কখনও কি সে অবস্থা অনুভব করিয়াছ? সে যে কি জ্যোতির্ম্ময় শান্তিপূর্ণ ভাব, এখন তাহা ভাবিবারও আমার শক্তি কোথায়?

এখানে এরূপ অনেক লোক আছেন, যাঁহারা কখনও কোন একটা দুষ্ক্রিয়া করেন নাই। তাঁহাদিগের নামোল্লেখ করিলে তোমরা "অবিচার" "অবিচার" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিবে। জীবদ্দশায় তাঁহাদিগের মন বেশ নির্ম্মল ও নিষ্পাপ ছিল, ধর্ম্মে তাঁহাদিগের দৃঢ় অনুরাগ ছিল, কিন্তু মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই তাঁহারা বুঝিলেন—তাঁহারা নরকে। তবে তাঁহাদিগের নরক-ভোগ আমাদিগের মত নহে। তাহা এক বিভিন্ন প্রকারের। তাঁহারা বাসনার দাস ছিলেন না বলিয়া, তাঁহাদিগকে

আমাদিগের মত বৃথা কামনা চরিতার্থতার উদ্দেশ্যে ঘুরিতে হয় না। পৃথিবীতে তাঁহারা অজ্ঞানান্ধ ছিলেন, মৃত্যুর পর এখনও যন্ত্রচালিতের ন্যায় পৃথিবীর কার্য্যেই ব্যস্ত আছেন। আমাদিগের যাতনা,—আমরা অতৃপ্ত বাসনা লইয়া ছুটিতেছি, তাঁহাদিগের যাতনা—তাঁহাদিগের প্রাণের আঁধার ঘুচিতেছে না বলিয়া দুইয়েরই হয় ত সমান যাতনা-জ্বালা!

(ক্রমশঃ)

সেবাব্রত পরিব্রাজক।

অলৌকিক রহস্য।

২য় সংখ্যা।] দ্বিতীয় ভাগ। [জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৭।

সম্পাদক মহাশয়,

আপনি বাস্তব-জীবনের ঘটনা জানিতে চাহিয়াছেন, নিম্নে কয়েকটী ঘটনা, যাহা আমার নিজের ঘটিয়াছিল লিখিলাম।

১৩১৩ সালে, আমি তখন এখানে, আমার একটী আত্মীয় কোন স্থানে মারা যান। সেদিন বৈশাখ মাসের ২৯শে ছিল। আমি তাঁহাকে বাল্যকালাবধি অত্যন্ত ভাল বাসিতাম, এখনও বাসি। ঐ দিন সন্ধ্যাবেলা হঠাৎ আমার এমনি মন খারাপ হইয়া গেল ও চোখের সম্মুখে নানারূপ বিভীষিকা দেখিতে লাগিলাম, যে তখনি এখানে অন্য সকলকে বলিলাম, যে, আমার যে আত্মীয়ের অসুস্থ সংবাদ সকলে শুনিয়াছ, তিনি আজ মারা গিয়াছেন। আমায় সকলে তিরস্কার করিলেন, কিন্তু আমি পুনঃ পুনঃ বলিলাম, যে, না আমার মনের ভিতর কে বলিয়া দিতেছে, যে তিনি মারা গিয়াছেন।

এই সময় বলিয়া রাখি, যে আমি তখন দ্বাদশবর্ষীয়া মাত্র। সুতরাং কোন রকম যে ভাবিয়া, বলিয়াছিলাম তাহা নহে। তাহার পরদিন আমার আত্মীয়ের নিকট হইতে টেলিগ্রাফ আসিল, যে "তিনি নাই"।

ইহাকে কি বলিব, সেকণ্ড সাইট্, না ভৌতিক? ইহার পরও প্রায়ই আমি যেন ঠিক সমস্ত ঘটনা, খানিকক্ষণ চেষ্টা করিয়া ভাবিলে চক্ষের সম্মুখে দেখিতে পাইতাম। একদিনকার একটী ঘটনা বড়

আশ্চর্য্য আছে। এটাও আমাদের বাটীর সকলেই জানেন। আমার মা বিদেশে থাকেন। সুতরাং কোন রকম বিপদাপদ বা সংসারে মনান্তর হইলেই সহজে কিছু জানান যায় না। কিন্তু একদিন কোন কারণে, আমার শরীর ও মন অত্যন্ত খারাপ হইয়াছিল, কেবল মার কাছে যাইতে ইচ্ছা করিতেছিল। এটী এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে সন্ধ্যার সময় ঘুমাইয়া পড়ি। ঘুমাইয়া স্বপ্ন দেখি, যেন আমি মার কাছে গিয়াছি, ও মা আদর করিয়া সমস্ত জিজ্ঞাসা করিলেন, ইত্যাদি অনেক কথা হইল। কিন্তু যেখানে আমি শুইয়াছিলাম, তাহারা বলিল, উঠিবার পর, যে তুমি অজ্ঞানের মত হইয়া গিয়াছিলে, তাই তোমার মাথায় চোখে জল দেওয়া হইতেছে।

এই ঘটনার দুই দিন পরে মা আসিলেন, ও প্রথমেই বলিলেন যে, সেদিন সন্ধ্যার সময়, তুমি এইরূপ কাপড় ও জামা পরিয়া ছিলে কি না? আমি আশ্চর্য্য হইয়া উত্তর করিলাম যে, হাঁ ছিলাম। তাহার খানিক পরে, মা বলিলেন, (ঠিক যেমন স্বপ্ন দেখিয়াছিলাম সব বর্ণে বর্ণে মিলিয়া গেল) যে, তোমার সেদিন দুঃখপূর্ণ মুখ দেখিয়া থাকিতে পারিলাম না, তাই আজ এত শীঘ্র চলিয়া আসিলাম।

আমি ত আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া গেলাম। আমার নিকটে যিনি ছিলেন, তিনিও সমস্ত কথা (পূর্ব্বে স্বপ্নের কথা সব বলিয়াছিলাম) শুনিয়া, ও আমার কথার সহিত মিলিত হইল দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন।

এইরূপ আমার অনেক বার হইয়াছে। মাও প্রায়ই, আমিও প্রায়ই চেষ্টা, ও একমনে চিন্তা করিলেই দেখিতে পাই।

গত বৎসর আশ্বিন মাসে, আমার একজন আত্মীয় মারা যান সেবারেও পূর্ব্বে হইতে জানিতে পারি।

অনেককে আমার এ ঘটনা জানাইয়াছিলাম, সকলেই বলেন, যে,

ইহাকে সেকেণ্ড সাইট বলে। চেষ্টা করিলে, আরও উন্নতি করিতে পারা যায়। কিন্তু আমি ইহাতে ততটা মন দিই নাই। ইহাকে কি বলে, আপনাদের মধ্যে যদি কেহ উত্তর দিতে পারেন ত বড় বাধিত হইব।

শ্রীমতী শ্রীমতী দেবী।

স্বামীজীর কথিত বিগ্রহ-দর্শন।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

(ক) একবার শিলেটের অন্তর্গত ঢাকা দক্ষিণ নামক গ্রামে (যেথানে মহাপ্রভুর পিতামহের বাটী) যাইতে যাইতে অরণ্যমধ্যে মহাপ্রভুর মূর্ত্তি দর্শন হইল। মূর্ত্তিটী আনন্দজনিত নৃত্যের এক অপূর্ব্ব ভাবযুক্ত। দেখিয়া প্রাণ বড়ই আকৃষ্ট হইল। পুনর্ব্বার দর্শন জন্য প্রাণ বড়ই ব্যাকুল হইতে লাগিল। তৎপরে উক্ত ঢাকা দক্ষিণ গ্রামে যাইয়া ঠিক সেইরূপ মূর্ত্তি মন্দিরে স্থাপিত দেখিতে পাইলাম।

(খ) সরস্বতী নদীতীরে সিদ্ধপুর নামক গ্রামে একটি সন্ন্যাসীর আশ্রমে শয়ন করিয়া আছি এমন সময়ে একটি সুন্দর পুরুষ ও একটি সুন্দরী নারী-মূর্ত্তি দেখিলাম। পরদিন বিন্দু-সরোবরে স্নান করিতে যাইয়া তীরদেশে ৺কপিলদেব ও তাঁহার মাতা দেবহূতির দুইটি প্রতিমূর্ত্তি রহিয়াছে দেখিলাম। আমার রাত্রে দৃষ্ট মূর্ত্তি দুইটি ঠিক এই প্রকারেরই ছিল।

(গ) শ্রীবৃন্দাবনে গোবিন্দ-কুণ্ড নামক স্থানে (যেখানে শ্রীকৃষ্ণ মাধবেন্দ্র পুরী গোঁসাইকে দুগ্ধ দিয়াছিলেন) জলের ভিতর একটি সহাস্য শ্রীগোপাল-মূর্ত্তি দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন দেখিলাম। পরে মন্দিরের ভিতর প্রবেশ করিয়া দেখিলাম ঠিক সেইরূপ গোপাল-মূর্ত্তি রহিয়াছেন।

আরও অনেক স্থলে বিগ্রহ সম্বন্ধে এইরূপ দর্শনলাভে কৃতার্থ হইয়া আমার ধারণা হইয়াছে যে, বিগ্রহ সকল, সচ্চিদানন্দ-মূর্ত্তি এবং তাঁহারা ভক্তদের যথার্থই দর্শন দেন।

স্বামীজীর দাউজি মহারাজ দর্শন।

বৃন্দাবন হইতে দশ বার ক্রোশ দূরে মহাবনের দিকে দাউজি নামক গ্রাম। এই গ্রামে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের পৌত্র বজ্রের প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রী৺ বলরাম বিগ্রহ আছেন। বিগ্রহ অতি জাগ্রত এবং প্রত্যক্ষ-লীলাময়, পরম-সুন্দর কৃষ্ণবর্ণ পাষাণ-নির্ম্মিত সুগঠিত শ্রীমূর্ত্তি। স্থানীয় ব্রজবাসিগণ বিগ্রহকে দাউজি মহারাজ বলেন। তাঁহারা সকলে দাউজি-গত-প্রাণ। দাউজি মহারাজের উপর তাঁহাদের সম্পূর্ণ নির্ভর। তিনিই তাঁহাদের ঐহিক-পারত্রিকের সম্যক্ ভরণপোষণকারী ও হর্ত্তাকর্ত্তা বিধাতা। আমি প্রথম যখন সেই স্থানে গিয়াছিলাম, শ্রীশ্রীপরমেশ্বর দাউজি মহা-রাজকে বলিয়াছিলাম যে, প্রভো, আমাকে উত্তমরূপে ভোজন মিলাইয়া দিও এবং ভালবাসিয়া এইস্থানে রাখিও। মন্দিরের অপর এক পার্শ্বে মা রেবতীদেবীর শ্রীমূর্ত্তি দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। আমি বলিয়াছিলাম যে, "দাউজী মহারাজ, তুমি আমার পিতা ও শ্রীশ্রীঈশ্বরী রেবতী আমার মাতা; আমাকে গোপালের মত লালন-পালন করিও এবং সুস্থির রাখিও।" শ্রীশ্রী৺ দাউজী মহারাজ আমার প্রার্থনা শুনিয়াছিলেন। আমাকে বড় ভালবাসিতেন। মাঝে মাঝে বাবা ও মা দুইজনেই দেখা

দিতেন। পরম-সুন্দর কৃষ্ণবর্ণ (ময়ূরপুচ্ছ-মধ্যস্থ ঘন কৃষ্ণবর্ণের মত) এক পুরুষরূপে দেখা দিতেন। শয়ান অবস্থায় কখন কখন গাঢ় আলিঙ্গন প্রদান করিতেন। তাঁহার করুণায় স্থানীয় পাণ্ডাগণ আমাকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। সাধারণের দুর্লভ দাউজি মহারাজের নিজ ভোগের প্রসাদ আমাকে খাওয়াইতেন।

একবার আমি অন্য দেশে যাইলে, কোন পাণ্ডা আমার জন্য কাঁদিয়াছিলেন, সকলেই দুঃখিত হইয়াছিলেন। এইরূপভাব একদিন দাউজি মহারাজ আশ্চর্য্যভাবে আমাকে জানাইয়াছিলেন। আমি জাহাজের মধ্যে ছিলাম, দিবাভাগে অকস্মাৎ দাউজি দর্শন দিয়া বলিলেন, "তুমি বড় নিষ্ঠুর, তোমার জন্য তোমার মা, কাঁদেন ও পাণ্ডারা কাঁদেন, তুমি আমাদিগকে ভুলিয়া রহিয়াছ। শীঘ্র চল।" এইরূপ অনেক সময় দর্শন দিয়াছেন। একদিন আমি দাউজি দর্শন করিতে করিতে বলিলাম "আমি নবঘনশ্যাম শ্রীমাধব-মূর্ত্তি দেখিতে বড় ভালবাসি আমাকে সেইরূপ দেখাও।" তখনি সে বাসনা পূর্ণ করিলেন। কৃষ্ণবর্ণ শ্রী-বিগ্রহ বহুক্ষণ নবঘনশ্যাম বর্ণ ধারণ করিয়া দর্শন দিলেন।

স্বামীজী নিজহস্তে এই ব্যাপারটি লিখিয়াছেন এবং নিম্নে এই টুকু টীকা স্বরূপে লিখিয়াছেন, "ভগবানের নিত্য ও লীলাময় এই দুই ভাবই তাঁহার কৃপাতে ভক্তগণ অনুভব করেন। একদিন শ্রীমদ্ গুরুদেব-শ্রীমুখাৎ শুনিয়াছিলাম—নিত্য ও লীলা দুইই সত্য।"

শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

সন্ন্যাসীর অলৌকিক কার্য্য।

নিম্নলিখিত বিষয়টি আমার একজন সোদর-প্রতিম বন্ধুর নিকট হইতে অবগত হইয়াছি।

আমার উক্ত বন্ধুটি বলিলেন, (তাঁহাদের নিবাস কৃষ্ণনগরের উপকণ্ঠে ঘূর্ণী নামক গ্রামে) একদিন গ্রীষ্ম কালের রাত্রিতে, আমরা চারিজন সমবয়স্ক যুবক মিলিয়া নিকটস্থ একজনের বহির্ব্বাটীতে রাত্রি আন্দাজ ৯॥০ টার সময় শয়নের উদ্যোগ করিতেছি, (তাঁহারা কয়েকজনে ঐ স্থানে পূর্ব্বাপর শয়ন করিতেন) এমন সময়,—"বোম্ বোম্ ভোলানাথ" বলিয়া নিঃস্তব্ধে প্রকৃতিকে সজাগ করিয়া জটাজূটধারী, গেরুয়া বসন-পরিহিত এক সুন্দর সুপুরুষ সন্ন্যাসী আমাদের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

হঠাৎ অন্ধকার রাত্রিতে সন্ন্যাসীর আগমনে যুবকগণের মধ্যে একটা উদ্বেগের ভাব লক্ষিত হইল ; সকলেই চতুর্দ্দিক হইতে নানারূপ প্রশ্ন-বাণ সন্ন্যাসীর উপর প্রয়োগ করিতে লাগিলেন।

কিন্তু সন্ন্যাসীর ঠাকুর সপ্তরথী-বেষ্টিত বীর অভিমন্যুর ন্যায় অটল অচল ভাবে রহিলেন, কাহারও কোন প্রশ্নের উত্তর না দিয়া বহির্ব্বাটীর দাওয়ার উপর উঠিয়া বসিলেন ও বলিলেন, "বাবা, অধিক রাত্রি হইয়াছে বিশেষ অন্ধকার রাত্রি সেজন্য, রাত্রিটা এই আশ্রয়ে কাটাইবার বাসনা করিতেছি।"

যুবকগণের মধ্যে অনেকেই আশ্রয়-প্রার্থী সন্ন্যাসীর বিরুদ্ধে দাঁড়াইলেন। একজন 'খেদাই না উঠান চষি' রকমের বলিল, "ঠাকুর, এখানে থাকবে কি করে? এখানে এত মশা যে তিষ্ঠান ভার ; এই দেখনা

আমরা সকলেই মশারী খাটাইয়া শুই, তুমি মশারীর বাইরে থাক্‌বে কি করে ?”

সন্ন্যাসী। আচ্ছা, বাবা মশায় যা'তে কিছুনা কর্ত্তে পারে, তা' করিয়া দিব ; কিন্তু এই অন্ধকার দুর্যোগ রাত্তিরে আশ্রয় ছেড়ে আর কোথাও যাব না।

সন্ন্যাসীর উক্ত কথা শুনিয়া যুবকগণ একটু কৌতূহলাক্রান্ত হইল ও বলিল, “আচ্ছা ঠাকুর, তা'হলে থাক—কিন্তু আপনার কি আহার হবে ?”

একজন যুবকের বিশেষ পীড়াপীড়ি সত্ত্বেও সন্ন্যাসী কিছুই আহার করিলেন না। ইতিমধ্যে একজন যুবক সন্ন্যাসীর নিকট আসিয়া বলিল, “ঠাকুর, আমার হাতটা দেখনা, আমি কত দিন বাঁচবো, ও আমার জন্মটা সুখে কি নানা বিপদ্‌পাতে কাটিবে।”

সন্ন্যাসী ঠাকুর মৃদু হাসিয়া বলিলেন, “বাবা, হাত দেখিয়া ভবিষ্যতের কথা বলা অসম্ভব, কারণ যদিও অদৃষ্টে কি ঘটিবে ও কত দিন পরমায়ু তাহার একটা হস্ত, ললাট দেখিয়া আভাস পাওয়া যায় ; কিন্তু তাহা প্রায় ঠিক করিয়া বলা যায় না। শুধু অদৃষ্ট লইয়াই মানুষের গতি চালিত হয় না। অদৃষ্ট ও পুরুষকার এই বিষয় লইয়া মানুষের শুভাশুভ ও মরণ-জনন চলিয়া থাকে। তুমি যেমন কাজ করিবে, তাহার ফলভোগ সেইরূপ করিবে। তুমি চারিখান কাঁঠালের পাতা লইয়া আইস, আমি রাত্রির মশা নিবারণ করিয়া দিব।”

একটী যুবক আলো লইয়া কাঁঠালের পাতা আনিতে গেল, সৌভাগ্য-ক্রমে একটী কাঁঠাল গাছ নিকটেই ছিল যুবক খানকতক পাতা লইয়া ফিরিল।

সন্ন্যাসী কাঁঠালের পাতা চারিটি দ্বারা চারিটা ‘ঠোঙ্গা’ প্রস্তুত করিয়া

দিয়া গৃহের চারিকোণে রাখিতে বলিলেন। তার পর যথা নিয়মে সকলে শয়ন করিলেন।

*　　　*　　　*

প্রাতে গাত্রোত্থান করিয়া সন্ন্যাসী ঠাকুর বলিলেন, "কেমন, বাবা-সকল মশায় বিরক্ত করিয়াছিল?" যুবকগণ একবাক্যে বলিল "কিছু মাত্র না।"

উক্ত বন্ধু বলিয়াছেন বাস্তবিক আমরা সন্ন্যাসীর অদ্ভুত কার্য্য দেখিয়া বড়ই আশ্চর্য্য হইয়াছিলাম, সেদিন একটীও মশার গুন্ গুন্ আওয়াজ পর্য্যন্ত আমাদের শ্রুতিগোচর হয় নাই।

তারপর সন্ন্যাসী ঠাকুর 'ঠোঙ্গা' কয়টি আনিতে বলিলে, একজন যুবক ঠোঙ্গা কয়টি হাতে করিয়া দেখে কি আশ্চর্য্য ঠোঙ্গা কয়টিই কোটি কোটি মশায় বোঝাই! যুবক নিদ্রার ব্যাঘাতকারী শত্রুগণকে হাতে পাইয়া সকলকে শমন-শদনে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিতেছিল; কিন্তু সন্ন্যাসী ঠাকুর বারণ করায় তাহা হইতে বিরত হইল।

সন্ন্যাসী ঠাকুর যুবকের নিকট হইতে উহা লইয়া সমস্ত মশাগুলি উড়াইয়া দিলেন।

তখন সকলেই ঠাকুরকে ধরিয়া বসিল, বলিল "ঠাকুর আমাদের মশা ধরার উপায়টা শিখাইতে হইবে।"

সন্ন্যাসী ঠাকুর বলিলেন, "আচ্ছা শিখাইব," কিন্তু কিছুক্ষণ পরে কি ভাবিয়া বলিলেন, "না, তোমাদের শিখাইব না, তোমরা তা'হলে শত শত জীব এককালে হত্যা করিবে," বলিয়া সেখান হইতে প্রস্থান করিলেন।

শ্রীলালগোপাল মিত্র।

পিতৃ-দর্শন।

ঢাকা জেলার অন্তর্গত কোতলি (বিক্রমপুর) নিবাসী বাবু মনোমোহন কুণ্ডু নারায়ণগঞ্জ কুণ্ডু বাবুদের গদিতে জনৈক কর্ম্মচারী। তাঁহার সঙ্গে আমার বিশেষ জানা শুনা এবং সদ্ভাব আছে। তাঁহার চরিত্র সম্বন্ধে আমার যে কিছু জ্ঞান আছে, তাহাতে তিনি স্বভাবতঃ শান্ত, সুশীল এবং ধর্ম্মভীরু বলিয়া আমার ধারণা। সাধারণ জন-মণ্ডলীর ন্যায় তিনিও এতকাল, অধ্যাত্ম-তত্ত্ব বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন বা ক্ষীণ-বিশ্বাসী ছিলেন। কিন্তু মঙ্গলময় বিধাতাপুরুষের দুরধিগম্য অত্যাশ্চর্য্য বিধানে, একটি ঘটনাতে তাঁহাকে বিশ্বাসের সুদৃঢ় ভূমিতে চির-প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। মানবের শত উপদেশ বা যুক্তি তর্কেও এরূপ অভাবনীয় পরিবর্ত্তন সংসাধিত হইত কিনা সন্দেহ।

১৩০৯ সনের ৯ই ভাদ্র বুধবার তাঁহার পিতৃবিয়োগ হয়। তিনি হিন্দু-প্রথানুসারে পিতার মাসিক শ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন করিবার মানসে প্রাত্যহিক হবিষ্যাদি যথাবিধি করিয়া আসিতেছেন। তাঁহার অভি-ভাবিকা মাতৃদেবী, স্ত্রীজনসুলভ-স্বাভাবিক-সংস্কার-প্রণোদিত হইয়া, পুত্রকে এই বলিয়া সময় সময় উপদেশ দিয়া থাকেন,—"তুমি বর্ত্তমান অবস্থাতে এক বৎসরকাল, বিশেষ সতর্কভাবে চলা ফিরা করিবে।" তিনি বিশ্বাস করেন, দেহ-মুক্ত প্রেতাত্মাগণ, পার্থিব মায়াশৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকিয়া, বৎসরান্তে ক্রিয়া সম্পন্ন না হওয়া পর্য্যন্ত, স্ব স্ব বাসস্থানের চতুঃপার্শ্বে, কিম্বা অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া স্থলে (শ্মশান, কবর ইত্যাদি) অতি উচ্ছৃঙ্খল ও অস্থিরভাবে সতত ঘুরিয়া বেড়ায়। সুতরাং তৎকাল পর্য্যন্ত পুত্র-কলত্রাদির পক্ষে প্রেতদর্শন স্বাভাবিক ও ভয়-বিপদ-সঙ্কুল।

মনোমোহন বাবুর পিতার মৃত্যুর ১৫।১৬ দিবস পর এক রজনীতে, তিনি, তাঁহার মাতা ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃবধূসহ বাড়ীর উত্তরের ভিটির গৃহে শায়িত ছিলেন। রাত্রি অনুমান ২ টার সময় তাঁহার মাতা, তাঁহাকে এবং তদীয় ভ্রাতৃবধূকে ডাকিয়া প্রস্রাব করিবার উদ্দেশ্যে বাহিরে যাইতে ছিলেন। তাঁহার পিছনে মনোমোহন এবং তৎপশ্চাৎ পুত্রবধূ, তিনি ক্রমে অগ্রসর হইয়া সিঁড়িতে অবতরণ করিয়াছেন; এমন সময়, হঠাৎ কি যেন দেখিয়া ভীত ও চমকিতভাবে পশ্চাৎপদ হইতে ছিলেন। পুত্র ইহা দেখিয়া মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা! তুমি এরূপে হঠাৎ পাছে হটিলে কেন"? তখন মা বলিলেন, "এমন কিছু নয়, হরি নাম কর, হরি নাম কর।" এই বলিয়া তিনি সভয়ে হরিনাম উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু ইহাতে মনোমোহন বিন্দুমাত্র ভীত বা উৎকণ্ঠিত না হইয়া স্বয়ং অগ্রবর্ত্তী হওত আঙ্গিনাতে দৃষ্টিপাত করিলেন। দেখিলেন, তাঁহার পিতা রাজকিশোর কুণ্ডু ১০।১৫ হাত দূরে অতি বিমর্ষভাবে নগ্নদেহে দণ্ডায়মান থাকিয়া স্থির-দৃষ্টিতে তাহাদের প্রতি চাহিয়া আছেন। ক্ষীণ-বিশ্বাসী মনোমোহন নিজ চক্ষুর্দ্বয়েও বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। তিনি চক্ষু রগড়াইয়া পুনরপি চাহিলেন। তখনও ছায়ারূপী পিতৃদেব পূর্ব্ববৎ দাঁড়াইয়া আছেন। এইরূপে তাঁহার পিতা প্রায় ২ মিনিটকাল সকলকে দেখা দিয়া ধীর-পাদ-বিক্ষেপে আঙ্গিনা পার হইয়া বাড়ির দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণ ধরিয়া চলিয়া গেলেন। তাহারা তিন ব্যক্তিই অতি স্পষ্টরূপে প্রায় ৩ মিনিট কাল ব্যাপিয়া এই ছায়া-মূর্ত্তিকে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন।

এই ঘটনাটিতে ছায়ামূর্ত্তির সম্পূর্ণ উলঙ্গ অবস্থাতে আপন পুত্র, কলত্র ও পুত্রবধূকে দর্শনদান করা পাঠকের চক্ষে নিতান্ত অস্বাভাবিক ও ঘৃণিত বলিয়া বোধ হইবে, সন্দেহ নাই। কিন্তু সর্ব্বনিয়ন্তা বিধাতা

পুরুষের অলঙ্ঘ্য নিয়মে নিয়মিত হইয়া, জীবের স্ব স্ব কর্ম্মফলানুরূপ নানাবিধ আভ্যন্তরিক অবস্থা-বৈষম্য অবশ্যম্ভাবী। পরলোকে সুকৃতিমান্ বিদেহীগণের নয়নাভিরাম, স্নিগ্ধ মনমুগ্ধকর স্বর্গীয় জ্যোতিতে, যেমন এক দিকে অপর সকলে বিমোহিত আনন্দিত ও চরিতার্থ হইয়া থাকেন। আবার পাপাসক্ত দুষ্ক্রিয়ান্বিত নরকভোগীদিগের অতিবীভৎস আকৃতি-প্রকৃতি দর্শনে ভীত-চকিত ও ক্ষুব্ধ হইয়া থাকে। ঈদৃশ দেব-দর্শন ও পিশাচ-দর্শন এই মর্ত্ত্যধামে প্রায়শঃ হইতেছে।

শ্রীদীনবন্ধু মিত্র।
নারায়ণগঞ্জ—আমলাপাড়া।

ভূতের রামায়ণ-শ্রবণ।

বর্দ্ধমানের পশ্চিমে ৪।৫ ক্রোশ দূরে তারপুর নামক একটি ক্ষুদ্র গ্রামে তারিণী তেওয়ারির বাস। তারিণীর অবস্থা তত ভাল নহে, সামান্য কয় বিঘা জমি চাষ করিয়া, কোন রকমে সংসার চলে। সংসারে স্ত্রী, কন্যা ও পুত্র ব্যতীত তারিণীর একজন পিসি আছে। দরিদ্র হইলেও তারিণী বেশ শান্ত-স্বভাব ও ধর্ম্ম-ভীরু; কখনও কাহারও কোন অনিষ্ট করা দূরে থাক, সাধ্যমত অনেকের উপকার করিয়া থাকে। সকলেই তারিণীকে ভালবাসে।

একদিন রাত্রি প্রায় দুই প্রহরের সময় তারিণী প্রস্রাব ত্যাগ করিবার নিমিত্ত ঘরের বাহিরে আসিয়া দেখে উঠানের এক পার্শ্বে ধান সিদ্ধ করিবার উনানের নিকট কে একটি স্ত্রীলোক অবগুণ্ঠনবতী হইয়া বসিয়া রহিয়াছে। তাহাকে দেখিয়া তারিণী ভাবিল তাহারই

ফুফু (পিসিকে উহারা ফুফু বলে) ধান সিদ্ধ করিবার মানসে বসিয়া আছে। এই ভাবিয়া সে অন্য দিকে গিয়া প্রস্রাব করিয়া আসিল। ফিরিবার সময় দেখিল সেই স্ত্রীলোক ঠিক একভাবে সেই স্থানে বসিয়া আছে। তারিণী মনে করিল ফুফু বুড়ি মানুষ হয় তো বসিয়া বসিয়া ঘুমাইতেছে, এই মনে করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল "ফুফু, ওফুফু, ওখানে বসিয়া ঘুমাইতেছ কেন? যাও শোওগে। এখনও ঢের রাত আছে; সকালে উঠিয়া ধান সিদ্ধ করিও।" স্ত্রীলোকের নড়ন চড়ন নাই, যেমন বসিয়া ছিল ঠিক সেইভাবে বসিয়া রহিল। তবে কি ফুফু, বেশী ঘুমাইয়া পড়িল নাকি? আর কোন স্ত্রীলোক হইবে কি? বাড়িতে তো সেরূপ স্ত্রীলোক আর কেহ নাই। কেহ মন্দ অভিসন্ধি করিয়া স্ত্রীলোক সাজিয়া বসিয়া নাই তো। অনেক ক্ষণ ধরিয়া তারিণী ভাবিতে লাগিল। স্ত্রীলোক সেই এক ভাবে বসিয়া আছে। কি আশ্চর্য্য মনে কি উহার ভয়ের লেশ মাত্র নাই। "কে গা ফুফু" বলিয়া তারিণী যেমন অগ্রসর হইল অমনি স্ত্রীলোকটী উঠিয়া দাঁড়াইল। সন্দেহ ক্রমে বৃদ্ধি হওয়ায় তারিণী ছুটিয়া, যেমন তাহাকে ধরিতে গেল, স্ত্রীলোক সরিয়া গিয়া উঠানের অপর প্রান্তস্থিত এক ডালিম গাছের তলায় গিয়া দাঁড়াইল। তারিণী ক্রোধে অধীর হইয়া, বেগে ডালিম তলায় হাজির হইল, স্ত্রীলোক কোনরূপ শব্দ বা অঙ্গভঙ্গী না করিয়া সোজা ভাবে ডালিম গাছের উপর শির ডালে গিয়া দাঁড়াইল। তখন তারিণীর চমক হইল। তবে তো মানুষ নয়। মানুষ কি কখন এত সরু গাছের শির ডালের উপর সোজা ভাবে দাঁড়াইতে পারে? নিশ্চয় উপ-দেবতা। ছুটিয়া আসিয়া তারিণী গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল ও তাহার স্ত্রীকে জাগাইয়া সকল কথা বলিল, তখন উভয়ে মিলিয়া বাহিরে আসিল ও ডালিম গাছের দিকে চাহিয়া দেখিল কেহ কোথাও

নাই। তাহারা বাটীর চারিধার বেশ করিয়া খুঁজিল, কিন্তু কোথাও কাহারও পায়ের চিহ্ন পর্য্যন্ত দেখিতে পাইল না।

নানারূপ আলোচনায় ও কথাবার্ত্তায় অবশিষ্ট রাত্রি টুকু কাটিয়া গেল। প্রাতে উঠিয়া তারিণী মাঠে গেল। তেওয়ারি-বউ গৃহকর্ম্মে ব্যস্ত হইল। ফুফু উঠিয়া রাত্রের ঘটনা শুনিয়া একটু হাসিল ও বলিল "তারিণী ছেলে মানুষ রাত্রে উঠিয়া ভয় পাইয়াছে, ও কিছু নয়" পাড়ার দুই একটি গিন্নি বেড়াইতে আসিয়া কথাটা শুনিয়া গেল। ক্রমে যথাবিধি কথাটা গ্রামে রাষ্ট্র হইয়া গেল। সকলেই শুনিল, তারিণী তেওয়ারীকে ভূতে পাইয়াছে। ভূত দেখিবার নিমিত্ত গ্রামের আবাল বৃদ্ধ বনিতা কাজকর্ম্ম ফেলিয়া তারিণীর বাটীতে আসিয়া উপস্থিত। কেহ বলিল "আহা বেচারার উপর দেবতার এত আক্রোশ কেন গা"; কেহ বলিল "তা, বাছা, আমাদিগকে কি উঠাইতে নাই"। একজন প্রবীণা বলিল "ও সময়ে কি মুখে কথা বাহির হয়, যে চীৎকার করিবে।" তারিণীর স্ত্রী কাহাকে কি জবাব দিবে ভাবিয়া আকুল, কোথাও কিছু নাই, অথচ লোকের ভিড় দেখে কে। আস্তে আস্তে বলিল "তোমরা ভুল শুনিয়াছ,—আমাদের কর্ত্তাকে তো ভূতে পায় নাই, তিনি মাঠে গিয়াছেন।" কি আশ্চর্য্য এত কথা কি মিথ্যা হয়, তেওয়ারী-বউয়ের কথায় কেহ বিশ্বাস করিতে পারিল না। কিন্তু যখন দেখিল তেওয়ারী-বউ কিছুতে সত্য কথা বলিবে না, তখন অগত্যা হতাশ হইয়া আপনাপন গৃহাভিমুখে সকলে চলিয়া গেল।

অন্যদিন জল খাইবার বেলা উত্তীর্ণ হইলে পর তারিণী মাঠ হইতে বাড়ি আসিত। কিন্তু আজ সকাল সকাল লাঙ্গল ছাড়িয়া দিয়া তারিণী বাটীতে ফিরিল। তাহার কারণ গত রাত্রে ভাল নিদ্রা না হওয়ায় শরীরটা ভাল নাই, আর যে কারণেই হউক মনের অবস্থাও

তত ভাল নহে। বাটীতে আসিয়া স্নানাদি করিয়া তারিণী একটি দড়ির খাটের উপর একখানি ছোট সতরঞ্চ পাতিয়া শয়ন করিল ও পাছে মাছির দৌরাত্ম্যে নিদ্রার ব্যাঘাৎ হয় এই ভাবিয়া এক খানি চাদর লইয়া আপাদ মস্তক আবৃত করিয়া রহিল। অল্পক্ষণ পরেই তারিণী গভীর নিদ্রায় নিমগ্ন হইল। তাহার পত্নী বা অপর কেহ সে ঘরের দিকে গেল না, পাছে তারিণীর নিদ্রার ব্যাঘাৎ হয়। বেলা প্রায় শেষ হইয়াছে এমন সময় তারিণীর নিদ্রাভঙ্গ হইল, কিন্তু বুকে কি যেন চাপিয়া বসিয়াছে বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। চাপ ক্রমে অসহ্য হওয়ায় তারিণী উঠিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু উঠিতে পারিল না। হাত বুলাইয়া দেখিল কি একটা কাঠের মত জিনিষ দিয়া কে যেন তাহার বুকের উপর চাপিয়া ধরিয়াছে। চক্ষু চাহিয়া দেখিল ঘরের সাঙ্গার সঙ্গে তাহার খাটিয়া খানি উঠিয়া লাগিয়া গিয়াছে ও সাঙ্গার চাপনে তাহার উঠিবার ক্ষমতা রহিত হইয়াছে। ভয়ে তারিণী চীৎকার করিয়া উঠিবা মাত্র খাটিয়া খানি মাটীতে পড়িয়া গেল ও সঙ্গে সঙ্গে তারিণী খাটিয়া হইতে মাটীর উপর গড়াইয়া পড়িল। বাটীর যাবতীয় লোক-জন দৌড়িয়া আসিল ও তারিণীর মুখে জল দিল। ঘটনা শুনিয়া সকলেই ভয়ে ও বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া গেল। অনেকক্ষণ পরে তারিণী প্রকৃতিস্থ হইল। সেই দিন সন্ধ্যার সময় তারিণী নিজের বাড়িতে বসিয়া সমাগত দুই চারি জন পাড়ার লোকের সহিত বসিয়া তামাক খাইতেছিল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীনলিনাক্ষ রায়।

প্রেতিনীর পদাঘাত।

১

সে প্রায় ৫০ বৎসর পূর্ব্বেকার ঘটনা। যদিও এখন প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষীর অভাব কিন্তু আজিও এমন লোক বিদ্যমান আছেন, যাঁহারা এই ঘটনা বিশেষরূপ অবগত আছেন।

আমাদের বাটীর পার্শ্বে মাধব বাবুর বাটী ছিল। ঐ বাটী এক্ষণে বিদ্যমান নাই, মাধববাবুর বংশ নির্ব্বংশ। উক্ত মাধববাবুর পত্নী মৃত্যু অন্তে প্রেতিনী যোনী প্রাপ্ত হইয়া বিশেষ উপদ্রব করিতে ছিল।

আমাদের গ্রামে পূর্ব্বে কালী মৌলিক নামক জনৈক ভদ্রলোক বাস করিতেন। এই ঘটনার সময় তাঁহার স্ত্রী প্রসন্ন দেবী জীবিতা ছিলেন। মৌলিক মহাশয়ের মৃত্যুর পর এই বিধবার সন্তান বা স্বামী-কুলের কেহ বর্ত্তমান না থাকায়, তিনি স্বামীর গৃহ এবং স্থাবর ব্রহ্মোত্তরাদি বিক্রয় করিয়া তাঁহার পিতৃগৃহে বসবাস করিতে লাগিলেন। আমাদের গ্রাম হইতে ৩।৪ ক্রোশ ব্যবধানে একখানি গণ্ড গ্রামে তাঁহার পিতৃ-নিবাস। এই বিধবা আমার প্রমাতামহী দেবীর ধর্ম্ম-কন্যা ছিলেন। তিনি প্রায়ই আমাদের গৃহে আসিতেন। একদা তিনি আমাদের গৃহে আসিয়া গ্রামস্থ পরিচিতা মহিলাগণের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। প্রত্যাবর্ত্তনকালীন মাধববাবুর গৃহে গমন করেন। তখন সন্ধ্যা প্রায় হইয়াছে। তিনি অন্দরস্থ একখানি খড়ের ঘরের দাওয়ায় বসিয়া, ঐ বাটীর মহিলাগণের সহিত নানা বিষয়ের আলোচনা করিতে ছিলেন। পরে ঐ বাটীর ভৌতিক উপদ্রব সম্বন্ধে গল্প উঠিল। এমন সময় তাঁহাদের সম্মুখে ঝুর ঝুর করিয়া ধূলা পড়িতে লাগিল। তদ্দৃষ্টে জনৈক মহিলা আগন্তুকার প্রতি চাহিয়া, বিরক্তি মিশ্রিত স্বরে কহিলেন

"দেখিলে, ঐ দেখ এমনি করিয়াই জালাতন হইতেছি।" আগন্তুক মহিলা কহিলেন,—"বোধ হয়, চালের ধূলা বাতাসে পড়িল।" কিন্তু তিনি মনে মনে নিতান্ত অবিশ্বাস করিতে পারিলেন না। ঠিক এই সময় তাঁহার বোধ হইল যেন, কে তাঁহার গা ঘেঁসিয়া দাঁড়াইল এবং তন্মুহূর্ত্তেই তাঁহার গাত্রে ধূলি পড়িল। তিনি ধূলা ঝাড়িয়া ফেলিয়া একটু সন্ত্রস্ত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "ওমা, একি! দূর হ, দূর হ।" ইহার পরক্ষণেই বাটীস্থ মহিলাগণ দেখিলেন যে, আগন্তুকা চীৎকার করিয়া দাওয়ার উপর লুটাইয়া পড়িলেন। সংজ্ঞাহীন! মহিলাগণ শুশ্রূষা করিতে, চৈতন্যলাভ করিলেন। একটু সুস্থ হইয়া বলিলেন, কে যেন তাঁহার কটিদেশে সজোরে ৪।৫ বার পদাঘাত করিল। এই আঘাতজনিত ব্যথা এমন প্রবল হইয়া উঠিল যে, তাঁহার উত্থান-শক্তি রহিত হইল। তাঁহাকে ধরাধরি করিয়া আমাদের বাটীতে আনা হইল। নানাবিধ ঔষধাদি প্রয়োগে সেঃ ব্যথা নিবারিত হইল না। অনেক ওঝা আসিয়া মন্ত্রাদি দ্বারা ঝাড়িয়া দিল, তথাপি কিছুই হইল না। তাঁহার পিতা তাঁহাকে স্বগৃহে লইয়া গিয়া অনেক চেষ্টা করিলেন, কিন্তু সবই বৃথা হইল! অভাগিনী বিধবা, উত্থান শক্তি-হীনা হইয়া বেদনার যন্ত্রণা ভোগ করিতে লাগিলেন।

(২)

একদা কোন ওঝা তাঁহাদের গৃহে আসিয়া রোগিণীর অবস্থা অবগত হইয়া কহিল যে, সে তাঁহাকে ব্যাধি-মুক্ত করিতে পারিবে। ওঝার সহিত তাঁহার পিতার এ বিষয়ে পরামর্শ হইলে, তিনি কন্যাকে কহিলেন, অদ্য রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় আসিয়া ওঝা তাঁহার বেদনা ঝাড়িয়া আরোগ্য করিবে। ব্যবস্থিত হইল যে, রোগিণী গৃহ-প্রাঙ্গণের দিকে পৃষ্ঠ ফিরাইয়া দাওয়ার উপর শয়ন করিয়া থাকিবেন; ওঝা আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলে,

হস্ত দ্বারা বেদনাযুক্ত স্থান প্রদর্শন করিবেন। কোন কথা কহিবেন না বা ফিরিয়া চাহিবেন না;—চক্ষু মুদ্রিত করিয়া থাকিবেন। বাটীর অন্যান্য মহিলাবর্গ গৃহদ্বার বন্ধ করিয়া থাকিবেন, ওঝার প্রক্রিয়া দেখিতে পাইবেন না। তদনুসারে কার্য্য হইল। রোগিণী পরে বলিয়াছেন যে, তাঁহার নিদ্রা হইতে ছিল না। তিনি উপদিষ্ট নিয়মে নিমীলিত-নয়নে শয়ন করিয়াছিলেন। একে বেদনার তাড়না—আবার মন ঔৎসুক্যে পূর্ণ। রাত্রি দ্বিপ্রহর অতীত হইলে তিনি শ্রবণ করিলেন, দাওয়ার নিকটবর্ত্তী হইয়া এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, "ব্যথা কই?" সে স্বর বড় গম্ভীর—অস্বাভাবিকরূপে গম্ভীর। ঐ প্রকার গম্ভীর স্বর তিনি কখনও শ্রবণ করেন নাই। তিনি হস্তদ্বারা বেদনাযুক্ত স্থান দেখাইয়া দিলে তথায় কোমল হস্ত-স্পর্শ অনুভব করিলেন। মনুষ্য-হস্ত যে এত কোমল, তাহা তিনি জানিতেন না। রোগিণীর বোধ হইল যে, সেই অসাধারণ কোমল হস্ত-মার্জ্জনে তাঁহার সমস্ত বেদনা, সকল জ্বালা জুড়াইয়া গেল। একবার হাত বুলাইয়া সেই অদৃষ্ট পুরুষ কহিল, "বল, নাই।" রোগিণী সেই কথার প্রতিধ্বনি করিয়া বলিলেন, "নাই।" সেই সঙ্গে সঙ্গে তিনি আপনাকে সম্পূর্ণ বেদনামুক্ত সুস্থ জ্ঞান করিলেন। বেদনা নিরসন হেতু কৃতজ্ঞতা বশতঃও বটে, স্ত্রীলোক-সুলভ কৌতূহল-বশতঃও বটে, তিনি একবার সেই অসাধারণ চিকিৎসকের দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া থাকিতে পারিলেন না। মুখ ফিরাইয়া প্রাঙ্গণে ছত্রাকার মস্তক সমন্বিত এক বিভীষণ মূর্ত্তিদর্শন করিয়া, ভয়ে উচ্চ চিৎকার করিয়া মূর্চ্ছাপ্রাপ্ত হইলেন। তখনই পূর্ব্বোক্ত ওঝা ও তাঁহার পিতা বহির্ব্বাটী হইতে আসিয়া শুশ্রূষা দ্বারা চৈতন্য সম্পাদন করিলেন। ওঝা কহিল, "কোন ভয় নাই, কিছুই অনিষ্টের কারণ নাই।" রোগিণী ভয়ের কারণ ব্যক্ত করিলে, ওঝা বলিল, "যদি চাহিয়া না দেখিতেন,

তবে কিছুই হইত না। আপনারা ভীত হইবেন বলিয়া চক্ষু খুলিতে নিষেধ করিয়াছিলাম। বেদনা নিবারণের অন্য উপায় নাই বলিয়া, আমি ব্রহ্মদৈত্যদ্বারা বেদনা তুলিয়া লইয়াছি। ব্রহ্মদৈত্যগণ জীবের কল্যাণসাধন করেন। উহাঁরা মহাদেবানুচর দেবযোনি বিশেষ। আপনারা মহাদেবের পূজা দিবেন।"

তাঁহারা যথাসময়ে তদুপদিষ্ট কার্য্য যথানিয়মে সম্পন্ন করিলেন। ওঝা রীতিমত পুরস্কৃত হইল। ঐ বিধবা সম্পূর্ণ সুস্থা হইয়া ইহার পর অনেকদিন জীবিতা ছিলেন। তিনি এই সকল ঘটনা যাঁহাদের নিকট বর্ণনা করিয়াছেন, অদ্যাপি তাঁহাদের কেহ কেহ জীবিত থাকিয়া আমাদিগকে এই সকল বলিয়াছেন।

শ্রীগিরিজাভূষণ চট্টোপাধ্যায়।

প্রেতিনী পত্নীর পতিপ্রেম।

বৃদ্ধবয়সে স্ত্রী-বিয়োগ হওয়াতে কেনারাম কাকা বড়ই কাতর হইয়া পড়িয়াছিলেন। বাড়ীতে এমন আপনার লোক কেহই ছিল না যে, তাঁহাকে সান্ত্বনা করে। একমাত্র পুত্র রাজেন্দ্রকুমার বিদেশে চাকরী করিতেন এবং সেইখানেই সপরিবারে বাস করিতেন। মাতা ঠাকুরাণীর গঙ্গালাভ হইলে অনেক কষ্টে কিছুদিনের ছুটি লইয়া বাটী আসিয়াছিলেন, কিন্তু অধিকদিন থাকিতে পারেন নাই। শ্রাদ্ধ-শান্তি শেষ হইলেই তাঁহাকে পুনরায় সপরিবারে চাকরী-স্থলে যাইতে হইয়াছিল। যাইবার সময় পিতাকে লইয়া যাইবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু কিছুতেই তাঁহাকে সম্মত করিতে পারেন নাই। তাঁহার এক বুলি, "বিদেশে যাইলে মৃত্যুকালে গঙ্গা পাইব না।" জানি না, ভিতরে

অন্য কোন কারণ ছিল কিনা, কিন্তু কেহই তাঁহাকে বাস্তু-ভিটা ছাড়িয়া বিদেশে লইয়া যাইতে পারে নাই। সকলে বলিল যে, তীর্থ ভ্রমণ করিলে, মন স্থির হইবে; রাজেন্দ্র দাদাও আবশ্যকমত খরচ-পত্র লোকজন দিয়া তীর্থ-ভ্রমণে পাঠাইতে চাহিলেন, কিন্তু কাকা কিছুতেই বাটী হইতে যাইলেন না। অগত্যা একজন বিশ্বাসী ভৃত্য, একজন পুরাতন বৃদ্ধা পরিচারিকা ও একজন বৃদ্ধা পাচিকা পিতার সেবার জন্য বাটীতে রাখিয়া রাজেন্দ্র দাদাকে চাকরী স্থানে যাইতে হইল। যাইবার সময় প্রতিবাসী ও আত্মীয়-স্বজন সকলকেই বলিয়া গেলেন যে, তাঁহারা যেন সর্ব্বদাই পিতার তত্ত্বাবধান করেন।

কেনারাম কাকা বড় অমায়িক লোক ছিলেন। গ্রামস্থ ছোট বড় সকলের সহিতই তাঁহার সদ্ভাব, সকলেই তাঁহাকে ভালবাসিত। সুতরাং রাজেন্দ্র দাদার প্রবাস যাত্রার পর সকলেই তাঁহার নিকট থাকিয়া, নানাপ্রকার কথা-বার্ত্তায় তাঁহার শোক নিবারণের চেষ্টা করিতেন; কিন্তু কেনারাম কাকা সর্ব্বদাই নির্জ্জনে থাকিতে ভালবাসিতেন। হঠাৎ অন্দরে প্রবেশ করিলে দেখা যাইত যে, তিনি আপন শয়ন-কক্ষে অন্য মনে বসিয়া যেন কাহার প্রত্যাশা করিতেছেন, অথবা কিছু শুনিবার চেষ্টা করিতেছেন।

কেনারাম কাকাকে আমারা বড় ভালবাসিতাম, আমাদের উপর তাঁহার ও তাঁহার পরিবারের অকৃত্রিম স্নেহ ছিল। তাঁহাদের বিশেষ অনুরোধ যে, খেলা-ধূলা, আমোদ-আহ্লাদ যাহা কিছু করিতে হয় তাঁহার বাটীতেই আমাদের করিতে হইবে, অন্য কোথাও যাইতে দিতেন না। তাঁহার বাগানের ফল আমাদের একচেটে ছিল। পুষ্করিণীতে প্রতি রবিবার মৎস্য ধরাইতেন, কিন্তু আমাদের নিমন্ত্রণ না করিয়া কিছুতেই সে মৎস্য খাইতেন না। আমাদের কাহারও শরীর অসুস্থ হইলে কাকার

আহার-নিদ্রা ত্যাগ হইত; এই সকল কারণে তাঁহাকে আমরা আন্তরিক ভালবাসিতাম, অতএব তাঁহার মনের ঐরূপ অবস্থা দেখিয়া, যে অস্থির হইব, আশ্চর্য্য নয়। আমাদের সর্ব্বদাই ভয় হইত যে, কাকার মস্তিষ্ক বা বিকৃত হয়।

স্ত্রী-বিয়োগের প্রায় তিন মাস পরে একদিন প্রাতঃকালে কেনারাম কাকা তাঁহার বাটীর এক নিভৃতকক্ষে আমাকে লইয়া গিয়া বলিলেন, "দেখ প্রিয়নাথ, আমি দেখিতে পাইতেছি, আমার জন্য তোমরা অত্যন্ত চিন্তিত হইয়াছ। হইবারই কথা, আমার মনের অবস্থা ও বাহ্যিক ব্যবহার দেখিয়া, আত্মীয়-স্বজন নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে না; কিন্তু তোমরা কি মনে কর যে কেবল স্ত্রী বিয়োগের জন্য আমি এরূপ অস্থির হইয়াছি? তাহা হইলে, তোমরা ভুল বুঝিয়াছ। স্ত্রী-বিয়োগ অনেকেরই হয়। কিন্তু আমার মত অস্থির কয়জন হয়?

আমি।—তবে কি অন্য কোন কারণ আছে?

কাকা।—হাঁ, আছে। অতি গোপনীয় কথা। আমি মনে করিয়াছিলাম, এ সকল কথা কাহাকেও বলিয়া হাস্যাস্পদ হইব না; কিন্তু আর না বলিলে চলে না। আমার শরীর ও মনের যেরূপ অবস্থা দিন দিন হইতেছে, এমন করিয়া থাকিলে, আমি অল্প-দিনেই পাগল হইব। প্রাণের হানি হইলেও হইতে পারে। অন্য কাহাকেও বলিলে আমাকে বিদ্রূপ করিবে। এ সকল কথা লইয়া ঠাট্টা বিদ্রূপ আমার সহ্য হইবে না। তোমাকে অন্য অপেক্ষা বিবেচক বলিয়া জানি, সেই জন্য মনে করিয়াছি, আজ সমস্ত কথা তোমাকে বলিব তুমি যাহা ভাল বিবেচনা কর করিবে। অন্য কাহার সহিত পরামর্শ করা যদি আবশ্যক বিবেচনা কর তাহাও করিবে। কিন্তু দেখিও যাহার তাহার সহিত এ সকল বিষয় আলোচনা করিও না।

আমি। আপনি বলিতেছেন অতি গোপনীয়, তবে যাহার তাহার সহিত কেন আলোচনা করিব ?

তাহার পর কিছুক্ষণ কি ভাবিয়া, পরে বলিতে লাগিলেন, "দেখ আজ দুইমাস হইতে আমার বোধ হইতেছে যেন সেজ-বৌ (অর্থাৎ তাঁহার পত্নী) সর্ব্বদাই আমার নিকট রহিয়াছে। একটু অন্য মন হইলেই যেন বোধ হয় তাহার কথা শুনিতে পাই, সে যেন বলে অত ভাবিও না সংসার ধর্ম্মে মন দাও, নাতিদের ও আত্মীয় স্বজন লইয়া পুনরায় আমোদ আহ্লাদ করিতে আরম্ভ কর। সময় হইলে পুনরায় আমার সহিত মিলন হইবে। এরূপ কথা প্রত্যহই দুই একবার শুনিতে পাই।"

আমি। আপনি তাঁহার সহিত কখনও কথা কহিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন ?

কাকা। করিয়াছিলাম, কিন্তু কখনও কোন উত্তর পাই নাই। ঐরূপ কথা শুনিবামাত্র একদিন জিজ্ঞাসা করিলাম তুমি কোথায় ? আমায় দেখা দিতেছ না কেন ? আর কোন উত্তর নাই। প্রায় ২০।২৫ দিন পূর্ব্বে এক দিন বৈকালে শুনিলাম যে, বাড়িতে ২।৩ জন ভদ্রলোক আসিতেছেন, তাঁহাদের অভ্যর্থনা করিবার ও আহারাদি করাইবার জন্য প্রস্তুত হও। দুই তিন ঘণ্টার মধ্যে তাঁহারা আসিয়া পৌঁছিবেন। মনে করিলাম যদি যথার্থ কেহ আসেন তাহা হইলে বুঝিব যে, আমার স্ত্রীর-আত্মা সত্যই আমার সহিত কথা কহিতেছেন। সেই দিন সন্ধ্যার সময় রাজেন্দ্রের তিনটি বন্ধু যথার্থই উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা ছুটি লইয়া বাটী আসিয়াছেন এবং রাজেন্দ্রের অনুরোধে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন। এমন অবস্থায় কি করে সন্দেহ করি যে আমার স্ত্রীর আত্মা আমার সহিত কথা কহিতেছেন না। আজ

প্রাতঃকালে শুনিলাম যে "বধূমাতা অত্যন্ত পীড়িতা, নিশ্চিন্ত হইয়া কেমন করিয়া বসিয়া আছ?" শুনিয়া অবধি যে আমি অত্যন্ত ভাবিত হইয়াছি তাহা বলা বাহুল্য। আমার বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পাইয়াছে। কি করিব কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না; যাহা করিতে হয় তোমরা কর। আবশুক হয় তোমার পিতার সহিত পরামর্শ কর।

সমস্ত শুনিয়া আমিও স্তম্ভিত হইলাম, কথাগুলি যেরূপ ভাবে বলিলেন, অবিশ্বাস করিবার স্থল ছিল না। ঠাট্টা বিদ্রূপের বিষয় নয়। আমি বলিলাম "আর কাহাকেও বলিবার পূর্ব্বে রাজেন্দ্র দাদাকে তার করিয়া জানি যে, বউ দিদি যথার্থ পীড়িতা কি না? তাহার পর যাহা যুক্তিযুক্ত হয় তাহা করিব।" এই বলিয়া আমি তার করিতে যাইলাম। তার আফিস আমাদের বাটী হইতে প্রায় অর্দ্ধ ক্রোশ দূরে। তার করিয়া ফিরিয়া আসিতে প্রায় দুই প্রহর হইল। তাড়াতাড়ি স্নান আহার করিয়া পুনরায় তার আফিসে গেলাম। এখনও কোন সমাচার আসে নাই, কাজেই অপেক্ষা করিতে হইল। বেলা ৫টার সময় তার আসিল। তাড়াতাড়ি খুলিয়া দেখিলাম বউ দিদি যথার্থই পীড়িতা। তিন দিন হইতে বিসূচিকায় মরণাপন্না হইয়া রহিয়াছেন। অনেক চেষ্টায় অদ্য একটু ভাল আছেন। জীবনের আশা কতক হইয়াছে। এখন কি করিব? কেনারাম কাকাকে এ সংবাদ দেওয়া উচিত কি না চিন্তা করিতে করিতে বাটী আসিতেছি, কিছু দূর আসিতেই কে ডাকিল "প্রিয়নাথ কোথায় গিয়াছিলে?" চাহিয়া দেখি রামলাল দাদা।

আমি। এই একবার টেলিগ্রাফ আফিসে গিয়াছিলাম।

রামলাল দাদা। টেলিগ্রাফ আফিসে কেন হে?

আমি। রাজেন্দ্র দাদার পরিবারের বিসূচিকা হইয়াছে তাই টেলিগ্রাফ করিয়া জানিতে গিয়াছিলাম কেমন আছেন।

রামলাল দাদা। কিছু সমাচার পাইলে ?

আমি কিছু না বলিয়া টেলিগ্রাফখানি দেখাইলাম। তিনি দেখিয়া কিছু চিন্তিত হইলেন। ২।৩ মিনিট পরে জিজ্ঞাসা করিলেন "পীড়ার সমাচার তোমরা কবে পাইয়াছিলে ? আমি ত পূর্ব্বে কিছু শুনি নাই।"

ওকথার কোন উত্তর না দিয়া আমি বলিলাম "রামলাল দাদা একটি অতি আশ্চর্য্য ঘটনা তোমাকে বলিতে ইচ্ছা করি। ঘটনাটি সহজে বিশ্বাস-যোগ্য নয়। কিন্তু সমস্ত বিষয় ভাল করিয়া বিবেচনা করিলে অবিশ্বাস করাও অসম্ভব।" এই বলিয়া কেনারাম কাকা সম্বন্ধীয় সমস্ত ঘটনা আনুপূর্ব্বিক বলিলাম। রামলাল দাদা অতি মনোযোগ দিয়া শুনিলেন ; পরে বলিলেন "ইহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নাই, অবিশ্বাসেরও কোন কারণ নাই।"

আমি। তোমার তবে সত্যই বিশ্বাস হয় যে, কেনারাম কাকার পরিবারের প্রেতাত্মা আসিয়া তাঁহার সহিত কথা কহিয়াছেন !

রামলাল দাদা। সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কেন সার্ব্বভৌম মহাশয়ের নিকট ত সেদিন শুনিয়াছ যে, মৃত ব্যক্তির আত্মা মৃত্যুর পরই আত্মীয় স্বজনকে ছাড়িয়া যাইতে পারে না। মায়ায় বদ্ধ হইয়া তাহাদের নিকট বিচরণ করিতে থাকে। ইহা কেবল সার্ব্বভৌম মহাশয়ের মত নয় অনেক পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরও মত এইরূপ। এই সম্বন্ধে বিখ্যাত কবি-টেনিশন্ বলিয়াগিয়াছেন,—

"I do not see why its central truth is untenable. If we would think about this truth, it would become very natural and reasonable to us, why should those who have gone before us, not surround and minister to us as legions of angels surrounded and ministered to our Lord."

তিনি বলিতেন যে তাঁহার বন্ধু আর্থার হ্যালেনের আত্মা সর্ব্বদাই তাঁহার নিকট আসিয়া ধর্ম্ম ও পরলোক সম্বন্ধে অনেক উপদেশ দিতেন। তাই তিনি তাঁহার প্রসিদ্ধ "In Memorium" নামক কবিতাতে লিখিয়াছেন,--

"And what delight can equal those,
That stir the spirits, inner deeps,
When one that loves and knows not reaps.
A truth from one that loves and knows."

কেনারাম কাকাকে যেমন তাঁহার পরিবারের আত্মা বলিয়াছেন যে "মৃত্যুর পর পুনরায় সাক্ষাৎ হইবে পুনরায় দুই জন মিলিত হইয়া সুখী হইব," সম্ভবত আর্থার হ্যালেনের আত্মাও টেনিশনকে ঐরূপ উপদেশ দিয়া ছিলেন এবং সেই উপদেশ বলে তিনি লিখিয়াছেন,—

"That each who seems a separate whole,
Should move his rounds and fusing all,
The skirts of self again, should fall,
Remerging in the etrenal soul.
Is faith as vague as all unsweet
Eternal soul from all beside;
And I shall know him when we meet
And we shall sit at endless feast,
Enjoying each the others good,
What vester cream can hit the mood
Of love on Earth."

ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে টেনিশনের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, মৃত্যুর পর হ্যালেনের আত্মার সহিত তাঁহার মিলন হইবে, এবং তাঁহারা পূর্ব্ব মত কথাবার্ত্তা ও আমোদ আহ্লাদ করিয়া সুখী হইবেন। যখন ভিন্ন দেশীয় বড় বড় পণ্ডিতগণ নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তখন আমাদের মত সামান্য লোকের ইহা অবিশ্বাস করা কি ধৃষ্টতা নয়?

আমি। তাহাতে আর সন্দেহ কি, তবে বধূ দিদির পীড়ার সমাচার কি কেনারাম কাকাকে দেওয়া উচিত বিবেচনা কর?

রামলাল দাদা। অবশ্য উচিত। তিনি চিন্তিত আছেন, একটু ভাল আছেন শুনিলে অনেকটা সুস্থ হইবেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীরাখালদাস চট্টোপাধ্যায়।

"পুনরাগমন"।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

পথে আর উল্লেখযোগ্য কোনও ঘটনা ঘটেনাই। কলিকাতায় পৌঁছিতে আমাদের সন্ধ্যা হইল। ছোট ঠাকুরদা ও বেচু গঙ্গাস্নান করিবার জন্য আমাকে অগ্রসর হইতে বলিলেন। আমি কিন্তু তাহা না করিয়া, হারয়া ও দরোয়ানকে বাটী পাঠাইয়া দিলাম এবং বেহারাদেরও বিদায় দিলাম। নানাপ্রকারে কষ্ট সহিয়াছে বলিয়া আমি তাহাদের যথেষ্ট পুরস্কৃত করিলাম।

হরিয়ার চলিয়া যাইবার সময়, তাহাকে পথের বিপদের কথা মায়ের কাছে বলিতে নিষেধ করিয়া, আমি পিতামহের স্নানের অপেক্ষায় গঙ্গাতীরে বসিয়া রহিলাম।

আমি এখনও পর্য্যন্ত ছোট ঠাকুরদার কাছে গোপালের কথা তুলিবার অবকাশ পাই নাই। পিতামহের স্নানান্তে আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিব স্থির করিয়াছি। সমস্ত দিবস অনাহার। পথে একস্থানে সামান্য মিষ্টান্ন মুখে দিয়া জলপানে তৃষ্ণার নিবারণ করিয়াছি মাত্র। অনাহারে, পথকষ্টে, চিন্তাতরঙ্গের মুহুর্মুহু ঘাত-প্রতিঘাতে, শরীর ও মন

একেবারে অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে। তথাপি আমি বাড়ীতে যাইলাম না। গোপালের কথা জিজ্ঞাসা করিব বলিয়া পিতামহের স্নানের অপেক্ষায় বসিয়া রহিলাম।

যাত্রার প্রারম্ভে পিতামহ প্রগল্‌ভ হইয়া ছিলেন—আমার মনস্তুষ্টির জন্য অনেক কথা কহিয়াছিলেন। যতই তিনি কলিকাতার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন, ততই তাঁহার কথা কমিতে লাগিল। কলিকাতায় পদার্পণ করিয়াই তিনি একরূপ নিরুত্তর। যা দুই একটা কথা কহিবার তা বেচুই কহিতেছে।

বেচু বলিল—"দাদাঠাকুর! স্নানটা একটু শীঘ্র সারিয়া লইবার ব্যবস্থা করুন।

খুল্লপিতামহ বলিলেন—"কেন?"

বেচু। দাদাবাবু সারাদিন অনাহারে—

পিতামহ। তাহাতে কি?

বেচু। আপনার মত ত তাঁহার উপবাস করা অভ্যাস নাই।

পিতা। অভ্যাস নাই বা থাকিল, তাহাতেই বা কি! ব্রাহ্মণ-দেহ,—আপাততঃ ক্রিয়া না থাকিলেও উহাতে সমস্ত শক্তিবীজ নিহিত আছে।

বেচু। তোমার ও আধ্যাত্মিক কথা বুঝিবার আমার শক্তি নাই। দেখিতেছ না, দাদাবাবুর মুখ বিবর্ণ হইয়াছে!"

পিতা। বেশ, তুমি শীঘ্র স্নান সারিয়া ভাইজীকে সঙ্গে লইয়া যাও। আমার যাইতে বিলম্ব হইবে। আমি অনেক কাল পরে মায়ের স্নিগ্ধ কোলে আবার আশ্রয় পাইতেছি, আমি সহজে উঠিতে পারিব না।

শুনিবামাত্র আমি বলিয়া উঠিলাম—"না দাদামশায়! আমার কিছুই কষ্ট হয় নাই। আপনি যতক্ষণ পারেন স্নান করুন—আমি আপনাকে সঙ্গে না লইয়া বাড়ী যাইব না।"

বেচু। অনেক দূর—এখনও আমাদের যাইতে হইবে।

আমি। তা হোক।

বেচু। পুজার বাজার—তাহাতে বড় বাজারের পথ।

বেচু বেশ ভয় দেখাইল! সমৃদ্ধিতে কলিকাতা এখন বিশাল ইংরাজ-সাম্রাজ্যের সমস্ত নগরের মধ্যে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছে। যাঁহারা কেবল এসময়ের কলিকাতা দেখিয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষে পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বের কলিকাতার অবস্থা অনুমান করা নিতান্ত দুঃসাধ্য। পথ ঘাট একান্ত সংকীর্ণ ছিল, সেই সংকীর্ণ পথের দুই ধারে গভীর পঙ্কিল দুর্গন্ধময় জলপূর্ণ পয়ঃ প্রণালী। গলিতে আজি কালিকার মত আলোর ব্যবস্থা ছিলনা। বড় বাজারের অনেক গলি দিবসেই অন্ধকারে ডুবিয়া থাকিত। রাত্রিতে তাহাদের অবস্থা যে কি ভীষণ, তাহা আপনারাই অনুমান করিয়া লউন। প্রায় প্রতি গলিতেই চোর ও জুয়াচোর তাহাদের চিরন্তন আবাস প্রতিষ্ঠিত করিয়া অবস্থিত থাকিত।

বেচুর কথায় সহসা মনের ভিতর ভয় জাগিয়া উঠিল। তখন এসময়ের মত গাড়ীরও আধিক্য ছিলনা—পালকী পাওয়া যাইত বটে, কিন্তু বিপদ উপস্থিত হইলে, আরোহীর পালকী ভিন্ন দ্বিতীয় সহায় থাকিতনা—উড়িয়া বাহক পালকী সমেত আরোহী ফেলিয়া ঝড়ের আগে উড়িয়া যাইত।

তথাপি সাহসে নির্ভর করিয়া আমি উত্তর করিলাম,—"তাহোক আমি দাদামহাশয়ের সঙ্গে যাইব।"

"বেচু! আর সময় নষ্ট করিও না—স্নান কর।" এই বলিয়াই ছোট ঠাকুরদা জলে নামিলেন।

* * *   * * *   * * *   * * *

প্রতিশ্রুত হইয়া বড়ই বিপদে পড়িয়াছি। ফলারে ব্রাহ্মণ মিষ্টান্ন-গর্ভ দধি-সরোবরের কাছ হইতে যেমন উঠিতে উঠিতেও উঠিতে চায়না, খুল্ল-পিতামহেরও সেই অবস্থা ঘটিয়াছে দেখিতেছি। এই পঙ্কিল-জলা জাহ্নবীতে দাদা কি জানি কি রস পাইয়াছেন যে, দুই ঘণ্টা অবিরাম সেই রসপান করিয়াও তাঁহার তৃষ্ণার নিবৃত্তি হইল না। লোহিত-সূর্য্য সম্মুখে করিয়া বসিয়াছিলাম, সে কোন কালে ডুবিয়া গিয়াছে! মহাষ্টমীর আরতি-বাদ্য সহরের চারিদিক হইতে দাদাকে আহ্বান নিমন্ত্রণ করিয়া অবসাদে নীরব হইল, দাদা উঠিলেন না। দুই একটা তারা পশ্চিমাকাশে ভাসিল, ডুবিল, দাদা উঠিলেন না! জাহ্নবী, তৃষ্ণানিবারণের জন্য, সাগর হইতে জল আনিয়া, দাদার মুখের কাছে তরঙ্গে তরঙ্গে তুলিয়া ধরিল, সে অতৃপ্ত পিপাসা নিবৃত্ত হইবার নয় ভাবিয়া, আবার সাগরাভি-মুখে ফিরিয়া চলিল। এক এক করিয়া ঘাটের সিঁড়ির চারিধাপ উঠিয়া গঙ্গা আমার কাছ পর্য্যন্ত আসিয়া দাদাকে তুলিবার জন্য অনুরোধ করিল,—আমার কথা কহিতে সাহস হইল না। প্রিয়ভক্ত বেচু পর্য্যন্ত অপেক্ষায় বিরক্ত হইয়া দাদাকে বার দুই তিন অনুচ্চস্বরে আহ্বান করিল;—উত্তর না পাইয়া সেও আর তাঁহাকে ডাকিতে সাহস করিল না। তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিয়া আমার কাছে বসিয়া, জলগর্ভস্থ নিস্তব্ধ ব্রাহ্মণের নিস্পন্দাভিনয় দেখিতে লাগিল।

সন্ধ্যাবন্দনাদি নয়, জপ নয়, স্তোত্রপাঠ নয়,—খুল্ল-পিতামহের সে বিস্ময়কর কার্য্য আজও পর্য্যন্ত আমার দুর্ব্বোধ্য রহিয়া গিয়াছে।—বরাবরই তাঁহার পানে চাহিয়াছিলাম, পলে পলে তাঁহার স্নানশেষের অপেক্ষা করিয়াছিলাম, কিন্তু মুহূর্ত্ত সময়ের জন্য তাঁহাকে একটুও স্থানত্যাগ করিতে দেখি নাই। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! খুল্ল-পিতামহের দেহ জলের উপর যে টুকু জাগিয়াছিল জাহ্নবী শত চেষ্টাতেও সেটুকু আবৃত করিতে

পারিলনা—জল বৃহৎ তরঙ্গের উচ্চতা লইয়াও দাদার চিবুকস্পর্শ করিতে সমর্থ হইল না।

সন্ধ্যা হইতে আরম্ভ করিয়া কত লোক যে ঘাটে আসিয়াছে, তাহার সংখ্যা নাই। তাঁহারা স্নানাহ্নিকাদি সারিয়া চলিয়া গিয়াছে। আর কেহ আসিতেছে না। আমি ও বেচু কেবল ঘাটে বসিয়া আছি।

নির্জনতার পীড়ন ক্রমে অসহ্য হইয়া উঠিল। আমি বেচুকে বলিলাম,—"বেচু! তুমি এই বারে দাদাকে উঠাও"

বেচু বলিল,—"না দাদা বাবু, আমি পারিব না। পারেন ত আপনি উঠান।"

আমি জলের সমীপে একটু অগ্রসর হইয়া ডাকিলাম,—"দাদা-মহাশয়!" উত্তর পাইলাম না। দুইবার তিনবার—উত্তর পাইলাম না। তখন গা ঠেলিয়া তাঁহার উত্তর লইতে সঙ্কল্প করিলাম। কিন্তু দাদার অঙ্গস্পর্শ করিতে হইলে জলে নামিতে হয়। আমি জুতা জামা খুলিয়া বেচুর হাতে দিলাম, তাহার নিকট হইতে বস্ত্র লইয়া বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিলাম।

জলে সবে মাত্র পা দিয়াছি, এমন সময় একটী বৃদ্ধা রমণী কোথা হইতে সেই ঘাটে আসিল। আসিয়াই বলিল—"কর কি বাবা! ব্রাহ্মণ ধ্যানে বসিয়াছেন, তুমি তাহা ভঙ্গ করিতে যাইতেছ কেন?"

তাহাকে দেখিবামাত্র ও কথা শুনিবামাত্র বেচু বলিয়া উঠিল,—"কাজ নেই দাদাবাবু, উঠিয়া আসুন।"

ইতিমধ্যে বৃদ্ধা আমার সমীপস্থ হইয়া জলে পা দিয়াছে। আমি তাহার কুৎসিত আকৃতি ও মলিন বেশ দেখিয়া তাহার কথার উত্তর দিতে ইচ্ছা করিলাম না। বেচুর কথার উত্তরে বলিলাম—"তবে কি সমস্ত রাত এই গঙ্গার ঘাটে বসিয়া থাকিব!"

বৃদ্ধা বলিল—"কোথায় যাবে বাবা ?"

আমি উত্তর দিলাম না। বেচু আমার হইয়া উত্তর করিল—"আমরা পটলডাঙ্গায় যাইব।"

বৃদ্ধা। সেত আর দূর নয়। উঁহার ধ্যানভঙ্গের অপেক্ষা কর।

বেচু। ঠাকুর দুই ঘণ্টার উপর বসিয়া আছেন।

বৃদ্ধা। উনি আরও এক ঘণ্টা সময় পরে উঠিবেন।

বেচু। আরও এক ঘণ্টা বসিতে হইলে দাদাবাবুর বড়ই কষ্ট হইবে। উনি সমস্ত দিন কিছুই আহার করেন নাই।

বৃদ্ধা। কিছু খাবার আনিয়া দিব কি ?

এরূপ কথায় আমার বৃদ্ধার প্রতি সন্তুষ্ট হওয়াই কর্ত্তব্য ছিল। তাহা না হইয়া আমি তাহার এই মমতাময় কথায় বরং ক্রুদ্ধ হইলাম।

সারাদিনের উপবাস এ ক্রোধে অনেকটা সাহায্য করিল। আমি বলিলাম—"তোমাকে কিছু আনিতে হইবে না।" এই বলিয়াই খুল্ল পিতামহকে ডাকিতে লাগিলাম—"দাদামহাশয়,"—উত্তর পাইলাম না। উচ্চতরস্বরে সম্বোধন করিলাম,—" দাদা মহাশয় উঠিয়া আসুন।" উত্তর পাইলাম না। এইবারে দাদার ব্যবহারে বিরক্ত হইলাম। এমন কি আহ্নিক, আমার একটা কথার উত্তর দিবারও অবসর নাই! দাদার বুজরুকি ভাঙ্গিয়া দিতে দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়া জলে অবতীর্ণ হইলাম। একগলা জলে নামিয়া যেমন দাদার গায়ে হাত দিয়াছি, অমনি—কি বলিব! আজিও পর্য্যন্ত স্মরণে আমার রোমাঞ্চ হইতেছে,—দাদার দেহ বায়ুপূর্ণ কুম্ভবৎ গভীরজলে ভাসিয়া গেল!

"কি করিলে দাদা বাবু! বলিয়া বেচু উপর হইতে উচ্চকণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে সেই মলিনবেশা কদাকারা বৃদ্ধার বিকট হাসি। সে বিভীষিকাময় হাস্য যে না শুনিয়াছে, সে তাহার বিকটত্ব

কিছুতেই অনুভব করিতে পারিবেনা। প্রথমে আমি স্তম্ভিত হইলাম, চারিদিক যেন অন্ধকার দেখিলাম। জাহ্নবী তরঙ্গে তরঙ্গে যেন সেই চীৎকার আলিঙ্গন করিল। প্রতিধ্বনি পরপার হইতে শতঝঙ্কারে ছুটিয়া আসিয়া আমার কর্ণাবরোধ করিল। আমি ভয়ে জল হইতে উঠিয়া পড়িলাম।

উঠিয়া দেখি, সে জীবন্ত ডাকিনীমূর্ত্তি কোথায় অন্তর্হিত হইয়াছে।

বেচু কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—,"দাদা বাবু! কি করিলে?" কোনও উত্তর দিতে সমর্থ হইলাম না। আর একবার জাহ্নবীর দিকে চাহিলাম। দেখিলাম দাদার দেহ নদীর স্রোতে কোন্ অনির্দ্দিষ্ট দেশে ভাসিয়া গিয়াছে।

"দাদামহাশয়! দাদামহাশয়!" কোন্ দূর দিগন্তাগত সেই ডাকিনীর বিকট হাস্যের মর্ম্মভেদী প্রতিধ্বনি আমার আকুল চীৎকারকে উদরস্থ করিয়া ফেলিল।

"বেচু! এখন কি করিব!" কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া আমি বেচুকে প্রশ্ন করিলাম।

ভৃত্য বেচু আর আমার মর্য্যাদা রাখিল না। মর্ম্মবেদনায় অতি ক্রোধে সে বলিয়া উঠিল,—"আবার কি করিবে! তোমার সঙ্গে পড়িয়া আমি আমার গুরুকে হারাইলাম। যাও ঠাকুর, ঘরে চলিয়া যাও।"

"তুমি?"

"আমি কোথায় যাইব?"

"দোহাই ভাই, মনের অবস্থা বুঝ, ক্রোধ করিও না।"

"ও পাপসঙ্গ আর করিতেছি না।' এই বলিয়াই বেচু তীরভূমি অবলম্বন করিয়া উন্মত্তের মত ছুটিল; ও দেখিতে দেখিতে অদৃশ্য হইয়াগেল।

জনপূর্ণ নগরে উৎসবময় মহাষ্টমীর নিশায় আমি একাকী—যেন জীবনহীন শ্মশানে উপস্থিত হইয়াছি। ঘরে ফিরিবার চিন্তায় হৃদয় দুরু দুরু কাঁপিয়া উঠিল। সমস্ত সঙ্গীকে অগ্রেই পরিত্যাগ করিয়াছি। সঙ্গে অর্থ রহিয়াছে; এরূপ অবস্থায় একাকী কেমন করিয়া ঘরে ফিরিব?

বেচু যাইবার সময় আমার বস্ত্রাদি পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে। আমি তাহা পরিধান করিয়া বেচুর বস্ত্র পরিত্যাগ করিলাম; এবং অনন্যোপায় হইয়া ঘাট ছাড়িয়া উপরে উঠিলাম।

পথে পড়িয়া দুই একপদ অগ্রসর হইয়া দেখি একখানা গাড়ী পথের পাশে দাঁড়াইয়া আছে; ভাড়াটিয়া গাড়ী মনে করিয়া নিকটে গিয়া দেখি—একি! এযে আমাদেরই গাড়ী! একি আমি স্বপ্ন দেখিতেছি!

আমি বিস্ময়ে, উল্লাসে, উন্মত্তের ন্যায় বলিয়া উঠিলাম—"কোচোয়ান!" কোচোয়ান আমাকে দেখিয়াই বলিল—"এই যে আছি হুজুর।"

তাহার উত্তরে আমার বিস্ময় চতুর্গুণ বাড়িয়া উঠিল। বোধ হইল, সে যেন আমারই অপেক্ষা করিতেছিল। আমি বলিলাম—"কে তোমাকে এখানে আসিতে বলিয়াছে?"

কোচোয়ান বলিল—"হরিয়ার মুখে আপনাদের আগমন বার্ত্তা শুনিয়া মা আপনাদের লইয়া যাইতে আমাকে পাঠাইয়া দিয়াছেন। আপনার সঙ্গে ঠাকুরদাদা বাবু আসিয়াছেন, তিনি কই?"

"তিনি অন্যত্র গিয়াছেন," এই বলিয়া গাড়ীতে উঠিয়া আমি কোচোয়ানকে চলিতে আদেশ করিলাম। বিভীষিকা সঙ্গে সঙ্গে চলিল। সেই বৃদ্ধার বিকট হাসি শকটচক্র শব্দ আবৃত করিয়া আমার সঙ্গে সঙ্গে চলিল। যাতনায় দুই হস্তে আমি মুখ ঢাকিলাম, আর মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলাম ইহ জন্মে আর গোপালের নাম মুখে আনিব না। (ক্রমশঃ)

শ্রীক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ।

স্বপ্ন-কথা।

স্বপ্নে দলীল প্রাপ্তি।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

সার ওয়াল্টার স্কট্ তাঁহার ওয়েবার্লি উপন্যাসের পরিশিষ্টে নিম্ন-লিখিত স্বপ্ন বৃত্তান্তটি খুব বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত বলিয়া সন্নিবেশিত করিয়াছেন।

রথারফোর্ড্ স্কট্লাণ্ড দেশীয় একজন সঙ্গতিপন্ন ব্যক্তি। তাঁহার অনেক জমি জমা ছিল। ঐ দেশের এক প্রবল জমিদার বাকি খাজনার দাবী দিয়া রথারফোর্ডের নামে অনেক টাকার নালিশ করিয়াছিলেন। যে জমির উপর খাজনার দাবী করা হইয়াছিল, উক্ত জমি নিষ্কর বলিয়া রথারফোর্ডের বরাবর ধারণা ছিল,—তাঁহার বিশ্বাস ছিল, বহুকাল পূর্ব্বে তাঁহার পিতা ঐ জমি সম্বন্ধে জমিদারদিগের সহিত একটা বন্দোবস্ত করিয়া গিয়াছেন, সুতরাং উহার খাজনা আর দিতে হইবে না। কিন্তু বহু অন্বেষণ করিয়াও তিনি এ সম্বন্ধে কোন কাগজ পত্র বা দলিল বাহির করিতে পারিলেন না এবং পিতা মৃত্যুর সময় বা পূর্ব্বে এ সম্বন্ধে তাঁহাকে কিছু বলিয়াছিলেন—ইহাও তাঁহার বোধ হইল না। মকদ্দমার দিন ক্রমে নিকটস্থ হইল, অথচ তিনি কিছুই প্রমাণ সংগ্রহ করিতে পারিলেন না। নিশ্চয়ই হারিতে হইবে ইহা ভাবিয়া তিনি স্থির করিলেন "কল্য এডিনবরা গিয়া জমিদারদের সহিত এই মোকদ্দমা আপোষে মিটাইয়া লইব। মকদ্দমা চালাইয়া বৃথা খরচ বাড়াই কেন?" এই সংকল্প করিয়া তিনি বিষণ্ণ-মনে নিদ্রা গেলেন।

সেই রাত্রেই তিনি স্বপ্ন দেখিলেন তাঁহার পিতা নিকটে দাঁড়াইয়া,

তাঁহার বিষাদের কারণ জিজ্ঞাসা করিতেছেন। তিনি পিতাকে সমস্ত বিবরণ দিয়া বলিলেন "আমার একান্ত বিশ্বাস উক্ত টাকা আমাদের দেয় নহে, অথচ এ সম্বন্ধে কোন কাগজ পত্র পাইতেছি না। ইহাই আমার বিষাদের কারণ।" পিতা বলিলেন "বৎস, তুমি যাহা ভাবিয়াছ তাহাই ঠিক। প্রকৃতপক্ষে উক্ত টাকা আমাদের দেয় নহে। অনেক কাল পূর্ব্বে আমি ঐ জমির স্বত্ব ক্রয় করিয়া জমি নিষ্কর করিয়া লইয়াছিলাম। ইহার দলীল অমুক এটর্ণির নিকট আছে। ঐ এটর্ণি এখন বৃদ্ধ হইয়াছেন এবং কার্য্য হইতে অবসর লইয়া এডিনবরার নিকট ইনভারেস্ক নামক নগরে বাস করিতেছেন। তাঁহার নিকট হইতে তুমি সমস্ত কাগজ পত্র পাইবে। কিন্তু ইহা অনেক কালের কথা, তাঁহার স্মরণ না থাকিতেও পারে। যদি তিনি ইহা বিস্মৃত হইয়া থাকেন, তাঁহাকে বলিবে যে যেদিন আমি তাঁহার টাকা চুকাইয়া দিতে যাই, সেই দিন একটি পর্ত্তুগাল মোহর ভাঙ্গাইবার জন্য আমাকে বড় কষ্ট পাইতে হইয়াছিল। ঐ মোহরের পরিবর্ত্তে কেহই টাকা দিতে চাহেনা, অবশেষে আমরা এক শুঁড়ির দোকানে কিছু মদ্য ক্রয় করিয়া তাহা ভাঙ্গাইয়াছিলাম। এই ঘটনাটি বলিলেই তাঁহার সকল কথা মনে পড়িবে।" এই বলিয়া পিতা অন্তর্হিত হইলেন। রথারফোর্ড প্রত্যূষে উঠিয়াই এটর্ণির নিকট গমন করিলেন। দেখিলেন বাস্তবিকই এটর্ণি খুব বৃদ্ধ হইয়াছেন। দলীলের কথা জিজ্ঞাসা করায় তাঁহার প্রথমে কিছুই স্মরণ হইলনা, পরে পর্ত্তুগাল মোহরের বৃত্তান্ত উল্লেখ করিবামাত্র তিনি বলিলেন "হাঁ হাঁ! ওঃ সে অনেক দিনের কথা। দলীল আমার নিকটে আছে।" এই বলিয়া তিনি সমস্ত কাগজ পত্র আনিয়া দিলেন। নির্দ্দিষ্ট দিনে রথারফোর্ড আদালতে ঐ দলীল হাজির করিয়া মকদ্দমায় জয়লাভ করিলেন।

সার ওয়াল্টার স্কট্ বলেন "বোধ হয় রথারফোর্ড বাল্যকালে পিতার নিকট হইতে ঐ বৃত্তান্ত শুনিয়াছিলেন ; কিন্তু উহা তাঁহার জাগ্রৎ-স্মৃতি (Consious memory) হইতে বিলুপ্ত হইয়াছিল, অথচ প্রচ্ছন্নভাবে (in a sub consious state) উহা তাঁহার অন্তরে অবস্থান করিতেছিল। নিদ্রাবস্থায় ঐ প্রচ্ছন্ন স্মৃতি জাগ্রৎ চৈতন্যে ভাসিয়া উঠিয়াছিল মাত্র।" অবশ্য, ইহা যে অসম্ভব নহে আমরা স্বীকার করিতে বাধ্য। আবার, পিতার অনবধানতা নিবন্ধন পুত্রকে যে বিষম মনস্তাপ ও অর্থহানি সহ্য করিতে হইতেছিল, তাহা নিবারণ করিবার জন্য সূক্ষ্মদেহে তিনি পুত্রের নিকট আসিয়া ঐ সকল কথা বলিয়া গেলেন—ইহাও অসম্ভব নহে।

ভীষণ হত্যাকাণ্ড।

এড্মণ্ড্ নরওয়ে নামক এক ইংরাজ ওরিয়েণ্ট জাহাজের অধ্যক্ষ ছিলেন। ১৮৪০ খৃঃ ফেব্রুয়ারী মাসে ঐ জাহাজ মানিলা হইতে কেম্ব্রিজে আসিতেছিল। ৮ই তারিখে উহা সেণ্ট্ হেলেনা দ্বীপ হইতে প্রায় ৭ মাইল দূরে অবস্থিত ছিল। সেই রাত্রে এড্মণ্ড্ যে একটি ভয়ঙ্কর স্বপ্ন দেখেন তাহা তিনি পরদিবসই এই ভাবে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখেন :—

জাহাজ ওরিয়েণ্ট
ম্যানিলা হইতে কেম্ব্রিজ,
৮ই ফেব্রুয়ারী, ১৮৪০

রাত্রি ৭॥০টার সময় সেণ্টহেলেনা দ্বীপ প্রায় ৭ মাইল উত্তর-পশ্চিমে। ৮টার সময় নীচের কামরায় আসিলাম। আমার ভ্রাতা নেবেলকে একখানি পত্র লিখিলাম। ৯—৪৫ মিনিটে শয়ন করিলাম ও নিদ্রা গেলাম। স্বপ্নে দেখিলাম—দুইটি লোক ভ্রাতাকে আক্রমণ ও হত্যা করিল। ভ্রাতা অশ্বারোহণে ওয়েড্ব্রিজ্ নামক স্থানে যাইতেছিল। পথিমধ্যে

এই ঘটনা ঘটিল। এক ব্যক্তি অশ্বের লাগাম ধরিয়া দুইবার পিস্তল ছুঁড়িল, কিন্তু কোন শব্দ হইল না। ইহাতে সে ভ্রাতাকে একটা আঘাত করিল। ভ্রাতা ঘোড়া হইতে পড়িয়া গেল। তখন তাহারা উভয়েই তাহাকে আঘাত করিতে লাগিল। অবশেষে তাহার স্কন্ধ দেশ ধরিয়া রাস্তার উপর দিয়া তাহাকে হিচ্‌ড়াইয়া টানিয়া লইয়া গেল এবং এক স্থানে ফেলিয়া চলিয়া গেল। রাত্রি ৪টার সময় জাহাজের তত্ত্বাবধানের জন্ম আমার নিদ্রাভঙ্গ করা হইল। আমি তখন পর্য্যন্ত ঐ স্বপ্নটি দেখিতেছিলাম। ইতি

এড্‌মণ্ড্ নর্‌ওয়ে

এই তো গেল ঘটনাস্থল হইতে শত শত মাইল দূরে সমুদ্রবক্ষে জাহাজের উপরের দৃশ্য! এখন প্রকৃত ঘটনাস্থলে আসিয়া দেখা যাক্ ব্যাপারটা কত দূর সত্য। নেবেল নর্‌ওয়ে ঐ দিবস (৮ই ফেব্রুয়ারী) কোন কার্য্যোপলক্ষে বড্‌মিনে যান। ফিরিতে রাত্রি হয়। প্রায় ৯॥ টার সময় তিনি একাকী অশ্বারোহণে গৃহাভিমুখে যাত্রা করেন। ওয়েড্‌ব্রিজে তাঁহার গৃহ, সুতরাং ওয়েড্‌ব্রিজের রাস্তা ধরিয়া তাঁহাকে আসিতে হইতেছিল। তিনি ৩.৪ মাইল আসিলে, লাইট্‌ফুট্ ও জেম্‌স্ নামে দুই ভ্রাতা তাঁহাকে আক্রমণ ও হত্যা করে। বড্‌মিনের আদালতে হত্যাকারীদের বিচার হয় এবং দোষী সাব্যস্ত হওয়ায়, ১৮৪০, ১৩ই এপ্রেল তারিখে উভয়েরই প্রাণদণ্ড হয়। বিচারকালে উইলিয়াম লাইট্‌ফুট্ নিজ মুখে যাহা স্বীকার করিয়াছেন, আমরা নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিলাম। ইহা হইতে পাঠক বুঝিতে পারিবেন স্বপ্নটি কত দূর সত্য।

"আমি ৮ই তারিখে বড্‌মিনে গিয়াছিলাম। ফিরিবার সময় রাস্তায় আমার ভাই জেম্‌সের সহিত দেখা হয়। তখন সন্ধ্যা হয় হয়। আমাদের কিছু পয়সার দরকার, সুতরাং এক মাঠে লুকাইয়া রহিলাম। খানিক

পরে এক অশ্বারোহীকে আক্রমণ করিলাম। জেম্‌স্ দুই বার পিস্তল ছুঁড়িল, কিন্তু আওয়াজ হইল না। ইহা দেখিয়া সে ঐ পিস্তলের দ্বারা উহাকে আঘাত করিল। আমি বরাবরই জেম্‌সের সঙ্গে ছিলাম। নর্‌ওয়ে ঘোড়া হইতে পড়িয়া গেলে আমরা তাহাকে টানিয়া রাস্তার ধারে জলের নিকট আনিলাম। তখন রাত্রি কত আমি জানি না। আমরা টাকার একটা থলে পাইলাম। উহাতে কত ছিল জানিতাম না।"

শ্রীমাখনলাল রায়চৌধুরি।

প্রেতাত্মার মূর্ত্তি দর্শন।

মৃতা চন্দ্রকুমারী।

কলিকাতার পূর্ব্বোপকণ্ঠস্থিত বাঘমারি নামক পল্লী হইতে এই কাঁকুড়গাছিতে আসিয়া বসবাস করিবার চারি পাঁচ বৎসর পরে একদিন রাত্রে মদীয় কনিষ্ঠ সহোদর-সমভিব্যাহারে সহর হইতে প্রত্যাগমন কালীন একটি অত্যাশ্চর্য্য দৃশ্য নয়নগোচর হইয়াছিল। আমরা দুই ভ্রাতায় রাত্রি আন্দাজ নয়টার সময় "সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজ-প্রার্থনা-মন্দির" হইতে গৃহে প্রত্যাগমন করিতেছিলাম। বরাবর মাণিকতলার খালের পুল পার হইয়া নারিকেলডাঙ্গা সাউথ্ রোডের মোড়ে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি, এমন সময় রাস্তার অপর পার্শ্বস্থিত চৌধুরী মহাশয়ের বাটীর সম্মুখস্থ একটি বকুল গাছের তলায় একজন পরিচিতা স্ত্রীলোকের সহিত আমাদের সাক্ষাৎ হইল। তাহার বয়স আন্দাজ ৪০।৪৫ বৎসর হইবে। বৃদ্ধা আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"বাবুদের যাওয়া হইয়াছিল

কোথায়?” আমি বলিলাম, “সিমলায় একটা কাজ ছিল, তাই গিয়াছিলাম, এখন বাড়ী ফিরিতেছি।” তারপর, আমাদের বাড়ীর অন্যান্য সকলের বিষয় জিজ্ঞাসা করিল; আমি যথাযথ উত্তর প্রদান করিলাম। শেষে আমরা উভয়ে তাহাকে একদিন আমাদের বাটী আসিতে অনুরোধ করিলাম; উহার উত্তরে বলিল,—“আর বাবা, আমার যাওয়া! পারি যদি মাঠাকুরুণের সহিত একবার দেখা করিব।” আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—“তুমি এখন এইখানেই তো আছ? এক দিন বেড়াইতে বেড়াইতে আমাদের ওখানে যেও না কেন?” “আর বাবা, আমি এখন কোথায় থাকি ঠিক নাই! রাত হ'য়ে যাচ্ছে, তোমরা এখন এসো।” এই বলিয়া বৃদ্ধা হঠাৎ আমাদের সম্মুখ হইতে অন্তর্হিত হইল। চক্ষের নিমিষে কোথায় যে সরিয়া পড়িল কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না! তাহাকে আরও দুই চারিটি বিষয় জিজ্ঞাসা করিবার ছিল, সেইজন্য আমরা উভয়ে তৎক্ষণাৎ এদিক ওদিক অন্বেষণ করিতে লাগিলাম, কিন্তু আমাদের চেষ্টা ব্যর্থ হইল। বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় যে, এত অল্প সময়ের মধ্যে সে অকস্মাৎ কোথায় লুকাইয়া পড়িল, আমরা কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না! আর একটা আশ্চর্য্য এই দেখিলাম যে, যখন সে আমাদের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতেছিল, তখন যেন রাস্তায় একটিও জনপ্রাণী ছিল না—যেন মুহূর্ত্তমধ্যে কোন মন্ত্রবলে সকলের গতিবিধি বন্ধ করিয়া রাখা হইয়াছিল—আর যেই সে আমাদের নিকট হইতে অপসৃত হইল, অমনি লোকের যাতায়াত আরম্ভ হইল! ইহা আমরা উভয়েই বেশ লক্ষ্য করিয়াছিলাম, কিন্তু তাহার অকস্মাৎ অপসর্পণে আমরা অধিকতর আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলাম। ইহার কোন কারণ খুঁজিয়া পাইলাম না। অবশেষে, আত্মতুষ্টির নিমিত্ত একটা মনগড়া

সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম,—বোধ হয়, কাহাকে দেখিতে পাইয়াছিল এবং তাহার সহিত বোধ হয় গোপনীয় কথাছিল, তাই, আমাদের নিকট হইতে হঠাৎ চলিয়া গেল। কিন্তু, যখন পুনরায় মনে হইল যে, এত অল্প সময়ের মধ্যে, অর্থাৎ চক্ষের নিমিষে, কোথায় সরিয়া পড়িল—আর ইহার মধ্যে কার সঙ্গেই বা দেখা হইল—তখন আমরা পুনরায় হতবিবেক হইয়া পড়িলাম! অবশেষে, তাহার সম্বন্ধে নানা বিষয় কথোপকথন করিতে করিতে আমরা বাড়ীর দিকে অগ্রসর হইলাম।

উপরোল্লিখিত স্ত্রীলোকটিকে আমরা বাল্যকাল হইতে চিনি; মাণিকতলা মেইন রোডের উপর উহার একখানি মুদিখানার দোকান ছিল; আমরা উহার দোকানে অনেক সময় সওদা লইতাম এবং সেও আমাদিগকে বাল্যকাল হইতে অত্যন্ত স্নেহ ও যত্ন করিত। প্রত্যহ প্রভাতে নিদ্রাভঙ্গের পর সর্ব্বপ্রথমে আমরা উহার দোকানে উপস্থিত হইলাম এবং সে আমাদের হাতে মুড়ী মুড়কী দিয়া পুনরায় বাটী পাঠাইয়া দিত। যদি কোন দিন আমরা যাইতে না পারিতাম, তাহা হইলে, সে দোকানের ক্রয়-বিক্রয় বন্ধ রাখিয়া আমাদের খবর লইয়া যাইত। আমরা তাহাকে "চন্দুরী" বলিয়া ডাকিতাম; কেবল যে আমরা তাহাকে ঐ নামে ডাকিতাম, তাহা নহে, পাড়ার সকলেই তাহাকে ঐ নামে ডাকিত—তাহার আসল নাম, "চন্দ্র-কুমারী"। তারপর, আমরা বড় হইলে, তাহার দোকানে আর যাইতাম না, সে কিন্তু প্রত্যহই আমাদের খবর লইত।

তারপর আমরা বাড়ী আসিয়া মাতাঠাকুরাণীকে জানাইলাম যে, অনেক দিন পরে "চন্দুরীর" সহিত সাক্ষাৎ হইল। তিনি আমাদের কথা শুনিয়া বিস্ময়-বাক্যে বলিয়া উঠিলেন,—"সে কি! চন্দুরী তো বছর খানেকের উপর হইল মারা গিয়াছে!" আমরাও তদ্দৎ বিস্মিত

হইয়া বলিলাম,—"মারা গিয়াছে কি! এই আমরা তাহাকে জলজ্যান্ত দেখিয়া আসিলাম; সে সকলের কথা জিজ্ঞাসা করিল এবং তোমার সহিত একদিন দেখা করিবে, তাহাও বলিল। মারা গিয়াছে তুমি কি করিয়া জানিলে?" তিনি বলিলেন,—"এই রাসের সময় আমাদের ওপাড়া থেকে অনেকে আমাদের বাড়ী আসিয়াছিল, কিন্তু তাহাদের সঙ্গে চন্দুরীকে দেখিতে না পাইয়া তাহার কথা জিজ্ঞাসা করায় তাহারা বলিল যে, সে 'দেশে' গিয়া 'কলেরায়' মারা গিয়াছে।" তারপর শুনিলাম যে, শুঁড়ায় চৈত্র পূর্ণিমার সময় ৺রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের বাগানে যখন রাস হয়, সেই সময় প্রতি বৎসর আমাদের ওপাড়া হইতে অনেক স্ত্রীলোক রাস দেখিতে আসিয়া একবার আমাদের বাড়ী হইয়া সকলের সহিত দেখা সাক্ষাৎ করিয়া যায়। চন্দুরীও তাহাদের সহিত আসিত; কিন্তু এই বৎসর সে আসে নাই দেখিয়া, তাহার কথা জিজ্ঞাসা করায় জানাগেল যে সে মারা গিয়াছে। আমাদের কথা শুনিয়া মাতাঠাকুরাণী অবশেষে বলিলেন যে, সে আমাদিগকে বাল্যকাল হইতে অত্যন্ত ভালবাসিত এবং অনেক দিন আমাদিগকে দেখে নাই বলিয়া মৃত্যুর পর আমাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিল! তাহার যে মৃত্যু হইয়াছে, সহজে এ কথা আমরা বিশ্বাস করিতে পারিলাম না। পিতাঠাকুর ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা এই কথা শুনিয়া বলিলেন, বোধ হয়, আমরা অন্য কাহারও সহিত কথা কহিয়া থাকিব, রাত্রিতে চিনিতে পারি নাই। আমরা যে চন্দুরীকেই দেখিয়াছিলাম এবং সে আমাদিগের সহিত কথাবার্ত্তা কহিয়াছিল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ আমাদের ছিল না। আমাদের উভয়েরই কি দৃষ্টিভ্রম উপস্থিত হইবে? আর, যে সময় তাহার সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল, সে সময় সেই রাস্তায় অন্য কোন জনপ্রাণী যাতায়াত করে নাই (ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি)

যে, আর কাহাকে দেখিয়া তাহাকে মনে করিয়া লইয়াছি। আর একটা কথা,—সে সময় বেশ জ্যোৎস্না ছিল, আমরা তাহাকে স্পষ্ট দেখিলাম, সে একখানি শাদা ধপ্‌ধপে থান পরিয়াছিল; তাহার আকার প্রকারে এবং সর্ব্বোপরি তাহার স্নেহমিশ্রিত কণ্ঠস্বরে তাহাকে আমরা সহজেই চিনিতে পারিয়াছিলাম। সে যে মারা গিয়াছে, তাহা কি প্রকারে আমরা এত শীঘ্র বিশ্বাস করি! মাতাঠাকুরাণীর এক প্রকার সিদ্ধান্ত এবং পিতাঠাকুর ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অন্য প্রকার—এতদুভয়ের মধ্যে পড়িয়া আমরা উভয়ে বিলক্ষণ হতবিবেক হইলাম। শেষে আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে ভাল করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম যে, আমরা যাহাকে দেখিলাম, সে চন্দুরী কি না? সে বলিল—"নিশ্চয়ই, ইহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। আচ্ছা, মেজদাদা, কাল ঐ পাড়াতে গিয়া আমরা নিজে জিজ্ঞাসা করিব, চন্দুরী কোথায় থাকে।" আমিও সম্মত হইলাম।

পরদিবস প্রভাতে উঠিয়াই গত রজনীর অলৌকিক ব্যাপারের তথ্যানুসন্ধানার্থ আমরা উভয় ভ্রাতায় বহির্গত হইলাম। মাণিকতলায় পূর্ব্বে যেখানে তাহার বাসস্থান ছিল, আমরা সেখানে উপস্থিত হইয়া তৎপ্রতিবেশীদিগের নিকট তাহার অনুসন্ধান করিলাম। তাহারাও বলিল যে, সে বছর খানেক হ'বে মারা গিয়াছে; তাহার দেশের একজন আত্মীয় আসিয়া তাহার এখানকায় দোকানঘর ও জিনিসপত্র প্রভৃতি বিক্রয় করিয়া লইয়াগিয়াছে। সুতরাং মাতাঠাকুরাণীর অনুমানই সত্য বলিয়া বোধ হইল। কিন্তু সে যে একদিন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবে বলিয়া আমাদিগের নিকট প্রকাশ করিয়াছিল, তাহা আর করিল না এবং আমরাও আর তাহাকে কোথাও দেখিতে পাই নাই।

মৃত্যু পরে যে প্রেতাত্মাদিগের সহিত পুনরায় সাক্ষাৎ হয়, এইটি

আমার তৃতীয় প্রত্যক্ষ প্রমাণ—পূর্ব্বে অপর দুইটির বিষয় বলিয়াছি ("অলৌকিক রহস্য", ১৩১৬ সালের ফাল্গুন ও চৈত্র সংখ্যা দ্রষ্টব্য)। কিন্তু কি উপায়ে ও কোন সূত্রে যে সাক্ষাৎ হয়, তাহা এখনও নির্দ্ধারণ করিতে পারি নাই। যদি ভগবানের কৃপা হয়, তাহা হইলে বোধ হয়, উহা উদ্ঘাটন করিতে সমর্থ হইব!

শ্রীঅমৃতলাল দাস।

ভূতুড়ে কাণ্ড।

ভূত বিশ্বাস করিতাম না, ভূত আছে ইহাও মনে স্থান দিতাম না। আমার জীবনে ভৌতিক কাণ্ড অনেকই প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়াছি, এবং উহাদের বিবরণ কোন কোন সংবাদও সাময়িক পত্রে তৎকালে প্রকাশ করিয়া সাধারণের অলৌকিক ভৌতিক কাণ্ডের প্রতি অবস্থা স্থাপন পক্ষে কতকটা সহায়তা করিয়াছি। আজ আমি পাঠকগণের তৃপ্তি ও অলৌকিক ভৌতিক কাণ্ডে বিশ্বাস স্থাপন পক্ষে সহায়তার নিমিত্ত একটী গল্প উপস্থিত করিলাম।

ময়মনসিংহ জেলায় বেতাগরি একটী প্রসিদ্ধ গ্রাম। সে গ্রামের বহু প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ মজুমদার পরিবার সে অঞ্চলে বড় মানুষ বলিয়া প্রসিদ্ধ। মানুষের উপর তাহাদের অসীম প্রতাপ হইলেও ভূত তাহা গ্রাহ্য করিল না। ভূত কাহাকেও খাজানা দেয় না, গ্রাহ্যও করে না, আইন কানুনও মানে না সুতরাং ভূতের উপর কাহারও ক্ষমতা খাটে না। তবে ওঝা নামক এক প্রকার জীব তাহারাই ভূতের উপর শাসনদণ্ড পরিচালন করিয়া স্বকীয় অদ্ভুত আধিপত্য বজায় রাখিতে পারিতেছে।

বেতাগরিরই একটী পাড়া সে গ্রামের নাম আত্মারাম পুর। সে গ্রামে ৮।১০ ঘর কায়স্থ, ১০।১২ ঘর নমশূদ্র, ৪।৫ ঘর নট অর্থাৎ নৃত্যকারী

গীতবাদ্যকারী লোকের ও বাকী ১০।১২ ঘর মুসলমানের বাস। এই কয় ঘর লইয়াই আত্মারাম পুর। বাহিরের লোক ইহাকে বেত্তাগরি হইতে স্বতন্ত্র গ্রাম বলিয়া জানে না। ইহারা সকলেই কোন প্রকার হলকর্ষণের উপর জীবন নির্ভর করিয়া থাকে, অপর কোন অর্জ্জন নাই বলিলেই চলে। ইহারা সকলেই প্রতাপশালী মজুমদার বাবুদের প্রজা। একটী বৃহৎ প্রাচীন অশ্বথ বৃক্ষ, ডিষ্ট্রিক্টবোর্ডের রাস্তা আর এই দরিদ্রদের ৩।৪টী পুষ্করিণী ব্যতীত এই ক্ষুদ্র গ্রামের সমৃদ্ধি আর কিছুই পরিলক্ষিত হয় না। এই গরিব পরিবারগুলির সদানন্দ দেখিয়া মনে হয় ইহারা যেন কখনও দুঃখের মুখ দেখে নাই।

এক দিন আমরা সংবাদ পাইলাম ঐ গ্রামে নরসিংহ নটের বাড়ীতে ভূত পড়িয়াছে। বিশ্বাস করিলাম না, কথাটা উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিলাম। সকলের নির্ব্বন্ধাতিশয় আগ্রহে আর যখন শুনিলাম এ ভূত মানুষের উপর আশ্রয় করিয়া কথা কয় না, কেবলই উপদ্রব করে। তখন অগত্যা ভূতুড়ে কাণ্ড দর্শন-প্রয়াসী হইয়া নরসিংহের বাড়ী গেলাম। আমি একাকী নহি। আমার সঙ্গে কয়েকটী ভদ্রলোক, তন্মধ্যে আমাদের গৃহ-চিকিৎসক শ্রীযুক্ত রূপচন্দ্র সেন কবিরাজ, শ্রীযুক্ত কালীচন্দ্র আচার্য্য ডাক্তার আর আমার জনৈক কর্ম্মচারী, নায়েব শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি। আমরা সেখানে গিয়া শুনিলাম ভূত ইহাদের উপর অদ্ভুত রকমে উপদ্রব, অত্যাচার করে। কিছু দেখা যায় না, কোথা হইতে অজস্র ঢিল আসিতে থাকে, খেতে বসিলে ভাতের থালা নিয়া টানাটানি করে, প্রদীপটা দৌড়িয়া চলিয়া যায় এই সকল ছাড়া কাহার উপর মারধর করে না। দিবারাত্রি সর্ব্বদাই এইরূপ সমান উপদ্রব করে।

আমরা যখন সে বাড়ীতে গেলাম, আমাদিগকে দেখিয়া বহু লোক

তামাসা দেখিবার জন্য সমবেত হইল। উহারা হয়ত মনে মনে আশা করিতেছিল এইবার প্রতাপশালী বাবুদের প্রতাপে বেটা ভূত ধরা পড়িবে অথবা নরসিংহের বাড়ী ছাড়িয়া পলাইবে। যখন তাহারা নিরাশ্বাস হইল, তখন হয়ত তাহারা মনে করিল ও বাবুদের অখণ্ড প্রতাপও বুঝি ভূতের কাছে পরাভব মানিল। আমরা যখন সেখানে পৌঁছিলাম তখন বেলা প্রাতে নয়টা। আমরা সেখানে বসিয়া থাকিতে থাকিতেই নরসিংহের বাড়ীর পশ্চিম দিকের একটা তেঁতুল গাছ হইতে অনবরত অজস্র ঢিল আসিতে লাগিল। প্রায় ঢিলগুলিই আসিয়া আমাদের সামনে পড়িল আমরা ভীত, চকিত হইলাম কিন্তু সে গৃহের লোকেরা কহিল, "আপনাদের ভয় নাই, এ পর্য্যন্ত কাহার উপরই ঢিল পড়ে নাই।" তথাপি আমরা যথাসম্ভব সতর্ক হইলাম। সে ঢিলের মধ্যে মাটি, ইট, প্রস্তর খণ্ড, ছোট নারিকেল কলিকা, আরও কত কিছু যা তা।

আমরা আর ইতস্ততঃ না করিয়া তেঁতুল গাছটা কাটিতে আদেশ করিলাম। অবিলম্বে আমাদের আদেশ প্রতিপালিত হইল। তারপর দেখি উহারই নিকটবর্ত্তী বাঁশের ঝাড় হইতে ঐরূপ ঢিল আসিতেছে। আমরা ঐ বাঁশের ঝাড়ও কাটিয়া ফেলিতে আদেশ করিলাম। অনতি-বিলম্বে সে আদেশও কার্য্যে পরিণত হইল। স্থূল কথা, নরসিংহের বাড়ীর পশ্চিম দিকে আর কিছুই রাখিলাম না। সব ময়দান হইয়া পড়িল। এখন ভূতকে জব্দ করিয়াছি ভাবিয়া ভারি খুসী হইলাম। ভূত কিন্তু আর এখানে রহিল না। নরহিংহের বাড়ীর উত্তর দিকে কিছু দূরে একটা প্রকাণ্ড বটগাছ আছে, এমন বটগাছ আর এদিকে নাই। এখন সেই গাছ হইতেই যেন ভূত জেদ করিয়া ঢিল ছুড়িতে লাগিল। আমরাও সাহস ছাড়িলাম না। ভূতকে জব্দ করিবার উপায়ান্তর

দেখিতে লাগিলাম। দেখিতে দেখিতে তখন বেলা প্রায় একটা। আমরা কিন্তু বিস্ময় ও কৌতুকে আবিষ্ট হইয়া ক্ষুধাকে ভুলিয়া গিয়াছি। আমাদের জঠর হইতে রাক্ষসী ক্ষুধা যেন কোথায় সে দিনের জন্য পলায়ন করিয়াছে। আমাদের ন্যায় অনেকেই কৌতূহলাবিষ্ট হইয়া ক্ষুধা তৃষ্ণাকে পরাজিত করিয়া ভূতুড়ে কাণ্ড দেখিতে উপস্থিত রহিয়াছে।

আমরাও কিন্তু আর বিলম্ব না করিয়া ভূতের সঙ্গে লড়াই আরম্ভ করিলাম। অপ্রত্যক্ষ, অজ্ঞাত পদার্থের সঙ্গে লড়াইর কথা শুনিয়া আপনারা হয় ত স্তম্ভিত হইবেন। ফলে, আমরা ভূতের নানা পথ বন্ধ করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলাম। এবার কিন্তু আমরা তাড়াতাড়ি কয়েকজন সাহসী যুবককে কহিয়া বলিয়া সাহস দিয়া সেই বটগাছে তুলিয়া দিলাম। নরসিংহের বাড়ী হইতে সেই বিশাল দেহ বট বৃক্ষ প্রায় চারিশত হস্ত দুরে কিন্তু উহা হইতে যে সকল ঢিল আসিত তাহা কেবলই সেই নরসিংহের গৃহ প্রাঙ্গণে আসিয়া পড়িত। লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া উহার একটীও অন্যত্র গিয়া পড়িত না। সে বাড়ীর লোকের দেখিয়া দেখিয়া একটা সাহস হইয়া উঠিয়াছিল। আমরা কিন্তু রাত্রি হইলে ভয়ই পাইতাম, দিনে বলিয়া ভীত হই নাই। যে কয় জন মানুষ গাছের আগায় উঠিল তাহাদিগকে দেখিয়াও ভূত ভীত হইল না, যেন তাহাদের নিকট হইতেই ঢিল আসিতে লাগিল। আমরা নীচ হইতে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম গাছের মানুষ এ ঢিলের কথা কিছুই বুঝিতে পারিতেছে না। আমাদের সন্দেহ বিশ্বাসে পরিণত হইল। বিশাল বৃক্ষ ছেদন করা কঠিন ও সেটা বাস্তু পূজার গাছ বলিয়া সকলে অস্বীকার হইল।

ইহার পর, ভূতের ওঝা আনিতে কহিয়া সে স্থান পরিত্যাগ করিলাম। আমরা দেখিয়াছি যখন কেহ পরীক্ষার্থী হইয়া বা ভূতকে

উপদ্রব করিবে বলিয়া সেখানে গেলে ভূত যেন জেদ করিয়া ঢিল ছুড়িতে থাকে। ইহার কতকদিন পর শুনিলাম ওঝা এসে রাত্রে পূজা পেতেছে। রাত্রিযোগে আমরা এক অদ্ভুত সংবাদ পাইলাম, সেই ওঝা ও তাহার সহকারীকে ভূত সেই বটগাছের আগায় তুলিয়া ফেলিয়াছে। আমরা গেলাম না কিন্তু কয়েকটী সাহসী যুবক সেখানে পাঠাইলাম, যখন ওঝা কহিল, "আমরা আর আসিব না, তোমাকে তাড়াইব না," তখন ওঝা আস্তে আস্তে গাছ হইতে নামিয়া পলায়ন করিল। আর ওঝা সে বাড়ীতে আসিতে সাহস করিল, না। নরসিংহের এক ভ্রাতুষ্পুত্রের নাম কৈলাস। ভূত কিন্তু কৈলাস, তাহার স্ত্রী ও মাকেই বেশী উপদ্রব করিত। ইহার কয় দিন পরে আর একজন শক্ত ওঝা আসিল। সে আসিয়া ভূতকে তাড়াইল সত্য কিন্তু ভূত কৈলাসের স্ত্রীকে আশ্রয় করিয়া কহিল যে "আমি কৈলাসকে লইয়া যাইব।"

ইহার কিছুদিন পর হইতে আর ভূত দেখা গেল না। একদিন কৈলাসের মুখ দিয়া রক্ত উঠিতে লাগিল, সঙ্গে কিছু কিছু জ্বরও দেখা দিল। ডাক্তার, কবিরাজেরা বলিলেন "কৈলাসের যক্ষ্মা হইয়াছে।" ভূতের ওঝা বলিল "ভূতের দৃষ্টি বা ভূতের আশ্রয় হইয়াছে।"

কিছুদিন পর কৈলাস মরিয়া গেল, আর ভূতের উপদ্রব হইল না। এখনও কৈলাসের বিধবা স্ত্রী বর্ত্তমান রহিয়াছে। কৈলাসের বয়স ছিল তখন প্রায় পঁচিশ বৎসর। এই ঘটনা বাঙ্গলা ১৩১২ সনে ঘটিয়াছিল। সে আজ চারি, পাঁচ বৎসরের কথা। এ রহস্য ভাবিবার কথা বটে।

শ্রীরাজেন্দ্রকুমার মজুমদার।

দাদা ম'শায়ের ঝুলি।

(৪২ পৃষ্ঠার পর)

পরদিন উভয়ে পুনরায় সম্মিলিত হইলে ব্যোমকেশ বলিল "দাদা-ম'শায়, আপনার কা'লকের শেষ কথা শুনে পর্য্যন্ত একটা উৎকট দার্শনিকতা আমাকে আশ্রয় ক'রেছে। সত্যিইত' ভারতবর্ষে বিশেষতঃ পবিত্র ব্রাহ্মণ কুলে জন্ম গ্রহণ ক'রে তত্ত্বানুশীলনে পশ্চাৎপদ হওয়া অত্যন্ত লজ্জার কথা।

ভট্টাচার্য্য—আজ আর বেশী কথা নয় শুধু একটা কথা ব'লে আমাদের আলোচ্য বিষয়ের অবতারণা করিব। জগতে যা কিছু দেখতে পাওয়া যায় সে সমস্তেরই মূলে একটা না একটা ভাব নিহিত র'য়েছে, যেটা তার জীবনের কেন্দ্র স্বরূপ; সেটাকে আশ্রয় ক'রেই জিনিষটা বেঁচে থাকে। যখন সেই ভাবটা নষ্ট হ'য়ে যায় কিম্বা পূর্ণ বিকাশ হ'য়ে তার কার্য্য ফুরিয়ে যায়, তখনই জগত হ'তে সেই জিনিষটার অস্তিত্ব লোপ পায়। প্রত্যেক জাতির সম্বন্ধে এই কথাটা খাটিয়ে দেখ। এক একটা জাতিকে একটা একটা ভাবের অভিব্যক্তি স্বরূপ বিবেচনা করা যেতে পারে। যেন সেই ভাবটা জগতে প্রচার করবার জন্যেই সে জাতটা জগতে জন্ম গ্রহণ ক'রেছে। যতদিন পর্য্যন্ত সেই ভাব অক্ষুণ্ণ থাকে ততদিন পর্য্যন্ত সেই জাতের উন্নতি ও অভ্যুদয় অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু যখনই সেই ভাবের হানি হয় তখনই জাতীয় জীবনটা ম্লান হ'য়ে পড়ে। গ্রীক রোমান্ প্রভৃতি অতীত যুগের জাতি সমূহ এবং বর্ত্তমান যুগের ইংরাজ ফরাসী, জর্ম্মাণ প্রভৃতি জীবিত জাতি সমূহের ইতিহাসের আলোচনা ক'রলেই আমার কথার যথার্থ উপলব্ধি করতে পারবি। এদের প্রত্যেকেরই জাতীয় জীবনের কেন্দ্রস্থলে একটা না একটা ভাবের অস্তিত্ব দেখ্‌তে পাওয়া যায়। কোথাও বা ক্ষাত্র ভাব, কোথাও বা বৈশ্য ভাব, কোথাও বা অপর কোন মিশ্রভাবকে আশ্রয় করে জাতিটার পুষ্টিসাধন হচ্চে। এখন আমাদের হিন্দুজাতির কথা বোঝ্। আধ্যা-

ত্মিকতা ও অন্তর্দৃষ্টিই এ জাতির প্রাণ। তার ফলে বেদ, উপনিষদ্, ষড়দর্শন জগৎকে আলোকিত করেছে। জগতে যত ধর্ম্ম বা উপধর্ম্ম আছে, অনুসন্ধান কর্‌লে দেখ্‌তে পাবি, সমস্তেরই মূল এই ভারতক্ষেত্রে রয়েছে। আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শনের মধ্যে এমন কোন কথাই দেখা যায় না, ভারতীয় দর্শনে যার আভাষ নাই। জগতের লোককে জ্ঞানশিক্ষা দিবার জন্যই, পৃথিবীতে যথার্থ তত্ত্বালোক প্রকাশ ক'রবার জন্যই এখনও হিন্দুজাতি বেঁচে আছে। তোরা কি দেখ্‌তে পাচ্ছিস না, কিরূপ শনৈঃ শনৈঃ হিন্দুজাতির চিন্তা-প্রসূত ভাবগুলি সমস্ত সভ্যজাতির সাহিত্যের মধ্যে প্রবেশ লাভ করে, তাদের মধ্যে নবীন আলোকের সঞ্চার করচে; পৃথিবীর প্রায় সমস্ত ভাষাতেই শ্রীমদ্ভগবদগীতার প্রকাশ হয়েচে। বেদান্তাদি দর্শন আজ বুধমণ্ডলীর বড় আদরের সামগ্রী। কিন্তু এই যে জ্ঞান-বিজ্ঞান, এর যথার্থ উত্তরাধিকারী হচ্চিস্ তোরা। এর প্রচার কার্য্য তোদের দ্বারাই সম্পাদিত হ'বে। বর্ত্তমান ভারতের আর কোন ব্যক্তি এ কার্য্যটা ক'রে উঠ্‌তে পারবে না। ভগবান বাঙ্গালী-জাতিকে এই বিশেষ কার্য্যের ভার দিয়ে জগতে পাঠিয়েছেন। তোরা বাঙ্গালীর ছেলে, লেখা পড়া শিখ্‌চিস্ তোরা দার্শনিক বিচারের নামে ভয় পেলে কে ভারতের মুখোজ্জ্বল করবে। ব্রহ্মবিদ্যার আলোক জগতে ছড়িয়ে দিতে তোরা জগতে এসেচিস্। এক জন বিবেকানন্দের শক্তিতে আমেরিকাবাসী মোহিত হয়েছিল। এমন দিন আসবে যে দিন এই বাঙ্গালা দেশ হ'তে শত শত বিবেকানন্দ ভারতের ব্রহ্মজ্ঞান বিলাইবার জন্য জগতের দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়াবে। পাশ্চাত্য বৈশ্যবৃত্তি-মূলক সভ্যতার বিস্তার ভারতের জাতীয় উদ্বোধন হবে না। এ ব্রাহ্মণের দেশ। ব্রাহ্মণদের অবনতি ঘটেই দেশের বর্ত্তমান দুর্দ্দশা সংঘটিত হয়েছে। যথার্থ ব্রাহ্মণত্বের পুনঃপ্রতিষ্ঠা হলে, এই পুণ্যভূমি আবার সমগ্র জগতের শীর্ষস্থান অধিকার করবে। যদি স্বদেশী হয়ে স্বদেশভক্তি প্রচার কর্ত্তে চাস্, তবে এই কথাটা ভাল করে হৃদয়ঙ্গম করতে যত্নশীল হ'ও।

(ক্রমশঃ)

শ্রীমলয়ানিল শর্ম্মা।

অলৌকিক রহস্য।

৩য় সংখ্যা।] দ্বিতীয় ভাগ। [আষাঢ়, ১৩১৭।

দিব্য-শ্রুতি।

ইংরাজিতে দিব্য-শ্রুতি শব্দে টেলিপ্যাথি বুঝায়। কর্ণ-সাহায্যে যে সকল শব্দ শ্রবণ করা যায় না তাহা শ্রবণ করার বিদ্যাকে science of Telepathy বলা যায়। দিব্য দৃষ্টিকে যেমন অনেকে clair-voyance বলেন, সেইরূপ দিব্য শ্রুতিকে কেহ কেহ clairandience বলিয়াও থাকেন। আমরা এই প্রবন্ধে দিব্য-শ্রুতি-সম্বন্ধীয় ঘটনা লিপিবদ্ধ করিতে মনস্থ করিয়াছি। কিন্তু তৎপূর্ব্বে এই বিদ্যা সম্বন্ধে মোটামুটি ভাবে আলোচনা করিলে বোধ হয় পাঠকগণের অপ্রিয় হইবে না।

আমরা যোগশাস্ত্রে দেখিতে পাই যে কুণ্ডলিনী শক্তিকে জাগ্রত করিয়া চক্র হইতে চক্রান্তরে উত্তোলন করিতে করিতে গলদেশের বিশুদ্ধ চক্রে লইয়া যাইতে পারিলে উক্ত চক্র জাগ্রত হয় এবং তাহার ফলস্বরূপ অন্যান্য শক্তির মধ্যে সাধকের দিব্যশ্রুতি-শক্তি হইয়া থাকে। অর্থাৎ এই অবস্থায় সাধক ভুবর্লোকের সমুদয় ধ্বনি শুনিতে পাইয়া থাকেন। ভুবর্লোকের কোন জীব কোন কথা বলিলে ইনি তাহা শুনিতে পাইয়া থাকেন।

স্বামী সচ্চিদানন্দ বালকৃষ্ণ মহাশয় বলেন যে, মন্ত্রদান-কাল হইতে গুরু ও শিষ্যে এক প্রকার যোগ হইতে আরম্ভ হয়। সাধনপথে শিষ্য যতই অগ্রসর হইতে থাকেন ততই এই যোগ সম্পূর্ণ হইতে থাকে। এই যোগ হওয়া হেতু শিষ্য ও গুরুর মধ্যে বহুদূর ব্যবধান থাকিলেও কথার চলন হইতে পারে।

শিষ্য ও গুরু পরস্পর স্থূলদেহে বহুদূর ব্যবধানে থাকিলে কি প্রকারে তাঁহাদের মধ্যে কথা হইতে পারে এইরূপ এক প্রশ্নের উত্তর কাশীধামস্থ সেণ্ট্রাল হিন্দু কলেজ ম্যাগাজিন নামক পত্রিকায় একবার প্রকাশিত হয়। তাহার লেখক বলিতেছেন যে, গুরু যে বিষয় শিষ্যকে অবগত করিতে ইচ্ছা করেন সেই বিষয়টি তিনি গভীর ভাবে কিয়ৎকাল ধরিয়া চিন্তা করিতে থাকেন, এবং এই গভীর চিন্তার জন্য শিষ্যের মানসপটে গুরুর চিন্তা প্রকাশ হইয়া পড়ে।

মাননীয়া শ্রীমতী আনি বেশান্ত মহোদয়া তাঁহার Communication between Different words নামক পুস্তিকাতে লিখিয়াছেন যে, আমরা ভুবর্লোকের ও স্বর্গলোকের অধিবাসীদের চিন্তা অনেক সময়েই নিজ মনে প্রকাশিত হইতে দেখিতে পাই। কোন গুরুতর প্রশ্নের মীমাংসা করিতে হইবে, নিবিষ্ট ভাবে চিন্তা করিয়াও কূল কিনারা পাইতেছি না, এমন সময়ে ভুবর্লোকের বা স্বর্গলোকের কোন গত আত্মীয় বা হিতৈষী বন্ধু উক্ত ব্যাপার অবগত হইয়া, কৃপাবশে আমাদিগকে তাহার মীমাংসার উপায় করিয়া দিয়া থাকেন। উঁহাদের কথিত শিক্ষা অকস্মাৎ মনে উদিত কোন রূপ ভাব বলিয়া, আমরা ধরিয়া লইয়া থাকি। কেহ কেহ বা তাহাদের কর্ণ-সাহায্যে কে যেন তাহাদিগকে কথাটি বলিয়া গেল এইরূপ ভাবে শুনিতে পাইয়াও থাকেন।

শ্রীযুক্ত লেড্‌বিটার্‌ সাহেব স্বরচিত Some Glimpses of decultism নামক পুস্তকে টেলিপ্যাথি সম্বন্ধে একটা প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তাঁহার মতে টেলিপ্যাথি অর্থে দূর হইতে অনুভব করা অর্থাৎ Feeling at a distance। এই কথার সহিত Thought transference অর্থাৎ চিন্তার পরিচালন বিদ্যাও মিশিয়া গিয়াছে। কোন বিষয় একজনের মানসপট হইতে অন্যের মানসপটে পরিচালন করিবার বিদ্যাকেও টেলিপ্যাথির অন্তর্গত ধরা হইয়াছে। এক্ষণে চিন্তা কি এবং কি প্রকারে আমরা চিন্তা করিয়া থাকি তাহা বিশেষ করিয়া বুঝা আবশ্যক।

আমাদের মস্তিষ্ক একটী স্থূল পদার্থ। ইহা ধূসর বর্ণের ও শ্বেতবর্ণের কণা সমূহে পূর্ণ। এই মস্তিষ্কের এক এক অংশ এক একটি বিশেষ গুণের সহিত সংশ্লিষ্ট আছে। কাহারও হয়ত সঙ্গীত বিদ্যায় আদৌ অভিরুচিনাই, ইহা হইতে বুঝিতে হইবে যে, তাঁহার মস্তিষ্কের যে অংশে সঙ্গীত বিদ্যার গুণ উৎপন্ন হইয়া থাকে তাহার সম্পূর্ণ পুষ্টি এ পর্য্যন্ত হয় নাই। এইরূপ কোন অংশের পুষ্টিতে দয়া, কোন অংশের পুষ্টিতে ক্ষমা প্রভৃতি এক এক অংশে এক এক গুণ উৎপাদনের উপকরণ থাকে।

এই যে মস্তিষ্কের শ্বেত ও ধূসর কণা বা অণু (cells) ইহারা পার্থিব অণু দ্বারা গঠিত এবং ইহাকে আমরা ভৌতিক (physical) অণু বলিয়া থাকি। এই অণু স্থূল, পার্থিব চক্ষুর দ্বারা দেখা যায়। ইহাপেক্ষা সূক্ষ্ম আর এক প্রকার অণু মস্তিষ্ক মধ্যে আছে যাহাকে ইথরঘটিত অণু বলা যায়। তদপেক্ষা সূক্ষ্ম অণুকে astral plane বা ভুবর্লোক ঘটিত বা প্রাণময় কোষ ঘটিত অণু কহে। তদপেক্ষাও সূক্ষ্ম অণুকে mental plane বা স্বর্গলোক অর্থাৎ মনোময় কোষ ঘটিত অণু কহে। শেষোক্ত তিন প্রকার অণুও মস্তিষ্ক মধ্যে আছে কিন্তু

স্থূল চক্ষে তাহাদের দেখা যায় না। এই তিন প্রকার অণু physical বা ভৌতিক অণু (cells) হইতে ক্রমশঃ সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতররূপে অবস্থিত। জলের মধ্যে মাছ এবং বায়ুর মধ্যে আমরা যেরূপ থাকি, সেইরূপ ভাবে ইহারা প্রত্যেকে (physical) ভৌতিক অণুর সহিত মেশামেশি ভাবে (interpenetrating) বর্ত্তমান আছে। তাহা হইলে বলিতে হইবে যে, দেখিতে না পাইলেও মস্তিষ্ক মধ্যে চারি প্রকার অণু বর্ত্তমান আছে। এই চারি প্রকার অণু তার দিয়া যোগ করিলে যেরূপ যোগ হয়, সেইরূপ পরস্পর সংযুক্ত আছে। তবে সিদ্ধ-পুরুষ ও উন্নতশ্রেণীর জীবদের প্রত্যেক অণুতে অণুতে যোগ আছে, সাধারণ মনুষ্যের তাহা নাই, যাহার যে গুণ বিশেষ বিকাশ পাইয়াছে, সেই গুণ-সহ মস্তিষ্কের যে অংশের সম্বন্ধ আছে, সেই অংশেরই কেবল উক্ত চারিপ্রকার অণুতে পরস্পর যোগ থাকে। অন্য অংশের চারি প্রকার অণু মধ্যে আদৌ যোগ থাকে না।

চিন্তা করিতে হইলে, প্রথমে মস্তিষ্কের মনোময় কোষের (mental plane) অণুতে স্পন্দন (Vibration) উৎপন্ন হয়, এই স্পন্দন হইতে অপেক্ষাকৃত স্থূল প্রাণময় কোষের (astral plane) অণুতে স্পন্দন হইতে থাকে, তাহা হইতে আবার স্থূলতর ইথর-ঘটিত অণুতে স্পন্দন। ইহার শেষে মস্তিষ্কের পার্থিব ধূসরবর্ণ অণুতে স্পন্দন হয় এবং ইহা হইতেই আমরা চিন্তার বিষয় অবগত হই এবং বাক্য বা লেখায় তাহা প্রকাশ করিয়া থাকি। অন্য ব্যক্তি আবার ঐ বাক্য শ্রবণ করায় তাহার কর্ণ-পটহে স্পন্দন দ্বারা মস্তিষ্কের ধূসরবর্ণের অণুর স্পন্দন এবং তাহা হইতে ক্রমশঃ ইথর-ঘটিত অণুর, প্রাণময় কোষের অণুর ও শেষে মনোময় কোষের অণুর স্পন্দন হইয়া, আমার চিন্তার বিষয় অবগত হয়।

ইহা হইতে দেখা যাইতেছে যে, চিন্তাকে বাহিরে প্রকাশ করিতে

চারিটী স্তর (plane) পার করিতে হয় এবং অন্তের শরীরে পরিচালন করিতে পুনরায় ঐ চারিটী স্তর পার করিতে হয়। টেলিপাথি যোগে উহার গতি সংযত হইয়া থাকে। ইহা দ্বারা একের মনোময় স্তর হইতে অন্যের মনোময় স্তরে বা প্রাণময় স্তর হইতে অপরের প্রাণময় স্তরেও চিন্তা-শক্তি চালনা করা যায়। একের ইথর-ঘটিত স্তর হইতেও অন্যের ইথর-ঘটিত স্তরে চিন্তা প্রেরণ করা যায়।

Speaking trumpet নামক যন্ত্র সাহায্যে কথা অধিক দূরে প্রেরণ করা যায়। এই যন্ত্র যোগে সমুদায় কথাটাই চালিত হইয়া যায়। কিন্তু telephone দ্বারা কথা যায় না। কথা বলা হেতু বায়ু-মণ্ডলে যে স্পন্দন বা ঢেউ হয়, তাহাই চলিয়া যায়। উক্ত যন্ত্রের শেষ সীমায় যে যন্ত্র লাগান থাকে, তথায় ঐ স্পন্দন আঘাত করিয়া পূর্ব্ব-কথিত বাক্যের প্রতিধ্বনি করে মাত্র। ট্রম্‌পেট দ্বারা কথার শব্দটা যায়, কেবল স্পন্দন যায় না, টেলিফোন দ্বারা শব্দ যায় না; কেবল স্পন্দন (vibrations) যায়।

কোন একটা মূর্ত্তি বা বিষয় গভীরভাবে আলোচনা করিলে, বাহ্য-মস্তিষ্ক হইতে ইথর-ঘটিত মস্তিষ্কের অণুতে স্পন্দন উৎপন্ন করে। এই স্পন্দন যাইয়া অন্য ব্যক্তির মস্তিষ্কের ইথর-ঘটিত অণুতে সেইরূপ স্পন্দন উৎপাদন করিয়া, সেই মূর্ত্তি বা বিষয় তাহার গোচর করিতে পারে। আপনি মনে মনে কোন একটি বৃত্ত বা ত্রিভুজ সম্বন্ধে গভীর ভাবে চিন্তা করুন, অপর একটা ব্যক্তি আপনার নিকট নিশ্চলভাবে বসিয়া থাকুন, দেখিবেন, তাহার মনে কি ভাব হয়। দেখিবেন, নিশ্চয় আপনার চিন্তিত বিষয় তাঁহার মনে উদয় হইয়াছে, অবশ্য প্রথম দুই একবার আপনি অকৃতকার্য্য হইতে পারেন, কিন্তু ইহা চেষ্টা করিলে হইবেই। ইহার নাম ইথর-ঘটিত অণুর সাহায্যে চিন্তা প্রেরণ বা thought

transference. একের ভুবর্লোক-ঘটিত অণু হইতে অন্যের উক্ত অণুতে নিজ চিন্তা প্রসারণও হইতে পারে। প্রাণময় কোষ রাগ, দ্বেষ প্রভৃতি ভাবের বাহন (vehicle) প্রায়ই দেখা যায়; বাটীর একজনের মন বিষণ্ণ হইলে অন্যের মনও অল্পাধিক বিষণ্ণ হইয়া থাকে। ইহার অর্থ আর কিছুই নয়, যাহার মনের বিষণ্ণতা হইয়াছে, তিনি প্রাণময় কোষের একপ্রকার স্পন্দন উৎপন্ন করিতেছেন এবং সেই স্পন্দন অন্যের প্রাণময় কোষে আঘাত করিয়া উক্তপ্রকার মনোভাব উৎপাদন করে।

মৃত ব্যক্তিদের সম্বন্ধে এই ভাবটি বিশেষভাবে বিবেচ্য। মৃত ব্যক্তিগণ স্থূলশরীর-বর্জ্জিত; তাহার প্রাণময়-কোষেই অবস্থিত করে। এইজন্য তাহারা লোকের মনোভাব দ্বারা সহজেই বিচলিত হয়। মৃত্যুর পর আত্মীয়-বন্ধু শোকার্ত্ত ও বিষণ্ণ থাকিলে সেই ভাব তাহাদিগকেও স্পর্শ করিয়া থাকে। এইজন্য শাস্ত্রকারগণ মৃতব্যক্তির জন্য শোক না করিয়া, তাহার উন্নতি ও শান্তির জন্য তৎসম্বন্ধে সচ্চিন্তা করিতে আদেশ দিয়াছেন। এইরূপ করিলে মৃতব্যক্তি ভুবর্লোকে যন্ত্রণার হাত হইতে অনেকটা নিষ্কৃতিলাভ করিয়া থাকে।

এইরূপ চিন্তা পরিচালন কার্য্য অতি উন্নত সাধকদের মধ্যে প্রচলিত আছে। মহাত্মারা তাঁহাদের শিষ্যদের এই উপায়েই শিক্ষা দিয়া থাকেন। আমাদের জাতীয় ক্রমোন্নতির সীমা সর্ব্বোচ্চ হইলে বোধ হয়, আমরা সকলেই এই শক্তির অধিকারী হইব। সাধারণ মনুষ্যের মধ্যে দুই-জনের পরস্পর এক বিষয়ে তীব্র সহানুভূতি থাকিলে, তাহাদের মধ্যে উক্ত বিষয় সংক্রান্ত চিন্তা কেবলমাত্র মনোময় কোষ হইতে মনোময় কোষে পরিচালিত হওয়া সম্ভব।

আমরা দেখিলাম, তিনপ্রকার দিব্য-শ্রুতি হইতে পারে। তবে কোন স্থলে শব্দ কোন্ স্তর বা plane হইতে উৎপন্ন হইয়া কোন্ স্তরে

যাইল, তাহা নির্ণয় করিতে হইলে সূক্ষ্মদৃষ্টি থাকা চাই, কেবল ক্লেয়ার-ভয়াণ্ট ব্যক্তিগণই তাহা নির্ণয় করিয়া বলিতে পারেন। কারণ তাঁহারা দৃষ্টিশক্তি প্রভাবে মনোময় স্তর হইতে প্রাণময় স্তরে ও তথা হইতে ইথর-ঘটিত স্তরে এবং শেষে ভৌতিক বা ফিজিক্যাল মস্তিষ্কে চিন্তা-শক্তির গতি স্পষ্ট দেখিতে পাইয়া থাকেন।

এইবারে আমরা টেলিপ্যাথি সম্বন্ধে আমার নিজ জীবনের কয়েকটী ঘটনার উল্লেখ করিয়া এই প্রবন্ধের শেষ করিব।

১। ঘটনা আজ ১৫ বৎসর হইবে। দুই বৎসর হইল দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছি। বি, এ পরীক্ষান্তে হাকোলার বাটীতে আছি। এমন সময়ে গুরুদেব আমাদের বাটীতে আসেন। তিনি কৃপা করিয়া দুইমাস কাল আমাদের বাটীতে থাকিতে সম্মত হওয়ায়, তাঁহার বাসস্থান বাগান-বাটীতে নির্দ্দিষ্ট হইল এবং নিজের কোন কাজ না থাকায়, দিবারাত্র গুরুসঙ্গ করিতে লাগিলাম। একদিন মধ্যাহ্নে গুরুদেব আহারান্তে নিজ আসনোপরি শয়ান অবস্থায় আছেন, আমি পদতলে ঘরের মেজেতে বসিয়া আছি, দুই একটি প্রাসঙ্গিক কথাবার্ত্তা হইতে হইতে তিনি আমাকে অনর্থক সময় নষ্ট না করিয়া, ইষ্টমন্ত্র জপ করিতে বলিয়া তন্দ্রাভিভূত হইলেন। আমি অল্পকাল নাম জপ করিয়াই নামে রুচি না থাকায় ও মন স্থির না হওয়ায় নাম করা বন্ধ করিলাম এবং মনে মনে গুরুদেবকে উদ্দেশ করিয়া বলিতে লাগিলাম, "আমায় কৃপা করিয়া যদি নাম দিলেন, তবে আরও একটু কৃপা করিয়া নামে রুচি করিয়া দিন, মন এত চঞ্চল হইলেই বা সাধন ভজন করিব কি করিয়া, কৃপা করিয়া মন স্থির ও নামে রুচি যাহাতে হয়, তাহা করুন।" এরূপ-ভাবে অনেক কথা মনে মনে তাঁহাকে জানাইতে লাগিলাম। ইহার বিশেষ এই যে কথাগুলি ওষ্ঠ বা জিহ্বা না নাড়িয়া প্রকাশ করিতে-

ছিলাম—সম্পূর্ণভাবে মনে মনে হইতেছিল। এই অবস্থায় থাকিতে থাকিতে গুরুদেব উঠিয়া শৌচার্থ বাগানে গেলেন, তথা হইতে পুষ্করিণীতে অবগাহন করিয়া ফিরিয়া আসিয়া কৌপীন পরিবর্ত্তন করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন, "কার্ত্তিক তুমি এই এই কথা আমাকে বলিতেছিলে নয়? তোমার কথাগুলি একে একে আমার শ্রুতিগোচর হইতেছিল, টেলিগ্রাফের তার দিয়া যেরূপ শব্দ টক্ টক্ করিয়া আসে, সেইরূপ প্রকারে তোমার কথাগুলি আমি শুনিলাম।"

২। আজ হইতে দ্বাদশ বর্ষ পূর্ব্বে এই ঘটনা হয়। আমার গুরুদেব বৃন্দাবনে থাকেন। মধ্যে মধ্যে তিনিও পত্র লেখেন, আমিও জবাব দিই। ইন্দ্রদেব স্বর্গরাজ্যচ্যুত হইয়া, মৃণালমধ্যে লুকাইয়া থাকেন এবং নহুষ নামক জনৈক ঋষি ইন্দ্রাধিকার লাভ করিয়া, শেষে শচী-দেবীকে পত্নীত্বে পাইবার জন্য জিদ করায়, তিনি কাতরে স্বীয় গুরুদেবের এক স্তব করেন। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে এই আখ্যায়িকা পাঠ করিয়া, ঐ স্তোত্রটি হৃদয়গ্রাহী বোধ হওয়ায় উহার মধ্যস্থিত আবশ্যকীয় দুইচারিটি কথা পরিবর্ত্তন করিয়া নিজে দ্বিসন্ধ্যা-পাঠ আরম্ভ করি। উক্ত স্তোত্রের প্রথম লাইনটি এইরূপ; "রক্ষ রক্ষ মহাভাগ ভীতাং মাং শরণাগতাং।" এইরূপ ভাবে কয়েকমাসকাল স্তোত্রটি পাঠ করিতেছি, ইতিমধ্যে গুরুদেবের নিকট হইতে এক পোষ্টকার্ড পাইলাম। উক্ত কার্ডটি আমার প্রেরিত কার্ডের উত্তরে লেখা হয়। আমার পত্রে কোনরূপ বিপদাপদের উল্লেখ ছিল না বা কোনরূপ সাহায্য বা আশ্রয় প্রার্থনা থাকে না। কিন্তু গুরুদেবের কার্ডের উপরেই অপেক্ষাকৃত বৃহদক্ষরে "মাভৈঃ মাভৈঃ" শব্দ লেখা এবং নিম্নতলে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র অক্ষরে অন্যান্য কথা লেখা, যাহার সহিত উপরের ঐ কথার কোন সম্বন্ধ নাই। ইহা হইতে বুঝা যায় এবং পরে গুরুদেবের নিকট শুনিলাম

যে, আমার স্তোত্রের প্রথম লাইনের কথা অনেক সময় তাঁহার নিকট পৌঁছাইতেছিল, এজন্য তিনি চিঠি লিখিতে যাইয়া প্রথমেই উহার উত্তর দিয়া পরে পত্রের উত্তর লেখেন।

৩। তৃতীয় ঘটনাটি সন ১৩১০ সালের মাঘ মাহায়। আমার পুত্র শ্রীমান্ গুরুচরণ বাবাজীর অন্নপ্রাশন হইয়াছে, তদুপলক্ষে ব্রাহ্মণাদি-ভোজন জন্য এক রবিবার দিন ধার্য্য হইয়াছে। শনিবার কাছারীর কাজ সারিয়া বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ের সন্ধ্যার ছয়টার ট্রেণে আবাদা ষ্টেশন উদ্দেশে চলিলাম। ষ্টেশনে নামিয়া তথা হইতে এক ঘণ্টা পদব্রজে যাইয়া বাটীতে পৌঁছাইতে হয়। বাটী পৌঁছাইতে এক মাইল পথ থাকিতে আমার মনে উদয় হইল, কাল লোক খাওয়াইবার জন্য আজ কয়েক মণ মাছ ধরান হইয়াছে তাহা এতক্ষণ ভাজিতে আরম্ভ হইয়াছে। গুরুদেব বড়ই মাছ ভাল বাসেন, তন্ত্রেও দেবীকে মাংসের পর্ব্বত, মৎস্যের পাহাড় প্রভৃতি দিবার ব্যবস্থা আছে, তদনুরূপ আমি আজ গুরুদেবকে মাছ ভাজার রাশি একটি স্বতন্ত্র পাত্র করিয়া দিব। এই কথা এত গুরুতর ভাবে মনে আসিল যে, বাকি রাস্তা ঐ বিষয় ভাবিতে ভাবিতে চলিলাম। দ্বিতলের উপর একটি প্রকোষ্ঠ গুরু-দেবের জন্য নির্দ্দিষ্ট থাকায় বাটীতে পৌঁছিয়া অগ্রেই ঐ ঘরে যাইলাম, দেখিলাম—তিনি তথায় নাই, এবং মাতাঠাকুরাণীকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম যে, তিনি আমাদের এক জ্ঞাতির বাটীতে আছেন, সেখানে আজ তাঁহার আহারাদি হইবেক। মনটা অতিশয় খারাপ হইল। কাপড় ছাড়া হইলে মাতাঠাকুরাণী আহারের জন্য বলায় ক্ষুধা নাই বলিয়া আমি উক্ত জ্ঞাতির বাটীতে যাইলাম। তথায় দেখিলাম যে, তিনি একটী বালককে দীক্ষা দিতেছেন, বালকটি বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইয়া ঢুলিতেছে ও মুখ দিয়া লালা পড়িতেছে, সম্মুখে গুরুদেব ধ্যানস্থ হইয়া

আছেন, আমি ঐ ঘরে প্রবেশ না করিয়াই চলিয়া আসিলাম। পরে বালকটির মুখে শুনিলাম ঐ অবস্থায় তাহার দশমহাবিদ্যার মূর্ত্তি ক্রমশঃ দর্শন হইতেছিল। লোক খাওয়াইবার জন্য পূজার দালানের সম্মুখের উঠান পরিষ্কার করিয়া উপরে পাল খাটান হইয়াছিল। মনটা খারাপ থাকায় বাটীর ভিতর না আসিয়া ঐ পালের নীচে প্রাঙ্গণে বসিলাম এবং এক মনে গুরুদেবকে জানাইলাম--কাতরে আমার আশা পূর্ণ করিবার প্রার্থনা করিলাম। ঘণ্টা দুই পরে গুরুদেব উহাদের বাটী হইতে আমাদের বাটীতে তাঁহার ঘরে আসিলেন, আমিও যাইয়া তাঁহার নিকট বসিলাম, দুই একটি কথাবার্ত্তা হইতেছে এমন সময়ে মাতাঠাকুরাণী আসিয়া পুনরায় আমাকে খাইবার জন্য বলিলেন, "তুইত বাহিরের কোন জিনিস খাস না, দশটার সময় খাইয়া কাছারি গিয়াছিলি, রাত্রি প্রায় দশটা হইল এখনও একটু জল মুখে দিলি না কেন।" আমি চুপ করিয়া আছি, গুরুদেব বলিলেন "আমার উহাদের বাটীতে ভাল খাওয়া হয় নাই, লুচি কাঁচা ছিল, আমাকে ভাত দাও এবং অনেক মাছ ভাজা একটা আলাদা থালা করিয়া দাও, আমার খাওয়া হইলে কার্ত্তিক খাইবেক।" এই কথার পর আমার আর কিছু বলিবার আবশ্যক হইল না।

৪। চারি বৎসর পূর্ব্বে আমার একবার জ্বর হয়, তখন আমি হাবড়ার বাটীতে আছি। আমার মধ্যম সহোদর শ্রীমান গণেশ চন্দ্র একজনা হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক, হাবড়াতে ভাল হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক না থাকায় গণেশ হাকোলা হইতে যাইয়া আমার চিকিৎসা করিত। মাসাধিক কাল যাবৎ আধ ডিক্রি জ্বর যাইতেছে না দেখিয়া, কলিকাতার কোন বিখ্যাত চিকিৎসককে দেখাইতে হাবড়া হইতে গাড়ী করিয়া কলিকাতায় যাওয়ায় গাড়ীর নাড়াতে গাত্রে ব্যথা হইয়া জ্বর বেশী হইল। কবিরাজী চিকিৎসা আরম্ভ করাতে একটু জ্বর

কমিবার মুখ হওয়ায় গণেশ হাকোলায় চলিয়া যায়। পরে জ্বর পুনরায় বৃদ্ধি হওয়ায়, কবিরাজী বন্ধ করা হইবে কি না যুক্তি জন্য গণেশকে দরকার হওয়ায়, হাবড়ায় চাকর না থাকায়, হাকোলায় গণেশের নিকট লোক পাঠাইবার অসুবিধা ঘটায় মনে মনে উহাকে ডাকিতে ইচ্ছা করিয়া সন্ধ্যাকালে "আমার জ্বর কমে নাই, তুই শীঘ্র আয়" এক কয়টী কথা গণেশের উদ্দেশে মনে মনে পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিলাম,এবং গণেশ যেন শুনিতে পায় এরূপ তীব্র ইচ্ছা করিতে লাগিলাম। পরদিন বৈকালে গণেশ আসিল। আসিয়াই আমাকে গোপনে জিজ্ঞাসা করিল কোন ক্রিয়া করা হইয়াছিল কিনা, আমি কারণ জিজ্ঞাসা করায় সে বলিল— কাল সন্ধ্যায় সে স্পষ্ট উক্ত কয়েকটি কথা শুনিয়া আজ আসিতেছে, "কথা কয়টি কে বলিল," আমি তাহাকে আমার কথা বুঝাইয়া দিলাম।

৫। আমি প্রথমবার বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারি নাই। যখন এই সংবাদ পাই তখন গুরুদেব আমাদের বাটীতে। তিনি পুনরায় একবৎসর পড়িতে বলিলেন এবং এইবারে পাশ হইবার জন্য আশীর্ব্বাদ করিলেন এবং বলিলেন যে কলিকাতায় ভক্তবীর বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় মধ্যে মধ্যে থাকেন তিনি যখন আসিবেন তখন একবার তাঁহাকে দর্শন করিতে যাইয়া মনে মনে তাঁহাকে জানাইয়া আসিবে, ইঁহাদের সদৃশ মহাত্মার কৃপায় সকল বাধা বিঘ্ন কাটিয়া যাইবেক। গোস্বামী মহাশয় সেবার কলিকাতায় আসিয়া হ্যারিসন রোডের উপর একটা বাটীতে ছিলেন, একদিন বৈকালে কলেজের পর তাঁহাকে জানাইতে যাইলাম, তখন বেলা ৫টা হইবেক বেশী লোক এখনও তাঁহার ঘরে জমা হয় নাই, যাইয়া প্রণাম করিয়া দূরে বসিয়া, মনে মনে আমার বাসনা জানাইলাম। যতবার তাঁহাকে দেখিতে গিয়াছি এ রকম সময়ে তাঁহাকে কোন গ্রন্থ পাঠ করিতে দেখি নাই, কিন্তু আজ তিনি একখানি গ্রন্থ

নিকট হইতে লইয়া পাঠ করিতে লাগিলেন যাহা পড়িলেন তাহা হিন্দি ভাষায় একটি মঙ্গল আশীর্ব্বাদ, গঙ্গাজী তোমার মঙ্গল করুন, শিব তোমার মঙ্গল করুন ইত্যাদি সমস্তই আশীর্ব্বাদ মত। আমি মনে করিলাম আমার বাসনা পূর্ণ হইবে, নিশ্চয়ই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইব। পরে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া চলিয়া আসিলাম।

শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

পাঞ্চজন রহস্য।

"নহ্যমূলা জনশ্রুতিঃ।"

কিঞ্চিদধিক দেড় শত বৎসর অতীত হইল, ইংরাজেরা ভারতে রাজ্য স্থাপন করিয়া রাজত্ব করিতেছেন। তৎপূর্ব্বে মুসলমানেরা প্রায় আট শত বৎসর রাজত্ব করিয়াছেন। মুসলমান রাজত্বের পূর্ব্বে হিন্দুদিগের রাজত্ব ছিল। ইতিহাসে ও পুরাণে তাহার বিবরণ জানিতে পারা যায়। হিন্দুদিগের রাজত্বসময়ে রাজ-নীতি, সমাজ-নীতি, রণ-নীতি ও আচার-ব্যবহার-জ্ঞাপক নানা উপকথা উপকথাবেত্তা ব্যক্তিগণের নিকট শুনিতে পাওয়া যায়। এই গল্প বা উপকথার স্রোত আমরা অদ্যাবধি দেখিতে পাই। গৃহস্থলী মধ্যে এই উপকথার প্রচলন এখন পর্য্যন্ত আছে। পরিবার-মধ্যে কেহ না কেহ এই গল্প বর্ণনা করিয়া থাকেন। এ গল্পগুলি যে তাঁহাদের স্বকপোলকল্পিত—তাহা নহে। পরম্পরাগত আখ্যান। কোনটী ভীতিব্যঞ্জক, কোনটী আনন্দব্যঞ্জক, কোনটী হাস্যোদ্দীপক এবং কোনটী উপদেশ-প্রবোধক সন্দেহ নাই। আমি সেই শ্রুত উপকথা হইতে একটী মনোনীত করিয়া পত্রে প্রকটিত

করিলাম। দেখা যাউক, ইহা হইতে আমরা কি কি উপদেশ গ্রহণ করিতে পারি।

জনশ্রুতি আছে—উদয় সেনের রাজত্বকালে একটি অদ্ভুত ভৌতিক ঘটনা ঘটিয়াছিল। রাজা দোর্দ্দণ্ড-প্রতাপে রাজত্ব করিতেন। প্রজাবর্গ তাঁহার নিতান্ত অনুগত ছিল। সকলেই মনের সুখে বসবাস করিত। রাজার দয়া না থাকিলে প্রজার সুখ-সমৃদ্ধি হয় না এবং প্রজার মঙ্গল রাজা ভিন্ন অন্য কেহই বিধান করিতে পারে না। একদা রাজা রাজ-কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া প্রাসাদ-সংলগ্ন উদ্যানে পরিভ্রমণ করিতেছেন এমত সময়ে একজন প্রতিহারী আসিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিল —মহারাজ গত কল্য সন্ধ্যার প্রাক্কালে আমার নিজ ভবনে দুইটি ব্রাহ্মণ একটি কুলবধূ, ডুলিযানের দুইটি বাহক সমভিব্যাহারে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। আমি তাঁহাদের স্বাগতাদি জিজ্ঞাসা করিয়া তাঁহাদের সেবা শুশ্রূষার আয়োজন করিতে ব্যস্ত হই, তজ্জন্য তাঁহাদের বিষয় সবিশেষ তন্মুহূর্ত্তে জানিতে পারি নাই। আগন্তুকদিগকে আমি অতিথি বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছিলাম। তৎপরে তাঁহাদের প্রমুখাৎ তাঁহাদের মন্তব্য অবগত হইয়া নিরতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইয়াছি। তাঁহারা উভয়ে একটি দ্বন্দ্ব উপস্থিত করিয়াছেন। সে দ্বন্দ্ব এতাদৃশ জটিল যে, আমি তাহার মীমাংসা করিতে পারি নাই। মীমাংসা করিবার নিমিত্তই তাঁহারা লোকালয়ে উপস্থিত হইয়াছেন। মহারাজের নিকট তাঁহাদিগকে উপস্থিত করিতে আমার সংপূর্ণ ইচ্ছা। আজ্ঞা হইলে তাঁহাদিগকে রাজসমীপে আনয়ন করি।

মহারাজ কহিলেন—কি প্রকার জটিল?

প্রতিহারী বলিল—তাঁহারা একটি ডুলি করিয়া একটি স্ত্রীলোককে আনয়ন করিয়াছেন। উভয়েই সেই রমণীর পতি বলিয়া পরিচয় দিতেছেন, প্রকৃত প্রস্তাবে কে তাহার স্বামী বুঝিতে পারা যায় না। এই স্ত্রী

লইয়া উভয়ের দ্বন্দ্ব। স্ত্রীলোকটিও বড় বিপদাপন্না। স্ত্রীলোকের বিবাহিত স্বামী একজনই হইয়া থাকে। দুই জনে তাহার উপর দাওয়া করাতে সে সর্ব্বদা গলদশ্রুপাত করিতেছে। আমি যে আহারাদির আয়োজন করিয়াছিলাম তাঁহারা তাহা গ্রহণ করেন নাই। আমার অতিথি সৎকারের চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে। আমি তজ্জন্য বড়ই দুঃখিত। ভাগ্যক্রমে পাঁচটি অতিথি পাইয়াও তাহাদের সৎকার করিতে পারিলাম না দেখিয়া আপনার নিকট তাঁহাদিগকে আনয়ন করিবার বাসনা করি।

মহারাজ কহিলেন—তুমি শীঘ্র যাইয়া তাঁহাদিগকে আনয়ন কর। আমি বিচার করিব।

প্রতিহারী যে আজ্ঞা মহারাজ বলিয়া চলিয়া গেল।

কিয়ৎক্ষণ পরে প্রতিহারী ব্রাহ্মণদ্বয়কে ডুলি সহিত আনয়ন করিল। ডুলিমধ্যে রমণী ছিল বলা বাহুল্য।

আসিবামাত্র মহারাজ দ্বারবানকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন—ঘোবেজি, ইঁহারাই কি তাঁরা?

দ্বারবান কহিল—হাঁ মহারাজ। ইঁহারাই দুই জন স্ত্রী লইয়া বিষম ঝগড়া উপস্থিত করিয়াছেন। উভয়েই বলিতেছেন স্ত্রী আমার। আমি এই স্ত্রীর প্রকৃত স্বামী কে, নির্ব্বাচন করিবার নিমিত্ত, এই বাহকদ্বয়কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম যে, এতদুভয়ের কোন্ ব্যক্তি তোমাদের ডুলি ভাড়া করিয়াছিল। বাহকেরা তাহাদের প্রকৃত প্রভুকে চিনিতে পারে না। কখন বলে ইনি, কখন বলে উনি। সুতরাং বাহকদ্বারা পতিব্রতা কুলকামিনীর স্বামী নির্ব্বাচন করা আমার পক্ষে অতীব দুরূহ হইয়াছে। বধূমাতাকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি স্ত্রীজাতি-সুলভ লজ্জাবশতঃ কোন উত্তর করেন নাই। আমি হতবুদ্ধি হইয়াছি। প্রকৃত ভর্ত্তা কে নিরূপণ করিতে পারি নাই।

রাজা দ্বারবান-মুখে এইপ্রকার বিবরণ শুনিয়া কহিলেন—ঘোবে ঠাকুর, তুমি উহাদিগকে দেহলীতে লইয়া যাও। এবং আহারাদির ব্যবস্থা করিয়া দাও। এই কথা বলিয়াই ঘোবে ঠাকুরকে বিদায় দিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে মহারাজ জনান্তিকে ঘোবে ঠাকুরকে ডাকিয়া কহিলেন—দেখ উহাদিগকে একটি একটি স্বতন্ত্র প্রকোষ্ঠে রক্ষা করিও এবং যেন এক এক জন সতর্ক প্রহরী উৎকর্ণ হইয়া উহাদের মনোভাব জানিবার জন্ম নিযুক্ত থাকে। পরে উহাদের বিচার হইবে।

রাজাজ্ঞা পাইয়া দ্বারবান এই পঞ্চজনকে দেহলীতে লইয়া গেল ও প্রত্যেকের নিমিত্ত এক একটি স্বতন্ত্র প্রকোষ্ঠ মনোনীত করিয়া দিল। বাহকেরা বহির্বাটীতে স্থান পাইল। রোরুদ্যমানা রমণী অন্তঃ-পুরে প্রেরিত হইল।

রাজপরিচারিকারা ব্রাহ্মণ-কন্যাকে অন্তঃপুরে লইয়া গেল। রাজ-মহিষী শুনিবামাত্র প্রত্যুদ্গমন করিয়া তাঁহার হস্তধারণ করিলেন ও নিজ প্রকোষ্ঠে লইয়া গেলেন। ব্রাহ্মণ-কন্যা বিপদবিহ্বলা, কাহার সহিত কথাবার্তা কহিতে পারিলেন না। দরদরিত অশ্রুধারা গণ্ডস্থল প্লাবিত করিয়া বক্ষস্থল সিক্ত করিতেছিল। কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া বাক্যস্ফূর্ত্তি পাইতে-ছিল না। সে স্বর শুনিলে স্বরভঙ্গরোগ আসিয়া আক্রমণ করিয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। সে স্বর আত্যন্তিক দুঃখাবভাসক গদগদ স্বর ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। ক্রমাগত অশ্রু বর্ষণ করিয়া চক্ষুর্দ্বয় রক্তিমবর্ণ ধারণ করিয়াছিল। অধর ওষ্ঠ বিস্ফারিত ও স্ফীতাকার অবলম্বন করিয়া-ছিল। বিস্রস্তকুন্তল উচ্ছৃঙ্খল হইয়া কোমলত্বের লাঘব জন্মাইয়া দিয়াছিল। মহা-বাত্যাপীড়নে গুল্মলতাদি যে রূপ ধারণ করে, ব্রাহ্মণ-কন্যার এখন সেই রূপ। রূপের ডালী হইলেই রূপভ্রষ্টা। অনেকক্ষণ কোন কথা কহিতে পারিলেন না। পরে অন্তঃপুরচারিণী রমণীগণ ও

পুরস্ত্রীদিগের সান্ত্বনায় অনেকাংশে আশ্বস্ত হইয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন ও গদগদস্বরে কহিতে লাগিলেন—"হা হতোস্মি, আমার এমন বিপদ অপেক্ষা মৃত্যু সহস্রগুণে ভাল ছিল। কেন যে এ প্রাণবায়ু উৎক্রান্ত হইতেছে না, বলিতে পারি না। আমার এ যাতনা সহ্য হয় না। পিত্রালয় হইতে শ্বশুরালয় যাওয়া আমার পক্ষে বিড়ম্বনা হইয়াছে। আমি পিতা মাতার স্নেহরজ্জু ছেদন করিতে যে ক্রন্দনকে প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, সেই ক্রন্দনই আমার জীবনের সীমান্তক হইল? আমি বিলাসপুর হইতে যাত্রা করিয়া তালদীঘী পর্য্যন্ত নির্ব্বিবাদে ডুলিমধ্যে আগমন করিতেছিলাম। আর্য্যপুত্র পথিমধ্যে শৌচ পীড়ায় কাতর হইয়া বহির্দ্দেশে গমন করিবেন আমাকে বলিলেন ও বাহকদিগকে ডুলি একটি বৃক্ষছায়ায় রক্ষা করিতে কহিয়া গেলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম কোন্‌দিকে যাইবে। এখানে নিকটে কি পুষ্করিণী বা জলাশয় আছে? তিনি কহিলেন—"ঐ যে তালদীঘীর পাড় দেখা যাইতেছে। দেখনা সমতল হইতে কত উচ্চ। তোমরা কিয়ৎকাল এই স্থানে অপেক্ষা কর। আমি শীঘ্র ফিরিয়া আসিতেছি।" এই বলিয়া তিনি দ্রুতপদে চলিয়া গিয়া যেমন পাড়ের অন্তরাল হইলেন অমনি একজন অজানিত পুরুষ তাঁহার মত পরিচ্ছদে সজ্জীভূত হইয়া আসিয়া কহিল—ডুলি উঠাও। চল অনেক বিলম্ব হইয়াছে। একটু শীঘ্র চল। এতক্ষণ আমরা বহুদূর যাইতে পারিতাম। আমি দেখিলাম তিনি আমার স্বামী নহেন। তিনি একজন অপর পুরুষ। তাঁহার কণ্ঠস্বর ভিন্ন।"

(ক্রমশঃ)

শ্রীমতিলাল রায়।

---

* ভূত দম্পতির বৃত্তান্ত।

কলিকাতার নিকটস্থ কোন স্থানে আমার ভ্রাতার শ্বশুরালয়। তাঁহারা উপস্থিত পাঁচ ভাই। মনে করুন তাঁহাদের নাম যথাক্রমে উমেশ বাবু, রমেশ বাবু, হরেন বাবু, ভূষণ বাবু ও সতীশ বাবু। আমার ভ্রাতা উমেশ বাবুর জামাতা। তাঁহারা উপস্থিত পৃথক হইয়াছেন, কিন্তু একই গ্রামে বাস করেন। তন্মধ্যে রমেশ বাবু ও হরেন বাবু একত্রে ও একান্নে বাস করেন। রমেশ বাবুর এক কন্যা ব্যতীত আর কেহই নাই। কন্যাটির নাম গন্ধেশ্বরী। তাহার কলিকাতার চোরবাগানে বিবাহ হইয়াছিল; কিন্তু কন্যা, জামাতা, দৌহিত্র ও দৌহিত্রী অধিকাংশ কালই রমেশ বাবুর নিকট থাকিতেন; কারণ তাহারা রমেশ বাবুর অতিশয় আদরের সামগ্রী ছিল

গত ১৩০৫ সনের কাল চৈত্রমাসে গন্ধেশ্বরী বাপের বাড়ী আসিয়াছিল, কিন্তু দিন কয়েক পরেই বসন্তরোগে আক্রান্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করিল। তাহার সপ্তাহ দুই পরেই গন্ধেশ্বরীর স্বামী (বরদা বাবু) কলিকাতায় ঐ কাল বসন্তরোগে মৃত্যুমুখে পতিত হন ও পাঁচ দিন পরে কনিষ্ঠা কন্যাও আক্রান্ত হয়। এখন বরদা বাবুর একটী পুত্র ব্যতীত কেহই রহিল না।

ইহাদিগের ক্রিয়া কার্য্য হইয়া যাইবার পর হইতেই ইহাদের অস্তিত্ব কিয়ৎ পরিমাণে অনুভূত হইয়াছিল। কারণ রমেশ বাবুর বাড়ীতে একটী ঢেঁকি ছিল; গভীর রাত্রিতে যেন কে তাহার উপর ঘা দিতেছে এরূপ বোধ হইত। স্ত্রীলোকেরা রাত্রিকালে ভয়ে বাহির হইত না। হরেন বাবু বাহির হইলে সব শব্দ থামিয়া যাইত, এবং কাহাকেও দেখা যাইত না।

---

* নাম সমূহ অপ্রকাশিত রহিল।

ইহার প্রায় তিন সপ্তাহ বাদে উমেশ বাবুর বাড়ীতেও কিছু পরিবর্ত্তন ঘটিল। অর্থাৎ রাত্রিকালে একলা ঘর হইতে বাহির হইলেই গা ছম্ ছম্ করিত। যে সময়কার ঘটনা লিপিবদ্ধ করিতেছি, সে সময় উমেশ বাবুর বাড়ীতে তাঁহার তিন পুত্র, এক কন্যা, গৃহিণী ও উমেশ বাবু ব্যতীত আর কেহই ছিল না। বলিতে ভুলিয়াছি যে তাঁহার জেষ্ঠ্য পুত্রবধূও ছিল। একদিন বৈকালে তাঁহার পুত্রবধূটি গা ধুইবার পরে "অসুখ করিতেছে" বলিয়া শয়ন করিল। তাহার পরদিন পুত্র-বধুটির ১০৪ ডিগ্রি জ্বর ; বৈকালে জ্বর ছাড়িয়া গেল ও সারা রাত্রি বেশ সুনিদ্রা হইয়াছিল। তাহার পরদিন সে নানাপ্রকার বকিতে লাগিল। কখন "ননদকে ভয় করিস্ না," "তোর এত বড় আস্পর্দ্ধা" বা কখন "কেমন জব্দ !" "মাথা, বুক আদুড় করে গা ধোয়া," ইত্যাদি বলিতে লাগিল। এই প্রকারে সে দিন কাটিয়া গেল।

পর দিবস উমেশ বাবু একজন ভাল ওঝা আনাইলেন। সে আসিয়া হলুদ পোড়া ইত্যাদি জিনিস ব্যবহার করাতে, সে বলিল "কেন আমাকে জ্বালাতন করিতেছ ; কি চাও বল ?"

ওঝা। তুমি কে তাহাই জানিতে চাই।

বধূ। আমি গন্ধেশ্বরী. আমায় চেন না ?

ওঝা। কেন আসিয়াছ ?

বধূ। বড় বউ এত বেহায়া কেন ? জেঠাই মায়েদের মাচায় বেশ মোটা পুঁই ডাটা খেতে চেয়ে ছিলাম না ? আমায় খেতে দেয় নাই কেন ?

তৎক্ষণাৎ বড় জেঠাই মা তাহাকে পুঁই শাক রাঁধিয়া আনিয়া দিল। তাহা দেখিয়া সে জ্বলিয়া গেল। বলিল "দুটী ভাত দিতে পার না ?" তাহাও আনিয়া দেওয়া হইল। তখন সে খাইতে বসিল।

খাইতে বসিয়া, দ্বারের দিকে চাহিয়া সে মৃদু মৃদু হাঁসিতে লাগিল। তাহা দেখিয়া জেঠাই মা জিজ্ঞাসা করিল "মা হাঁসিতেছ কেন?" সে বলিল, "তোমার জামাই (বরদা বাবু) দাঁড়াইয়া আছে।" তখন তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইলে সে বলিল, তাহারা তিন জনেই ভূতযোনি প্রাপ্ত হইয়াছে। তৎপরে সে মুখ প্রক্ষালন করিয়া একটা পান চাহিয়া খাইল। তখন তাহার বড় দাদাকে, অর্থাৎ যাহার স্ত্রীকে ধরিয়াছিল, তাহাকে বলিল "দেখ দাদা তুমি যদি আর বড় বউকে ঠেঙ্গাও ত, তা হলে আমি মজা দেখাব।" তৎপরে তাহার খুড়িমাকে (হরেন বাবুর স্ত্রীকে) বলিল "খুড়ি মা, আমার বাছাকে একটু যত্ন ক'রো ওর সংসারে আপনার বলতে আর কেউ রহিল না। ওকে ঠিক সময় মত খাওয়াইও।"

এইবার ওঝা তাহাকে বেশী পেড়াপীড়ি করিতে লাগিল যে, আমার রুগী কষ্ট পাইতেছে তুমি শীঘ্র যাও। তখন এক ঘটী জল দাঁতে করিয়া ধরিয়া বাহিরে আসিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। তৎপরে তাহার চৈতন্য সম্পাদন করাতে সে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া উঠিয়া তাহার শ্বশ্রূঠাকুরাণীকে জিজ্ঞাসা করিল যে ব্যাপার কি; আমাকে বাহিরে আনিলে কেন? তখন সে সকল বৃত্তান্ত শুনিয়া অতিশয় অবাক্ হইল।

শ্রীকালীকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী।

প্রেতাত্মার তাড়না।

হুগলী জেলার বাতানল গ্রামে নারায়ণ নাপিতের বাস, সে বহুদিন হইতে দপ অর্থাৎ লোহার সিন্দুকের চাবির ব্যবসা করিয়া থাকে। বাটীতে মাল প্রস্তুত করিয়া কলিকাতায় চালান দেওয়াই তাহার প্রধান কার্য্য। গত ১৩১৬ সালের শ্রাবণ কি ভাদ্র মাসে (বেশ মনে নাই) নারায়ণ একদিন এই কার্য্যব্যপদেশে কলিকাতায় গিয়াছিল। তথায় কার্য্য সারিয়া বাটী ফিরিতে তাহার ২.৩ দিন বিলম্ব হইয়াছিল।

বাটী আসিবার সময় সে কিছু লোহা কিনিয়া লয় এবং যথা সময়ে হাওড়াষ্টেসনে ট্রেণে চড়িয়া তারকেশ্বর ষ্টেসনে আসিয়া উপস্থিত হয়। তারকেশ্বর হইতে বাতানল বড় সামান্য দূর নহে। কাজেই নারায়ণের বাটী যাইতে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া যায়। যখন সে বাতানলের নিকটবর্ত্তী মলয়পুরের মাঠে গিয়া উপস্থিত হইয়াছে তখন সে স্পষ্ট শুনিতে পাইল যেন তাহার পিতা আসিয়া তাহাকে "নারায়ণ, নারায়ণ" শব্দে আহ্বান করিতেছে। নারায়ণ এদিক ওদিক অনেক চাহিয়া দেখিল কিন্তু কাহাকেও দেখিতে পাইল না।

অল্পক্ষণ পরে সে বাটী আসিয়া দেখিল যে, কিয়ৎক্ষণ মাত্র পূর্ব্বে তাহার জনকের আয়ুশেষ হইয়াছে। যাহা হউক অতঃপর নারায়ণ পিতার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়াদি সমাপন করিয়া ভাবিল—খিটখিটে জনকের হস্ত হইতে অব্যাহতি লাভ করিলাম। কিন্তু কি সর্ব্বনাশ! পরদিন যখন সে স্বীয় ভ্রাতার সহিত পিতার শয়ন কক্ষে গিয়া শয়ন করিয়াছে, তখন তাহার মৃত পিতার প্রেতাত্মা যষ্টি হস্তে তৎসমক্ষে আসিয়া উপস্থিত। কেবল তাহাই নহে। সেই 'মালকোচা মারা" মূর্ত্তি তাহাকে মারিবার জন্ত

চেষ্টা পাইতেছে ও নানাপ্রকার বাগাস্ফালন করিতেছে। নারায়ণ ইহাতে যথেষ্ট ভয় পাইল এবং তৎক্ষণাৎ সে গৃহ ছাড়িয়া অপরের বাটীতে গিয়া শুইয়া রহিল। মনে করিল বোধ হয় নূতন বলিয়া এরূপ ভ্রান্ত ভয়ের উদ্রেক হইতেছে। কিন্তু হায় পরদিনেও আবার সেই দৃশ্য। উপর্য্যুপরি প্রতিদিন যখন এইরূপ ঘটিতে লাগিল, তখন নারায়ণ গ্রামের প্রসিদ্ধ ডাক্তার শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ ২।১ জন ভদ্র লোকের নিকট গিয়া গোপনে এ সকল কথা প্রকাশ করিল। তাঁহারা তাহাকে প্রেতাত্মার ঐরূপ আস্ফালনের সময় কাকুতি মিনতি সহকারে জীবিত কালের অপরাধের জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করিতে পরামর্শ দিলেন।

নাপিতনন্দন প্রতিদিন তাহাই করিতে লাগিল। যেমন তাহার পিতার প্রেতমূর্ত্তি তদীয় পার্শ্বে আসিয়া সেইরূপ বাহ্বাস্ফালন করিতে উদ্যত হয়, অমনই সে করযোড়ে তাহার নিকট কত কাতরতা, আনুগত্য প্রকাশ করে ও ক্ষমা ভিক্ষার দ্বারা জীবিতকালের দ্বেষাদ্বেষি ভুলাইয়া দিবার চেষ্টা পাইতে থাকে। আশ্চর্য্যের বিষয় যে, এইরূপ করিলেই প্রেতমূর্ত্তি অন্তর্হিত হইয়া যায়, অনবরত কয়েকদিন এইরূপ করিবার পর প্রেতাকৃতির আবির্ভাব দিনকয়েকের জন্য বন্ধ হইয়া যায়। তাহার পর যে দিন শ্রাদ্ধ হইয়া গিয়াছে, সেই দিন আবার সেই মূর্ত্তি প্রাদুর্ভূত হইয়া, শ্রাদ্ধাদি করার জন্য নারায়ণকে অনেক আশীর্ব্বাদ করে। কোন্ ব্যক্তি প্রেতের সঙ্গে কাল কাটাইতে ইচ্ছা করে, কাজেই নারায়ণ পিতার শ্রাদ্ধাদি করিয়াই গয়া যাত্রা করিল। পথি মধ্যে বা অন্য কোথাও আর সে মূর্ত্তি দেখা দেয় নাই, যে দিন তদুদ্দেশ্যে পিণ্ডাদি প্রদত্ত হইবে, তাহার পূর্ব্ব দিবস আবার সেই মূর্ত্তি নারায়ণের সম্মুখে উপস্থিত। অতঃপর বহুবিধ আশীর্ব্বাদ করিয়া, সে মূর্ত্তি বলিতে লাগিল—"নারায়ণ মনে করিয়াছিলাম তোর মত কুসন্তানের দ্বারা আমার গতিমুক্তির

উপায় কিছু হইবে না! কিন্তু কার্য্যতঃ তাহা ঘটে নাই। তুই আমার শ্রাদ্ধাদি করিয়াছিস, আজ আবার আমাকে এই যন্ত্রণাময় অবস্থা হইতে উদ্ধার করিবার জন্ত গয়ায় আসিয়াছিস, আশীর্ব্বাদ করি—তোর কল্যাণ হউক।"

প্রেতাত্মা এই কথা বলিয়াই বিকট হাস্য পূর্ব্বক সে দিন প্রস্থান করে। পরদিন যথাসময়ে নারায়ণ মৃত পিতার উদ্দেশে পিণ্ডাদি দান করিয়া, আর পিতার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইবে না বলিয়া কথঞ্চিৎ দুঃখিত হয়। সে মনে করিয়াছিল ভয় প্রদর্শন করিয়াও যে তাহার জনক দেখা দেয়, তাহাও তাহার পক্ষে নয়ন-সুখাবহ। যাহা হউক, গয়াপিণ্ডদানের পর হইতে আর সে প্রেতমূর্ত্তি দেখা যায় নাই। নারায়ণ এক্ষণে নির্ভয়ে পিতৃভবনে বসবাস করিতেছে। আর কোন প্রকার বিভীষিকা দেখা যায় নাই।

শ্রীরাজকুমার বেদতীর্থ,

মন্তব্য :—এই গল্পটী কৈকালা স্কুলের হেডমাষ্টার শ্রীযুক্ত হরিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ, মহাশয়ের নিকট শুনিয়া লেখা হইয়াছে। আমাদের পরিচালিত হিন্দুসখা মাসিক পত্রে ইহা প্রকাশ করিবার ইচ্ছাছিল। কিন্তু বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের অভিপ্রায়ানুসারে অলৌকিক রহস্যেই পাঠাইতে বাধ্য হইলাম।

শ্রীরাজকুমার বেদতীর্থ।

সফল-স্বপ্ন।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

স্বপ্নে কবর-দর্শন।

১৮৩৬ খৃষ্টাব্দের শীতকালে আমেরিকার উত্তরাংশে ফণ্ডি উপসাগরে (in the bay of Fundy) একখানি ক্ষুদ্র জাহাজ বরফে আবদ্ধ হইয়াছিল। তৎকালে ঐ জাহাজের অধ্যক্ষ কাপ্তেন ক্লার্ক একরাত্রে একটি অদ্ভুত স্বপ্ন দেখেন। কাপ্তেনের পিতামহী তখন ইংলণ্ডের লাইম্ রেজিস্ নামক স্থানে বাস করিতেছিলেন। কাপ্তেন তাঁহাকে বড় ভাল বাসিতেন। ১৭ই ফেব্রুয়ারী তারিখে কাপ্তেন স্বপ্ন দেখিলেন যেন তিনি লাইম্ রেজিসে উপস্থিত হইয়াছেন এবং তাঁহার সম্মুখ দিয়া অনেক লোক পিতামহীকে গোর দিতে লইয়া যাইতেছে। তিনি একে একে সকল ব্যক্তিকেই লক্ষ্য করিলেন,—কাহারা শোক করিতেছিলেন, কাহার পর কে যাইতেছিলেন এবং কেই বা পুরোহিত ছিলেন, তিনি সমস্তই দেখিলেন ও মনে করিয়া রাখিলেন। তিনিও তাঁহাদের সহিত যাইতে লাগিলেন। তাঁহার বোধ হইল যে কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে প্রবল ঝড়বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে, কারণ তখনও রাস্তা ভিজা ছিল, ও স্থানে স্থানে জল দাঁড়াইয়াছিল। তখনও ঝড় বহিতেছিল। একটা ঝটিকা আসিয়া মৃতদেহের আবরণ বস্ত্রখানি কতকটা উড়াইয়া দিল। তাঁহাদের একটি নির্দ্দিষ্ট গোরস্থান ছিল, বংশের সকলকেই সেই স্থানে গোর দেওয়া হইত। কাপ্তেন ঐ স্থানটি উত্তমরূপে জানিতেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, পিতামহীকে সেখানে লইয়া যাওয়া হইল না, উহার কিছু দূরে অন্য এক স্থানে তাঁহার কবর প্রস্তুত ছিল। সে যাহা হউক,

মৃতদেহ কবরের নিকট আনীত হইলে, কাপ্তেন দেখিলেন কবরের গর্ত্তে বৃষ্টির জল দাঁড়াইয়াছে এবং ঐ জলে দুইটা মরা ইন্দুর ভাসিতেছিল। অতঃপর কাপ্তেন তাঁহার মাতাকে তথায় দেখিতে পাইলেন। তাঁহার মুখে শুনিলেন যে, বেলা, ১০ টার সময় গোর হইবার কথা ছিল, কিন্তু ভয়ানক বৃষ্টি হওয়ায় ৪টা পর্য্যন্ত বিলম্ব করিতে হইল। ইহাতে কাপ্তেন বলিলেন "আমার পক্ষে ইহা ভালই হইয়াছে, কারণ দেরী না হইলে হয়ত আমি আসিয়া জুটিতে পারিতাম না।"

এই স্বপ্নটি কাপ্তেনের এরূপ বাস্তব ও জীবন্ত বোধ হইল যে, পর-দিন প্রাতঃকালেই তিনি তারিখটি লিখিয়া রাখিলেন। বহুদিবস পরে তিনি বাটীর এক পত্র পাইলেন। ইহাতে লেখা ছিল "পিতামহী মারা গিয়াছেন এবং ১৭ই ফেব্রুয়ারী তাঁহার গোর হইয়াছে।"

ইহার চার বৎসর পরে কাপ্তেন লাইম্ রেজিসে প্রত্যাগত হন এবং পিতামহীর কবরের তথ্যানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন। তিনি যাহা জানিলেন তাহা এই :—

স্বপ্নে যে যে ব্যক্তিকে যাইতে দেখিয়াছিলেন, যিনি পুরোহিত ছিলেন, যাঁহারা যাঁহারা শোক করিয়াছিলেন, প্রকৃত পক্ষে তাঁহারাই তত্তৎ কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। ভয়ানক ঝড় বৃষ্টি হওয়ায়, কবর বেলা দশটার পরিবর্ত্তে ৪টার সময় হইয়াছিল। তাঁহার মাতার বেশ স্মরণ ছিল যে, হঠাৎ একটা ঝড় আসিয়া মৃতদেহের গাত্রবস্ত্র একটু সরাইয়া দিয়াছিল। পিতামহী মৃত্যুর কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে তাঁহার কবরের স্থান স্বয়ং নির্ব্বাচিত করিয়াছিলেন, সেই জন্যই কৌলিক গোরস্থানে তাঁহার গোর হয় নাই। যে ব্যক্তি কবর খনন করিয়াছিল তাহার নোট বুক হইতে জানা গেল যে, কবরে বাস্তবিকই জল দাঁড়াইয়াছিল। এবং দুইটা মৃত ইঁন্দুর সে তুলিয়া ফেলিয়া দিয়াছিল।

স্বপ্নে সান্ত্বনা।

১৮৫৯ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চমাসে এক সম্ভ্রান্ত ও বিদ্বৎ-সমাজে সুপরিচিত ইংরাজ মহিলা নিম্নলিখিত ঘটনাটি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন :—

"একটি ভদ্রলোকের সহিত আমাদের খুব ঘনিষ্ঠতা ও বন্ধুত্ব ছিল। তিনি অসুস্থ হওয়ায়, আমাদের বাটী হইতে শত শত মাইল দূরে একটি স্বাস্থ্যকর স্থানে বাস করিতেছিলেন, সুতরাং বহু বর্ষ ধরিয়া কেবল চিঠি পত্র দ্বারা তাঁহার সহিত আলাপ চলিত, সাক্ষাৎ হয় নাই। হঠাৎ এক রাত্রে (সে দিন বন্ধুর বিষয়ে আমি কিছুই ভাবি নাই) স্বপ্ন দেখিলাম যেন আমাকে তৎক্ষণাৎ বন্ধুর নিকট যাইতে হইবে। আমি একটা বাটীর দ্বারে উপস্থিত হইলাম, এবং গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া একেবারে উপর তালায় উঠিয়া এক অন্ধকারময় ঘরে ঢুকিলাম। দেখিলাম বন্ধু শয্যায় শয়ান, যেন মৃতপ্রায়। কিন্তু আমার হৃদয়ে যেন একটা সাহস আসিল, আমি তাঁহার শয্যা পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইলাম এবং ধীরে ধীরে তাঁহার হাতখানি ধরিয়া বলিলাম 'তোমার কোন ভয় নাই, তুমি নিশ্চয় রক্ষা পাইবে'। ঠিক যখন এই কথা বলিতেছিলাম, কোথা হইতে যেন একটি সুন্দর সঙ্গীতধ্বনি আমার কর্ণে প্রবেশ করিল।

এই স্বপ্ন দেখিয়া আমার মনটা বড় খারাপ হইল। পরদিবসই বন্ধু কেমন আছে জিজ্ঞাসা করিয়া এক পত্র লিখিলাম। অবশ্য স্বপ্নের বিষয় কিছুই উল্লেখ করি নাই। তাহার উত্তর পাইতে বিলম্ব হইল। তিনি লিখিয়াছেন 'আমার সম্প্রতি বড়ই অসুখ হইয়াছিল,—এমন কি জীবনের আশা ছিল না। তোমার পত্র পাইয়া সুখী হইলাম।"

এই ঘটনার তিন বৎসর পরে লণ্ডনে বন্ধুর সহিত একদিন সাক্ষাৎ

হইয়াছিল। আমার স্বপ্নের কথা তাঁহাকে বলাতে, তিনি বলিলেন "ইহা বড়ই অদ্ভুত। তোমার পত্র পাইবার ২।৩ দিন পূর্ব্বে (যে দিন আমার পীড়া খুব সাংঘাতিক ভাব ধারণ করিয়াছিল) সেই রাত্রে আমিও স্বপ্ন দেখি যেন আমার মৃত্যুকাল উপস্থিত এবং আমার ভ্রাতার নিকট শেষ বিদায় লইতেছি। ভ্রাতা জিজ্ঞাসা করিলেন 'তোমার মৃত্যুকালীন ইচ্ছা কিছু আছে কি?' আমি বলিলাম 'দুইটি মাত্র ইচ্ছা আছে, ১ম আমার বন্ধু. (তোমার নাম করিয়া) অমুককে একবার দেখা, এবং ২য় আমার সেই প্রিয় "বিথোভেন" নামক সঙ্গীতটি একবার শ্রবণ করা।" কিন্তু যেমন ঐ কথা বলিলাম, অমনি তুমি যেন আমার শয্যাপার্শ্বে দাঁড়াইলে এবং বলিলে 'ভয় নাই তুমি মরিবে না'। আর প্রিয় সঙ্গীতটি যেন ঘর আমোদিত করিয়া আমার কর্ণ শীতল করিতে লাগিল।" *

---

* সূক্ষ্মদর্শিগণ (clairvoyants) বলেন যে, নিদ্রাকালে আমাদের সূক্ষ্মদেহ স্থূলদেহ ত্যাগ করিয়া সূক্ষ্মজগতে ঘুরিয়া বেড়ায়। এরূপ হইতে পারে যে, সূক্ষ্মজগতের কোন কৃপালু ব্যক্তি "বন্ধু"র শেষ ইচ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য ইংরাজ রমণীর সূক্ষ্মদেহকে চালিত করিয়া বন্ধুগৃহে লইয়া গিয়াছিলেন। অথবা বন্ধুর সূক্ষ্মদেহ প্রবল বাসনা-চালিত হইয়া রমণীর সূক্ষ্মদেহকে আকর্ষণ করিয়াছিল। যেরূপেই হউক দুইজনের সূক্ষ্মদেহে যে সাক্ষাৎ ঘটিয়াছিল তাহার অণুমাত্র সন্দেহ নাই। এই সূক্ষ্মদেহের ক্রিয়া পরবর্ত্তী স্বপ্নদ্বয়ে আরও স্পষ্টরূপে লক্ষিত হইবে।

প্রতিশোধের প্রতিশ্রুতি।

গত বৎসর ভাদ্রমাসে, আমার এক আত্মীয়া, বহুদিন হইতে গ্রহণী ও উদরাময় রোগে কষ্ট পাইয়া মারা যান। ইনি মারা যাইবার পূর্ব্বদিনে, ইঁহার আপনার ভগিনীকে (আমারই আর একজন আত্মীয়া। ইহাঁর সহিত, যিনি মারা যান তাঁহার অনেকদিন হইতে মনান্তর ছিল) বলেন, "যে তুমি যেমন আমায় কষ্ট দিয়াছ, তোমায় আমি তেমন জব্দ করিব"। বলিয়া পরদিন প্রাতঃকালে মারা যান।

ইহার পর আশ্বিন মাস কাটিয়া গেল, তখনও কিছু হয় নাই। কার্ত্তিকমাসে, উপরের ঘরে, যে ঘরে আমার আত্মীয়া শয়ন করেন, সেই ঘরে তিনি আরও কয়েকজনে মিলিয়া রাত্রি ৯।১০ টার সময় গল্প করিতে-ছিলেন, হঠাৎ জানলায় (সমস্ত জানলা বন্ধ ছিল) ভয়ানক শব্দ হইতে লাগিল, খুব জোরে ধাক্কা দিলে, বা লাথি মারিলে, যেরূপ শব্দ হয়, ঠিক সেইরূপ। রাস্তার উপর জানলা। সুতরাং ইহাতে ঘরে যাঁহারা ছিলেন, প্রায় কয়জনেই চীৎকার করিয়া অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া যান।

তাহার পর রাস্তায় পাড়ার প্রায় সমস্ত লোক ও ৩।৪ জন পাহারা-ওয়ালা সমস্ত রাত দাঁড়াইয়া রহিল যে, যদি কেউ বজ্জাতি করিয়া করে। ও ঘরে আমার আত্মীয়ার স্বামী, ও তাঁহার দুই জন বড় ছেলে, ও অন্যান্য আত্মীয় স্বজন, অনেকেই সমস্ত রাত্রি জাগিয়া অতিবাহিত করিলেন, কিন্তু শব্দের কোন কারণই স্থির করিতে পারিলেন না। যখন সকলে ছিলেন, তখনও খুব জোরে জোরে শব্দ হইতেছিল, তবে জানলাটা খুলিয়া দিলে, শব্দ বন্ধ থাকিত।

এইরূপ রাস্তায় ও ঘরে প্রায় ২।৩ মাস সমানে লোক থাকিয়াও কোন

কারণ নির্দ্ধারিত করিতে পারিলেন না। তখন, ততটা ভয়ও কমিয়া গেল। আর একটা আশ্চর্য্যের বিষয়, মানুষের মত, যন্ত্রটা শব্দ করিতে বলা যায়, যেমন, ২টা কিল মার, অথবা চড় মারো, ঠিক সেইরূপ ততগুলি শব্দ হয়।

আগে ইহাঁরা অত্যন্ত ভয় পাইয়াছিলেন, এমন কি দিন কতক, বাড়ী ভাড়া পর্য্যন্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু বারমাস নিজ বাড়ী ছাড়িয়া থাকা, যে কতটা কষ্টকর, ভুক্তভোগী মাত্রেই জানেন।

৫।৬ মাস পরে ইহাঁরা পুনরায় ফিরিয়া আসিলেন, শব্দও পূর্ব্বমত আরম্ভ হইল। এখন ইঁহাদের অভ্যাস হইয়া গিয়াছে!

আমরা অনেকেই কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া সেখানে রাত্রিবাস করিয়াছি, কিন্তু এরূপ আশ্চর্য্য ঘটনা কখন শ্রবণ বা দৃষ্টিপথের পথিক হয় নাই।

এখন আর পূর্ব্বের মত, প্রত্যহ হয় না মধ্যে মধ্যে হয়। ইহা কলিকাতার অনেকেই জানেন। কেননা পরিচিতদিগের ভিতরে অনেকেই দেখিতে আসিয়াছিলেন। এখন ইহাঁরা অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছেন, কোন ভয় পান না।

যদি আপনারা পরিচয় জানিতে ইচ্ছা করেন জানাইবেন। আমি তাঁহাদের মত গ্রহণ করিয়া পরিচয় দিতে পারি।

শ্রীমতী শ্রীমতী দেবী।

প্রেতাত্মার আসক্তি

সম্পাদক মহাশয় অদ্য আপনার অলৌকিক-রহস্য-নামধেয় মাসিক পত্রিকার জন্য একটী আশ্চর্য্য ঘটনা লইয়া উপস্থিত হইলাম। যদি উপযুক্ত বিবেচনায় কিঞ্চিৎ স্থান দেন তাহা হইলে সুখী হইব। যে ঘটনাটী পাঠকদের সম্মুখে আনয়ন করিতেছি, তাহা যদিও আমি প্রত্যক্ষ করি নাই, তথাপি ইহা আমার বাটীর নিকটস্থ স্থানে ঘটিয়াছিল এবং বিশ্বস্তসূত্রে আমি অবগত আছি। এই আখ্যায়িকার নাম দেওয়া হইয়াছে "প্রেতাত্মার আসক্তি"। ইহার কারণ এই যে এই উপাখ্যানে দেখা যাইবে যে, স্থূল দেহধারী বিশিষ্ট জীব জীবিতাবস্থায়, যে যে বিষয়ে আসক্ত থাকে, এই দেহ পরিত্যাগ করিয়াও আপাতঃদৃষ্ট সাংসারিক ভাবনা, কামনা এবং চেষ্টনার হাত এড়াইয়াও আসক্তির হাত এড়াইতে পারেনা। আসক্তির কি পরিণাম! মনে মনে বিষয় স্মরণ করিতে করিতে তাহাতে যে আত্যান্তিক কামনা জন্মায়, দেহত্যাগেও জীব তাহা ভুলিতে পারে না। আমরা কিন্তু এতই মোহান্ধ যে ভ্রমেও পারমার্থিক চিন্তা না করিয়া, সর্ব্বদাই বিষয় চাহিতেছি, যাহা চাই তাহা পাই, বিষয় চাই বিষয় পাই, সর্ব্বদাই বিষয় লইয়াই ব্যতিব্যস্ত। মুখে অর্থই অনর্থের মূল আওড়াইলেও সর্ব্বদা অর্থ চিন্তায় ব্যতিব্যস্ত। যে চিন্তা বা কামনা লইয়া, জীবন অতিবাহিত করিতেছি, দেহত্যাগেও সে চিন্তার অবসান হইবে না। যাবজ্জীবন আসক্তির দাস থাকিয়া জীবনান্তেও কামদেহে আসক্তির তৃপ্তি সাধনার্থে বিচরণ করিতে হইবে। কৃমি-কীট যেমন পুরীষ মধ্যে থাকিতে থাকিতে বিষ্ঠাকেই তাহার পরম প্রিয়বস্তু বিবেচনা করিয়া লয়, তাহা ত্যাগ করিতে মন চায় না, তেমনই যে বিষয়ে অত্যাসক্ত হওয়া যায়, তাহা

যতই দূষণীয় নিন্দনীয় হউক না কেন, তাহা হইতে মন সহজে ফিরিতে চায় না। এমন কি আসক্তি-জনিত সংস্কার জন্মান্তর পর্য্যন্ত জের টানিতে থাকে।

অনেক বক্তৃতা করিলাম। এক্ষণে ঘটনাটীতে আপনারা মনঃসংযোগ করুন। প্রায় দুই বৎসর হইল এখানে কামিনীবল্লভ সাহা নামে একজন লোক বাস করিত। তাহার জীবনের প্রথম অবস্থার বিষয় আমি বিশেষ অবগত নহি, ও তাহার সহিত এই প্রসঙ্গের কোন সম্বন্ধ নাই। যখন তাহার বয়স আন্দাজ ২৭।২৮ বৎসর তখন সে এখানকার স্থানীয় বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হয়। ৩।৪ বৎসর পরে কোন কারণ বশতঃ স্কুলটী উঠিয়া যায়। এবং উক্ত কামিনী সাহা কোনরূপে কায়-ক্লেশে দিন কাটাইতেছিল। এই অবস্থায় তাহার আবার একটী মালতী-নাম্নী রক্ষিতা স্ত্রীলোক (উপপত্নী) ছিল। এবং সেই স্ত্রীলোকটী কামিনীর প্রতি অত্যন্ত আসক্তা ছিল। কিছু দিন পরে স্ত্রীলোকটীর মৃত্যু হওয়ায় কামিনী সাহা তাহার বাটীর কার্য্য নির্ব্বাহার্থে একটী পরিচারিকা নিযুক্ত করে। এক দিন আমার পরিচিত * একজন চিকিৎসা-ব্যবসায়ী ও থিওজফিষ্ট বন্ধু কোন স্থান হইতে আসিতেছিলেন, পথি মধ্যে তাঁহাকে শ্রীরাজকৃষ্ণ পণ্ডিত নামে এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি নিজ বাটীতে ডাকেন। সেখানে দীনবন্ধু অধিকারী (একজন ভদ্রলোক) ও কামিনী সাহা উপ-স্থিত ছিলেন। ঐ ভদ্র লোকেরা ইঁহাকে বলেন যে, মহাশয় কামিনী সাহার বড়ই বিপদ। প্রত্যহ ইহার বাটীতে ইট পড়ে। ঝির ফিট হয় ও ইনি নিজে ভয় পান। আপনি যদি কোন লোক দ্বারা প্রতি-কার করাইতে পারেন তবে কামিনী সাহার বড়ই উপকার হয়। ইহা

---

* কোন বিশেষ কারণ বশতঃ উক্ত বন্ধুর নাম প্রকাশ করিতে পারিলাম না।

শুনিয়া আমার সেই বন্ধুটী সেই রাত্রেই কামিনী সাহার বাটী যান। তিনি যাইয়া একটু জল পড়িয়া সেই ঝিকে পান করিতে দেন। ঠিক সেই সময়ে একটা বিকট শব্দ হয়। উপস্থিত সকলে একটু ভীত হন। তৎপর ঝিকে "হিপ্নোটাইজ" করা হয়, প্রথমতঃ ঝিটী নিজের চরিত্র ভাল বলিয়া প্রকাশ করে। কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই ঝিএর শরীরে মালতীর ভৌতিক দেহের আবেশ হয়। এবং সে বলে আমি "মালতী"। কামিনীর উপ-পত্নী! মরিয়া ভূত হইয়াছি। আমার কামিনী সাহার প্রতি অত্যন্ত আসক্তি থাকায় আমি তাহাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিতেছি না। আর এই ঝি অত্যন্ত মন্দ প্রকৃতির। কামিনী ইহাকে মুখে মা বলে কিন্তু গুপ্ত ভাবে ইহারা অবৈধ প্রণয়ে আবদ্ধ। এই জন্য আমি এই ঝির প্রতি অত্যাচার করিতেছি। যদি "এ" কামিনীকে পরিত্যাগ না করে তবে আমি যেমন করিয়া পারি কামিনী সাহাকে আমার সঙ্গে করিয়া লইব। ইত্যাদি কথা বার্ত্তার পর আমার ঐ চিকিৎসক বন্ধু বাটী ফিরিয়া আই-সেন, ও কামিনী সাহাকে অনেক প্রকারে বঝাইয়া দেন যাহাতে সে উক্ত ঝি এর সঙ্গ পরিত্যাগ করে। কিন্তু দুঃখের বিষয় ফলে ইহাই হইল— যদিও ঝিএর কয়েক দিন ফিট হইল না, কিন্তু হঠাৎ এক দিন প্রাতে শোনা গেল, কামিনী সাহা গলে দড়ি লইয়া আত্মহত্যা করিয়াছে। এই গল্প হইতে ইহাই অনুমিত হয় যে, কামিনী সাহা ঝির প্রণয় পরিত্যাগ করিতে না পারায় প্রেতিনী মালতী আসক্তি বশতঃ ঝির প্রতি ঈর্ষান্বিত হইয়া, তাহার চিন্তাতরঙ্গ দ্বারা কমিনী সাহার মস্তিষ্কের বিকার উপস্থিত করাইয়া ঐরূপ পরিণাম উপনীত করাইয়াছে। আসক্তির কি শোচনীয় পরিণাম! যদি কেহ তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে চান তবে তাঁর আসক্তি পরিত্যাগ করিতে চেষ্টা করা উচিত। নতুবা তিনি বিনাশ প্রাপ্ত হন। তাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—

ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে।
সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে ॥
ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতি-ভ্রংশাদ্‌বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি ॥ ইতি

শ্রীসুরেন্দ্রনারায়ণ সিংহ।

"পুনরাগমন"

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

(২৯)

বাটীতে পৌঁছিয়াই শুনিলাম পিতা গৃহে ফিরিয়াছেন। কোচোয়ান তাঁহার আগমন সংবাদ আমাকে দেয় নাই, তাহাতেই বুঝিলাম আমার আসিবার অল্পক্ষণ পূর্ব্বেই তিনি বাড়ীতে উপস্থিত হইয়াছেন।

বাহির বারান্দায় পিতা পায়চারি করিতেছিলেন। সম্মুখস্থিত কোম্পানীর বাগানের সমস্ত আলোক তখন নির্ব্বাপিত হইয়াছিল। শুদ্ধ একটী ক্ষীণ আলোক বাগানের ফটকের কাছে স্তম্ভের উপর অবস্থিত হইয়া অন্যান্য আলোকসঙ্গীর অভাবে নিজের বিরহ-মলিনতা প্রকাশ করিতেছিল। এই জন্য গাড়ীতে বসিয়া প্রথমে আমি তাঁহাকে দেখিতে পাই নাই। দেউড়ি পার হইয়া সদর দরজায় যেই পা দিয়াছি, অমনি পিতা আমাকে ডাকিলেন—"কেও, গোপীনাথ!"

আমি পিতার সমীপে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলাম; এবং জিজ্ঞাসা করিলাম "আপনি কবে আসিয়াছেন?"

"আমিত আর কাহাকেও সঙ্গে লইয়া যাই নাই।"

"যাইবার সময় ছিল না, কিন্তু ফিরিবার সময়ত ছিল! শুনিলাম, আমার গুণধর খুড়ো তোমার রক্ষকস্বরূপ হইয়া আসিতেছিল, সঙ্গে সেই নিমকহারাম চাকরটাও ছিল, তাহারা গেল কোথায়!"

পিতার প্রশ্নে বুঝিলাম, হরিয়া আমার নিষেধসত্ত্বেও সমস্ত ঘটনা তাঁহার কাছে প্রকাশ করিয়াছে।

আমি পিতার প্রশ্নের কি উত্তর দিব! কোথায় পিতামহ! স্মরণ-মাত্রেই ভাগীরথীকে যেন চোখের সম্মুখে দেখিতে পাইলাম। আর দেখিলাম, তাহার তরঙ্গাসনে উপবিষ্ট, অথচ প্রাণহীনবৎ নিশ্চল, পিতা-মহের সেই সুন্দর দেহ চন্দ্রকিরণ-নিষেকে সুবর্ণ কুম্ভের ন্যায় সিন্ধু অভি-মুখে ভাসিয়া চলিয়াছে। গুরু-বৎসল বেচু পিতামহের অন্বেষণে উন্মত্তের ন্যায় তীরভূমি অবলম্বনে ছুটিয়াছে। উভয়কূল জগতের সমস্ত কোলাহল জাহ্নবীগর্ভে ডুবাইয়া নীরব আবাহনে, পিতামহের পাদস্পর্শলালসায় যেন সঙ্গে সঙ্গে চলিয়াছে। তথাপি পিতামহের নিদ্রাভঙ্গ হইল না! কোনও দিকে লক্ষ্য নাই—তরঙ্গের পর তরঙ্গ তাঁহার অঙ্গে আছাড়িয়া পড়িতেছে, তাহাতে ভ্রূক্ষেপ নাই—সাগরাভিমুখী গঙ্গারই মত পিতামহ যেন কোন্ পরমাত্মীয়ের অন্বেষণে তন্ময় হইয়া চলিয়াছেন।

কোথায় পিতামহ! পিতাকে কি উত্তর দিব! সত্য বলিতে সাহস নাই, মিথ্যা বলিতেও অধর স্ফুরিত হইতেছে না। কেমন করিয়া বলিব আমি পিতামহকে হত্যা করিয়া চলিয়া আসিয়াছি!

আমার মনের অবস্থা পিতা বুঝিতে পারিলেন কিনা জানি না—আমাকে তিনি নিরুত্তর দেখিয়া বলিলেন—"থাক; ভয়ে, পরিশ্রমে, অনাহারে তুমি অবসন্ন হইয়া আসিয়াছ। আজ রাত্রির মত বিশ্রাম কর। কাল আমি ইহার প্রতিবিধান করিব। আমি বাড়ীতে পা দিয়াই, হরিয়ার কাছে সমস্ত কথা শুনিলাম! শুনিয়া আর ভিতরে প্রবেশ করি নাই—খুড়ার

প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া আছি। তাহার চতুরতা আমার বিশেষ জানা আছে। বুঝিয়াছিলাম সে আসিবে না! তবে যদি আমাকেও তোমার মত বোকা মনে করিয়া, তোমাকে দস্যুর আক্রমণ হইতে রক্ষা করিয়াছে বলিয়া পৌরুষ প্রকাশ করিতে খুড়া এখানে আসে, তাই তাহাকে প্রত্যুদ্গমন করিতে এখানে দাঁড়াইয়াছিলাম। অভ্যর্থনা করিতে পাইলাম না, আক্ষেপ রহিয়া গেল। যাক্, যখন সে আসে নাই, তখন আজিকার মত বিশ্রাম কর, যাহাতে সে আসে কাল আমি তার ব্যবস্থা করিব।"

আমার দেহ মন অবসন্ন হইয়াছিল, সুতরাং পিতার কথার মর্ম্মগ্রহণ করিতে আমার অবসর হইল না—আমি পিতার সঙ্গে গৃহে প্রবেশ করিলাম।

* * * *

আহারান্তে বিশ্রামার্থ শয়ন করিতে যাইতেছি, এমন সময়ে পিতার উম্মাসূচক বাক্য আমার কর্ণে প্রবেশ করিল। সঙ্গে সঙ্গে মায়ের কথাও আমার শ্রুতিগোচর হইল। পিতার কথা বুঝিতে পারিলাম, মায়ের কথা বড় ধীর—বুঝিতে পারিলাম না। পিতা বলিতেছিলেন—"শুধু তোমার জন্যই এত দিন আমাকে অনর্থক ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইয়াছে। এখন বুঝিতেছি, তোমার আবদারের প্রশ্রয় দিয়া, আমি নিতান্ত গর্হিত কার্য্য করিয়াছি। এখনও যদি তুমি আমাকে বাধা দিতে চাও, তাহলে তোমারও পর্যান্ত আমি মুখ দর্শন করিতে চাহি না। তাহলে বুঝিব স্ত্রীরূপে তুমিই আমার সর্ব্বপ্রধান শত্রু।" এরূপ কথা শুনিয়া আমি আর শয়ন করিতে পারিলাম না। জ্ঞান হইয়া অবধি একটী দিনের জন্য পিতাকে মায়ের প্রতি রূঢ় বাক্য প্রয়োগ করিতে শুনি নাই। রূঢ় বাক্য প্রয়োগ দূরে থাকুক, কখনও কোনও সময়ে পিতা যদি কাহারও প্রতি ক্রুদ্ধ হইতেন, মায়ের উপস্থিতিতে অথবা তাঁহার একটীমাত্র মিষ্টবাক্যে পিতার ক্রোধ উপশান্ত হইত। এমন কি আমরা ইহাই জানিতাম যে,পিতা

পৃথিবীর মধ্যে আমার মধুর প্রকৃতি জননীকেই এক মাত্র ভয় করিতেন। আর সর্ব্বত্রই তাঁহার মান্য, সমাজে তাঁহার সুপ্রতিষ্ঠা, সুতরাং বাটীর বাহিরে ভয় করিবার তাঁহার কেহই ছিল না। সেই পিতাকে মাতার প্রতি কুপিত হইতে দেখিয়া, আমি বিস্মিত হইলাম। বিশেষতঃ জননীর যে পীড়ার সংবাদ আমি তাঁহার গোচর করিয়াছিলাম, তাহাতে তাঁহার প্রতি পিতার এরূপ ব্যবহার আমার বোধের অতীত হইয়া পড়িল।

উত্তরোত্তর পিতার স্বর রুক্ষতর হইতে লাগিল। আমি আর শয়ন করিতে পারিলাম না। এরূপ তীব্র আলাপের যাহাতে শীঘ্র নিবৃত্তি হয়, এইজন্য ঘর হইতে বাহির হইয়া পিতার গৃহাভিমুখে চলিলাম।

পিতা বলিতে লাগিলেন—"তুমি আমাকে নির্ব্বোধ মনে করিও না। তোমার মনের অবস্থা জানিয়াও ইচ্ছা পূর্ব্বক আপনাকে এত দিন প্রতারিত করিয়া আসিয়াছি। কিন্তু আর করিব না।"

এইবারে মায়ের কথা শুনিতে পাইলাম। মা উত্তর করিলেন—"কি মনের অবস্থা জানিলে!"

পিতা বলিলেন—"কেন আর প্রশ্ন করিয়া আমার ক্রোধ উদ্দীপন করিতেছ! সেই হতভাগ্যদিগকে স্থানান্তরিত করিবার পর হইতে তুমি আর এক প্রকৃতির হইয়া গেছ। জোর করিয়া মুখে হাসি মাখিয়া আমার ও আমার পুত্রের সঙ্গে কথা কহিতেছ—তোমার মুখে হাসি তোমার অন্তরের দুঃখের আবরণ। মূর্খে তোমার মুখ দেখিয়া তোমার মনের অবস্থা জানিতে পারিবে না বলিয়া আমিও কি তা পারিব না! রমানাথ আসিলে তাঁহার সেবার জন্য তুমি যেরূপ আন্তরিকতার সহিত তৎপর হও, তোমার ভরণ-পোষণের ভার লইয়া, তোমার সর্ব্বপ্রকারে শ্রেষ্ঠ গুরুস্থানীয় হইয়াও আমি সে আন্তরিকতা পাই নাই। অন্যে তোমার এ আচরণে অকৃত্রিম গুরুভক্তির নিদর্শন দেখিতে পারে, কিন্তু আমি নারীর চরিত্রাভিজ্ঞ আমিত তা দেখিব না! নিজের পুত্রকে পর করিয়া পরের

পুত্রকে আপন করা একমাত্র তোমাতেই দেখিলাম। ইতিহাসেও কোথাও পড়িয়াছি কি না আমার মনে হয় না।

মাতা বলিলেন—"এতকাল আত্মগোপন করিয়া আমার সহিত ব্যবহার তোমার ন্যায় পণ্ডিতের কি উপযুক্ত কার্য্য হইয়াছে।"

পিতা বলিলেন—"রমণী বুদ্ধিহীন বলিয়া তোমাকে ক্ষমা করিয়াছিলাম। ভাবিয়াছিলাম কালে তোমার মতির পরিবর্ত্তন হইতে পারে। কিন্তু এখন দেখিলাম, তা' হইল না। দরিদ্রের কন্যা অগাধ ঐশ্বর্য্য দিয়াও তোমার মতি পরিবর্ত্তিত করিতে পারিলাম না। তুমি—"

মাতা পিতার কথায় বাধা দিয়া বলিলেন—"থাক্ পাশের ঘরে ছেলে শুইয়া আছে—সে শুনিতে পাইলে মৃত্যুর অধিক হইবে।"

পিতা বলিলেন—"সে জ্ঞান কি তোমার আছে। উপযুক্ত পুত্র—আজবাদে কাল সে একটা দেশ-পূজ্য ব্যক্তি হইবে, তুমি এমন পুত্রের প্রতি মমতাও বিসর্জন দিয়াছ সাত বৎসর অতীত হইয়া গেল যৌবনের পারে পৌছিলে, এখনও পর্য্যন্ত সেই স্ত্রীস্বভাব-বিশিষ্ট চরিত্রহীন মূর্খটার মোহ পরিত্যাগ করিতে পারিলেনা।

মাথা ঘুরিয়া গেল—গোবিন্দ! গোবিন্দ! একি শুনিতে আসিয়াছিলাম! পিতা মাতার প্রতি নাজানি আরও কি নিষ্ঠুর বাক্য প্রয়োগ করেন! শুনিবার ভয়ে কর্ণে অঙ্গুল দিয়া আমি সে স্থান ত্যাগ করিলাম। ঘরে ফিরিয়া শয্যায় যখন পুনরুপবিষ্ট হইয়াছি; তখন বাস্তবিকই দুই গণ্ডে অশ্রুবিন্দু পতিত হইল। আমি হস্তে মুখ ঢাকিয়া শয্যায় শয়ন করিয়াছিলাম।

আজি পঞ্চাশ বৎসর পরে তোমাদের কাছে এই কথা কহিতেছি। এই পঞ্চাশ বৎসরে আমার মনের অবস্থা একরূপ বিপর্য্যস্তই হইয়া গিয়াছে। এই দূর সময়ান্তরাল হইতে পূর্ব্বজীবনের সমস্ত ঘটনা বিকৃতবৎ দেখিলেও সে দিনের হৃদয়ের আঘাত আমি আজিও বিস্মৃত হইতে পারি

নাই। গোবিন্দ! গোবিন্দ! কেন আমি কৌতূহল পরবশ হইয়া পিতা মাতার রহস্যালাপ শুনিতে গিয়াছিলাম!

শয়ন করিয়া কেবলই ভাবিতে লাগিলাম, যে মাকে কত কষ্টে আসন্ন মৃত্যু হইতে রক্ষা করিয়াছি, সেই মাকে এইবার বুঝি হারাইলাম।

ছোট ঠাকুর দাদার উপর পিতার ক্রোধ ও সেই সঙ্গে গোপালের উপর তাঁহার দ্বেষ এতদুভয়ের কারণ আমি এতদিন পরে জানিতে পারিলাম। এতদিন পরে বুঝিলাম, মাতৃস্নেহ উপলক্ষে গোপালের প্রতি আমার ন্যায্য ঈর্ষা পিতার প্রচণ্ড ঈর্ষার কেবলমাত্র সহায়তা করিয়াছে। গৃহ হইতে গোপালের নির্ব্বাসনে পিতাই আমার অধিকতর উদ্যোগী। কই যখন স্বগ্রামে বাস করিতাম, তখনত পিতার এরূপ মতি ছিল না। কলিকাতায় আসিয়াই কি তাঁহার এইরূপ মতি পরিবর্ত্তিত হইল। ছি ছি! পণ্ডিত পিতার অকারণ এ দুর্ম্মতি কেন হইল!

সমস্ত রাত্রির মধ্যে মুহূর্ত্তমাত্র সময়ের জন্যও আমার নিদ্রা আসিল না। সমস্ত দিবসের ক্লান্তিও দারুণ দুশ্চিন্তাকে পরাস্ত করিয়া আমাকে নিদ্রার আশ্রয়ে সমর্পণ করিতে পারিল না!

সূর্য্যোদয় না হইতেই আমি শয্যাত্যাগ করিলাম। এবং তাড়াতাড়ি মুখ-চোখে জল দিয়া নীচে চলিয়া আসিলাম। মনে করিলাম, কেহ না দেখিতে দেখিতে আমি বাড়ীর বাহির হইব; একবার ডাক্তার বাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিব। ডাক্তার বাবুকেই এখন আমি প্রকৃত বন্ধু বুঝিয়াছিলাম। মনে করিলাম, কাল রাত্রের সমস্ত ঘটনা তাঁহার কাছে প্রকাশ করিয়া তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া আসিব। বুঝিয়াছি, ছোট ঠাকুরদা'র কোনও কথা লইয়া মাতা পিতা-কর্ত্তৃক তিরস্কৃত হইয়াছেন, কিন্তু সে কথাটা যে কি, তাহা সম্যক উপলব্ধি করিতে পারি নাই। যে কথাই হ'ক, আমি আমার মনের অবস্থা তাঁহার কাছে প্রকাশ করিব। অন্ততঃ একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু না পাইলে আমার নিস্তার নাই। স্থির করিলাম, গত দুই

দিবসের সমস্ত ঘটনা আনুপূর্ব্বিক তাঁহাকে শুনাইব, পিতামহ-বিসর্জ্জনের কথাও তাঁহার কাছে গোপন করিব না।

মা প্রতিদিন অতিপ্রত্যূষেই শয্যাত্যাগ করেন, কিন্তু সেদিন দেখিলাম তিনি উঠেন নাই। তিনি উঠেন নাই, সুতরাং পরিচারিকাদের মধ্যেও একজন কেহ উঠে নাই। বাড়ী নিস্তব্ধ। আমি সেই নিস্তব্ধতার মধ্য দিয়া নিঃশব্দে বহির্ব্বাটীতে আসিলাম। তারপর দরোয়ানকে জাগাইয়া বাটীর বাহির হইলাম। পথে তখনও আলো জ্বলিতেছিল। এখনও পর্য্যন্ত সহরের কোনও স্থানে নবমীর প্রভাতী বাদ্য বাজে নাই। এরূপ সময়ে ডাক্তার বাবুর বাড়ীতে যাওয়া যুক্তিসিদ্ধ নয় বলিয়া, কিয়ৎক্ষণ সময় অতিবাহিত করিবার জন্য আমি কোম্পানীর বাগানের মধ্যে প্রবেশ করিতে চলিলাম।

ফটকের কাছে উপস্থিত হইয়া দেখি, একজন লোক দ্রুতপদে আমার দিকে অগ্রসর হইতেছে। সে ব্যক্তি আমাকে বাগানে প্রবিষ্ট হইতে দেখিয়া দূর হইতেই আমাকে সম্বোধন করিয়া বলিল—"বাবু! একটু দাঁড়াও, আমি একটা কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করিব।"

কি আপদ! এত সেই ডাকাতটার কণ্ঠস্বর! লোকটা নিকটে আসিবামাত্রই বুঝিলাম আমার অনুমান মিথ্যা নয়। সে কিন্তু প্রথমে আমাকে চিনিতে পারে নাই। নিকটে আসিয়াই সে আমাদের বাড়ীর দিকে হস্তপ্রসারণ করিয়া বলিল,—"হাঁ বাবু! ওইটাকি রাধানাথ তর্করত্নের বাড়ী?"

প্রশ্ন করিয়াই সে আমাকে চিনিতে পারিল। চিনিবামাত্র সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিল "তাইত! এই যে বাবু তুমি! যাক্, মা কালী আমাকে ঘোরা হইতে রক্ষা করিয়াছে। আমি একেবারে ঠিক জায়গায় আসিয়াছি। যে ঠাকুরম'শায় তোমার সঙ্গে কাল আসিতেছিল, সে ঠাকুর কোথায়?"

লোকটার প্রশ্নে মাথাটা ঘুরিয়া গেল। তথাপি অতি চেষ্টায় আপনাকে প্রকৃতিস্থ করিয়া, তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"সে ঠাকুরকে তোমার কি প্রয়োজন?"

সে উত্তর করিল—"প্রয়োজন না থাকিলে, এই রাত্রেই এখানে আসিলাম কেন?"

"তবু শুনি!"

"তর্করত্ন ঠাকুর তোমার কে?"

"আমি তাঁর ছেলে।"

"তা'হ'লে ভালই হয়েছে। আমার মনিব তোমার বাবার নামে, আর সেই ঠাকুর ম'শায়ের নামে দুইখানা চিঠি দিয়াছে। চিঠি জরুরি—যাতে ঠাকুরম'শায় এখনি পায়, তাই কর।"

এই বলিয়া সে মাথার পাকড়ী হইতে দুইখানা পত্র বাহির করিল। পত্র আমার হাতে দিতে দিতে বলিল—"বাবু! চিঠি দুইখানি এখনি গিয়া তাহাদের হাতে দাও।"

চিঠি লইতে আমার হাত কাঁপিতে লাগিল। কিন্তু যখন শুনিলাম, সে পত্র আমার হাতে দিয়াই চলিয়া যাইবে, তখন অনেকটা নিশ্চিন্ত হইলাম। ভাবিলাম, আপাততঃ সমস্ত রহস্য প্রকাশের দায় হইতে রক্ষা পাইলাম। লোকটা আমার সঙ্গে বাড়ীতে গেলে কোনও কথা গোপন থাকিত না। অনর্গল মিথ্যা কথায় আমাকে আসল কথা গোপন করিতে হইত। লোকটা পত্র দিয়াই আমাকে প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল।

কিন্তু এ কিসের পত্র! কাল সবে মাত্র পথে ব্রাহ্মণের সঙ্গে আমার পরিচয়, আর সে পরিচয় ব্রাহ্মণের পক্ষে বড় সুখকর হয় নাই—তাহার শত আগ্রহেও তাহার গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করি নাই! হায়! তখন যদি ব্রাহ্মণের উপরোধ রক্ষা করিতাম, তাহা হইলে আমাকে বোধ হয় পিতামহের জলনিমজ্জনের কারণ হইতে হইত না! মনঃক্ষুণ্ণ ব্রাহ্মণের

নীরব অভিসম্পাতেই কি আমাকে ব্রহ্মহত্যার পাতকী হইতে হইল!

কিন্তু এ কিসের পত্র! আমরা কে, কোথা হইতে আসিয়াছি, কোথায় যাইব এ সব কথাত ব্রাহ্মণকে জানাই নাই, তাহা হইলে সে আমার পিতার নাম, আমাদের বাসস্থানের ঠিকানা—এ সকল কেমন করিয়া জানিল। লোকটা পরিচিতের স্থায় একেবারে আমাদের বাড়ীর দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়াছে। কে ইহাকে আমাদের বাড়ীর সংবাদ দিল।

এ পত্রের ভিতরে কি আছে! পত্রস্পর্শের সঙ্গে সঙ্গে সেই বালিকার মুখখানি আমার মনশ্চক্ষে ফুটিয়া উঠিল,—সেই স্বকুমার সৌন্দর্য্য তড়িদ্বেগে আমার মর্ম্মস্পর্শ করিল। কিন্তু—কি বলিব—আমি যেন সে বালিকার নিকট হইতে দুস্তর সাগর-পারে চলিয়া আসিয়াছি। সিন্ধু-হৃদয়োত্থ প্রভাতারুণের স্থায় সে কেবল আমার দৃষ্টির তীব্র আকাঙ্ক্ষা বাড়াইয়া দূর উর্দ্ধগগনে দীপ্ত তেজে উড়িয়া যাইবে—আমি আর তাহার দিকে চাহিতেও পারিব না।

একবার মনে করিলাম, চিঠি খুলিয়া ভিতরে কি আছে দেখি। কিন্তু অসংখ্য ঘাত-প্রতিঘাতে আমার মর্ম্ম আগে হইতে ছিন্ন-ভিন্ন হইয়াছিল। এখন ভূকম্পান্দোলনে জীর্ণ গৃহ কে যেন প্রবল শক্তিতে নাড়িয়া দিল। আমার সর্ব্বশরীর কাঁপিয়া উঠিল। আমি চিঠি খুলিতে পারিলাম না—সেইখান হইতেই ডাক্তার বাবুর বাড়ী চলিয়া গেলাম।

শ্রীক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ।

অদৃশ্য-জগৎ-ভ্রমণ।

নিম্নলিখিত আমার স্বপ্নদৃষ্ট বিষয় যত দূর স্মরণ আছে তাহা আনুপূর্ব্বিক বিবৃত করিবার চেষ্টা করিয়াছি।

ধর্ম্ম কি? কর্ম্ম কাহাকে বলে। কি উপায়ে জীবাত্মা পরমাত্মাতে মিলিত হইতে পারে। এই উপায় নির্দ্ধারণের জন্য ঋষিরা হিন্দুধর্ম্মকে কেন প্রধান বলিয়া থাকেন।

হিন্দুধর্ম্মে পিতৃযজ্ঞের ও তর্পণের বিধান আছে। প্রত্যহ স্নানের পর ব্রহ্ম হইতে স্তম্ব পর্য্যন্ত এক গণ্ডূষ জল দ্বারা তর্পণ করা প্রত্যেক হিন্দু মাত্রেরই কর্ত্তব্য কেন। এই সকল চিন্তা করিতে করিতে একদা রাত্রিতে নিদ্রিত হইলাম। নিদ্রাবশে ক্রমশঃ স্বপ্নদেবী দেহ অধিকার করিলেন। দেখিলাম, গুরুদেব স্বয়ং সম্মুখে উপস্থিত হইয়া মৃদু-মন্দ-স্বরে আহ্বান করিতেছেন, ও কহিতেছেন, "বৎস জাগ্রত হও, আমার সঙ্গে আইস, আমি ভূর্লোক হইতে ক্রমশঃ ভুবর্লোক, স্বর্লোক মহর্লোক, জনলোক, তপলোক ও সত্যলোকে গমন করিয়া পরম ব্রহ্মকে দর্শন করিবার মানস করিয়াছি, তুমি আমার পশ্চাদ্গামী হও, তাহা হইলে বুঝিতে পারিবে যে, হিন্দুধর্ম্মের সার মর্ম্ম কি।" আমি গুরুদেবকে দর্শন করিয়া পরম পুলকিত হইলাম ও সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাতপূর্ব্বক কোনপ্রকার বাঙ্‌নিষ্পত্তি না করিয়া তাঁহার অনুসরণ করিলাম। ক্রমে আমরা নানা নদী, নদ, প্রস্রবণ, পর্ব্বত ও বন অতিক্রম করিয়া একটী নদীর পরপারে এক সুন্দর স্থানে উপনীত হইলাম। গুরুদেব কহিলেন, "বৎস! এক্ষণে তুমি ভূর্লোক অতিক্রম করিয়া ভুবর্লোকে উপস্থিত হইয়াছ। এই স্থানের দৃশ্য ভূর্লোক হইতে কিঞ্চিৎ বিভিন্ন। তুমি ইহা বিশেষরূপে পরিদর্শন কর"। দেখিলাম যে সমস্ত স্থূল পদার্থ তথায় বিদ্যমান আছে, তাহার অভ্যন্তরে কি পদার্থ আছে তাহাও আমার দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল।

একি আশ্চর্য্য! পূর্ব্বে ভূর্লোকে ঘন পদার্থের দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, ও উচ্চতা মাত্র দেখিতে পাইতাম, এক্ষণে তাহার অভ্যন্তর ভেদ করিয়া, সেই স্থূল পদার্থের মধ্যে যে সকল সূক্ষ্ম পদার্থ আছে, তাহাও দেখিতে পাইতে লাগিলাম, সেই জন্য সকল পদার্থই ভূর্লোক হইতে কিছু বিভিন্ন বোধ হইতে লাগিল। আরও দেখিলাম যে, ভূর্লোকে সমচতুর্ভুজ ক্ষেত্রের প্রস্থ যেমন দৈর্ঘ্য অপেক্ষা কিছু কম বোধ হইত, এক্ষণে তাহা সমান বলিয়া বিবেচিত হইতে লাগিল। গুরুদেব কহিলেন, "বৎস! এই প্রেতভূমি ৭ সাতটী প্রদেশে বিভক্ত। এখানকার বাসেন্দাদিগের স্থূল শরীর নাই। তাহারা ছায়া-শরীর ও লিঙ্গ-শরীর লইয়া বিচরণ করিতেছে।" ক্রমে আমরা অগ্রসর হইতে লাগিলাম। দেখিলাম ঐস্থান ক্রমশঃ অন্ধকারে আচ্ছন্ন কাননের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। গুরুদেবকে কহিলাম, "প্রভু! আমার এই স্থান সমস্ত অন্ধকারময় বোধ হইতেছে, আমি আর কিছু দেখিতে পাইতেছি না। সুতরাং চলিতে পারিতেছি না।" তিনি বলিলেন "বৎস! আমার হস্তে যে ত্রিশূল আছে, ইহা ধারণ কর। ইহার আলোকে এই অন্ধকারময় স্থানে তুমি প্রথমতঃ "পূর্ণচন্দ্রের" আলোর ন্যায় আলোক দর্শন করিবে, ক্রমশঃ সূর্য্যের ন্যায় আলোক দেখিতে পাইবে।" আমি গুরুদেবের ত্রিশূল হস্তে ধরিয়া চলিতে লাগিলাম। অদূরে এক ভয়ানক কোলাহল শ্রুতিগোচর হইল। সম্মুখে এক প্রকাণ্ড অন্ধকারাচ্ছন্ন পুরী—চতুর্দ্দিকে এক নদী দ্বারা পরিবেষ্টিত—দৃষ্টিগোচর হইল। ঐ নদীর জল বাষ্পপূর্ণ তপ্ত ফেনের ন্যায় উত্তাল তরঙ্গমালা বিস্তার করিয়া এক একবার ১০।১৫ হাত ঊর্দ্ধে উঠিতেছে এবং পুনরায় অতলস্পর্শ নিম্নে গমন করিতেছে। ইহা দেখিয়া গুরুদেবকে জিজ্ঞাসা করিলাম "পিতঃ এই পুরী কি? এবং এই নদীর নাম কি?" তিনি বলিলেন, "এই পুরীর নাম যমপুরী, এবং এই নদীর নাম বৈতরিণী।" দেখিলাম, ঐ নদীর উপরিভাগে

অত্যাশ্চর্য্য এক সেতু নির্ম্মিত রহিয়াছে। ঐ সেতু কখন ধূমাবৃত, কখন প্রজ্বলিত অগ্নিময় ও কখন স্বুবর্ণ-রচিত বলিয়া প্রতীয়মান হইতে লাগিল; এবং অগণ্য প্রাণিগণ কেহ বা হাহাকার রবে এবং কেহ বা উল্লাসিত প্রাণে সেই সেতুর অভিমুখে গমন করিতেছে। গুরুদেবকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "কৃপাময়, এ সেতুটী কি, এবং কিজন্য নানাপ্রকার মূর্ত্তিধারণ করিতেছে।" গুরুদেব কহিলেন, "এই সেতুর নাম কামসেতু। ঐ দেখ, এই সেতুর প্রবেশদ্বারে যমদূত দণ্ডহস্তে দণ্ডায়মান হইয়া বজ্রনিনাদে হুঙ্কার করিতেছে। মৃত্যুর পর সকল প্রাণীকে দেহ-ত্যাগ করিয়া ভূর্লোক পরিত্যাগ পূর্ব্বক, নিজ কর্ম্মফল ভোগ করিবার জন্য এই প্রেত-পুরীতে অবশ্যই আসিতে হইবে। ঐ দেখ অগণ্য প্রাণিগণ দেহান্তরের পর এই প্রেত-পুরীর দিকে অভিগমন করিতেছে। যাহারা ঘোর পাপী, ঐ দেখ! যমদূত দণ্ডপ্রহারে তাহাদিগকে সেতুর উপর হইতে বৈতরণীর অগ্নিসদৃশ উত্তপ্ত জলে নিক্ষেপ করিতেছে, এবং তাহারা মহাকষ্টে নদী পার হইয়া যম পুরীতে প্রবেশ করিতেছে। যাহারা মহাপাপী অপেক্ষা কিছু ন্যূন পাপী, তাহারা যখন সেতুপথ দিয়া গমন করিতেছে, তখন ঐ সেতু অগ্নিময় রূপ ধারণ করিতেছে এবং তদপেক্ষা কম পাপীর আগমন কালে ঐ সেতু ধূমময় রূপ ধারণ করিতেছে। কিন্তু যখন পুণ্যাত্মা প্রাণিগণ ঐ সেতুর উপর দিয়া আগমন করিতেছেন, তখন ঐ সেতু প্রশস্ত ও স্বর্ণরঞ্জিত সুন্দররূপ ধারণ করিয়া ধার্ম্মিকগণের মনো-রঞ্জন করিতেছে। এইজন্য ঐ সেতুকে কামসেতু বলা যায়।" ক্রমশঃ আমরা যমপুরীর তোরণ-দ্বার পার হইয়া পুরীমধ্যে প্রবেশ করিলাম। দেখিলাম, কতকগুলি প্রাণী তোরণদ্বারের সন্নিকটে অস্থি-চর্ম্ম-সার কঙ্কালবিশিষ্ট দেহে জ্বর ভোগ করিতেছে, কেহ বা ভয়ানক শীতে থর থর কম্পান্বিত হইতেছে এবং কেহবা ভয়ানক প্রদাহের জ্বালায় ছটফট করিয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া ক্রন্দন করিতেছে এবং কেহ বা পিত্ত, শ্লেষ্মা

ও বায়ুর প্রকোপে নিস্পন্দ ভাবে জ্ঞানশূন্য হইয়া রহিয়াছে। অপর পার্শ্বে কোন উদর-পরায়ণ অজীর্ণ ভোজন-দ্রব্য সকল দুই হস্তে পুনঃপুনঃ উত্তোলন করিয়া গ্রাস করিতেছে এবং কেহ বা সেই সকল ভক্ষণ করিয়া পরিপাক করিতে অশক্ত হওয়ায় দুর্গন্ধময় মলাচ্ছন্ন হইয়া উদরাময় রোগে জীর্ণ শীর্ণ কলেবরে পড়িয়া আছে, তাহার পার্শ্বে কেহ বা প্রেমোন্মত্ত হইয়া ঢুলুঢুলু নেত্রে জ্ঞানশূন্য হইয়া কখন গান, কখন নৃত্য, কখন ক্রন্দন এবং কখন বিবাদ করিতেছে। এবং কেহবা কামোন্মত্ত হইয়া বিগলিত শীর্ণ দেহে সুরতে ব্যাপৃত রহিয়াছে। তৎপার্শ্বে কেহ বা যক্ষ্মারোগে দিবানিশি কাসিতে কাসিতে রক্ত বমন করিতেছে, এই সকল দেখিয়া মনে কিঞ্চিৎ বিস্ময় ও ভয়ের উদ্রেক হইল। গুরুদেবকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "ভগবন্ ইহারা কি চিরকালই এইরূপ যন্ত্রণা ভোগ করিবে।" গুরুদেব কহিলেন, "বৎস! পূর্ব্বে তোমাকে যে কামরাজ্য সাতটী প্রদেশে বিভক্ত বলিয়াছিলাম এইটী তাহার প্রথম প্রদেশ। অনেকে মনে করেন যে, মৃত্যুর পর লোকের স্বভাবের ও বুদ্ধির পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে, কিন্তু তাহা হয় না, তোমাকে তাহা দেখাইবার জন্যই এখানে আনিয়াছি। মানুষেরা জীবদ্দশায় যে যেরূপ স্বভাব ও বুদ্ধি সহকারে ভূর্লোকে বিচরণ করিয়া থাকে, কামরাজ্যে আসিয়া প্রথমে তাহারা প্রায় সেইরূপ স্বভাব ও বুদ্ধিসম্পন্ন হইয়াই কার্য্য করিয়া থাকে। যাহারা ভূর্লোকে পশুস্বভাবাপন্ন, মদ্যপায়ী কু-ইন্দ্রিয় সেবক, তাহারাই এই প্রদেশে জাগ্রত অবস্থায় থাকে, ও যাহার কামনা যত প্রবল, তাহাকে তত অধিক কাল এই প্রদেশে বাস করিয়া এই সকল ভয়ানক যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। কেননা তাহাদের স্থূল শরীর বিদ্যমান না থাকায়, তাহারা তাহাদের কামনা পরিতৃপ্তি করিতে পারে না, সুতরাং ভূর্লোক অপেক্ষা অধিকতর ক্লেশ ভোগ করিতে থাকে, তবে যদি তাহারা ইতিমধ্যে ভূর্লোকস্থিত কোন মনুষ্যকে আপনাদের স্বভাবে পরিবর্ত্তিত করিতে পারে, তবে তাহাদের

স্কন্ধে বা তাহাদের দ্বারা আপনাদের বাসনা চরিতার্থ করিবার চেষ্টা করে। ইহাকেই ভূর্লোকে "ভূতে পাওয়া" বলে। আর দেখ ঐ যে লক্ষ লক্ষ লোক এই প্রদেশে বাস করিতেছে তাহাদের সকলের অবস্থা ও স্বভাব সমান নহে। তাহারা কেহ কেহ আপনার সুকর্ম্ম ফলে অতি অল্পকাল মাত্র এই প্রদেশে বাস করিয়া স্বর্গলোকে গমন করিবে। অর্থাৎ যাহারা ভূর্লোকে বিশুদ্ধ ও সৎ স্বভাবে কালযাপন করিয়াছে এবং যাহাদের কামনা স্বার্থশূন্য ও ধর্ম্মপরায়ণ, তাহাদিগের এই প্রদেশে কোন আসক্তি নাই। তাহারা অতি অল্প সময়ের জন্য এই প্রদেশে সুষুপ্তি অবস্থায় বাস। করিয়া নিজের দেহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বর্গলোকে গমন করিয়া ধর্ম্ম বৃক্ষের সুপক্ক ফল ভোগ করিয়া থাকে, তোমাকে সে সকল লোকের গতি, স্বর্গ লোকে যাইয়া সত্বর দেখাইব। সাধারণ মনুষ্য মৃত্যুর পূর্ব্বে নীচ কামনা সব ত্যাগ করিতে পারে না, সুতরাং তাহাদিগকে এই প্রদেশে ততদিন বাস করিতে হয়, যতদিন তাহারা ভূর্লোকে যে শক্তিদ্বারা তাহাদের আত্মাকে তমসাচ্ছন্ন করিয়াছিল, সেই শক্তির নাশ না হয়। প্রত্যেক মনুষ্যকেই মৃত্যুর পর এই সকল প্রদেশ ভ্রমণ করিয়া স্বর্গলোকে যাইতে হইবে।

তুমি যে ঐ পাপাত্মাদিগের দুর্দ্দশা দেখিয়া বিস্মিত ও ভীত হইতেছ, তাহা হওয়া উচিত নহে। উহাদের মধ্যে সকলেই যে চিরকাল অনন্ত দুঃখ ভোগ করিবে তাহা মনে ভাবিও না। বিধাতা মঙ্গলময়। জীবগণ অনন্ত কষ্ট ভোগ করিবে এবং তিনি তাহা দেখিয়া সুখী হইবেন, ইহা কখনও মনে স্থান দিও না। এই সংসার কোন দৈত্যের ইচ্ছানুযায়িক প্রচলিত নিয়মের দ্বারা পরিচালিত হইতেছে না। সংসারের প্রত্যেক নিয়ম ও আইন সেই পরম কারুণিক মঙ্গলময় জগদীশ্বরের প্রণীত। ঐ সকল দুর্দ্দশাপন্ন লোকের মধ্যে অনেকেরই জ্ঞান এত সঙ্কীর্ণ যে ভূর্লোকে তাহারা যেমন অজ্ঞানের ন্যায় নিষ্প্রয়োজনীয় লক্ষ্যশূন্য কার্য্যে সময় অতি-বাহিত করিয়াছে, এখানেও সেইরূপ অজ্ঞানের ন্যায় ঐরূপ কার্য্যে ব্যাপৃত

রহিয়াছে। তুমি যেরূপ উহাদিগকে দুর্দ্দশাপন্ন দেখিয়া কষ্ট বোধ করিতেছ উহারা সেইরূপ কষ্ট বোধ করিতেছে না।

কিন্তু, উহাদের জ্ঞান যতই সঙ্কীর্ণ হউক না কেন, মনুষ্য মাত্রেরই একটু ধর্ম্মপ্রবৃত্তি আছে, এবং ঐ ধর্ম্ম প্রবৃত্তি সর্ব্বদাই ঐ অজ্ঞানকে নিত্র পথে নিয়োজিত করিবার জন্য আকর্ষণ করিতেছে। সুতরাং যতদিন পর্য্যন্ত ঐ অজ্ঞানের কতক পরিমাণ জ্ঞানাগ্নি দ্বারা শোধন না হয়, ততদিন তাহাদিগকে এই প্রদেশে বাস করিতে হইবে। কেহই অনন্ত দুঃখ ভোগ করিবে না। হয়ত, উহাদের মধ্যে কেহ কেহ ভূর্লোকে কিছু কিছু বিশেষ ধর্ম্মোপার্জ্জন করিয়াছে, সুতরাং তাহারা এই প্রদেশে অবস্থানের পর স্বর্গলোকে যাইয়া তাহাদের পুণ্যের ফলভোগ করিবে।

যাহাহউক, তুমি ঐ দূর প্রদেশে যে সকল মনুষ্য দেখিতেছ, যেস্থানে তোমাকে লইয়া যাইতে ইচ্ছা করি না, উহারা আত্ম-হত্যাকারী পরহত্যা-কারী, বা পরদ্বারা হত। উহাদের অবস্থা যাহারা স্বাভাবিক রোগে বা বৃদ্ধাবস্থায় মৃত্যুর পর এস্থানে আসিয়াছে তাহাদের অপেক্ষা বিভিন্ন। উহাদের ভূর্লোকীয় কামনা সকল অপক্ক ফলের ন্যায় পরিপক্ক না হওয়ায় উহাদের আপন সুকর্ম্ম ফল থাকিলেও, কিছু দীর্ঘ কাল এই প্রদেশে থাকিতে হইবে। তন্মধ্যে যাহারা পরহত্যাকারী তাহারা ভূত, প্রেত, পিশাচ প্রভৃতি রূপ ধারণ করিয়া বহুকাল এ প্রদেশে বাস করিবে। এবং মধ্যে মধ্যে ভূর্লোকে মদ্যালয়, কসাইখানা, বেশ্যালয় প্রভৃতি স্থানে যাইয়া উৎপাত করিবে। অর্থাৎ তাহাদের মনের মত স্ত্রী ও পুরুষদিগকে নানাবিধ কুকর্ম্মে রত করিবার চেষ্টা করিবে। বিশুদ্ধাত্মা ধার্ম্মিক লোক দিগের তাহারা কিছুই করিতে পারে না। যাহারা পাপকার্য্যের সহায়তা করিয়া থাকে, তাহাদিগের নিকটেই এইরূপ পিশাচেরা গমন করিয়া থাকে।

যাহা হউক, এখানে আর অধিক কাল থাকিবার প্রয়োজন নাই। চল, আমরা দ্বিতীয় প্রদেশে গমন করি। তৎক্ষণাৎ মুহূর্ত্ত মধ্যে দ্বিতীয়

প্রদেশে উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম, এখানে অনেকগুলি ভদ্রলোক বাস করিতেছেন। গুরুদেব কহিলেন ইহারা সাধারণ লোক। ভূর্লোকে বাসকালীন ইহাদের কামনা ও চিন্তা কেবল সাংসারিক বিষয়ে লিপ্ত ছিল সুতরাং এখানেও ইহারা ভূর্লোকে যে সকল লোক ও স্থানের সহিত বিশিষ্ট ঘনিষ্ঠতা সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছিল, এখানেও সেই সকল স্থান ও লোকের সহিত বিচরণ করিয়া থাকে। তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম বিভাগের লোক সকলের অবস্থাও প্রায় এইরূপই। তবে তাহারা প্রায়ই আপনাপন চিন্তাতেই গাঢ়তর রূপে নিমগ্ন থাকে এবং ক্রমে ক্রমে তাহাদের মনকে পার্থিব বিষয় হইতে অপসৃত করিয়া তাহাদের প্রিয়তম চিন্তাতেই বিলীন হইয়া থাকে।"

আমরা ক্রমশঃ ষষ্ঠ প্রদেশে উপস্থিত হইলাম, দেখিলাম এখানে অনেকগুলি স্বার্থপর ধার্ম্মিক লোক বাস করিতেছেন। দেখিলাম, কেহ কেহ আপনার স্বকপোল-কল্পিত রাজধানী, বিদ্যালয়, ধর্ম্মালয় প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া তাঁহাদের ভূর্লোকে যে সকল কামনা পরিতৃপ্ত হয় নাই, সেই সকল কামনা ভোগ করিতেছেন এবং স্বার্থ-পরতা বশতঃ কখন চীৎকার, কখন উন্মাদের ন্যায় বিচরণ করিয়া অপর সকলকে আপনাদের মতের পোষকতা করিবার জন্য অনু-মোদন করিতেছেন, এবং যাহারা তাঁহাদের মতের বিরুদ্ধাচারী তাহা-দিগকে উচ্চৈঃস্বরে নিন্দাবাদ করিতেছেন। যাঁহারা ভূর্লোকে অধি-কাংশ জীবন বুদ্ধিজীবীর ব্যবসা অবলম্বন করিয়া নানা প্রকার বিদ্যার উন্নতি সাধন করিয়া, তদ্দ্বারা সাধারণ লোকের উপকার হউক বা না হউক, নিজের নাম, যশ ও প্রতিষ্ঠা লাভের জন্য, অতিবাহিত করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেককেই এই স্থানে দেখিতে পাই-লাম। গুরুদেব কহিলেন ইহারা দীর্ঘকাল এপ্রদেশে বাস করিয়া তাহাদের নিজের বুদ্ধি পরিমার্জ্জিত করিয়া সুখভোগ করিবে, যেহেতু এ প্রদেশে ক্লান্তি নাই, কিন্তু অপরের কোন উপকার সাধন করিতে পারিবে না এবং তদ্দ্বারা আপনাদের স্বর্লোকের পথও পরিষ্কার করিতে পারিবে না।

যাহা হউক, আমরা ক্রমশঃ সপ্তম প্রদেশে উপস্থিত হইলাম, প্রথমতঃ দেখিলাম এখানে অনেকগুলি বিশুদ্ধাত্মা ভদ্রলোক বাস করিতেছেন গুরুদেব কহিলেন, ইহারা ভূর্লোকে পার্থিব কামনা সকল জয় করিয়া ইহাদের ইচ্ছাশক্তি উচ্চ পথে নীত করিয়াছেন, সুতরাং ইঁহাদের নীচ কামনা শক্তি অনেক পরিমাণে হ্রাস হইয়াছে, অতএব ইঁহাদিগকে অতি অল্প সময়ের জন্য মাত্র এই প্রদেশে বাস করিতে হইবে। ঐ দেখ অনেকেই এখানে নিদ্রিত অবস্থায় আছেন, এবং কেহ কেহ সামান্য স্বপ্নাবস্থায় কিছুকাল অতিবাহিত করিয়া পরে নিদ্রিত হইবেন এবং অতি অল্প সময় মধ্যে কামদেহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বর্গলোকে গমন করিবেন। যাহাহউক, তৎপরক্ষণেই কতকগুলি দীপ্তিমান প্রশান্ত মূর্ত্তিবিশিষ্ট যুবক দর্শন করিলাম গুরুদেব কহিলেন, বৎস! ইঁহারা বড় বড় মহাত্মা দিগের শিষ্য। ইঁহারা স্বর্গলোকে যাইয়া ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত দর্শন করিতে পারেন কিন্তু সেরূপ ইচ্ছা করেন না। ভূর্লোকে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক সাধারণ লোকের উপকারার্থ জীবন যাপিত করিবার জন্য ততদিন এপ্রদেশে থাকিবেন, যতদিন ইহাদের গুরুদেবেরা ইহাদের অভিপ্রায় অনুরূপ কামদেহের সৃষ্টির বন্দোবস্ত করিয়া না দিবেন। ইহারা এই সপ্ত প্রদেশের যেখানে ইচ্ছা সেইখানেই বিচরণ করিতে পারেন।

আমরা এইস্থানে একটু বিশ্রাম করিতেছি, এমন সময় দেখিলাম কতকগুলি মনুষ্যাকৃতি কিন্তু অবয়বে কিঞ্চিৎ খর্ব্ব জীব শূন্যমার্গে উড্ডীয়মান হইয়া যাইতেছে। গুরুদেবকে জিজ্ঞাসা করিলাম "পিতঃ ইহারা কে?" তিনি বলিলেন "বৎস! ইহারা জীন, পরী ইত্যাদি নামে বিখ্যাত। ইহারা কামলোকের অন্যান্য বাসেন্দার ন্যায় ইচ্ছানুসারে সকল প্রকার আকৃতি ধারণ করিতে পারেন। ইঁহাদের মধ্যে অনেক প্রকার জাতি আছে, যাহাদের জ্ঞান ও স্বভাব মনুষ্যজাতির ন্যায় বিভিন্ন। ইঁহাদের মধ্যে অনেকেই মনুষ্য জাতির সহিত মিশিতে ইচ্ছা করেন না। (ক্রমশঃ)

শ্রীদুর্গাচরণ চক্রবর্ত্তী রায় সাহেব।

অলৌকিক রহস্য।

৪র্থ সংখ্যা] দ্বিতীয় ভাগ। [শ্রাবণ—১৩১৭।

স্বপ্ন-তত্ত্ব।

পূর্ব্বভাস।

(১)

প্রতীচ্য বিজ্ঞানে গর্ব্বদীপ্ত বিদ্বন্মণ্ডলী, পূর্ব্বে স্বপ্ন অলীক বলিয়া মনে করিতেন। কিন্তু, এখন এ ধারণা ক্রমে ক্রমে তিরোহিত হইতেছে। জড়বাদী বৈজ্ঞানিকেরা মনে করেন, নির্জীব পরমাণুর সমষ্টিতে কোষাণু, এবং অনন্ত কোষাণুর সম্মিলনে জীবদেহ ও প্রাণধর্ম্ম-সমন্বিত জীবের উৎপত্তি হয়। তাঁহাদিগের মতে,—প্রাণহীন জড়ভূতের সমন্বয়ের পরিণামই চৈতন্যাধিষ্ঠিত মানব জীব। তাঁহারা আত্মার পৃথক অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। অতএব তাঁহাদিগের মতে সূক্ষ্মদেহ ও সূক্ষ্মলোকের অস্তিত্ব অনুমান, আবশ্যক হয় না।

প্রেত-তত্ত্ববাদিগণের মত কিন্তু, অন্যরূপ। তাঁহারা মানব-আত্মার পৃথকসত্তা স্বীকার করেন। তাঁহারা বলেন, মানব যুগপৎ দুই লোকে কার্য্য করেন,—এই স্থূল পৃথিবী ও আত্মার লীলাস্থল সূক্ষ্মলোক। * (ক)

(ক) I have assumed that man is an organism informed or possessed by a soul. This view obviously involves the hypothesis that we are living a life in two worlds at once ; a planetary life in this world, to which the organism is intended to react ; and also a Cosmic life in that spiritual or metetherial world, which is the native

তাঁহাদিগের মতে, জাগ্রৎকালে স্থূলচৈতন্য ক্রিয়ার আধিক্য হেতু, আত্ম-চৈতন্য-লীলা বুঝা যায় না ; তাহা স্থূলচৈতন্যের দুর্দ্দমনীয় বিলাসোদ্দামে নিমজ্জিত ও লয়-প্রাপ্ত হয় ; কিন্তু, নিদ্রাগমনের সঙ্গে সঙ্গেই যেমন স্থূলচৈতন্যের ক্রিয়া মন্দীভূত হইতে থাকে, আত্মচৈতন্যও তাহার অভিভূত অবস্থা হইতে ধীরে ধীরে জাগ্রত হইতে থাকে। এই ভাবটী একটী উপমার সাহায্যে বেশ হৃদয়ঙ্গম হইবে ; দিবাকালে, প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডের প্রখর কিরণজালে যেইরূপ তারকার ক্ষীণালোক অভিভূত থাকে, আমরা তাহার অস্তিত্ব বুঝিতে পারিনা, আবার সূর্য্যাস্ত গমনের সঙ্গে সঙ্গেই যেমন একটী একটী করিয়া তারকা ফুটিতে থাকে, আত্মচৈতন্যের বিষয়ও তদ্রূপ।

এই ত হইল প্রেততত্ত্ববাদীদিগের "আত্মা" ও "স্বপ্ন চৈতন্য" বিষয়ক অনুমান। এখন দেখা যাউক কতদূর এই নব-বিজ্ঞান জড়বাদী প্রতীচ্য জ্ঞানকে রঞ্জিত করিতেছে।—প্রেততত্ত্ববাদিগণের অধিকাংশই পাশ্চাত্য ভূমির বিশিষ্ট বিজ্ঞানবিৎ এবং কেহ কেহ বৈজ্ঞানিক সম্প্রদায়ের শীর্ষস্থানীয় ও আচার্য্য। তাই তাঁহাদিগের অভিমত ও অনুমান অবহেলনীয় হইতে

---

element of the soul. From that unseen world the energy of the organism needs to be perpetually replenished. That replenishment we cannot understand ; we may figure it to ourselves as a protoplasmic process ;—as some relation between protaplasm,ether and whatever is beyond ether, on which it is at present useless to speculate. * * * * * * The soul has withdrawn from the specialized material surface of things (to use such poor metaphor as we can) into a realm where the nature of the connection between matter and spirit—whether through the intermediacy of the ether or otherwise—is more profoundly discerned. That same withdrawl from the surface which, while diminishes power over complex muscular processes, increases power over profound organic processes, may at the sametime increase the soul's power of operating in *that spiritual world to which sleep has drawn it nearer.*—Meyer's Human Personality.]

পারে না। তাই ইংলণ্ডের শ্রেষ্ঠ জ্ঞান-ভাণ্ডার "এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা" (Encyclopœdia Britannica) গ্রন্থে স্বপ্ন-তত্ত্ব সম্বন্ধীয় আলোচনায়, লেখক লিখিয়াছেন যে,—"একদিকে বিশ্বাস-প্রবণ প্রেত-তত্ত্ববাদী, অপরদিকে সন্দিগ্ধ জড়বাদী, এতদুভয়ের মধ্যে প্রকৃত বৈজ্ঞানিক দণ্ডায়মান। তাঁহারা বলেন যে, দৈহিক কার্য্যকলাপ ও মানসিক ক্রিয়া এই দুইটী বিভিন্ন জাতীয়; অথচ এতদুভয় এরূপ সম্বন্ধযুক্ত যে দৈহিক ক্রিয়াকলাপ মানসিক ক্রিয়ারই বিকার বিশেষ বলিয়া মনে হয়।" * (ক)

সাধক জর্ম্মন দার্শনিক সুইডানবর্গের (Swedenborg) স্বপ্ন সম্বন্ধীয় অভিমত প্রায় প্রাচ্য দার্শনিক ও সূক্ষ্মদর্শীদিগের মত ছিল। তিনি এক স্থানে বলিয়া গিয়াছেন,—"স্বপ্ন চারি প্রকার,—তাহা ভবিষ্যভাবপণাত্মক, উপদেশাত্মক, গূঢ়ার্থ-প্রকাশক বা অলীক দেহাদির বিকৃত অবস্থা হইতে উদ্ভূত।" * (খ)

তিনি আর এক স্থানে বলিয়াছেন,—'দিবা-স্বপ্ন, নিশা-স্বপ্ন এবং স্বপ্নান্তর্গত স্বপ্ন বা স্বপ্নে স্বপ্নদর্শন। আমি সকল প্রকার স্বপ্ন দেখিয়াছি। জ্ঞানহীন লোক ভাবে, মানব দিবসে যে সমস্ত কার্য্যে লিপ্ত থাকে, তাহার ফলেই স্বপ্ন দেখে। আমি এইরূপ স্বপ্নের গুরুত্ব দর্শন করি না। স্বপ্ন দুই প্রকারের,—সুস্বপ্ন ও দুঃস্বপ্ন। কোন কোন স্বপ্ন, ভাবী বিপদ হইতে আমাদিগকে পূর্ব্বাহ্নে সাবধান করিয়া দেয় বা কোন একটা

(ক) Midway between the spiritualist and materialist hypothesis is the scientific view in its narrower sense, namely, the doctrine that the mental and the bodily are perfect dessimilar regious of phenomena, which are yet connected in such a way that bodily events appear as conditions of mental events.—Encyclopœdia Britannica.]

(খ) Dreams are either prophetic, or instructive, or signifi- cative, or fantastic.—Swedenborg.

ভবিষ্য ঘটনা পূর্ব্বে জ্ঞাপন করে, কোন কোন স্বপ্ন আমাদিগের কৃতকর্ম্মের ফলস্বরূপ, আমাদিগের শাস্তি বা যন্ত্রণা দেয় '......" * (ক)

তিনি আরও বলিয়াছেন,—"স্বপ্ন ভবিষ্যদ্দৃষ্টি সূচনা করে; এই ভবিষ্যদ্দৃষ্টি হইতে ভবিষ্যদ্বাণী ও ভবিষ্যদ্বাণী হইতে যে সমস্ত ঘটনা পূর্ব্বে সূচিত হয় সেই সমস্ত ঘটনার আবির্ভাব হয়।" * (খ)

স্বপ্ন যে ভবিষ্যভাষণাত্মক, এ কথা পাশ্চাত্য শ্রেষ্ঠ কবিরাও বিশ্বাস করিতেন। * (গ)

এইবার আমরা স্বপ্ন সম্বন্ধীয় প্রাচ্য মত আলোচনা করিব। অতি প্রাচীন ঋষিরা স্বপ্নতত্ত্বের আলোচনা করিয়াছেন। সামবেদের কাথ শাখায়, কোন স্বপ্নে কি পুণ্য, কোন স্বপ্নে কি শুভফল হয় এই বিষয়ের বিশেষ বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে আছে, নন্দ

(ক) Day-dreams, night-dreams, and double-dreams. I have dreamt all kinds of dreams. The ignorants have this seen, that dreams have their root in thoughts and toils of day and in big suppers. Of this I make no account. Dreams are ill and good. Some warn or foretell, others reward or punish. Some cast us into wanhope and abyssal darkness, other left us into hope and heavenly light. He rken, O reader, to all kinds of dreams. Hearken to sighs from the deep !

(খ) A dream denotes foresight, and from foresight prediction and from prediction the event itself predicated.—Swedenborg.

—(গ) Jessica, my girl
Look to my house. I am right loa th to go ;
There is some ill abrewing towards my rest,
For I did dream of money-bags to-ntght.—Shakespeare.
(Such night till this I never passed) I this night have dreamed,
If dreamed, not, as I oft am wont, of the,
Works of day passed, or of morrow's next design,
But of offence and trouble which may mind
Knew never till this irksome night.—Milton.

শ্রীভগবানকে সুস্বপ্ন ও দুঃস্বপ্নের প্রকার ও ভেদ জিজ্ঞাসা করিতেছেন এবং ভগবান তাঁহার প্রশ্নের সুন্দর মীমাংসা করিয়া দিতেছেন। * (ক) ভক্তাগ্রগণ্য অক্রূরের সুস্বপ্ন দৃষ্টির কথা পুরাণ-পাঠকেরা সকলেই বিদিত আছেন। কি উপায়ে দুঃস্বপ্নের শান্তি করিতে হয়, তাহাও শাস্ত্রে * (খ) কথিত আছে। যেমন অক্রূর-দৃষ্ট স্বপ্ন সুখদায়ক, সেইরূপ আবার কংসের স্বপ্ন বীভৎস। সেইরূপ কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন-দৃষ্ট ও পরশুরাম-দৃষ্ট দুঃস্বপ্নের কথা পুরাণে কথিত আছে। * (গ) অপর পুরাণেও স্বপ্ন বৃত্তান্ত আছে,—ঘোরাসুরদৃষ্ট, দুঃস্বপ্ন, দেবীপুরাণের ২২ অধ্যায়ে, কালিকাপুরাণে পুষ্যাভিষেকে, ৮৭ অধ্যায়ে, মৎস্যপুরাণে যাত্রানিমিত্ত স্বপ্নাধ্যায় কথন, ৮৭ অঃ। স্বপ্নের কথা হিন্দুর রামায়ণে আছে, হিন্দুর মহাভারতে আছে। প্রকারভেদে স্বপ্ন যে সুখ ও দুঃখদায়ক এ কথা হিন্দু চিরকালই বিশ্বাস করিয়া আসিতেছে।

বৌদ্ধেরাও হিন্দুদিগের মত স্বপ্ন বিশ্বাস করেন। দ্বিতীয় অধ্যায়ে নাগসেন মিলিন্দা সংবাদে এই কথা দেখান হইয়াছে। ইহা প্রাচ্য ধর্ম্ম গ্রন্থ (Secred Book of the East) পুস্তকের মিলিন্দার প্রশ্নাবলি অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

(ক) [ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ, শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ড, ৭৭ অঃ, ৮২ অঃ]
(খ) ঐ ৮২ অঃ]
(গ) ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ, গণেশখণ্ড ৩৩ ও ৩৪ অধ্যায়]

সিলিন্দা নাগসেন সংবাদ।

(২)

ভক্তিভাজন নাগসেন, এ জগতে নরনারী নানা প্রকারের স্বপ্ন দেখিয়া থাকে ; তাহা কখনও সুখকর কখনও অসুখকর, কখনও শান্তি-জনক, কখনও বা ভয়ঙ্কর, কখনও দৃষ্টপূর্ব্ব বস্তুর বা কৃতপূর্ব্ব কর্ম্মের বিষয়-সম্বন্ধী, কখনও বা অদৃষ্টপূর্ব্ব বস্তুর বা অকৃতপূর্ব্ব কর্ম্মের বিষয়সম্বন্ধী, কখনও নিকটবর্ত্তী, কখনও দূরবর্ত্তী পদার্থসূচক, এবং সর্ব্বদা নানা আকৃতি ও বর্ণ বিশিষ্ট। মনুষ্য যাহাকে স্বপ্ন বলে তাহা কি এবং যিনি স্বপ্ন দেখেন তিনিই বা কে ?

মহারাজ, স্বপ্ন মনোমধ্যে আবির্ভূত সঙ্কেত বিশেষ মাত্র। ছয় প্রকার কারণে মনুষ্যের স্বপ্ন দর্শন ঘটিয়া থাকে। যে স্বপ্ন বায়ু-প্রধান, পিত্ত-প্রধান বা শ্লেষ্মা-প্রধান ধাতুবিশিষ্ট ব্যক্তিগণ দেখিয়া থাকেন, যাহা সৎ-শক্তির প্রভাবে কিম্বা ব্যক্তিগত পূর্ব্বাভ্যাসের প্রভাবে দৃষ্ট হয় এবং যাহা ভাবী ঘটনাসূচক। ইহাদের মধ্যে, শেষোক্ত প্রকারের স্বপ্নই প্রকৃত, অপরগুলি মিথ্যা।—

বরেণ্য নাগসেন, মনুষ্য কি প্রকারে ভাবী ঘটনা-সূচক স্বপ্ন দেখে ? ভাবি লক্ষণগুলি কি মানব পূর্ব্বে নিজে নিজে চিন্তা করে, কিম্বা তাহারা আপনারাই তাহার মনে উদিত হয়, অথবা অন্য কেহ আসিয়া ইহাদের বিষয় তাহাকে বলিয়া যায় ?

তাহার নিজের অন্তঃকরণ পূর্ব্বলক্ষণগুলি অন্বেষণ করে না, এবং বাহির হইতে কেহ আসিয়া তাহাকে ইহাদের বিষয় বলে না। তাহারা আপনারাই তাহার মনে উদিত হয়। দর্পণ প্রতিবিম্ব ধারণ করিবার জন্য পদার্থের অন্বেষণ করে না কিম্বা পশ্চাদ্বর্ত্তী পদার্থের প্রতিবিম্ব গ্রহণ

করেনা। তাহাতে প্রতিবিম্বিত বস্তু তাহার প্রতিফলিত করিবার শক্তির অন্তর্গত স্থানে অর্থাৎ সম্মুখেই অবস্থান করে। স্বপ্ন সম্বন্ধে মানব-মনের কার্য্যও তদ্রূপ জানিবেন।

বরেণ্য নাগসেন, যে ব্যক্তি স্বপ্ন দর্শন করে সে কি আপন মনে বুঝিতে পারে 'এই শুভ বা অশুভ ঘটনা ঘটিবে ?'

না, মহারাজ ! সে ব্যক্তি ইহার বিষয় অন্য লোকের গোচর করে, এবং তাহারাই ইহার অর্থ ব্যাখ্যা করিয়া দেয়।

নাগসেন—তাহা কি প্রকার ?

মহারাজ, তিল, আঁচিল বা ব্রণাদি স্ফোটক শরীরে নির্গত হইলে মানুষ কি বুঝিতে পারে যে তাহারা তাহার শুভ বা অশুভ, খ্যাতি বা অখ্যাতি, প্রশংসা বা নিন্দা, সম্পদ্ বা বিপদের সূচনা করিতেছে ?

না মহাত্মন্ ! তাহাদের নির্গমের স্থান পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দৈবজ্ঞেরা বলিয়া থাকেন, "ইহার ফলে এই ঘটিবে।"

সেইরূপ, যে ব্যক্তি স্বপ্ন দেখেন তিনি সকল সময়ে বুঝিতে পারেন না যে ইহার ফলে ভাল বা মন্দ কি ঘটিবে। তিনি স্বপ্নের কথা অপরকে বলিলে তাহারাই ইহার অর্থ ব্যাখ্যা করে।

মহাত্মন্ নাগসেন, মানুষ কখন্ স্বপ্ন দেখে ? নিদ্রিত বা জাগরিত অবস্থায় ?

না নিদ্রিত, না জাগরিত অবস্থায়। মহারাজ, যখন নিদ্রা লঘু হইয়া আসিয়াছে এবং মানব সম্পূর্ণরূপে সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয় নাই, তখনই স্বপ্ন দর্শন হয়। সুষুপ্ত অবস্থায় মানব-মন ভবাঙ্গে পুনঃ প্রবেশ করে; এইরূপে লয়প্রাপ্ত হইলে ইহা কোনও কার্য্য করেনা এবং তখন তাহার ভাল বা মন্দ কিছুই থাকেনা—সুতরাং তখন স্বপ্ন দেখা যায় না। মন যখন কার্য্যক্ষম তখনই স্বপ্ন দর্শন হয়। মহারাজ, যেমন আলোক-বিহীন অন্ধকারে সুসংস্কৃত স্বচ্ছ দর্পণেও কোন প্রতিবিম্ব দেখা যায় না, সেইরূপ

মন সুষুপ্তিকালে আপনার মধ্যে ফিরিয়া আসিলে লয়প্রাপ্ত হইয়া তাহার বাহিরে কার্য্য করিবার ক্ষমতা হারায় সুতরাং তাহার আর শুভাশুভ থাকে না এবং কাজেই সে অবস্থায় স্বপ্ন দর্শন হয় না। কারণ মন যখন কার্য্য করে তখনই লোকে স্বপ্ন দেখিয়া থাকে। মহারাজ, শরীরকে দর্পণের, সুষুপ্তিকে অন্ধকারের এবং মনকে আলোকের তুল্য ভাবিবেন। অথবা যেমন কুজ্‌ঝটিকার আবরণে সূর্য্যের প্রভা বিকাশ পায় না, সূর্য্য-কিরণ বর্ত্তমান থাকিলেও তাহা ভেদ করিতে অক্ষম, এবং গৌরকর কার্য্য না করিলে আলোকের উৎপত্তি হয় না, সেইরূপ সুষুপ্তিকালে মন আপনার মধ্যে ফিরিয়া আসিলে আবদ্ধ হইয়া কার্য্য করিবার ক্ষমতা হারায়, সুতরাং শুভ বা অশুভ জানিতে পারেনা, কাজেই সে অবস্থায় স্বপ্ন দর্শন হয় না। মহারাজ, শরীরকে সূর্য্যের তুল্য, সুষুপ্তিকে কুজ্‌ঝটিকার আবরণের তুল্য ও মনকে সূর্য্য-কিরণের তুল্য ভাবিবেন!

মহারাজ, শরীরান্তর্গত হইলেও মন দুই অবস্থায় কার্য্য করে না— সুষুপ্তিকালে এবং মোহাবিষ্ট অবস্থায়। জাগরণ-কালে মানব-মন, উত্তেজিত, উন্মুক্ত, পরিষ্কৃত ও অনাবদ্ধ থাকে এবং এ অবস্থায় ভাবী-ঘটনাসূচক নিমিত্ত দেখা যায় না। যেমন আত্মগোপনেচ্ছু ব্যক্তি সরল, অকপট, কার্য্যশূন্য বা অসংযতবাক্ ব্যক্তিকে পরিত্যাগ করে, সেইরূপ ঐশিক ইচ্ছা জাগ্রত ব্যক্তির নিকট বিকাশ পায় না, সুতরাং জাগ্রত ব্যক্তি স্বপ্ন দেখে না। যাহাদের জীবনোপায় বা চরিত্র নিন্দনীয়, যাহারা পাপিদিগের মিত্র, দুষ্ট, অশিষ্ট বা আগ্রহবিহীন তাহারা যেমন জ্ঞানো-পার্জ্জনের উপোযোগী গুণবিহীন হয়, সেইরূপ জাগ্রত ব্যক্তির নিকট ঐশী ইচ্ছা বিকশিত হয় না, সুতরাং জাগ্রত ব্যক্তি স্বপ্ন দেখে না। শ্রদ্ধেয় নাগসেন, নিদ্রার কি আদি, অন্ত বা মধ্য আছে?

হাঁ মহারাজ।

তবে কোথায় আদি, কোথায় মধ্য ও কোথায় অন্ত!

মহারাজ, শরীরের ক্লান্তি ও অসামর্থ্য, দৌর্ব্বল্য, শৈথিল্য ও জড়তার ভাব নিদ্রার আদি; লঘু 'কপি-নিদ্রা'—যে অবস্থা পর্য্যন্ত মানব তাহার বিক্ষিপ্ত চিন্তাগুলিকে রক্ষা করে, তাহাই নিদ্রার মধ্য; এবং মন যখন আপনার মধ্যে প্রবেশ করে, তাহাই নিদ্রার শেষ। মহারাজ, এই মধ্যাবস্থার কপি নিদ্রাতেই—মানুষে স্বপ্ন দেখিয়া থাকে। যেমন সংযত-চিত্ত চিন্তাশীল অটল-বিশ্বাসশালী, গভীর প্রজ্ঞাবান্ ব্যক্তি বিবাদের কোলাহল হইতে দূরে বনে প্রবেশ করিয়া সূক্ষ্ম বিষয়ের চিন্তায় নিমগ্ন হয় এবং স্থির ও শান্ত অন্তঃকরণে তাহাকে আয়ত্তীভূত করিয়া লয়; সেইরূপ সতর্ক মানব, নিদ্রার সম্পূর্ণ বশীভূত না হইয়া, কেবল মাত্র কপি-নিদ্রায় তন্দ্রাগ্রস্ত হইয়া স্বপ্ন দেখে। মহারাজ, সতর্কাবস্থাকে বিবাদের কোলাহলের সহিত এবং কপি-নিদ্রাকে নির্জ্জন কাননের সমান মনে করিবেন। এবং সেই মনুষ্য যেমন বিবাদের কোলাহলকে দূরে রাখিয়া, বিনিদ্র থাকিয়া, মধ্যাবস্থায় থাকিয়া গূঢ় বিষয়ের মর্ম্মার্থ অবগত হয়, সেইরূপ সতর্ক ব্যক্তি সম্পূর্ণ নিদ্রিত না হইয়া, কপি-নিদ্রায় তন্দ্রাগ্রস্ত হইয়া স্বপ্ন দেখে।

উত্তম, নাগসেন! ইহা এইরূপ এবং আপনার বাক্য আমি শিরোধার্য্য করিলাম।

(ক্রমশঃ)

শ্রীকিশোরীমোহন চট্টোপাধ্যায়।

ভূতের মনুষ্যোচিত আহার।

ভগবানের লীলা-বৈচিত্র্য হৃদয়ঙ্গম করে কাহার সাধ্য। যে কালের অঙ্গুলী হেলনে এই পরিদৃশ্যমান বিশ্বসংসার পরিচালিত হইতেছে, সে কালও সর্ব্বশক্তিমান বিশ্বনিয়ন্তার নয়নঠারে কার্য্য-পরিসমাপ্তি-করণে যত্নবান। যে মানবগণের চিরপূজিত নাকবাসী নির্জ্জরগণ শক্র ভিন্ন অপর কাহারও নিকট পদানত হইয়া চিরানুগ্রহ-প্রার্থী নহে, তাঁহারাও সর্ব্বনিয়ন্তার করকবলিত সন্দেহ নাই। মানবগণের অকিঞ্চিৎকর কার্য্য ত ধর্ত্তব্যের মধ্যে গণ্য হইতে পারে না। ইঁহাদের স্থান ত বহু নিম্নে। ভূতযোনিও মনুষ্যযোনি অপেক্ষা বহু অংশে শ্রেষ্ঠ। যোনিভেদে কার্য্যের শ্রেষ্ঠাশ্রেষ্ঠের তারতম্য লক্ষিত হয়। অতএব প্রেতগণ মানবাপেক্ষা অনেকাংশে শক্তিশালী, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। ইহাও ব্রহ্মাণ্ডপতির লীলা। তাই বলিতেছিলাম ঐশী লীলা বৈচিত্র্যময়। অদ্য আমরা পাঠক-পাঠিকাগণ-সকাশে মানবশক্তির অতীত একটি রহস্যমূলক সত্যঘটনাপূর্ণ তথ্যের অবতারণা করিব। নিম্নে ঘটনাটি যথাযথ প্রকটিত করিলাম।

সে আজ চারিবৎসরের কথা। সান্ধ্যসমীরণ মল্লিকা-ব্রততী প্রকম্পন করতঃ ধীরে ধীরে প্রবাহিত হইতেছে। গ্রীষ্মার্ত্তি-শয্যে লোকে ঘটী ঘটী জলখাইয়াও সোয়াস্তি পাইতেছে না। বৈশাখ মাসের প্রথম। লোকে রাত্রি কালেও মশাছারপোকার তাড়নায় তিষ্ঠিতে পারিতেছে না। ১৩১৩ সালের ২৮শে এপ্রিল শনিবার মদনমোহনবাবু শয্যায় পড়িয়া এ পাশ ও পাশ করিতেছেন ইত্যবসরে শেষরাত্রে হঠাৎ প্রয়াগ হইতে মদনমোহনবাবুর নিকট এক টেলিগ্রাম আসিল তাহাতে লেখা আছে, "শ্রীমান্ কৃষ্ণচন্দ্র অত্যন্ত পীড়িত। 'তার' প্রাপ্তি মাত্র

এখানে তোমার উপস্থিতি জরুরী আবশ্যক।” রবিবার বেলা দশ-ঘটিকার মধ্যে আমাকে প্রয়াগে পৌঁছিতেই হইবে এইরূপ স্থির করিয়া সমস্ত রাত্রি অতি উদ্বিগ্নে কোন প্রকারে সময় কাটাইয়াছিলাম। রবিবার মেলে চাপিয়া বেলা দশঘটিকার সময় প্রয়াগে পৌঁছান গেল। যথা সময়ে যুগলকিশোর বাবুর বাসায় যাইয়া কৃষ্ণচন্দ্রকে সঙ্কটাপন্ন পীড়িত দেখিয়া উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িলাম। পীড়ার কারণ জিজ্ঞাসায় জানিতে পারিলাম সে শনিবারের পূর্ব্বদিন অর্থাৎ শুক্রবারে একটি বন্ধুর বিবাহের দ্রব্যাদি ক্রয় করিবার জন্য ‘চকে’ গিয়াছিল। তথা হইতে গৃহে ফিরিয়া আসিয়া সর্দ্দি-গর্ম্মী হয়। পরমুহূর্ত্তেই খুব জ্বর হয়। পরদিন শনিবার জ্বর আরও বৃদ্ধি পাওয়ায় কৃষ্ণচন্দ্র প্রলাপ বকিতে থাকে। ভাগ্যক্রমে তথায় সুবিখ্যাত ডাক্তার ওদেদার উপস্থিত ছিলেন। তিনি অপরাপর ডাক্তারের পরামর্শানুসারে চিকিৎসা করিতে আরম্ভ করেন। কৃষ্ণচন্দ্রের জীবন সঙ্কটাপন্ন হইয়াছে বলিয়াই তিনি এইরূপ ব্যবস্থা করিলেন। ভগবদিচ্ছায় পীড়া ক্রমশঃ নিরাময় হইতে আরম্ভ হইল। পীড়ার বর্দ্ধিতাবস্থায় এরূপ দাঁড়াইয়াছিল যে, পাঁচজন লোকে তাহাকে (কৃষ্ণচন্দ্রকে) ধরিয়া রাখিতে পারা যায় নাই। সোমবার দিন প্রাতঃকালে হঠাৎ অবস্থার পরিবর্ত্তন হইল। তাহাতে স্পষ্ট উপলব্ধি হইল রোগীকে কোন ভূতযোনি আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। ‘ফিট’ বা মূর্চ্ছা ক্ষণে ক্ষণে হইতেছিল। সোমবারের পূর্ব্ব কয়েকদিন ‘ফিট’ হইলেই এক লোটা বরফ-জলেই তাহার মূর্চ্ছাপনোদন হইত। সোমবার সেরূপ চেষ্টায় আর কোন ফলোদয় হইল না। ঘড়া ঘড়া বরফ জলেও আজ তাহার মস্তিষ্ক শীতল হইল না। তখন সকলের ভয় আরও বাড়িয়া উঠিল। যত জল অধিক পরিমাণে তাহার মাথায় ঢালা হইতে লাগিল এবং মুখগহ্বরে জলের প্রক্ষেপ দেওয়া হইতেছিল ততই পীড়া ভয়ঙ্কর হইয়া দাঁড়াইতে লাগিল। রোগী ক্রমশঃ বিবর্ণ হইতে আরম্ভ করিল। কয়েক দিন হইতে

প্রলাপ বকিতে ছিল। আজ আর তাহার সেরূপ ভাব নাই। সে আজ বুদ্ধিমানের মত কথা বলিতে লাগিল। আবার তাহার মূর্চ্ছার পালা আরম্ভ হইল। সে অদ্য পাঁচবার মূর্চ্ছা প্রাপ্ত হইয়াছিল। এই মূর্চ্ছা-ব্যপদেশে যেরূপ যাহা ঘটিয়াছিল এবং কথাবার্ত্তা হইয়াছিল অদ্য আমরা পাঠকগণ সকাশে ক্রমশ তাহার বিবরণ যথাযত বর্ণনা করিব। প্রথম মূর্চ্ছা ৬টার সময় হয়। তখন কৃষ্ণচন্দ্রের মাতা তাহার নিকটে ছিলেন। কৃষ্ণচন্দ্র চক্ষুরুন্মীলন করতঃ তাহার মাতার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া হাস্য করিতে আরম্ভ করিল। তদীয় মাতা তাহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বাছা কৃষ্ণ, তোর অতিমাত্র যন্ত্রণায় আমি মর্ম্মাহত হইয়াছি। কৃষ্ণচন্দ্র অতঃপর চক্ষু নিমীলিতাবস্থায় বলিল, "মা, যদ্যপি তুমি আমার মঙ্গল চাও তবে পাঁচটি টাকা (অঙ্গুলিদ্বারা স্থান নির্দ্দেশ করিয়া) এই ঘরের মেজের বিভিন্নস্থানে রাখিয়া দাও।" জননী তাহাই করিলেন কিন্তু সে কথা ঘুণাক্ষরেও সেই দিন ঘোর সন্ধ্যা না হওয়া পর্য্যন্ত তিনি কাহারও নিকট প্রকাশ করেন নাই। দ্বিতীয় মূর্চ্ছা পূর্ব্বাহ্নে দশঘটিকার সময়। মূর্চ্ছা ক্রমশঃ ভীষণরূপ ধারণ করিল। এই মূর্চ্ছার সময়ে একটি বিচিত্র ঘটনা সংঘটিত হইল। কৃষ্ণচন্দ্রের পূর্ব্বে ইংরাজী সাহিত্যে তত দখল ছিল না এবং সে বেশী তাড়াতাড়িও ইংরাজী কহিতে পারিত না। কিন্তু এখন আর সে 'সেকৃষ্ণ' নাই! এখন সে চোস্ত ইংরাজী অনর্গল বলিয়া যাইতে পারে। সে তাহাই করিল। তাহার মধ্যে অন্য ভাষার নাম গন্ধও নাই। এই ইংরাজী অতি উচ্চধরণের এবং বিশুদ্ধ মাতৃ ভাষার ন্যায় সে অবলীলা ক্রমে বলিতে লাগিল। এমন সুন্দর ভাবপূর্ণ বিশুদ্ধ ইংরাজী শুনিয়া বহুলোক এবং ডাক্তারেরা বিস্মিত হইয়া রহিলেন। উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলী বলিতে লাগিল এমন সুন্দর ইংরাজী তো কখনও শুনি নাই। তাঁহারা সকলেই বুঝিলেন, ইহা দৈবক্রিয়ায় সংঘটিত হইতেছে। এইরূপ কিয়ৎক্ষণ অতিবাহিত হইবার পর রোগী ঈষৎ প্রকৃ-

স্থির হইল। সঙ্গে সঙ্গে প্রলাপ থামিয়া গেল। রোগী বিশ্রাম-সুখ উপভোগ করিতে লাগিল।

অপরাহ্নে যখন ঘড়ীতে টং টং করিয়া দুইটা বাজিয়া গেল তখন তাহার তৃতীয় মূর্চ্ছা আরম্ভ হইল। ইহার প্রকোপও নিতান্ত কম নহে এবং ইহা প্রায় তিন ঘণ্টা ব্যাপিয়া ছিল। রোগী এখন প্রকৃত সৈনিক পুরুষের ন্যায় কথা বার্ত্তা বলিতে আরম্ভ করিল। এই ইংরাজী তত বিশুদ্ধ নহে সুতরাং ব্যাকরণ দোষ ঘটিত। কথাবার্ত্তার মর্ম্ম এইরূপ যথাঃ—

সে যেন কোন সৈনিক কর্ম্মচারী—তাহাকে কোন যুদ্ধে প্রেরণ করা হইয়াছে। সমগ্র সৈন্যপরিচালনার ভার তাহার উপর ন্যস্ত আছে। সে দেখিল যেন শত্রুসৈন্য পুরোভাগে অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। ঐ সৈন্যগণের পশ্চাৎভাগে একটি দুর্গ অবস্থিত। তাহাকে এই বিপুল সৈন্যবাহিনী পরাভূত করিয়া সেই দুর্গ অধিকার করিতে হইবে। সে যেন স্বীয় ক্ষিপ্রকারিতায় শত্রু-সৈন্য বিধ্বস্ত করিয়া দুর্গ জয় করিয়া লইল। অতঃপর সে তত্রদেশস্থ রাজার নিকট গমন করতঃ এক স্বীকার-নামা লিখাইয়া লইল। রাজা দ্বিরুক্তি না করিয়া সকল সম্পত্তি তাহাকে প্রদান পূর্ব্বক দীনভাবে তাহার অধীনে বসবাস করিতে লাগিল। সে যেন এই সংবাদ তারযোগে স্বগৃহে প্রেরণ করিল। এইরূপে তাহার মূর্চ্ছার তৃতীয়াঙ্ক শেষ হইল। আবার কিয়ৎকাল সে মৌনী হইয়া রহিল। সায়াহ্নে ৫ টায় চতুর্থ মূর্চ্ছা আরম্ভ হইল। ইহার স্থায়িত্ব দুই ঘণ্টা মাত্র। এই সময়ে সে যেন তিনটি যুদ্ধে জয়লাভ করিল। তাহার প্রলাপোক্তিতে এইরূপ প্রকাশ।

অতঃপর পঞ্চম মূর্চ্ছার পালা আসিল। তখন সন্ধ্যা প্রায় ৭টা এখন আর কাহারও জানিতে বাকি রহিল না যে রোগীকে 'ভূতে পাইয়াছে।' তখন ভূতের ওঝা আনিবার জন্য চারিদিকে লোক প্রেরিত

হইল। বহু ওঝা আসিল কিন্তু কেহই রোগের প্রতিবিধান করিতে পারিলেন না। অবশেষে একজন সুদক্ষ ওঝা আসিয়া পৌছিল কিন্তু সে রোগী দর্শন করিরা অবাক হইয়া প্রস্থান করিল। জিজ্ঞাসা করিলে, সে বলিল, আমার দ্বারা এই কঠিন পীড়ার চিকিৎসা হইবে না। ষষ্ঠ মূর্চ্ছার বিবরণ অতি বিস্ময়াবহ। ডাক্তার ওদেদারের সঙ্গে প্রেতাশ্রিত কৃষ্ণচন্দ্রের নিম্নলিখিতরূপ বাক্যালাপ হইতেছিল। পাঠকপাঠিকাগণের অবগতির জন্য তাহা যথাযথ প্রদত্ত হইল।

ডাক্তার ওদেদার। তুমি কে ?

কৃষ্ণচন্দ্রাশ্রিত প্রেত। আমি মানুষ।

ডাঃ। তোমার নিবাস কোথায় ?

কৃ প্রেঃ। এই স্থানেই।

ডাঃ। 'এই স্থানে' বলিলে কি বুঝিব ?—ইহার অর্থ কি ?

প্রেঃ। এই ডাকবাঙ্গলায়।

ডাঃ। কোন ঘরে তুমি থাক ?

প্রেঃ। আমি কোন ঘরেই থাকি না।

ডাঃ। তবে যে বলিলে এই ডাকবাঙ্গলায়ই থাকি ? সত্য কথা বল ?

প্রেঃ। এই সম্মুখস্থ বৃক্ষে বাস করি।

ডাঃ। তোমার নাম কি ?

প্রেঃ। তাহা আমি বলিতে পারিব না।

ডাঃ। তুমি সৈন্যের কাপ্তান অথবা সেনাধ্যক্ষ বা তোমার অপর কোন নাম আছে ? ইহার মধ্যে কি কোন নিগূঢ় রহস্য আছে ?

প্রেঃ। রহস্য তেমন কিছু নয়।

ডাঃ। তবে তুমি নাম বলিতে ইতস্ততঃ করিতেছ কেন ? নাম না বলিবার কারণ কি ? তুমি কি বিশেষ অন্যায় কার্য্য দ্বারা নামার্জ্জন করিয়াছ ?

প্রেঃ। যাহাই হউক, আমি নাম বলিতে পারিব না।

ডাঃ। এতগুলি ভদ্রলোকে তোমার নাম শুনিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া আছেন অথচ সকলে তোমার প্রতি ভদ্রোচিত সম্মানে সম্মানিত করিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইতেছেন। অতএব তুমি তোমার নামোল্লেখ নিঃসন্দেহে করিতে পার।

প্রেঃ। আমার নামোল্লেখ না করিবার বিশেষ বলবৎ কারণ আছে।

ডাঃ। আচ্ছা, ভাল, তুমি এই বালককে 'পাইয়া বসিয়াছ' কেন?

প্রেঃ। আমি তাহাকে ভালবাসি বলিয়া।

ডাঃ। এ যে বড় ভালবাসার বিলক্ষণ লক্ষণ দেখিতেছি! রোগী আজ তিন দিন যাবৎ কিছুই খাইতে পারেনা এবং তাহাতে এমত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে যে সে ইচ্ছা পূর্ব্বক দাঁড়াইতে পারে না। কেন তাহাকে এইরূপে বৃথা কষ্ট দিতেছ?

প্রেঃ। আমি তো তাহাকে কোন পকার কষ্ট দিই নাই। আমি কেবল তাহাকে আমার অসীম সাহসিক যুদ্ধের সংবাদ বর্ণন করিয়াছি মাত্র।

ডাঃ। কি করিলে তুমি ইহাকে ছাড়িয়া যাও?

প্রেঃ। আমাকে কিছু খাইতে দিলে।

ডাঃ। তুমি কি খাইতে চাও?

প্রেঃ। আমাকে কয়েকখানা বড় পাঁউরুটি ও কিছু ভেড়ার মাংস দাও (Dairy mutton)

ডাঃ। এত অধিক রাত্রে এরূপ মাংস কোথায় পাইব? বাজারে তো সে মাংস মিলিবে না। বাজারের সাধারণ মাংস হইলে চলিবে না?

প্রেঃ। না।

ডাঃ। তুমি দেখিতেছি নিতান্ত বুদ্ধিহীনের মত কথা বলিতেছ! তুমি অসম্ভব সম্ভব করিতে চাও?

প্রেঃ। আচ্ছা, তবে বাজারের সাধারণ ছাগমাংস হইলেই চলিবে।

ডাঃ। মাংস ও রুটি কি পরিমাণ চাও?

প্রেঃ। ছ'খানা খুব বড় পাঁউরুটী, তত্তুলনায় কিঞ্চিৎ অধিক পরিমাণ ভেড়ার মাংস ও খানিকটা চিনি এবং কিছু মেঠাই।

ডাঃ। এই সমুদায় দ্রব্য তোমার কথিত বৃক্ষের নিম্নে রাখিয়া দিলেই চলিবে তো?

প্রেঃ। সেরূপ করিতে হইবে না। ঐ কূপের মধ্যে একটি পাত্রে করিয়া দ্রব্যগুলি নিক্ষেপ করিলেই চলিবে।

বাচন বলিয়া ভৃত্যটি এই স্থলে বাধা দিয়া বলিল, এই আঙ্গিনায় দুইটি কূপ দেখিতেছেন, ইহার মধ্যে কোন্ কূপের মধ্যে খাদ্য দ্রব্যগুলি ফেলিয়া দিতে হইবে?

প্রেঃ। ভৃত্যগণের বাসস্থানের নিকটে যে কূপ আছে, আমি তাহার কথা বলিতেছি না। ঐ রাস্তার পার্শ্বে যে কূপ দেখিতেছেন, আমি সেই কূপ লক্ষ্য করিয়াই বলিয়াছি। ঐ কূপ মধ্যে দ্রব্যগুলি একটি চুপড়ীতে করিয়া ফেলিয়া দিলেই হইবে।

ডাঃ। সে কূপের জল কি ইহাতে নষ্ট হইয়া যাইবে না? এবং উহাতে মাংসাদি নিক্ষিপ্ত হইলে অনেকের জল পানের ব্যাঘাত করা হইবে। যদি কেহ না জানিয়া ঐ জল পান করে তবে তাহার যে বিশেষ অনিষ্ট হইবে।

প্রেঃ। আমার এই ঘটনা শুনিলে কেহই তথায় সাহস করিয়া ঐ কূপের জল পান করিতে যাইবে না। কাহারও প্রাণে কি ভয় নাই? সুতরাং আপনাদের আর ঐ সকল ভাবনা ভাবিতে হইবে না।

ডাঃ। আচ্ছা, বেশ। তাহা যেন হইল কিন্তু যখন রুটি-মাখন-মাংসাদি * ঐ কূপে নিক্ষিপ্ত হইবে, তখন তাহা যে কূপ মধ্যে পতন মাত্র নষ্ট হইয়া যাইবে?

প্রেঃ। সে নষ্ট হওয়া না হওয়ার ভার তোমাদের উপর নহে। আমি যাহা বলিতেছি তাহাই কার্য্যে পরিণত কর। আমি তাহাতেই পরিতুষ্ট হইব।

ডাঃ। এখন তুমি বালকটিকে ছাড়িয়া যাও।

প্রেঃ। আচ্ছা, তবে এখন বিদায় হই।

ডাঃ। নমস্কার।

ইহার কিয়ৎক্ষণ পরে ডাক্তার বাবু বাসায় চলিয়া গেলেন। দুর্গাপ্রসাদ ও অপরাপর বন্ধুগণ তখনও কৃষ্ণচন্দ্রের নিকট রহিলেন। ভৃত্য বাচন তৎক্ষণাৎ দ্রব্যাদি আনয়ন জন্য বাজারে চলিয়া গেল। উক্ত ভৃত্যটি বাজারে যাইবার সময় বন্ধুগণ বলিয়াছিলেন, ঐ সকল দ্রব্যাদি তো লইয়া আসিবেই এতৎসঙ্গে কিছু মাখন লইয়া আসিও। কারণ মাখন না হইলে রুটি খাওয়া চলে না। ইহা অবশ্য সকলের পক্ষে নহে। কাহাকেও ভাল করিয়া আহার করাইতে হইলে রুটির সঙ্গে মাখন দিতে হয়। আজ্ঞাবহ ভৃত্য বাচন, যে আজ্ঞা, তাহাই হইবে বলিয়া প্রস্থান করিল। দশ মিনিট হইতে না হইতে রোগী আবার মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। যতবার মূর্চ্ছা হইয়াছে ততবারই চক্ষু দুইটি বন্ধ হইয়া গিয়াছে এবং মূর্চ্ছাপনোদন পর্য্যন্ত চক্ষুরুন্মীলন ঘটে নাই। এখনও তাহাই হইল। সে বলিয়া উঠিল—

---

* পূর্ব্বে মাখনের কথা উল্লিখিত হয় নাই, তাহা পাঠকগণের বিস্মিত হইবার কোন কারণ নাই। পাশ্চাত্যদেশে কাহাকেও পাঁউরুটি আহার করিতে দিলে মাখন সেই সঙ্গে প্রদান করিবার রীতি আছে। লেখক।

প্রেঃ। যাহার সঙ্গে আমি এতক্ষণ কথা বলিতে ছিলাম, তিনি কোথায়? আমি তাঁহার নিকট আরও কিছু বলিতে চাই।

একজন বন্ধু তখন বলিলেন, আমি এই স্থানেই আছি। কি বলিতে চাও, বল।

প্রেঃ। তুমি সে ব্যক্তি নও।—তুমিতো দেখিতেছি নিতান্ত নির্ব্বোধ!

ইত্যবসরে অপর একব্যক্তি বলিলেন, তোমার সঙ্গে যিনি কথা বলিতেছিলেন, তিনি চলিয়া গিয়াছেন।

প্রেঃ। এই বালকের পিতা কোথায়? আমি তাঁহার সঙ্গেই কথা বলিব।

পিতা। আমি এই স্থানেই উপস্থিত।

প্রেঃ। আপনি কি এই বালকের পিতা? আপনার নাম কি?

পি। আমার নাম যুগলকিশোর।

প্রে। আমি কয়েকটি কথা বলিতে ভুলিয়া গিয়াছিলাম। সেই জন্য আবার আসিয়াছি।

পি। আচ্ছা, বল, তোমার কি বলিবার আছে?

প্রেঃ। আমি ছ'খানা বড় পাঁউরুটি ও তত্তুলনায় প্রচুর পরিমাণে ভ্যাড়ার মাংস, কিছু চিনি, লবণ, এবং আরও কিয়ৎ পরিমাণে মাখন চাই। এই মাখন ও লবণের কথা বলিতে ভুলিয়া গিয়াছিলাম।

পি। তুমি না চাইলেও অপরাপর দ্রব্যের সঙ্গে মাখন, লবণ প্রাপ্ত হইতে। আমরা পূর্ব্বেই বিবেচনা করিয়া সকল দ্রব্যই আনয়ন জন্য বাজারে লোক প্রেরণ করিয়াছি। যথাসময়ে তুমি সকল দ্রব্যের সঙ্গে মাখন ও লবণ পাইবে, সেজন্য চিন্তা করিও না।

প্রে। ভাল কথা, আমি আপনাকে আরও দুইটি বিষয় বলিতে আসিয়াছি। আপনারা এই স্থানে যতদিন বাস করিবেন ততদিন এই দুইটি নিয়ম লঙ্ঘন করিতে পারিবেন না।

পি। সে দুইটি নিয়ম কি? আমাকে বল।

প্রে। প্রথম নিয়ম এই—কেহ যেন ঐ কূপের নিকট না যায়। দ্বিতীয় নিয়ম—কেহ যেন এই সন্নিকটবর্ত্তী বৃক্ষের নিম্নে প্রস্রাব না করে।

পি। আচ্ছা, তাহাই হইবে। কিন্তু বক্তব্য এই তুমি পুনঃ পুনঃ এই বালকটিকে বৃথা কষ্ট দিতেছ কেন?

প্রে। আমি তো তাহাকে কোনরূপ কষ্ট দেই নাই। আমি কেবল তাহার নিকট যুদ্ধের বিষয় বর্ণনা করিয়াছি। ইহা ভিন্ন আর কিছুই করি নাই।

পি। যদ্যপি তুমি ইহাকে সত্বর ত্যাগ না কর তবে ইহার মৃত্যু নিশ্চয়। বলিতে কি সে বাস্তবিকই কয়েক দিন ধরিয়া উপবাস করিতেছে এবং তজ্জনিত দৌর্ব্বল্য ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে।

প্রে। আচ্ছা, আমি ইহার মস্তিষ্ক বিকৃতি আর করিব না! ইহাই স্থির নিশ্চয়। কিন্তু আমি ইহাকে সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিব না। কেননা আমি ইহাকে প্রাণের সহিত ভালবাসি। আমি ইহার সঙ্গে থাকিলে অত্যন্ত আমোদ উপভোগ করি এবং খুব শান্তিতে থাকি। বিপত্তি সময়ে ইহার সহচররূপে বিচরণ করিব এবং ইহার স্বভাবের রুক্ষভাব পরিবর্ত্তিত করিয়া সৎস্বভাব বিশিষ্ট করিয়া দিব। কারণ সে কিছু উদ্ধত হইয়া পড়িয়াছে। আপনি তাহা অনুভব করিতে পারিতেছেন কি?

পি। সময় সময় সেরূপ বোধ হয়, বটে।

প্রে। এইরূপ কেন হইতেছে, বলিতে পারেন কি?

পি। না, আমি তাহার কারণ কিছুই বুঝিতে পারি নাই।

প্রে। তবে শুনুন। আমি সকল ঘটনা বলিতেছি। এই বালকটি পূর্ব্ব জন্মে আমার সুদক্ষ কমাণ্ডার বা প্রধান সৈন্য পরিচালক ছিল এবং

সেই কার্য্য অতি দক্ষতার সহিত করিয়া আসিয়াছে। গাড়ী ইউরোপে ছিল তাহা বোধ হয় ইংরাজী কথাবার্ত্তাতেই বুঝিতে পারিয়াছেন। কিন্তু পূর্ব্ব জন্মের সৈনিকের তেজ বর্ত্তমান জন্মেও কিঞ্চিৎ পরিমাণে বিদ্যমান রহিয়াছে। * আমি তাহার সে ভাব প্রায় পরিবর্ত্তিত করিয়া আনিয়াছি। যাউক সে সকল কথা। এই গূঢ়রহস্য আপনার নিকট বলিলাম।

পি। তোমার প্রতিজ্ঞানুযায়ী কার্য্য হইবে কি? এক্ষণে আর তুমি ইহাকে বৃথা কষ্ট দিও না।

প্রে। হাঁ, আমি মহাত্মা সলোমানের নাম করিয়া প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, আমি আর কখনই ইহাকে বিরক্ত করিব না। বালকটি কি বিবাহিত?

পি। হাঁ, সম্প্রতি বিবাহ দেওয়া হইয়াছে।

প্রে। ইহার স্ত্রী কোথায়?

পি। তাঁহার পিত্রালয়ে আছেন।

প্রে। যদ্যপি বালকটি অবিবাহিত থাকিত, তবে আমি আর

---

* ইহাতে স্পষ্টই উপলব্ধি হইতেছে পূর্ব্বজন্মে যে ভাব হৃদয়ে পোষণ করতঃ জীব মৃত্যুমুখে পতিত হয় তাহাই পর জন্মে বর্ত্তিয়া থাকে। আমাদের হিন্দুশাস্ত্রে গীতা প্রভৃতি শাস্ত্র গ্রন্থে তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ রহিয়াছে।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—

যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরং।
তং তমেবৈতি কৌন্তেয়। সদা তদ্ভাবভাবিতঃ॥

গীতা, ৮, ৮অঃ।

অর্থাৎ ভগবান বলিলেন, মৃত্যুকালে চিন্তা বিষয়ে এই সাধারণ নিয়ম আছে যে, ম্রিয়মাণ ব্যক্তি অন্তকালে যে কোন ভাব মনে করিয়া দেহত্যাগ করে, হে কৌন্তেয়। সে ব্যক্তি সেই ভাবই প্রাপ্ত হইয়া থাকে অর্থাৎ মৃত্যুকালে যে যাহা চিন্তা করে, মৃত্যুর পরে সে তাহাই হয়।

তাহাকে কোন ক্রমেই পরিত্যাগ করিতাম না। যাহাই ঘটুক না কেন, আমি তাহাকে আমার সহচর করিয়া লইতাম। আর এই স্থানে রাখিতাম না। আমি পূর্ব্বেই বালকটি যে বিবাহিত তাহা জানিতে পারিয়াছিলাম তথাপি সন্দেহ দূর করিবার জন্ত জিজ্ঞাসা করিলাম। যেহেতু তাহার বিবাহ হইয়াছে, আর তাহার আশা করিতে পারি না। আমি তাহাকে পরিত্যাগ করিলাম।

পি। দেখিও, তোমার প্রতিজ্ঞানুযায়ী কার্য্য করিতে ভুলিও না। আর কখনও ইহার স্কন্ধে চাপিয়া পরিবার শুদ্ধ সকলকে উপবাসী এবং উদ্বিগ্ন করিও না।

প্রে। আচ্ছা, তাহাই হইবে। আমি সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হইয়াছি সুতরাং ইহার লঙ্ঘন কোনরূপেই হইবে না। আমাদেরও সত্যাসত্য বিচার আছে, জানিবেন।

পি। তবে ইহাকে এখনও ছাড়িতেছ না কেন? এখন ইহাকে পরিত্যাগ কর।

প্রে। ইহা স্থির জানিবেন আমি কথিতরূপ খাদ্যাদি না পাইলে, ইহাকে পরিত্যাগ করিব না।

পি। বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়, বলিতে হইবে! তোমাকে এত করিয়া বলিয়াও প্রত্যয় করাইতে পারিতেছি না। বাজারে, সেই সকল আনয়ন করিতে ভৃত্য গিয়াছে। আসিলেই দেওয়া হইবে।

প্রে। দেখিবেন, সাবধান, আপনি যাহা প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন তাহার যেন ব্যত্যয় না ঘটে।

পি। কদাপি আমার কথায় অপলাপ করিব না। এখন তুমি ইহাকে পরিত্যাগ কর।

প্রে। আচ্ছা, তবে এক্ষণে বিদায় হই। নমস্কার।

ইহার ২।৩ সেকেণ্ডের মধ্যেই কৃষ্ণচন্দ্র উঠিয়া দাঁড়াইল। সে এখন

অত্যন্ত শান্তি বোধ করিতেছে সে একথাও প্রকাশ করিল। যেন তাহার মস্তক হইতে একটি প্রকাণ্ড বোঝা নামাইয়া লওয়া হইল। সে তাহার পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন করিয়া বলিল, তাহার অত্যন্ত ক্ষুধা বোধ হইতেছে। অনেকেই তাহাকে সামান্য কিছু আহার করিতে বলিল। সে তাহার কিছু প্রত্যুত্তর না করিয়া অপর ঘরে প্রবেশ করিল এবং উদর পূর্ণ করিয়া লুচী ও তরকারী খাইয়া ফেলিল। এই প্রেতাত্মা ছাড়িয়া যাইবার কয়েক মিনিট পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সে অত্যন্ত দৌর্ব্বল্য বোধ করিতেছিল। তাহাকে শৌচ ক্রিয়া করাইবার জন্য কয়েক ব্যক্তিকে ধরিয়া লইয়া যাইতে হইয়াছিল, এক্ষণে সে স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। তাহার আর দুর্ব্বলতার লেশ মাত্র নাই।

(ক্রমশঃ)

শ্রীগণপতি রায়।

অদ্ভুত পরিণয়।

মৃত্যুর পরেও আত্মার জীব-জগতের উপর কেমন একটা তীব্র আসক্তি থাকে এই সত্য ঘটনাটীই তাহার উদাহরণ।

হুগলি জেলায়—গ্রামে পীতাম্বর দাসের নিবাস, পীতাম্বর জাতিতে গোয়ালা বহু কষ্টে চাষ আবাদ করিয়া সে দিন গুজ্‌রাণ করে। ক্ষুদ্র গ্রামের নিভৃত কোণে কৃষক পরিবারের—এক পত্নী ও দুইটী ভ্রাতুষ্পুত্র ছাড়া সংসারে পীতাম্বরের আপনার বলিবার আর কেহ ছিল না। কিন্তু আর কিছু না থাকিলেও তাহার ধর্ম্ম ভয় ছিল, পাপ পুণ্য বিচার ছিল; শত অভাব অভিযোগের মধ্যে থাকিয়া তাহার চরিত্র অটুট রাখিয়া ছিল।

এত পরিশ্রম ও অযত্নের মধ্যেও যেন কেমন একটু সৌন্দর্য্য তাহাতে পরিলক্ষিত হইত, তাই যে তাহাকে দেখিত সেই স্নেহ করিত।

গ্রামের জনৈক ধোপার একটী যুবতী স্ত্রী পীতাম্বরকে দেখিয়া মোহিত হয়। ভালবাসার প্রবলতা যখন বেশী হয় তখন ব্যবধান কমিয়া আইসে, তাই যুবতী মোক্ষদা তাহার আবেগ আর লুকাইয়া রাখিতে পারিল না। এক দিন যখন পীতাম্বর প্রাতে আহার করিয়া লাঙ্গল লইয়া তাহার বাটীর উপর দিয়া যাইতে ছিল তখন সে তাহার কু অভিপ্রায় জানাইয়া দিল, জানাইল—বহুদিন যাবৎ মোক্ষদা তাহার রূপে মুগ্ধ, সে তাহার প্রেমাকাঙ্ক্ষিণী। কিন্তু পীতাম্বর চরিত্রবান পুরুষ, সেই প্রস্তাব ঘৃণার সহিত প্রত্যাখ্যান করিল ও বলিয়া গেল যে, আর যেন এই কথা তাহার শুনিতে না হয়। যদি পুনরায় ইহার আলোচনা হয় তবে তাহার স্বামীকে বলিয়া দিবে এই ভয় দেখাইল।

এ দিকে প্রত্যহ সকালে পীতাম্বর ভূমি চাষ করিতে যাইবার সময় দেখে মোক্ষদা যেন কাহার আগমন প্রতীক্ষায় বসিয়া আছে। যেন পীতাম্বরকে দেখিতে তাহার কত আগ্রহ, কত ঐকান্তিক বাসনা। প্রত্যহই পীতাম্বর তাহাকে এই বিমর্ষ অবস্থায় দেখিতে পাইত। কিন্তু আর কোন দিন মোক্ষদা তাহাকে কিছু বলে নাই। প্রাণের কোনও আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করে নাই কেবল পীতাম্বরকে দেখিয়া একদৃষ্টে চাহিয়া চাহিয়া লজ্জায় ছুটীয়া পলাইয়াছে। পীতাম্বর চলিয়া গেলে মর্ম্মভেদী দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়াছে। এই রূপে প্রায় দুইবৎসর কাটিয়া গেল। এক দিন মোক্ষদার প্রবল জ্বর হইল, দরিদ্রের ঘরে মোক্ষদার চিকিৎসার কোনওই চেষ্টা হইল না। প্রায় মাসাধিক রোগ-যন্ত্রণায় কষ্ট পাইয়া মৃত্যুর পূর্ব্ব মুহূর্ত্তেও অস্ফুট স্বরে পীতাম্বরের নাম উচ্চারণ করিতে করিতে মোক্ষদার প্রাণ বায়ু বাহির হইয়া গেল। এই রোগ যন্ত্রণার মধ্যেও অভাগিনী তাহার প্রিয়কে তাহার আকাঙ্ক্ষিত মূর্ত্তিকে ভুলিতে পারে নাই।

বর্ষাকালে পল্লীগ্রামের খালগুলি জলে পরিপূর্ণ হইয়া থাকে এবং বর্ষার পরে ক্রমে যখন জল কমিয়া সামান্য মাত্র অবশিষ্ট থাকে তখন গ্রাম্য লোকে তাহাতে বাঁধ দিয়া নানা প্রকার সরঞ্জাম দ্বারা মাছ ধরিয়া থাকে। পীতাম্বর যে গ্রামে বাস করিত সেই গ্রামের পার্শ্বেই একটী খাল ছিল। গ্রামের মৃত দেহ ঐ খালের নিকটেই দাহ করা হইত। অন্ধকার রাত্রে অনেকে সেই নির্জ্জন স্থানে যাইতে সাহস করিত না, উপরোক্ত ঘটনার প্রায় চারি মাস পরে একদিন পীতাম্বর তাহার ভ্রাতুষ্পুত্র বলাইকে লইয়া অন্ধকার রাত্রে সেই শ্মশানের নিকটে মাছ ধরিতে ছিল। নিস্তব্ধ রাত্রি, আর কোন সাড়া শব্দ নাই; প্রায় দুই প্রহর অতীত হইয়া গিয়াছে এমন সময় সেই শ্মশানের নিকট হইতে একটা অগ্নির উজ্জল পিণ্ড ধীরে ধীরে উহাদের দিকে আসিতেছে দেখা গেল, ক্রমে সেই অগ্নি-গোলক যত নিকটে আসিতে লাগিল ততই যেন সেই অগ্নি মধ্যে অগ্নিময় মনুষ্য মূর্ত্তি স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতে লাগিল।

বালক চীৎকার করিয়া তাহার খুল্লতাতকে উহা দেখাইল এবং ভয়ে কাঁপিতে লাগিল। ধীরে ধীরে অগ্নি গোলক উহাদের নিকট আসিয়া সরিয়া গিয়া আবার বিলীন হইয়া গেল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীযতীন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী

ভুতের রামায়ণ শ্রবণ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

এমন সময়ে উঠানে হঠাৎ ধুম্ দাম্ করিয়া কি শব্দ হইল ও সঙ্গে সঙ্গে উঠানের উপর কোথা হইতে গরুর হাড়, ঢিল, ইট, ইত্যাদি আসিয়া পড়িতে লাগিল। সকলে ভয়ে ও বিস্ময়ে স্তম্ভিত! দেখিতে দেখিতে রাশি রাশি হাড় ও ইষ্টকাদি চূর্ণে উঠান ভরিয়া গেল। প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা ব্যাপিয়া এইরূপ ব্যাপার চলিয়াছিল।

কাহারও মুখে কথাটি নাই! যাহারা বেড়াইতে আসিয়াছিল তাহারা কোন কারণ নির্দ্দেশ করিতে না পারিয়া আপনাপন বাড়ী চলিয়া গেল। তারিণী এতক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়াছিল; সকলে চলিয়া গেলে পর সে আবর্জ্জনা সকল স্থানান্তরিত করিবার নিমিত্ত ব্যস্ত হইল ও অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত পরিশ্রম করিয়া ঐ সকল আবর্জ্জনা বাটীর বাহিরে ফেলিয়া আসিয়া হাত পা ধুইয়া বিশ্রাম করিতে বসিল। এদিকে গৃহিণী রান্না-ঘর হইতে আসিয়া সংবাদ দিল হাঁড়িতে ভাত তরকারি কিছুই নাই, কে যেন তাহা চাটিয়া খাইয়া গিয়াছে ও হাঁড়ির মধ্যে বিষ্ঠা ঢালিয়া দিয়াছে। অদ্ভুত ভৌতিক কাণ্ড দেখিয়া বাটীর সকলে ভয়ে কাঁপিতে লাগিল। বলা বাহুল্য সে রাত্রে তারিণী বা পরিবার বর্গের আহারাদি বন্ধ রহিল।

রাত্রে ভাল নিদ্রা হইল না। প্রভাতে গ্রামের যাবতীয় লোক মজা দেখিবার নিমিত্ত আসিয়া উপস্থিত হইল। অনেক ক্ষণ ধরিয়া জটলা করিবার পর সকলে স্ব স্ব স্থানে চলিয়া গেল। রাত্রে কাহারও আহার হয় নাই কাযেই তেওয়ারী বউ সকাল সকাল স্নানাদি করিয়া রন্ধনাদি কার্য্যে ব্যাপৃতা হইল। সে দিন তারিণী আর মাঠে গেল না। যথা-

সময়ে স্নান করিয়া আসিয়া খাইতে গেল। তেওয়ারী বউ রন্ধন কার্য্য শেষ করিয়া এতক্ষণ তাহারই অপেক্ষা করিতেছিল। তারিণী আসিলে তাড়াতাড়ি রান্না ঘরে গিয়া ভাত বাড়িতে গেল। কিন্তু এ কি ব্যাপার! হাঁড়িতে কিছুই নাই। কেবল বিষ্ঠা! সর্ব্বনাশ হইয়াছে বলিয়া তেওয়ারী বউ কাঁদিতে কাঁদিতে বাহিরে আসিয়া সকল কথা তারিণীকে বলিল।

কি হইবে! এরূপ হইলে ছোট ছোট ছেলেরা কেমন করিয়া বাঁচিবে! হা ভগবান, এমন সরল স্বভাব ব্যক্তির উপর এত অত্যাচার কেন! তারিণী মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল। বসিয়া থাকিলে চলিবে কেন। আবার দোকান হইতে নূতন হাঁড়ি ও চাউল দাইল ইত্যাদি আনা হইল। আবার রান্না চড়িল। রান্না হইয়া গেলে সেবার আর হাঁড়ি ভিতরে না লইয়া গিয়া, সঙ্গে সঙ্গে সকলে ভাত বাড়িয়া খাইতে বসিল। সকলের আহারাদি এক প্রকার শেষ হইয়া গেল।

সমস্ত দিন কোন গোলমাল নাই। সন্ধ্যার সময় আবার পূর্ব্বদিনের ন্যায় হাড় ইট্ পাট্‌কেল পড়িতে আরম্ভ হইল ও সেই প্রকার অর্দ্ধঘণ্টা পরে বন্ধ হইয়া গেল।

উপর্য্যুপরি ৩।৪ দিন এইরূপ ঘটনা হইলে পর, তারিণী এক দিন নিতান্ত বিষণ্ণ মনে গলায় বস্ত্র দিয়া যোড় হাত করিয়া সন্ধ্যার পূর্ব্বে পূর্ব্বলিখিত ডালিম তলায় দাঁড়াইয়া বলিতে লাগিল "তুমি কে আমি জানি না; আমি তোমার কি অপরাধ করিয়াছি তাহাও জানি না। যদি আমার অজ্ঞাতসারে কোন অপরাধ করিয়া থাকি, তবে আমায় ক্ষমা কর; আর তুমি যাহা করিতে বলিবে আমার অসাধ্য না হইলে আমি তাহাই করিব। যদি তুমি প্রসন্ন না হও তাহা হইলে আমি এখনই এই ডালিমতলায় দাঁড়াইয়া আত্মহত্যা করিব"।

কিয়ৎক্ষণ চারিদিক নিস্তব্ধ। অনেকে দাঁড়াইয়াছিল; কাহারও

মুখে কথা নাই। তেওয়ারী বউ, ফুফু, প্রভৃতি যোড়হাত করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। প্রায় ৫।৭ মিনিট এই ভাবে কাটিয়া গেল, হঠাৎ সেই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া রমণীর কণ্ঠ-স্বরে কে যেন ডালিম গাছের উপর হইতে বলিতে লাগিল—"তেওয়ারী আমি তোমার শ্যালী। আজ প্রায় দুই মাস হইল ওলাউঠা রোগে আমার দেহত্যাগ হইয়াছে তোমরা আমার দেহ সৎকার না করিয়া দামোদরের জলে উহা ভাসাইয়া দিয়াছিলে। আমার সদ্‌গতি হয় নাই। কে একজন বীভৎস আকারের লোক আমায় ধরিয়া লইয়া যায় ও একটা নদীর ধারে লইয়া গিয়া রাখে। নদীর অপর পার হইতে আদেশ হয় যে, উহাকে এখানে আনিও না। ও যদি ছয় মাস ধরিয়া রামায়ণ শ্রবণ করিতে পারে তবে উহাকে এখানে আনিবে; এখন প্রেতযোনি প্রাপ্ত হইয়া উহাকে পৃথিবীতে থাকিতে হইবে। তা ভাই, সেই অবধি আমি ভূত হইয়া রহিয়াছি। রামায়ণ শ্রবণ করিবার অন্য উপায় দেখিতে না পাইয়া, অগত্যা তোমার আশ্রয়ে আসিয়াছি। তোমায় অনুরোধ করিলে পাছে তুমি তাহা না রাখ, এই ভাবিয়া তোমায় ভয় দেখাইয়া কার্য্য-সিদ্ধি করিবার মানসে তোমার উপর এত অত্যাচার করিয়াছি। এক্ষণে তোমায় প্রতি আমার এই আদেশ যে তুমি আগামী কল্য হইতে আমার আহারের নিমিত্ত নিত্য এক মণ টাট্‌কা খাশ মিহিদানা বর্দ্ধমান হইতে আনিয়া এই ডালিম তলায় রাখিবে ও তোমার বাড়ীতে কোন ভাল রামায়ণের দলের গান করাইবে। ছয় মাস এইরূপ করিবে তাহা হইলে আমি তোমার আর কোন অপকার করিব না, নচেৎ তোমার বিষম বিপদ ঘটিবে।

কণ্ঠ-স্বর বন্ধ হইল। কি ভয়ানক আদেশ! তারিণী যোড়হাত করিয়া বলিল "আমার অবস্থা তুমি জান; এক মণ খাশ মিহিদানা আমি যে সর্ব্বস্ব বিক্রয় করিলেও যোগাড় করিতে পারিব না। তবে আমার মৃত্যুই শ্রেয়ঃ।

আবার সেই কণ্ঠস্বরে উত্তর হইল "আচ্ছা যাও, আধ মণ দিবে"।

"তাহাও পারিব না"।

"তবে পাঁচ সের"।

"তাহাও পারিব না"।

"তবে কত পারিবে?"

"প্রত্যহ একটি করিয়া অতি কষ্টে দিতে পারি"।

"আচ্ছা, তাহাতেই হইবে, কিন্তু রোজ টাট্‌কা হওয়া চাই"।

"আর রামায়ণের কি করিব। সে খরচ আমি কোথায় পাইব?"

"দেখ, তুমি কাল সকালে উঠিয়া বর্দ্ধমানে গিয়া যে কোন একটা ভাল রামায়ণওয়ালাকে আমার আদেশের কথা জানাইবে ও তাহাকে বলিবে যদি সে বিনা বেতনে তোমার বাড়ীতে ছয় মাস রামায়ণ গান না করে তাহা হইলে আমি তাহার সর্ব্বনাশ করিব"।

এই কথা কয়টি বলিয়া কণ্ঠ-স্বর চুপ হইল, আর শুনা গেল না। সেই দিন তারিণীর বাড়ীতে আর কোন উপদ্রব নাই। পরদিন প্রত্যূষে উঠিয়া তারিণী বর্দ্ধমানে গেল ও একটা রামায়ণের দল, আদেশ মত স্থির করিয়া আসিল ও আসিবার সময় দুই পয়সা দিয়া একটি টাট্‌কা মিহিদানা, লইয়া আসিল। সন্ধ্যার পূর্ব্বে রামায়ণের দল আসিয়া পৌঁছিল। সন্ধ্যার সময় সর্ব্ব-সমক্ষে সেই মিহিদানাটি ঠোঙা সমেত ডালিম তলায় রাখিয়া তারিণী গললগ্নীকৃতবাসে দাঁড়াইয়া রহিল। হঠাৎ ঠোঙাটী অদৃশ্য হইল ও অল্পক্ষণ পরে গাছের উপর হইতে পড়িয়া গেল।

"মিহিদানাটা নাই"।

রামায়ণ আরম্ভ হইল। অনেকে রামায়ণ শুনিতে আসিয়াছিল, সকলেই একবাক্যে বলেন যে যতক্ষণ রামায়ণ গান হইতেছিল, সেই ডালিম গাছের উপর একটি স্ত্রী-লোক বসিয়া তাহা শুনিতেছিল। রামায়ণ বন্ধ হইলে তাহাকে আর দেখা গেল না।

ছয় মাস কাল এইরূপে কাটিয়া গেল। শেষ দিন যখন রামায়ণ বন্ধ হইল, তখন সকলেই দেখিল হঠাৎ একটা ঝড় উঠিয়া ডালিম গাছটী ভূমিসাৎ হইল। তারিণী তেওয়ারীর বাটীতে আর কখন কোন উপদ্রব হয় নাই। ইহার পর হইতে তারিণীর অবস্থার উন্নতি হইয়াছিল।

সমাপ্ত।

শ্রীনলিনাক্ষ রায়।

দাদাম'শায়ের ঝুলি

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

ব্যোমকেশ আসিয়া ভট্টার্য্যের পদধূলি গ্রহণ করিয়া কহিল 'দাদা ম'শায় হঠাৎ নিরুদ্দেশ হয়েছিলেন কোথায়? একবারে কোন খোঁজ খপরই ছিল না, আমি ভাবছিলাম কি হলো!'

ভট্টাচার্য্য। আর ভায়া! সংসারী মানুষ, তাতে নেহাত একা, পাঁচটা কর্ম্মের ঝঞ্ঝাটে ঘুরে বেড়াতে হয়। আমার তো ইচ্ছা, রোজ রোজ তোদের সঙ্গে কথাবার্ত্তায় খানিকটা কাল অতিবাহিত করি। এ বৃদ্ধ বয়সে আর অধিক সুখ কোথা হতে পাবো। কিন্তু কর্ম্মের এমনি পাকচক্র, যে দিনরাত যেন হাবুডুবু খেয়ে বেড়াচ্চি। ভগবান জানেন কত দিনে এই কর্ম্ম ঋণ পরিশোধ হবে, কত দিনে এই কলুর বলদের মত ঘুরপাক খাওয়া রহিত হবে!

ব্যোমকেশ। দাদাম'শায়, আপনার শেষ দিনের কথা গুলো আমি বেশ করে ভেবে দেখেছি, এবং আমাদের হিন্দুজাতির ও হিন্দু সভ্যতার

ভিতরের কথারও যেন খানিকটা আভাস পেয়েচি। এ সম্বন্ধে আমার অনেক জিজ্ঞাস্য আছে, কিন্তু আপাততঃ সে গুলো স্থগিত রেখে ভুবর্লোক সম্বন্ধীয় আলোচনাটা শেষ করলে ভাল হয়।

ভট্টাচার্য্য। আমাদের কিসের কথা হ'চ্ছিল ?

ব্যোমকেশ। ভুবর্লোকের অধিবাসীর কথা কেমন করে স্থূলদেহ বিশিষ্ট মানুষ সময়ে সময়ে স্থূলদেহটা ছেড়ে ভুবর্লোকে যায় সেই কথাটা আপনি বোঝাচ্ছিলেন।

ভট্টাচার্য্য। মানুষ যখন যোগমার্গে খানিক দূর উন্নত হয় তখন সে স্থূল শরীরটাকে ছেড়ে সূক্ষ্মশরীর অবলম্বন করে অনায়াসে ভুবর্লোকে যাতায়াত করতে পারে। এই শ্রেণীর লোকের মধ্যে কেহ বা সিদ্ধ হয়েছেন, কেহ বা কোন সিদ্ধপুরুষ বা জীবন্মুক্তের চেলা বা শিষ্য। তার মধ্যে সিদ্ধপুরুষেরা অনেক সময়েই মায়াবীরূপ গ্রহণ করে বিচরণ করেন। এইরূপ মনোময় কোষের অংশ নিয়ে তৈরী হয়। কাজে কাজেই ভুবর্লোকেও ইঁহারা সাধারণতঃ অন্যের অদৃশ্যভাবে থাকেন। তবে ইচ্ছা হ'লে এই মায়াবীরূপের উপর একটা ভুবর্লৌকিক জড় পদার্থের আবরণ এঁরা গ্রহণ কর্ত্তে পারেন, এবং তখন এঁরা ভুবর্লৌকিক দৃষ্টির বিষয়ীভূত হন। চেলারা সাধারণ সূক্ষ্মশরীর লইয়া বেড়ান মাত্র, সুতরাং সহজেই তাঁহাদিগকে দেখতে পাওয়া যায়।

ব্যোমকেশ। সিদ্ধপুরুষদিগের কথা ছেড়ে দিন; কিন্তু তাঁদের চেলাদের কথা যে বল্লেন সেই সম্বন্ধে আমার একটা জিজ্ঞাস্য আছে। এঁরা কিরূপ ব্যক্তি, জীবিত না মৃত ? ভুবর্লোকেই বা কি জন্য যান ?

ভট্টাচার্য্য। আমি যাঁরা জীবিত অর্থাৎ স্থূলদেহধারী, তাঁদের কথাই বলচি। নিদ্রাবস্থায় যখন স্থূলশরীরের সহিত একটা সাময়িক বিচ্ছেদ সংঘটন হয়, তখন যাঁরা কোন মহাপুরুষের কৃপালাভ করেছেন অর্থাৎ তাঁদের শিষ্যত্বলাভ করতে সমর্থ হয়েছেন, তারা সাধারণ লোকের মত

ভুবর্লোকে ভেসে ভেসে না বেড়িয়ে অনেক প্রকার হিতকর কার্য্যে ব্যাপৃত থাকেন এবং বহুবিধ জ্ঞান সঞ্চয় করেন।

ব্যোমকেশ। একটা খট্‌কা ঠেক্‌চে। নিদ্রাবস্থায় ত মানুষ অজ্ঞানই হয়ে থাকে জানি। সে সময়ে আবার জ্ঞানসঞ্চয় কিরূপে হতে পারে?

ভট্টাচার্য্য। তুই দেখ্‌চি এর মধ্যে সব হজম করে বসে আছিস। তোকে আগেই বুঝিয়েছি, আত্মা হচ্ছেন জ্ঞানস্বরূপ; জ্ঞানই যার স্বরূপ সে কখনও অজ্ঞান হ'তে পারে না। নিদ্রার সময় এই জ্ঞান আর স্থূল-শরীরকে অবলম্বন ক'রে আপনাকে প্রকাশিত করে না, কাজেই স্থূল-শরীরটা অসাড় ও জ্ঞানশূন্যভাবে পড়ে থাকে। যথার্থ মানুষটা তখন সূক্ষ্মশরীর অবলম্বন ক'রে ভুবর্লোক ইত্যাদিতে বিচরণ করে, এবং সেই সমস্ত লোকেই তখন তার আত্মার বা জ্ঞানের প্রকাশ হয়, কাজে কাজেই তখন তার জ্ঞান সঞ্চয় বা জ্ঞানোন্নতি অসম্ভব কিসে? জাগ্রতা-বস্থায় আমরা যে সমস্ত উপাধির সাহায্যে জ্ঞানার্জ্জন করি, তার মধ্যে স্থূলোপাধি ভিন্ন আর সমস্তগুলিই নিদ্রাবস্থায় বর্ত্তমান থাকে। সুতরাং স্থূলজগতের জ্ঞান ভিন্ন অপর অর্থাৎ সূক্ষ্ম জগত সম্বন্ধীয় জ্ঞানলাভ হবার পক্ষে কোন বাধা থাকে না।

ব্যোমকেশ। তবে কি মানুষ মাত্রেই এই রকম ক'রে নিদ্রাবস্থায় ভুবর্লোক গিয়ে জ্ঞানার্জ্জন করতে পারে?

ভট্টাচার্য্য। নিদ্রাবস্থায় সকলেই ভুবর্লোকে উপস্থিত হয়, কিন্তু সকলে জ্ঞানার্জ্জন কর্ত্তে সক্ষম হয় না।

ব্যোমকেশ। এরূপ পার্থক্যের কারণ কি?

ভট্টাচার্য্য। একটু চিন্তা করিলেই সেটা বুঝতে পারবি। জ্ঞানার্জ্জন ক্রিয়া উপাধির সাহায্যেই হ'য়ে থাকে। এই স্থূল জগৎটায় জ্ঞান কি ক'রে হয়, সকলেই জানে ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে এই জ্ঞান হয়ে থাকে। যাদের ইন্দ্রিয়শক্তি দোষযুক্ত দুর্ব্বল তারা বহির্জ্জগৎসম্বন্ধীয় জ্ঞানলাভ

হতে বঞ্চিত থাকে। সেই রকম যাদের ভুবর্লোকিক শরীর এখনও ভালরূপ গঠিত হয় নি সেই সমস্ত লোক ভুবর্লোকে উপস্থিত হলেও সেখানকার জ্ঞান লাভ করতে পারে না, কাজে কাজেই অজ্ঞানাবস্থায় ভেসে ভেসে বেড়ায়। কিন্তু যাঁরা গুরুকৃপায় সাধনমার্গে কিয়দ্দূর অগ্রসর হয়েচেন, তাঁদের সূক্ষ্মশরীরের অবস্থা অনেক পরিমাণে উন্নত হয়েছে, সুতরাং ভুবর্লোকে উপস্থিতি কালে তাঁরা সজ্ঞান অবস্থায় থেকে সেই শরীরের সাহায্যে সূক্ষ্মজগৎ সম্বন্ধীয় অনেক তথ্য লাভ করতে সমর্থ হন। একটা কথা মনে রাখবি, মানুষ বাহ্যদৃষ্টিতে সকলেই সমান হলেও ভিতরের অবস্থা সম্বন্ধে অনেক তারতম্য আছে। এই কথাটা বুঝতে না পেরে কিম্বা গ্রাহ্য না করেই, এদেশের অধিকার তত্ত্ব জিনিষটা পাশ্চাত্য শিক্ষাভিমানীর নিকট হেয় বলে বোধ হচ্ছে। সে কথা থাক্। এখন তোকে ভুবর্লোকের অন্য অধিবাসীর কথা বলি শোন্।

(ক্রমশঃ)

শ্রীমলয়ানিল শর্ম্মা।

"পুনরাগমন"।

ডাক্তার বাবুর বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া শুনিলাম, তিনি একটু আগেই বাড়ী হইতে বাহির হইয়া গিয়াছেন। যে ভৃত্য এই সংবাদ দিল, সে নূতন লোক হিন্দুস্থানী। আমি এই কয়দিন ডাক্তার বাবুর বাড়ী না আসার মধ্যে সে আসিয়াছে। ডাক্তার বাবু কোথায় গিয়াছেন জিজ্ঞাসা করাতে সে বিশেষ কোনও উত্তর দিতে পারিল না। কেবল বলিল, এক জন লোক আসিয়া তাঁহাকে লইয়া গিয়াছে। তখনও পর্য্যন্ত ডাক্তার বাবুর অন্যান্য পরিজনবর্গ নিদ্রিত। বিশেষ জানিবার উপায় নাই বুঝিয়া বাড়ী ফিরিবার উপক্রম করিতেছি, এমন সময় ডাক্তার বাবুর স্ত্রী দ্বিতলের বারাণ্ডা হইতে আমাকে ডাকিলেন—"গোপীনাথ!" খবর কি?"

অতি আগ্রহের সহিতই তিনি আমাকে প্রশ্ন করিলেন। এরূপ অসময়ে আসাই তাঁহার সাগ্রহ প্রশ্নের কারণ বুঝিয়া আমি উত্তর করিলাম—"ভাল।" তাহার পর আমি তাঁহাকে ডাক্তার বাবু কোথায় গিয়াছেন জিজ্ঞাসা করিলাম। প্রশ্ন শুনিয়াই তিনি বিস্মিতভাবে বলিয়া উঠিলেন—"সেকি, তুমি কোথা হইতে আসিতেছ?"

"কেন বাড়ী হইতে।"

"বাড়ী হইতে আসিতেছ, অথচ বাড়ীর খবর জাননা।"

"আমিত কিছুই জানিনা। আমি অতি প্রত্যূষেই বাড়ী হইতে বাহির হইয়াছি।"

"শীঘ্র বাড়ী ফিরিয়া যাও, তোমার পিতা দারুণ অসুস্থ। হরিয়া এই মাত্র আসিয়া ডাক্তার বাবুকে তোমাদের বাড়ীতে লইয়া গিয়াছে।"

"কি অসুখ শুনিয়াছেন কি?"

"তা জানিনা। শুনিলাম, তোমার পিতা কথা কহিতে পারিতেছেন না—তাঁহার দম বন্ধ হইবার উপক্রম হইয়াছে। তোমার মা ডাক্তার বাবুকে লইতে পাঠাইয়াছিলেন।"

শুনিবামাত্র আমি সেস্থান ত্যাগ করিয়া বাড়ীর অভিমুখে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিলাম।

ডাক্তার বাবুর বাড়ী হইতে আমাদের বাড়ী যাইতে হইলে, ঠনঠনের কালীতলা পার হইয়া যাইতে হয়, দিগ্বিদিক জ্ঞান শূন্যের মত আমি কালীতলা পার হইয়া যাইতেছি, এমন সময় সেই পূর্ব্বপরিচিতা বৃদ্ধার বিকট হাসি আমার কর্ণে ধ্বনিত হইল। মাথা তুলিয়া দেখি, সেই বুড়ীটা মন্দিরের ধাপে বসিয়া রহিয়াছে। একবার চমকিতের ন্যায় দাঁড়াইলাম। মনে করিলাম বুড়ী বুঝি আমাকে দেখিয়াই হাসিল। কিন্তু কিয়ৎক্ষণ দাঁড়াইয়া বুঝিলাম, তাহা নয়। সে একবারও আমার পানে তাকাইল না—মাটীপানে চাহিয়া আপনার মনে সে হাত পা নাড়িতেছিল, আর হাসিতেছিল। বুঝিলাম বুড়ী পাগল। সেখানে তাহাকে ভয় করিবার কিছুই ছিল না। তথাপি কি জানি কেন, তাহার মুখের দিকে ভাল করিয়া চাহিতে পারিলাম না। বৃদ্ধার সঙ্গে কথা কহিবারও আমার অবসর ছিল না। আমি তাহার পার্শ্ব দিয়া আবার চলিতে আরম্ভ করিলাম। চলিবার উপক্রমেই বৃদ্ধা আর একবার খলখল হাসিয়া উঠিল। আর কাহার উদ্দেশে যেন বলিয়া উঠিল—"কেমন? কেমন পাগুত—কেমন? কেমন মজা লাগিতেছে?"

পাগলের প্রলাপ, তাহাতে সন্দেহই নাই, তথাপি বৃদ্ধার অঙ্গচালনে, কথায়, হাসিতে আমার বুক কাঁপিয়া উঠে কেন? যে চাকরী করিবার জন্য আমি প্রস্তুত হইয়াছি, এ রমণীসুলভ দুর্ব্বলতায় সে ইনজিনিয়ারিং কেমন করিয়া করিব? বুকে সাহস ধরিয়া বুড়ীকে অগ্রাহ্য করিয়া আমি

চলিলাম। কিন্তু, বলিলে তোমরা আমাকে পাগল বলিবে,—আমি কি জানি কেমন করিয়া বুড়ীর চিন্তাতে তন্ময় হইয়া গিয়াছি। অথবা গৃহাভিমুখে চলিতে চলিতে আমি কি যে চিন্তা করিয়াছি, তাহা বলিতে পারি না। বাড়ীর কথা বিস্মৃত হইয়াছি, রুগ্ন পিতাকে একেবারেই ভুলিয়াছি। চলিতে চলিতে বাড়ী ভুলিয়া, পথ হারাইয়া আমি এ কোথায় আসিয়া পড়িলাম।

চলিতে চলিতে পরিচিতস্বরের বাধা না পাইলে আমি যে কোথায় যাইতাম তার ঠিক কি! পশ্চাৎ হইতে বেচু আমাকে ডাকিল—"কি দাদাবাবু, এমন সময় এদিকে এমন ভাবে কোথায় যাইতেছ?"

নিদ্রোত্থিতের ন্যায় আমি বেচুর দিকে মুখ ফিরাইলাম। চারিদিক চাহিলাম। স্থান অপরিচিত—জঙ্গলে পূর্ণ। "আমি এ কোথায় আসিয়াছি বেচু?"

বেচু বলিল—"আমি ত এস্থানের নাম জানিনা বাবু।"

পথে এমন কেহই ছিল না যে তাহাকে জিজ্ঞাসা করি। লোকপূর্ণ কলিকাতার সন্নিহিত স্থান এমন জনহীন ও অরণ্যপূর্ণ হইতে পারে, ইহা আমার ধারণাতেই আসিল না। আমার বিস্ময় ভয়ে পরিণত হইল—মনে মনে ভাবিলাম, আমি কি পাগল হইয়াছি। যাহার কিঞ্চিন্মাত্রও মস্তিস্থিরতা আছে তাহারত কখনই এমন আত্মবিস্মৃত হইতে পারে না। বেচুর পানে চাহিয়া আমি কাঁদিয়া ফেলিলাম।

বেচু যেন কি বুঝিল। বুঝিয়া বলিল—"দাদাবাবু! তুমি কি রাত্রে বাড়ী হইতে বাহির হইয়াছ।"

আমি। একটু বেশী ভোরে বাহির হইয়াছি। ঠিক রাত্রিতে বলিতে পারি না।

বেচু। ঘুম থেকে কি একেবারেই উঠিয়া আসিয়াছ?

আমি। রাত্রে ভাল নিদ্রা হয় নাই। আমি একরূপ জাগিয়াই ছিলাম।

বেচু। তাহ'লেই ঠিক হইয়াছে—কখন তোমার তন্দ্রা আসিয়াছে, তাহা তুমি বুঝিতে পার নাই। বেটী সেই সময়েই কাজ হাসিল করিয়াছে।

আমি। বেটী কে বেচু ?

বেচু। নিশি বেটী, আবার কে ? যাক্ একথা আর কাউকেও বলিয়োনা—আর পথে কাউকে দেখিলে কোনও কথা জিজ্ঞাসা করিয়ো না। জিজ্ঞাসা করিলে অনিষ্ট হইবে।

আমি বেচুর কথার কোনও উত্তর না দিয়া, তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আমাকে কলিকাতা যাইবার পথটা দেখাইতে পার ?"

বেচু। কলিকাতার পথ চিনিনা। তবে তোমাকে কালীঘাটে লইয়া যাইতে পারি।

আমি। কালীঘাট এখান হইতে কতদূর হইবে ?

বেচু। এক ক্রোশের কিছু উপর হইবে। সেখান হইতে যদি পথ চিনিয়া যাইতে পার।

স্থান সম্বন্ধে অবশ্য তোমাদের কৌতূহল হইতে পারে। আমি বালীগঞ্জে আসিয়াছিলাম। বালীগঞ্জ সে সময় বনময়—আমি তখন তাহার নাম জানিতাম না।

আমি বাড়ী হইতে এতদূরে চলিয়া আসিয়াছি! চিন্তামাত্রেই আমি যেন কেমন একরকম শক্তিহীন হইয়া গেলাম। আমি একটু কাতরতার সহিত বেচুকে বলিলাম—"বেচু! ভাই, তুমি আমাকে বাড়ীতে লইয়া চল।"

"আমি ত যাইতে পারিব না।"

"অনেক কাল আমাদিগের বাড়ী যাও নাই। বাবা বড়ই পীড়িত, একবার দেখিয়া আসিবে চল।"

"আমার যাইবার যো নাই।"

"ভাল, বাবাকে দেখিতে না চাও, মাকে কি দেখিতে ইচ্ছা হয় না?"

"তবে তোমাকে মনের কথা বলি। মায়ের কথা তুলিলে যাইতে ইচ্ছা করে।"

"তাহ'লে চল।"

"কিন্তু তোমাদের আচরণে যাইতে ইচ্ছা করে না। কাল তুমি তোমার গুরুজনকে স্রোতে ভাসাইয়া দিলে—এতক্ষণ কথা হইল, তাঁর সম্বন্ধে একটা কথাও জিজ্ঞাসা করিলে না।"

"বেচু! আর তিরস্কার করিয়োনা। সেই মহাপাপে আজ আমার এই দুর্দ্দশা হইয়াছে। আমার পিতা শুনিলাম মুমুর্ষু—এতক্ষণ আছেন কিনা জানিনা। আমি তাঁর বিপদের কথা শুনিয়া বাড়ীতে ছুটিতে এখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। বেচু! আমার মতিভ্রম হইয়াছে। ঠাকুরদাদা কি বাঁচিয়াছেন?"

"বাঁচিয়াছেন বইকি! তিনি ইচ্ছা না করিলে তাঁহাকে মারে কে?"

"তিনি কোথায় আছেন?"

"তাঁর অনুমতি না পাইলে বলিতে পারিব না।"

"বেশ ভাই, তাঁহাকেই না হয় লইয়া চল। তিনি সাধু আমার বিশ্বাস তিনি আমাকে ক্ষমা করিয়াছেন।"

"তাতে কি আর সন্দেহ আছে? তিনি অক্রোধ পুরুষ।"

"বেচু! তাহ'লে তুমি তাঁকে আমার পিতার সংবাদ জ্ঞাপন কর।"

"ভাল, এখন কালীঘাটে চল। সেস্থান হইতে তুমি আগে বাড়ী যাও। আমি তাঁহাকে সমস্ত ঘটনা বলিব। তিনি যদি যাবার মানস করেন,

তাহা হইলে আমরা পরে যাইতেছি, বেলা বাড়িয়া যাইতেছে আর এখানে দাঁড়াইয়োনা—সঙ্গে চল ”

বেচুর সঙ্গে চলিলাম। কালীঘাটে পৌছিতে প্রায় একঘণ্টা সময় লাগিল। সেখানে একখানা গাড়ী ভাড়া করিলাম। সঙ্গে ছোট ঠাকুরদার নামের চিঠিখানা ছিল। সেই চিঠি বেচুর হাতে দিয়া বলিলাম,—“কালকের সেই পাইকটা আজ ভোরে আমার হাতে তাহার মনিব সেই ব্রাহ্মণের নাম করিয়া দুইখানা চিঠি দিয়া গিয়াছে। দাদা মহাশয়ের নামের চিঠিখানা তাঁহাকে দিয়ো। বাবাকে জীবিত দেখিতে পাই, তাহা হইলে তাঁর চিঠি তাঁর হাতে দিব।” এই বলিয়া বেচুর নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলাম। তখন বেলা প্রায় নয়টা হইয়াছে। গাড়োয়ানকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—“এখান হইতে পটলডাঙ্গা পৌছিতে কতক্ষণ লাগিবে ?”

গাড়োয়ান বলিল—“এক ঘণ্টা।”

“ইহার পূর্ব্বে পারিবে না ?”

“কেন পারিব না ? বকসিস পাইলে আধঘণ্টার মধ্যেই পৌছিতে পারিব।

“বক্‌সিস মিলিবে—যত শীঘ্র পারিবে, ততই বেশি বক্‌সিস পাইবে।”

আমার মনের অবস্থা কাহাকেও বুঝাইবার প্রয়োজন হইবে কি ? আমি আমাকে কাহারও চিন্তার বিষয় করিতে সাহসী হইতেছি না। প্রতিমুহূর্ত্ত যুগের যাতনা গর্ভে পূরিয়া সিন্ধুগর্ভ শ্রাবণের মেঘের ন্যায় আমার মাথায় ঢালিয়া চলিয়া যাইতেছে আমি যাতনা-সাগরে ডুবিয়াছি। মায়ের মনোবেদনার ক্ষণিক চিন্তায় উন্মত্তের ন্যায় বাটীর বাহির হইয়াছিলাম। সে চিন্তা পিতার মৃত্যুচিন্তায় আচ্ছাদিত হইয়াছে ! পিতার শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত হইতে আমি কোথায় কতদূর নিজের

অজ্ঞাতসারে আপনাকে নির্ব্বাসিত করিয়াছি। সূর্য্যালোকিত বসুন্ধরা—উপরে আকাশ, নিম্নে বৃক্ষ লতা—অসংখ্য প্রাণী—সমস্তই কুক্ষিগত করিয়া আমার চোখের সম্মুখ হইতে যেন অন্তর্হিত হইয়াছে। উন্মুক্ত মেঘ-শূন্য আকাশে অস্বচ্ছ নিয়তির আবরণে অন্ধকাররূপী রবি! সহৃদয়! এযন্ত্রণার ক্ষণমাত্র আঘাতেই আপনাদের হৃদয়ে যাতনার তরঙ্গ উঠিবে! আমি আর কাহাকেও চিন্তার বিষয়ী করিতে সাহসী হইতেছি না। অন্ধকার—সূচীভেদ্য অন্ধকার—আমাকে কুক্ষিগত করিবার জন্য যেন সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। সে সমস্তই ঢাকিয়াছে আমাকেও ঢাকিতে আসিয়াছে কিন্তু অন্ধকার একটী দৃশ্য ঢাকিতে পারিল না কেন? তাহার প্রতি তরঙ্গে মুমূর্ষু পিতার চিত্র ভাসিয়া উঠিতেছে!

পিতা অসংখ্য মৃতের সঙ্গে আত্মরক্ষার্থ যুদ্ধ করিতেছেন, মাতা আকাশপানে স্থির নেত্র নিবিষ্ট করিয়া করযোড়ে যেন তাহাদের কাছে পিতার জীবন ভিক্ষা করিতেছেন। "ওগো! তোমরা আমার আয়তি কাড়িয়া লইও না। পুত্র আমার নিরুদ্দিষ্ট, প্রভাত হইতে তাহাকে দেখি নাই—সে যে আমাকে না বলিয়া, আমার অনুমতি না লইয়া কোথাও যাইবে না আমি একসঙ্গে স্বামী পুত্র হারাইতে বসিয়াছি। ওগো! আমার প্রতি তোমরা কৃপা করিয়া আমার স্বামীকে ফিরাইয়া দাও।"

মহানবমী তিথিতে দেবী দর্শনাভিলাষী তীর্থযাত্রীপূর্ণ পথে অনাবৃত চক্ষে আমি কেবল সেই ভীষণ দৃশ্য দেখিতে দেখিতে চলিয়াছি।

কতক্ষণ চলিয়াছি জানি না, চলিয়াছি কি না তাহাও অনুমানে আনিতে পারিতেছি না, সহসা এক বিপুল শব্দে আমার গাড়ী পথ-পার্শ্বের এক প্রস্তরখণ্ডে ব্যাহত ও বিপর্য্যস্ত হইয়া নালায় পড়িয়া গেল। আমি সম্মুখের গদীতে বিষম বেগে উপুড় হইয়া পড়িয়া গেলাম।

দৈবানুগ্রহে আমি সংজ্ঞাশূন্য হই নাই। কিন্তু আমার মনে হয় সে সময়ে আমার সংজ্ঞাহীন হওয়াই ভাল ছিল। কেন বলিতেছি।

বহুলোকে আমাকে মুক্ত করিতে সাহায্য করিয়াছিল। কিন্তু আমি মুক্ত হইয়াই ছুটিতে আরম্ভ করিলাম। গাড়ীর কি হইল, গাড়োয়ানের কি হইল, খোঁজ লইলাম না। আমার শরীরের কোথায় কি আঘাত লাগিয়াছে, তাহাও জানিবার অবকাশ হইল না। যাহারা আমাকে রক্ষা করিল, তাহাদের দিকে একবার ফিরিয়াও চাহিলাম না—মুক্ত হইবামাত্র আমি ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিলাম।

কিন্তু আমাকে কে ছুটিতে দিবে? আমার মস্তিষ্ক বিপর্য্যস্ত, আমার বুদ্ধি বিকৃত হইয়াছে মনে করিয়া অনেক লোকে ছুটিয়া আমাকে ধরিয়া ফেলিল। আমি তাহাদিগকে প্রাণপণে বাধা দিলাম, এমন কি দুই চারি জনকে প্রহার পর্য্যন্ত করিলাম। কেহ গ্রাহ্য করিল না। তাহাদের সমবেত শক্তিতে তুলিয়া ধরিয়া তাহারা সেই লোক-সমুদ্রের উপর দিয়া আমাকে যেন ভাসাইয়া লইয়া চলিল হতাশায় আমি অবসন্ন হইলাম, চক্ষু অবসাদে মুদ্রিত হইয়া গেল।

যখন চক্ষু খুলিলাম তখন দেখি আমি এক ভদ্রলোকের গৃহে আশ্রয় পাইয়াছি। আর দেখি রক্তে আমার বক্ষ ভাসিতেছে, পরিধেয় বস্ত্র রক্তাক্ত হইয়াছে।

যিনি গৃহস্থ তিনি একজন পরিণত-বয়স্ক ব্রাহ্মণ। বাড়ীর অবস্থা দেখিয়া তাঁহাকে ধনাঢ্য বলিয়া বোধ হইল। তাঁহারই পুত্রেরা যত্নের সহিত আমাকে বাড়ীতে লইয়া আসিয়াছে। আমি নিয়তির উপর নির্ভর করিয়া তাঁহাদের যত্নদত্ত আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। প্রতিবাদে কোনও ফল নাই বলিয়া আর কোনও প্রতিবাদ করিলাম না।

ব্রাহ্মণের সদয় আতিথ্য মনে পড়িলে এখনও পর্য্যন্ত আমি চোখের

জল সম্বরণ করিতে পারি না। তাঁহার পুত্রেরা না থাকিলে আমার জীবন থাকিত কি না সন্দেহ। কেন না যে সময় আমি তাঁহাদের গৃহ পরিত্যাগ করি, তখন অত্যধিক রক্তপাতে আমি একরূপ চলচ্ছক্তি হীন হইয়াছি। ব্রাহ্মণের এক পুত্র ডাক্তার। তিনি যত্নসহকারে আমার চিকিৎসা করিয়াছেন। 'শুধু তাই নয়, গাড়োয়ান আমা অপেক্ষাও গুরুতর আঘাত পাইয়াছিল। তিনি তাহারও শুশ্রূষা করিয়া এবং কিঞ্চিৎ অর্থ দিয়া তাহাকে বিদায় দিয়াছেন।

আমি কে, কোথা হইতে আসিতেছিলাম, কোথায় যাইতেছিলাম প্রথমে এসকল প্রশ্ন তিনি করেন নাই। অপরাহ্নে যখন আমি বিদায় লইতে চাহিলাম, তখন তিনি আমার পরিচয় জানিতে ইচ্ছা করিলেন। আমি অকপটে যখন তাঁহাকে সমস্ত ঘটনা বলিলাম, তখন তিনি পূর্ব্বাহ্নের সমস্ত অবস্থা হৃদয়ঙ্গম করিলেন, এবং নিজের গাড়ী করিয়া ও ডাক্তার পুত্রকে সঙ্গে দিয়া আমাকে বাড়ী পাঠাইয়া দিলেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম, এ।

হক্‌-মেলা।

হক্‌-মেলা। (Huka Mella)

হক্‌-মেলা অর্থে নষ্ট দ্রব্যের পুনঃপ্রাপ্তি বুঝায়। আমাদের দেশে কাহারও কোন দ্রব্য অপহৃত হইলে তাহা পাইবার জন্য বাটী চালা, নল চালা করার কথা শুনা যায়। হক্‌মেলাও তদনুরূপ কার্য্য। বাটী চালাতে যেমন কোন পরিষ্কৃত স্থানে একটি বাটি বসাইয়া তাহার উপর মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া ক্রমাগত ফুঁ দিতে হয়, শেষে বাটিটি গতিশীল হইয়া এক দিকে ছুটিতে থাকে এইরূপ যেখানে নষ্টদ্রব্য লুক্কায়িত আছে অথবা চোর যেস্থানে আছে সেইস্থানে উহা যাইয়া স্থির হয়, কোন লোকের নিকট থামিলে সেই লোককে চোর বলিয়া বুঝিতে হয় এবং কোন জনহীন স্থানে যাইয়া থামিলে সেই স্থানে অপহৃত দ্রব্য প্রোথিত বা লুক্কায়িত থাকা বুঝা যায়। নল চালাতে বাঁশ ঝাড় হইতে একটি কঞ্চি কাটিয়া তাহা মৃত্তিকাতে না স্পর্শ করে এরূপে সংগ্রহ করিয়া উহাকে লম্বালম্বি চিরিয়া দুই প্রান্ত দুই জনায় ধরিয়া থাকে এবং ওঝায় মন্ত্র পড়িয়া ফুঁদিতে থাকে, ক্রমে ঐ নলের গতি হয়, এবং যাহারা ধরিয়া থাকে তাহাদের ঐ গতির বশে চলিতে হয়, শেষে নাকি চোরের নিকট যাইয়া উপস্থিত হয়। এইরূপ কথা বাল্যকাল হইতে শুনিয়া আসিতেছি, কোথাও এইরূপে চোর ধরা দেখি নাই, কেহ এইরূপে চোর ধরিতে সক্ষম হইয়াছে বলিয়া বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত হওয়াও যায় নাই। এই কারণে এরূপ ব্যাপার অনেকটা অবিশ্বাসের কথা বলিয়াই আমাদের ধারণা ছিল।

বর্ত্তমান সনের জুলাই মাসের থিয়জফিষ্ট পত্রিকায় নীলগিরি-উপাখ্যানে শ্রীমতী ব্লাভাট্স্কি মহোদয়া দুইটি ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা আমাদের অবিশ্বাসের কোন কারণ না থাকায় উক্ত প্রকার ঘটনা অলৌকিক রহস্যে এপর্য্যন্ত লিপিবদ্ধ না হওয়ায় আমরা নিম্নে উক্ত প্রবন্ধ হইতে ঘটনা দুইটির ভাবানুবাদ তুলিয়া দিলাম।

১। এই ঘটনাটি ১৮৮৪ সালের ২৯শে মে তারিখের "আসাম নিউজ্" নামক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। একটি ব্রাহ্মণের বাটীতে চুরি হয়। ব্রাহ্মণটির বাটী আসামের অন্তর্গত গোলাঘাটে। বহু চেষ্টায় চোরের সন্ধান হইল না ও নষ্ট দ্রব্যের পুনঃপ্রাপ্তি ঘটিল না। শেষে ব্রাহ্মণটি "চকমেলা" করিবার বাসনা করিলেন। আসামে ইহাকে "গতিশীল লাঠী" (runningstick) কহে। মহীধর নামক বিখ্যাত ওঝাকে তিনি ডাকিয়া আনিলেন। তিনি আসিয়াই প্রথমে ব্রাহ্মণের বাঁশ ঝাড় হইতে একটি বাঁশ কাটিলেন। বাঁশটি লইয়া তিনি ব্রাহ্মণের বাটীর সদর দরজায় বসিয়া—কোন পথিকের সহিত সাক্ষাতের অপেক্ষায় রহিলেন। কিছু পরেই স্থানীয় কমিশনর আফিসের রচপার নামক একজন কেরাণীকে যাইতে দেখিয়া তাহাকে ওঝা ডাকিলেন এবং সমুদয় কথা তাহাকে বুঝাইয়া, তিনি ব্রাহ্মণের অপহৃত দ্রব্য পুনঃ প্রাপ্তিতে সাহায্য করিতে প্রস্তুত আছেন কিনা জিজ্ঞাসা করিলেন। রচপার সম্মত হওয়ায় ওঝা সেই বংশখণ্ডটি মন্ত্রপূত করিয়া তাহার হাতে দিলেন। বংশখণ্ডটি হাতে করিবামাত্র কোন অলৌকিক শক্তি বলে সে দৌড়াইতে বাধ্য হইল, লোকটি বলিল বংশখণ্ডটি যেন তাহার হাতে জড়াইয়া গিয়াছে এবং তাহাকে টানিয়া লইয়া যাইতেছে। ঐ ব্রাহ্মণ এবং বহুলোক কেরাণীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিল। একটি ছোট পুকুরের নিকট আসিয়া রচপার তাহার বংশখণ্ড পুকুরের মধ্যস্থল লক্ষ্য করিয়া কহিল "এইস্থানে

খনন কর।" পুকুরের জল ছাঁচিয়া ফেলা হইল এবং কাদা খুঁড়িয়া অপহৃত দ্রব্যের কতকঅংশ প্রাপ্ত হওয়া গেল।

ব্রাহ্মণ ইহাতে সন্তুষ্ট হইয়া অবশিষ্ট দ্রব্যগুলি পাইবার জন্য ওঝাকে বলায় তিনি ঐ বংশখণ্ডকে পুনরায় মন্ত্রপূত করিলেন এবং পুনরায় উহা রচপার কেরাণীর হাতে দিলেন। রচপার দৌড়াইতে বাধ্য হইল, যেন লাঠি তাহাকে টানিয়া লইয়া যাইতে লাগিল। এইবার সে অন্য দিকে যাইল ও ব্রাহ্মণের বাটীর নিকটে একটি গাছের তলায় থামিল। সেই স্থান খুঁড়িতে বলিল। সেই স্থান খুঁড়িয়া অবশিষ্ট অপহৃত দ্রব্য পাওয়া গেল।

এই ঘটনার পর পুলিসে রচপারকে ধৃত করিল এবং চোর অথবা অপহৃত দ্রব্যের গ্রাহক বলিয়া—চালান দেওয়ায় বিচারে উহার পোনের মাসের কারাদণ্ড হয়, হাইকোর্ট বিচারেও ঐ দণ্ড বাহাল থাকে। এই রূপে জড়বাদের জয় হইল। কেরাণী রচপার চোর না হইলে সে চোরাই মাল যে স্থানে ছিল তাহা কিরূপে দেখাইয়া দিতে পারে। এইরূপ মকদ্দমা উঠায় সম্ভবতঃ উহা আসাম নিউসে প্রকাশ হইয়াছিল, এবং ঘটনা মিথ্যা হইলে মকর্দ্দমায় মিথ্যা প্রমাণ হইত।

২। এই ঘটনাটী শ্রীমতী ব্ল্যাভাট্স্কির নিজ জীবনে ঘটে। একদা তাঁহার ব্রুচ ও চেন চুরি যায়। পরদিন একটি স্থানীয় ফকির একটি পঞ্চম বর্ষীয় বালিকার হস্তে—লাঠি মন্ত্রপূত করিয়া দেওয়ায় অপহৃত দ্রব্য পাওয়া গেল। ফকির কিছুই লইলেন না এই অঞ্চলে ঐ বালিকাটির সাহায্যে এই রূপ ব্যাপার প্রায়ই হয়। (From Theosophist for July 1910 page 1249—Mysterious tribes.)

শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

—

পাঞ্চজন রহস্য।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

বাস্তবিক এক এক বংশের কণ্ঠস্বর এক এক প্রকার হইয়া থাকে। বংশের আদি পুরুষের কণ্ঠস্বর তদ্বংশাবলীর কণ্ঠস্বর হইয়া থাকে। এই কণ্ঠস্বরে স্বরতত্ত্ববিৎ যোগীরা ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিকে, তাহাদের পরস্পরের রূপ-সাদৃশ্য থাকিলেও ভিন্ন বংশীয় বলিয়া জানিতে পারেন। এটি তত্ত্বজ্ঞ মহাপুরুষদের একটি গুহ্যতর শক্তি। ব্রাহ্মণ-কন্যার এই শক্তি নিরতিশয় প্রখরা ছিল। তদ্ভিন্ন তিনি কি প্রকারে কণ্ঠস্বর শুনিয়া আপনার পতি নহেন স্থিরীকৃত করিলেন। অতঃপর আমি বাহকদিগকে কহিলাম—আমি অনেকক্ষণ হইতে রাস্তারদিকে চাহিয়া রহিয়াছি আর্য্যপুত্র এখনও ফিরেন নাই। উনি কে এবং কি বলিতেছেন। একজন বাহক বলিল—কেন উনি যে ঠাকুর মহাশয়।

ব্রাহ্মণী কহিলেন—"ব্যাটারা কি আকাট মূর্খ কাহাকে কি বলে কিছুই বুঝিতে পারে না। তোরা কি মানুষ চিনতে পারিস্ না?" আমি অসহায়া স্ত্রীলোক। তাহাদিগকে নিবারণ করিতে পারিলাম না। তাহারা উঁহার কথাতেই ডুলি উঠাইল। আমার কথায় কর্ণপাত না করিয়া চলিতে লাগিল। আমি হতবুদ্ধি হইয়া কিছুই করিতে পারিলাম না। কারণ আমার কথা শোনে কে? খানিক দুর যাইতে যাইতেই দেখি আর্য্যপুত্র আমাদের পশ্চাতে ধাবমান। উচ্চৈঃস্বরে বলিতেছেন "কে ডুলি লইয়া যায় রে? তুই কে রে?" সে অতি রুক্ষভাবে উত্তর করিল "তুই কে রে? কি বলিতেছিস" আমি স্ত্রী লইয়া বাটী যাইতেছি।" অল্পক্ষণ পরেই তিনি নিকটস্থ হইলেন। এবং বাহকদের গতি রোধ

করিলেন। উভয়ে বাগ্‌ বিতণ্ডা ও তুমুল ঝগড়া আরম্ভ হইল। সে ঝগড়ার নিষ্পত্তি কিছুতেই হইল না। কত পান্থ আসিয়া সমস্ত ব্যাপার আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিয়া মধ্যস্থ হইল, কিন্তু ঝগড়া মিটিল না। উহারা উভয়েই ভুলির পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতে লাগিল পরিশেষে সেই ছদ্মবেশী ব্রাহ্মণ এই কহিল "যে এস্থানে যদ্যপি কোন ধর্ম্মাধিকরণ থাকে আমি যাইতে প্রস্তুত আছি। তথায় যাহা বিচার হইবে আমি তাহার অমান্য করিব না।" এই বলিয়া ছদ্মবেশী ব্রাহ্মণ ও আমার স্বামী এই রাজদ্বারে উপস্থিত হইয়াছেন। অদৃষ্টে কি ঘটিবে বলিতে পারি না। ব্রাহ্মণ-কন্যা রাজ্ঞীর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন "মা আমি অত্যন্ত বিপদাপন্না। আপনি যেমন এই স্থানে আসিয়া আমাকে রক্ষা করিয়াছেন। আপনাদের মঙ্গল হইবে, সেইরূপ যদি আপনি আমার শ্বশুরালয়ে বিশেষ বন্দোবস্ত করিয়া প্রেরণ করেন তবে এ জীবন রাখিব। অন্যথা আত্মহত্যা করিয়া ইহার শেষ করিব।" রাজ্ঞী এই কথা শুনিবামাত্র অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইলেন এবং কন্যাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "ভয় কি মা, তুমি যখন আমাদের আশ্রয়ে আসিয়া পঁহুছিয়াছ, তখন আর তোমার কোন ভাবনা নাই। আমি তোমাকে অভয় দান করিতেছি এবং প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইতেছি তোমাকে নিরাপদে তোমার শ্বশুরালয়ে পাঠাইয়া দিব। রাজা অন্দরে আসিলে আমি সমস্ত কথাই তাঁহাকে কহিব এবং যথাবিহিত বিবেচনা করিব।"

রাত্রি প্রহরাধিক অতীত হইলে রাজা অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। রাজ্ঞী তাঁহাকে পরিচর্য্যা করিয়া এই ব্যাপার আদ্যোপান্ত তাঁহার নিকট বর্ণনা করিলেন। রাজা শুনিয়া চমকিয়া উঠিলেন। এবং বলিলেন, "কি বিভ্রাট্‌। এমন কি কখন হয়? কেহ কখন কি শুনিয়াছে? দিবাভাগে ভূতযোনি মানবের রূপ ধরিয়া মনুষ্যরূপে বেড়াইতে পারে?

আমিত কখন শুনি নাই। এই প্রথম শুনিলাম। এবং প্রত্যক্ষ দেখিতেছি। যাহা হউক এ বিষয়ে বিশেষ বিচার আবশ্যক। বিচার না করিয়া কেবল বধূমাতার কথার উপর নির্ভর করিয়া এক জনকে দণ্ডবিধান করা ধর্ম্মবিরুদ্ধ, ন্যায়বিরুদ্ধ এবং রাজনীতি-বিরুদ্ধ; এবং কাহাকেই বা দণ্ডবিধান করিব? উভয়েরই রূপ প্রায়ই একপ্রকার। যাহা হউক কল্য ইহার বিচার হইবে। অদ্য যাহা যাহা করিতে হইবে কর্ম্মচারিগণকে বলিয়া আসিয়াছি। তুমি বিশেষ যত্ন-সহকারে বধূমাতাকে রক্ষা করিও। স্ত্রীলোকের স্বামীই জীবন। স্বামীহীন জীবন মরুসদৃশ। দেখিও, যেন জীবন-রক্ষা হয়। বলিও তাঁহাকে লোক-সমভিব্যাহারে শ্বশুরালয়ে প্রেরণ করিব। এরূপ সাহস-বাক্যে তাঁহাকে উৎসাহিত না করিলে তিনি আহারাদি গ্রহণ করিবেন না। শুনিয়াছি তিনি কল্য হইতে অনাহারে আছেন। অনাহারে শুষ্ককণ্ঠ হইয়া প্রাণত্যাগ করিলে, তুমিই স্ত্রী হত্যার পাতকিনী হইবে। যাহাতে আহারাদি করেন তদ্বিষয়ে যত্নবতী হইবে।"

পরদিন প্রত্যূষে প্রহরীদ্বয়কে রাজ-সন্নিধানে আসিবার আজ্ঞা বাহির হইল। প্রহরীরা অতিমাত্র ব্যস্ত হইয়া তাহাই করিল।

প্রহরীরা রাজ সমীপে উপস্থিত হইলে, রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন—কেমন হে গত রাত্রিতে তোমরা কি উহাদের স্বগতাদি কিছু শুনিতে পাইয়াছিলে?

প্রথম প্রহরী কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিল—মহারাজ, আমি যাঁহার দ্বাররক্ষক ছিলাম, তিনি সমস্ত রাত্রি "হা হতোঽস্মি, আমার কপালে কি এই ছিল। প্রিয়তমা ভার্য্যা হারাইলাম। হা হতবিধে, তোমার মনে কি এই ছিল, আমি বৃদ্ধ পিতামাতার পরিচর্য্যার্থ স্ত্রীকে নিয়োজিত করিব বলিয়া যে সংকল্প করিয়াছিলাম, আমার সে সংকল্পে তুমি প্রতিবাদী

হইলে? আমি কি মহাপাপী। ইহজীবনে বৃদ্ধ পিতামাতার পরিচর্য্যা আমার ব্রতস্বরূপ মনে মনে জাগরূক ছিল। তুমি তাহা করিতে দিলে না? আমি দরিদ্র, দাস দাসী রাখিয়া তাঁহাদের সেবা ও শুশ্রূষা ইচ্ছানুরূপ হইতে পারে না, তাহা আমি জানি। হা ভগবান কি করিলে।" এই প্রকার কাতরোক্তিতে সমস্ত রাত্রি অতিবাহিত করিয়াছেন।

দ্বিতীয় প্রহরীকে ইঙ্গিত করিবামাত্র সে গললগ্নীকৃতবাস হইয়া শুশ্রূষু নরপতিকে নিবেদন করিল। মহারাজ, আমি যাঁহার দ্বাররক্ষা করিয়াছিলাম, আমার বোধ হইল, আনন্দাধিক্য বশতঃ তিনি কখন উদ্ধতহাস্যে হা-হা-করিয়া, কখন কেমন এক খেলা খেলিয়াছি বলিয়া, প্রথম রাত্রিতে নানা প্রকার প্রগল্‌ভতাব্যঞ্জক স্পর্দ্ধার কথা উচ্চারণ করিয়া নিরস্ত হইয়াছিলেন। এবং রাত্রি-শেষে নানাবিধ অস্ফুট বচন উচ্চারণ করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে স্পষ্ট ভাবে এই কথা গুলি শুনিতে পাইয়াছিলাম "মহারাজ যে বিচারই করুন না কেন আমাকে দণ্ড দেওয়া বড় কঠিন। আমি ইচ্ছা করিলে এই গবাক্ষছিদ্র দিয়া এই মুহূর্ত্তে গৃহনিক্রান্ত হইয়া যাইতে পারি। তবে এই স্ত্রীরত্নের লোভে পড়িয়া একটা কাণ্ড করিয়া ফেলিয়াছি। তাই এই ঘরে আবদ্ধ আছি। আমার আবার বন্ধন। আমি যে নির্ব্বন্ধ। আমি মনে করিলে অদৃশ্যভাবে এই স্ত্রীদেহে আবিষ্ট হইয়া থাকিতে পারি। দেখা যাউক রাজার বুদ্ধি ও বিচার। বিচারে দণ্ড হইলে আমার কি করিবে? আমি অদৃশ্যে এই ভূমণ্ডল যথাপূর্ব্ব তথাপর প্রদক্ষিণ করিব। আমার কি লইবে? আমার বলিতে জগতে কিছুই নাই। কেবলমাত্র একটি তালগাছ আছে। কিন্তু তাহা কে জানে আমার? সুতরাং আমার তালগাছ আমারই থাকিবে। ভয় কিসের? আমিই অন্য জনের ভয়। আমি বিচার গৃহে রাজার ভীতি উৎপাদন করিয়া দুই একটি অমানুষিক ক্ষমতার পরিচয় দিব, তিনি কোন্ বিবেচনায় বলিবেন স্ত্রী আমার নহে? যদি বিচারে স্ত্রী আমার নাই হয়, ফিরিয়া যাইব। আমার তাল গাছ ত কেহ নেবে না। বিচারে স্ত্রী আমার হইবে নিশ্চয়ই জানি। না হয়, তাল গাছের ভূত তাল গাছেই যাবে।"

(ক্রমশঃ)

শ্রীমতিলাল রায়।

অলৌকিক রহস্য।

৫ম সংখ্যা] দ্বিতীয় ভাগ। [ভাদ্র—১৩১৭ ।

চাঁদপুর
১০।৭।১০

মান্যবর সম্পাদক মহাশয় !

আপনার "অলৌকিক রহস্য" মাসিক পত্রে প্রেতাত্মা সম্বন্ধীয় অনেক অলৌকিক ঘটনার সমাবেশ দেখিয়া আমার নিজ জীবনের কয়েকটি প্রত্যক্ষ ঘটনাও উহাতে প্রকাশিত হইবার জন্য আপনাকে অনুরোধ করিয়া এই পত্র দিলাম। ইতিপূর্ব্বে আমি প্রেততত্ত্ব নামে এক খানা পুস্তক প্রণয়ন করি; উহার পাণ্ডুলিপি শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম, এ মহাশয় নিজে দেখিয়া, উহার সম্বন্ধে যে পত্র দেন, তাহাও নিম্নে লিখিত হইল। আমার ইচ্ছা যে আমার ঐ পুস্তক খানা আপনার পত্রিকায় ধারাবাহিক রূপে মুদ্রিত হউক। পত্রিকায় লিখিতে হইলে যাহা অনাবশ্যক বলিয়া অনুমান করেন, তাহা বাদ দিয়া ছাপিতে আমার কোনই আপত্তি নাই এবং কতক কতক আমিও বাদ দিয়াই লিখিয়া পাঠাইতেছি। আপনার পত্রিকায় এই সমুদায় ঘটনা লিখিবার জন্য শ্রীযুক্ত হীরেন বাবুও আমাকে বলিয়াছিলেন। ইতি

নিবেদক
শ্রীসুরেশচন্দ্র গাঙ্গুলী।

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের পত্র।

শ্রীহরিঃ

১১।১।০৯

শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র গাঙ্গুলী মহাশয়েষু।

সবিনয় নিবেদন—

আপনার প্রেততত্ত্ব গ্রন্থের পাণ্ডুলিপির অনেকাংশ আমি পাঠ করিয়াছি। আপনার গ্রন্থে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় আছে এবং যে ভাবে রচনা করিয়াছেন, তাহা বেশ

চিত্তাকর্ষক হইয়াছে। আমার বিশ্বাস, আপনার গ্রন্থ প্রকাশিত হইলে সাধারণে আগ্রহ সহকারে পাঠ করিবে। আপনার গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগ সম্পূর্ণ করেন, ইহা আমার ইচ্ছা। ইতি

ভবদীয়
শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত।

প্রেত-তত্ত্ব।

১ম ভাগ।

ভূমিকা।

বাল্যকাল হইতেই সাধ ছিল যে, যে কোন উপায়েই হউক, প্রেততত্ত্ব এবং পরকাল অথবা পরলোক সম্বন্ধে কিছু তত্ত্ব সংগ্রহ করিব। কিন্তু এই বিষয়টি এত সহজ নহে যে, ইচ্ছা করিলেই ইহার একটা কূলকিনারা নির্ণয় করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ দৃশ্য জগতের সহিত উহার সম্বন্ধ এক প্রকার নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তারপর যে টুকু সম্বন্ধ রহিয়াছে, তাহাও এতই জটিল সমস্যায় পরিপূর্ণ যে, এই সম্বন্ধে সামান্য তর্ক বিতর্ক দ্বারা উহার মীমাংসা করিয়া উঠা দুষ্কর। এইরূপ অবস্থায় এমন একটা দুরূহ বিষয়ে যে কতটা কৃতকার্য্য হইতে পারিব, তাহা ভগবানই জানেন

সংসারে যত লোকই কাজ করে, সকলেই কোন না কোন বিষয়ে সামান্য দু-একটুকু সাফল্যের চিহ্ন না পাইয়া থাকে, এমন নহে। আমার আশা ও উচ্ছ্বাসের ভিতরেও সেইরূপই একটুকু সফলতার ক্ষুদ্র সম্ভাবনা দেখিয়াই এই দুরূহ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছি। তবে সাংসারিক কর্ম্মের সফলতার সম্ভাবনা যেমন অপরের আয়ত্ত বিষয়কে অবলম্বন

করিয়াই প্রলুব্ধ করে, আমার এই বিষয়টি তেমন নহে। আমার সেই ক্ষীণ অবলম্বন শুধুই "হিষ্টিরিক ফিট"। এই বিষয় অথবা ব্যাধিটি ধরিয়া প্রেততত্ত্বের আলোচনা করিতে যাইয়া সর্ব্বদাই আমাকে একটুকু অত্যধিক সতর্কতার সহিত চলিতে হইতেছে। কারণ, যাহাকে এতকাল মানব-সমাজ ব্যাধি বলিয়াই ধারণাকে বদ্ধমূল করিয়াছে, আমি তাহাকেই, শুধু আমার সংস্কার ধরিয়াই, বলিতে প্রয়াসী হইয়াছি যে, উহা ব্যাধি নহে, "ভূতাবেশ"।

যে অবস্থা, এবং লক্ষণাদি অবলম্বন করিয়া এই ব্যাপারে লিপ্ত হইয়াছি, সেইরূপ লক্ষণাক্রান্ত অবস্থা যে ব্যাধি হইতে পারে না, তাহা নহে। তবে আজ পর্য্যন্ত যে কয়টী লোক আমার অধীনে থাকিয়া স্বাস্থ্য অথবা মুক্তিলাভ করিয়াছেন, তাহাদের প্রায় সকলেরই একই অবস্থা দর্শনে আমার এইরূপ দৃঢ় প্রতীতি হইতেছে যে, এইরূপ অবস্থাক্রান্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে শতকরা ৯৫ জনই যে ভূতাবিষ্ট, তাহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। এই সম্বন্ধে যদি কেহও কোন প্রত্যক্ষ কিম্বা প্রতিকার ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে আমি অম্লান বদনে ঐ ভার গ্রহণ করিতে সম্মত আছি।

ভূতাবেশ অথবা হিষ্টিরিয়া সম্বন্ধে আলোচনা করিতে যাইয়া দেখিয়াছি যে, ভূতাবেশ হেতু মানব-দেহে অনেক প্রকার ব্যাধির আবির্ভাব হইয়া থাকে, যাহা আবেশ-মুক্ত হইলেই স্বাভাবিক ভাবেই আবির্ভূত হইয়া থাকে, অনেক সময় আবার আবেশ ভিন্নও কেবল প্রেতাত্মার দৃষ্টিতে পড়িয়াও অনেক ব্যাধি হইয়া থাকে।

যতক্ষণ পর্য্যন্ত মানবাত্মা প্রেতাত্মাকে গ্রাহ্য না করে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত প্রেতাত্মার মানব আত্মার উপরে কোনই আধিপত্য বিস্তারের ক্ষমতা থাকে না। Hypnotism দ্বারা যেমন, যখন তখনই মানব-শরীরে

নানা প্রকার গ্লানি উপস্থিত করা যায় এবং ঐ সময়ে যেমন তাহার কোনই আত্মস্বাধীনতা থাকে না, প্রেতাত্মাগণও তেমনই দূর হইতে মানব আত্মাকে আত্ম-অধীনতাবদ্ধ করিবার জন্য ইচ্ছাশক্তির পরিচালনার দ্বারা মানব-শরীরে ব্যাধির সৃষ্টি করিয়া দিয়া আত্মাকে দুর্ব্বল করিয়া ফেলে এবং পরিশেষে সুযোগ ও সুবিধা অনুসারে দেহ-প্রবিষ্ট হয়। এই ইচ্ছাশক্তির পরিচালনাকেই সাধারণতঃ লোকে দৃষ্টি বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকে। আমার নিজের কর্ম্ম-প্রত্যক্ষ অনেক ঘটনা দ্বারাই আমি এই-রূপ সিদ্ধান্তে পঁহুছিয়াছি এবং আমার দৃঢ় সূত্রে বিশ্বাস যে, আমার এই ধারণা মোটেই অমূলক নহে।

আর একটি বিষয় দেখিয়াছি যে, অনেকে মৃত্যুশয্যায় কিম্বা বিকার অবস্থায় এমনভাবে আলাপ করিতেছে, যেন নিশ্চয়ই সে কাহাকেও দেখিতে পাইতেছে এবং নানা বিষয়ের আলাপ করিয়া তৃপ্তি লাভ করিতেছে। এইরূপ ঘটনা যদিও ২।৪ টির অধিক দেখি নাই; কিন্তু একটি অত্যন্ত আশ্চর্য্যজনক ঘটনাই দেখিয়াছি যাহার সকল কথাই শেষে কার্য্যে পরিণত হইয়াছে। এই ঘটনাটি আমার প্রেততত্ত্বের শেষাংশে লিখিত আছে।

হিষ্টিরিক্ ফিট প্রকৃতই ভূতাবেশ কি না, যদিও ইহার প্রমাণ তত দুরূহ বলিয়া বিবেচনা করি না ও এই ৩।৪ বৎসরের আলোচনায় এবং অনেক আবিষ্টের আবেশ-মুক্তি প্রত্যক্ষ করিয়া উহাকে ভূতাবেশ বলি-তেই সাহস করি, কিন্তু তবুও এখন ঐ সমুদায় বিষয়ের কোনও বিশেষ সমালোচনা কিম্বা যুক্তিতর্ক দ্বারা বিজ্ঞান-সম্মত বলিয়া প্রচার করিতে ইচ্ছা করি না। কারণ ভূতাবেশ এবং রোগশক্তির মধ্যে যে কি কি পার্থক্য রহিয়াছে, তাহা বহুসংখ্যক রোগীর এবং আবিষ্টের লক্ষণাদি বিশেষভাবে বিচার না করিলে এই দুই অবস্থাকেই কোন্ কোন্ অবস্থা

অথবা লক্ষণ স্বাভাবিক, তাহা ৩০। ৩৫টি মাত্র লোকের অবস্থা দেখিয়াই চূড়ান্ত মীমাংসা করিতে যাওয়া উচিত নহে। তবে আমি বিশ্বাস এবং আশা করি যে, এই হিষ্টিরিক ফিটকে এখন যাঁহারা ভূতাবেশ বলিলেই ভ্রূকুঞ্চন করিয়া চলিয়া যান, হয় ত একদিন তাঁহারাই মুক্তকণ্ঠে বলিবেন যে, ব্যাধি নহে, নিশ্চয়ই "ভূতাবেশ"।

হিষ্টিরিয়ার অবস্থাতে যখন আত্মা আসিয়াছে বলিয়া প্রমাণ হয়, তখনই তাহাকে কোনও প্রক্রিয়াদ্বারা আবদ্ধ করি। প্রায় সকল আত্মাই প্রথমতঃ সহজে কথা কহিতে চাহে না। তখন কতক সময় মত না দিলেই কথা কহিতে আরম্ভ করে। আজ পর্য্যন্ত যত লোক আমার হাতে পড়িয়াছে, তন্মধ্যে কেবল দুইটি লোকেরই অবস্থা বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই। যে সমুদায় লোকের ভূতাবেশ বলিরা প্রমাণ হইয়াছে, ভগবানের ইচ্ছায় তাঁহারা সকলেই আজ পর্য্যন্ত সুস্থ শরীরেই আছেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীসুরেশচন্দ্র গাঙ্গুলী।

ভূতের মনুষ্যোচিত আহার।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

পাঠক পাঠিকাগণের মধ্যে অনেকের হৃদয়ে এই প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, এই ভূতটা ছ'খানা বৃহৎ পাঁউরুটি চাহিল কেন? এই প্রশ্নের সমাধান আমিই করিয়া দিতেছি। সে কথা যথাস্থানে বলিতে বিস্মৃত হইয়াছিলাম। ভূতটা স্বয়ং জিজ্ঞাসা করিল, আপনারা বলিতে পারেন, "আমি ছ'খানা রুটি কেন চাহিলাম?" তখন আমরা কেহই ইহার কারণ

জাত নহি বলিয়া প্রকাশ করিলে, সে বলিল, "আমি ভিন্ন আরও পাঁচজন আমার সহচর আছে। আমরা সকলে একসঙ্গেই এই চত্বরে বাস করি। আমরা সকলে খাইব বলিয়া ছ'খানা বড় রুটি চাহিয়াছি।" পাঠকগণ এখন বুঝিলেন ছ' খানা রুটির আবশ্যকতা কেন ?

ইতিমধ্যে বাচন একটি চুপড়ীতে করিয়া সকল দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া লইয়া আসিল। তাহা একগাছি দড়ীদ্বারা ঝুলাইয়া সেই পূর্ব্ব-কথিত রাস্তার পার্শ্বস্থিত কূপ মধ্যে নামাইয়া দেওয়া যাইতে পারে, এইরূপ ব্যবস্থা করিয়া রাখা হইল। সেই ভৃত্যটি এবং আরও একজন লোক সঙ্গে করিয়া রোগীর পিতা ঐ চুপড়ীপূর্ণ দ্রব্য দড়ীদ্বারা ধীরে ধীরে সেই কথিত কূপ মধ্যে নামাইয়া দিলেন। তিনি বলিলেন "৮।১০ ফিট নিম্নে উক্ত চুপড়ী যাইতে না যাইতে আমরা একটা হ্যাঁচ্‌কা টান অনুভব করিলাম। বোধ হইল, কেহ যেন চুপড়ীটি ছিনাইয়া লইয়া প্রস্থান করিল। সে ভীষণ টানে আমার হস্তে বিশেষ বেদনা অনুভব করিলাম। ঝুড়ীটি কোথায় অদৃশ্য হইল এবং আমার অঙ্গুলীতে রজ্জু চিহ্ন লক্ষিত হইল।" ইহার কিয়ৎকাল পরে কৃষ্ণচন্দ্র আহার করিয়া বাহিরে আসিল। সকলে তাহাকে রাত্রিতে একাকী শয়ন করিতে নিষেধ করিলে তাহার মাতা তাহার নিকট শয়ন করিলেন। কয়েক মিনিট পরে কৃষ্ণচন্দ্র তাহাদের ভৃত্য বাচনকে ডাকিয়া বলিল, "তাহার যেন বোধ হইতেছে, কতকগুলি লোক তাহার কর্ণের নিকট আসিয়া ফিস্‌ফিস্ করিয়া কি বলিতে চাহিতেছে। সুতরাং সে কাহারও সঙ্গে সে রাত্রে শয়ন করিবে না। সে তাহাদের (ভূতগণের) সঙ্গে একবার সজ্ঞানে বাক্যালাপ করিবে।" এই কথা শুনিয়া তাহার অপরাপর বন্ধুগণ ভীত হইয়া পড়িলেন। তাহার মাতা তাহার শয্যাপার্শ্বে পৃথক "খাটুলীতে' শয়ন করিয়া রহিলেন। সেস্থান হইতে কৃষ্ণচন্দ্রের মাতা তাহার গাত্রে হস্ত

প্রদান করিতে পারেন, এমত্ত ব্যবধান রহিল মাত্র। অপরাপর ভৃত্যবর্গ ও বন্ধুবান্ধবগণ অন্যান্য ঘরে সতর্কভাবে সময়কর্ত্তন করিতে লাগিল। বন্ধু-বর্গের মধ্যে রামচরণ বলিয়া একব্যক্তি রাত্রি ১ ঘটিকার সময় অপর বন্ধুগণের নিকট বলিলেন, তিনি পাঁচজন ব্যক্তিকে কূপ মধ্য হইতে উত্থিত হইয়া ঐ বৃক্ষাভিমুখে গমন করিতে দেখিলেন। তন্মধ্যে চারিজনকে তিনি চিনিতে পারিলেন না, পরন্তু পঞ্চম ব্যক্তিকে তিনি উত্তমরূপে চিনিতে পারিলেন। পঞ্চম ব্যক্তি একজন সৈনিক পুরুষ, তাহার মস্তকে তরবারির আঘাত দৃষ্ট হইল। তাঁহারা এইরূপ তর্ক বিতর্ক করিতেছেন, ইত্যবসরে বাচন জল পান করিবার জন্য উঠিয়াছে। তখন রাত্রি আন্দাজ দেড়টা হইবে। যে গৃহে কৃষ্ণচন্দ্র শয়ন করিয়াছে, তাহার নিকটেই 'শুরই'তে জল রহিয়াছে। ভৃত্যটি ধীরে ধীরে তাহার শয্যা পার্শ্বে আসিতেছে, এমন সময় সে তাহার কর্ত্তৃঠাকুরাণীকে (কৃষ্ণ চন্দ্রের মাতাকে) কৃষ্ণের শয্যাপার্শ্বে দাঁড়াইয়া থাকিতে, দেখিতে পাইল। সে তাঁহার নিকট যাইয়া চুপে চুপে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিল। প্রভুপত্নী উত্তর করিলেন, "এক ব্যক্তি আসিয়া আমাকে উঠিয়া দাঁড়াইতে বলিল। আমি উঠিবার উপক্রম করিতেছি, এমন সময়ে সে হঠাৎ আমার হস্তধারণ করতঃ, তুমি যেরূপ দেখিতেছ আমাকে তদবস্থায় দাঁড় করাইয়া দিয়াছে।" ভৃত্যটি সত্বর বাবুর বন্ধু-বর্গকে ডাকিল। তাহারা সকলে উপস্থিত হইয়া প্রেতাত্মাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "আবার আসিয়াছ কেন ?"

প্রে। হাঁ, আবার আসিলাম।

একবন্ধু। কেন আসিলে ?

প্রে। আমি বালকটিকে কিছু বলিতে আসিয়াছি। আমি অল্প-ক্ষণই থাকিব। ইহাতে ভয়ের কোন কারণ নাই। দেখিও,

আমাকে বাধা দিওনা। আমি শীঘ্র কার্য্য সম্পাদন করিয়া চলিয়া যাইব।

এক বন্ধু। বালকটির কোন বিপদ হইবার আশঙ্কা আছে কি?

প্রে। কোন আশঙ্কা নাই। আমি ভীষণ প্রতিজ্ঞা করিয়াছি। তাহা কি তোমরা সকলে একবারেই বিস্মৃত হইয়াছ? আমার সে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইবে না।

ইত্যবসরে ভৃত্য বলিল, "আপনি যে দ্রব্যাদি চাহিয়াছিলেন, তাহা পাইয়াছেন কি?"

প্রে। পাইয়াছি বৈ কি।

ভৃ। আপনি সে সমুদায় আহার করিয়াছেন কি?

প্রে। (ক্রোধব্যঞ্জকস্বরে)——তোমায় সে সকল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে কে বলিয়াছে? আর এইরূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিও না।

বন্ধুগণ। (ভীত হইয়া) আমরা কি এই বাঙ্গলাতে বাস করিতে পারিব? যদ্যপি অনুমতি করেন, তো আগামী কল্যই এইস্থান পরিত্যাগ করিব।

প্রে। আপনাদের এই বাটী পরিত্যাগ করিতে হইবে না। তবে এই বালকটির পিতার নিকট যে দুইটি নিষেধ বাক্য বলিয়াছি, তাহা সতত পালন করিবেন। তিনি যেন সকলকেই বলিয়া দেন, সকলেই যেন উহা পালন করে। কেবল এই বালক ইহার অপব্যবহার করিতে পারে। তাহার জন্য কোন বাধা-বাধকতা নাই——কারণ তাহাকে আমি অতি আত্মীয়জন বলিয়া জানি এবং তাহাকে বাস্তবিকই ভালবাসি।

বন্ধুগণ। এইস্থানে বাস করিয়া কাহারও পীড়ার বিরাম হইতেছে না। এখনও ১২ জন লোক পীড়ায় শয্যাশায়ী আছে।

প্রে। আগামী কল্যকার মধ্যে আর কাহারও পীড়া থাকিবে না

এই আমার আদেশ-বাক্য। আমার বচন অতি সত্য বলিয়া জানিবেন।

ভূ। আপনি পরিতুষ্ট হইয়াছেন কি?

প্রে। নিশ্চয়ই। একণে তোমরা সকলে এই স্থান হইতে ক্ষণ-কালের জন্য স্থানান্তরিত হও। আমি আমার কার্য্য শেষ করিয়া চলিয়া যাই।

এই কথা শুনিয়া তাঁহারা সকলেই কৃষ্ণচন্দ্রকে একাকী রাখিয়া অন্যস্থানে চলিয়া গেলেন। পাঁচ মিনিট পরে উচ্চৈঃস্বরে এইরূপ কথা বার্ত্তা শ্রুতিগোচর হইল। একজন বলিল, "নমস্কার, আমাকে বিদায় দাও। আমাকে শীঘ্রই প্রস্থান করিতে হইবে।" এই কথাগুলি অতি উচ্চশব্দে প্রতিধ্বনিত হইয়াছিল। বন্ধুগণ সকলে পরস্পরের মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছিলেন। অতঃপর তাঁহারা সকলেই কৃষ্ণ-চন্দ্রের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তাহাকে সুস্থকায় দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলেন। কৃষ্ণচন্দ্র বলিল, "প্রেতাত্মা যাইবার সময়, আমাকে আরও গুহ্যতম কতিপয় বিষয় বলিয়া গিয়াছে। তাহা অপরের নিকট বলিতে নিষেধ আছে।" বন্ধুগণ এই কথা শুনিয়া আর সে সকল রহস্য-মূলক বৃত্তান্ত শ্রবণ করিতে পীড়াপিড়ি করেন নাই। ঐরূপ করিলে অনেক সময়ে বিষময়ফল প্রসব করিয়াছে, তাহাও অনেকে বলিলেন। তবে কৃষ্ণচন্দ্র সে সকল কথার কিঞ্চিৎ আভাস দিয়াছিল মাত্র। সে বলিল, "বিপৎকালে কি প্রকারে উদ্ধার হইতে হইবে এবং জীবনের উন্নতি বিধান কি প্রকারে করা কর্ত্তব্য, সেই সকল বিষয়েও সে উপ-দেশ পাইয়াছে।" কৃষ্ণচন্দ্র অপর বিষয় গুলি নিষেধ আছে বলিয়া প্রকাশ করিতে অনিচ্ছুক দর্শনে তাঁহারাও (বন্ধুগণও) নিরস্ত হই-লেন। এই বন্ধুগণের মধ্যে একব্যক্তি এই সকল গল্প শুনিতে অত্যন্ত

ভালবাসিতেন। তিনি কৃষ্ণচন্দ্রকে বলিলেন, "ঐ প্রেতাত্মা বিদায় হইবার সময় কি তোমাকে নমস্কার করিয়া থাকে?" তখন কৃষ্ণচন্দ্র বলিল, "সৈন্যগণের কাওয়াৎ করিবার সময় যে প্রকার নমস্কার করিতে হয়, তদ্রূপ নমস্কার সে আমাকে প্রত্যেক বারেই করিয়া থাকে। বহু দিন ধরিয়া সে আমাকে কতস্থানে যে খুঁজিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই; কিন্তু সর্ব্বত্রই সে বিফল-মনোরথ হইয়া এই প্রয়াগধামে আসিয়া এক বৎসর ধরিয়া ঐ বৃক্ষে বাস করিতেছে। যখন আমি এই বাঙ্গলোতে অবস্থান জন্য আগমন করিলাম, সে তখন আমাকে অমনি তাহার সৈনিক প্রভু বলিয়া সন্দেহ করিয়া বসিল। একদিন রাত্রে যখন আমি বাঙ্গলোর বাহিরে ঘুমাইতেছিলাম, সে তখন তাহার সন্দেহ বিদূরণ মানসে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ, বলিয়া দুইবার ডাকিয়াছিল, আমি তাহাতে কর্ণপাত না করায় সে আমার পেছু লইয়াছিল। তিন সপ্তাহ গত হইল, একদিন রাত্রে দুইবার তাহাকে সৈনিক পুরুষোচিত বসন ভূষণে আচ্ছাদিত হইয়া ঐ বৃক্ষতলে দণ্ডায়মান দেখিয়াছিলাম। সে আমাকে কয়েকবার অভিবাদনও করিয়াছিল এবং নতজানু হইয়া আমাকে তাহার নিকটে যাইতে আহ্বান করিয়াছিল। কিন্তু আমি ভাবিয়াছিলাম, কোন সৈনিক পুরুষ ঐস্থানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। সেইজন্য আমি ততটা খেয়াল করি নাই। তিনটা রাত্রিতে সেই সৈনিককে তদবস্থায়ই সেথায় দণ্ডায়মান দেখিলাম। সে পুনঃপুনঃ আমাকে অভিবাদন করিতে লাগিল। তখনও তাহাকে গ্রাহ্য করি নাই। অবিরাম চিত্তে শয়ন করিলাম। কিন্তু যখন আমার সন্দিগ্ধ হয়, তখন কয়েকটি কথায় ঐ প্রেতাত্মার অন্বেষিত ব্যক্তি আমিই, তাহার সত্যতা উপলব্ধি করিয়াছিলাম। সে আরও বলিয়াছিল, "তুমি আমার প্রভু। আমি তোমার আজ্ঞা সর্ব্বদা পালন করিব!"

একদিন ঐ প্রেতাত্মা পাঁচটি টাকার জন্য প্রার্থনা করে। যথা সময়ে তাহার জন্য টাকা ঐ বৃক্ষতলে রাখিয়া দেওয়া হয়। পরে আর একটি টাকার জন্য প্রার্থনা করে, তাহাও বালকের (কৃষ্ণচন্দ্রের) জননী তথায় যাইয়া রাখিয়া আইসেন। কিন্তু এই একটি টাকার সম্বন্ধে বাচন ও অপর কয়েক ব্যক্তি 'কাণা-ঘুষা' করিয়াছিল বলিয়া ঐ প্রেতাত্মা বালকের জননীকে আসিয়া বলে, "সেই টাকাটি এখনও বৃক্ষতল হইতে লইয়া আসা হয় নাই কেন? উহা আমি লইব না। ঐ টাকাটি যেন প্রাতঃকাল হইতে না হইতে বৃক্ষতল হইতে লওয়া হয়।" যথা সময়ে তাহাই করা হইল। তখন হইতে কৃষ্ণচন্দ্রের শরীরে কোন ব্যাধি নাই। তদবধি বাটীর পরিবারবর্গকেও আর পুনঃ পুনঃ রোগ-যন্ত্রণা উপভোগ করিতে হইত না। * ইতি

(সমাপ্ত) শ্রীগণপতি রায়।

দিব্যদৃষ্টি।

দিব্যদৃষ্টি বা (Clairvoyance) অর্থে স্পষ্ট দর্শন। ইহাকে অনেকে জ্ঞানদৃষ্টি, সূক্ষ্মদৃষ্টি প্রভৃতি শব্দে অভিহিত করেন। স্থূলতঃ মানব-চক্ষুর অগোচর পদার্থ দৃষ্টি করিবার শক্তিকেই ক্লেয়ারভয়ান্স্ বা দিব্যদৃষ্টি কহে। ইহা নানা প্রকারের হইয়া থাকে, নানা প্রকারে মানব এই শক্তিলাভ

---

* লক্ষ্ণৌ সহরের Messrs Vidyant & Co. বিদ্যান্ত কোম্পানির কর্ম্মচারী, শ্রীযুক্ত যুগল কিশোর মান্নার পুত্র শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্রকে সাহেব ডাক্তার চিকিৎসা করিয়াছিলেন, তাঁহার এ সম্বন্ধে বক্তব্য নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

Dr. Ohdedar says :—"All that I can say is that during my professional career, extending over nearly 27 years, I never saw another case which appeared more like ihat of 'possessed' than this. Certain things that happened in my presence absolutely started me and I am unable to offer any explanation for them."

করিতে পারে, ভালমন্দ নানাবিধ কার্য্যে ইহার ব্যবহার হয়, এবং এই শক্তির স্থায়িত্ব সামান্য ক্ষণ হইতে জন্ম-জন্মান্তর কাল পর্য্যন্ত হইতে পারে।

মানব কি প্রকারে স্থূল দৃষ্টি-শক্তির সম্প্রসারণ করিতে পারে, কি প্রকারে তাহার ইথিরিক, এষ্ট্র্যাল ও মনোময় কোষের দৃষ্টিশক্তির বিকাশ হয়, অনুবীক্ষণ ও দূরবীক্ষণ যন্ত্র সাহায্যে যে সকল ক্ষুদ্র ও দূরবর্ত্তী পদার্থ দেখা যায়, তদপেক্ষা সহস্রাংশ ক্ষুদ্র ও সহস্রগুণ দূরবর্ত্তী পদার্থের দর্শন কিরূপে হয়, অগাধ জলধিতলে বা ভূগর্ভে বহুক্রোশ নিম্নে স্থিত পদার্থ বা জীব কিরূপে মানব নয়নগোচর করিতে পারে, কিরূপে যুগান্তরের পরের ভবিষ্যঘটনা বা গত যুগের অতীত ঘটনা সকল প্রত্যক্ষ-বৎ প্রতীয়মান হয়, কিরূপে সৌরমণ্ডলের মধ্যস্থ গ্রহের যাবতীয় ঘটনা, জীব ও দৃশ্যাদি সম্মুখস্থিত-মত প্রতিভাত হয়, তাহাই আমরা এই প্রবন্ধে আলোচনা করিতে চেষ্টা করিব।

স্বার্থসিদ্ধি বা অর্থলাভ উদ্দেশেই যাহারা কতকটা দৃষ্টিশক্তির সম্প্রসারণ করিয়া থাকে, তাহারা কি উপায়ে সিদ্ধ হয় এবং তাহাদের পথ বিপদসঙ্কুল কেন, সাধারণের এই উদ্দেশ্যে দিব্যদৃষ্টি লাভ করিতে চেষ্টা করা কেন গর্হিত, কিরূপ লোকের সাধারণতঃ অল্লাধিক দিব্যদৃষ্টি থাকে, কাহাদেরই বা এই দৃষ্টি আপনা হইতে বিনা-চেষ্টায় মধ্যে মধ্যে প্রকাশ পায়, তাহার কারণই বা কি, পরার্থে, জীবের কল্যাণের জন্য যাঁহারা এই শক্তিলাভে প্রয়াসী, তাঁহাদের কিরূপে শরীর গঠন করিতে হইবে, কিরূপে তাঁহাদের চরিত্র সংশোধন করিতে হইবে, কি নিয়মে জীবন যাপন করিতে হইবে, কিরূপ লোকের নিকট এই বিদ্যালাভের ক্রিয়া শিক্ষা করিতে হয়, সে লোক কোথায় ও কখন মিলে, কিরূপেই বা এই শক্তির ব্যবহার করিতে হয়, কিরূপ লোকের ইহা লাভে প্রয়াসী হওয়া উচিত, এই সমুদয় আমাদের এই প্রবন্ধের বিষয়ীভূত।

যোগশাস্ত্রে আমাদের দেহে ষট্‌চক্র থাকার বিষয় উল্লেখ দেখা যায়। মেরুদণ্ডের নীচে মূলাধার, নাভিদেশে স্বাধিষ্ঠান, প্লীহা স্থানে মণিপুর, হৃদয়ে অনাহত, কণ্ঠদেশে বিশুদ্ধ এবং ভ্রূমধ্যে আজ্ঞা এই ছয়টি চক্র। মস্তকে সহস্রার নামে আর একটি চক্র আছে, উহাকে চক্র বলিয়া ধরিলে মোটে সাতটি চক্র হয়। মূলাধার চক্রে কুণ্ডলিনী নামে একটি সর্পাকার শক্তি নিদ্রিত অবস্থায় আছেন, উহা অগ্নিময়; তড়িৎ শক্তি (Electrilcty) এবং প্রাণ শক্তি (Vitality) যেমন ভগবৎ-শক্তির দুইটি নিম্নমুখী স্রোত, সেইরূপ এই কুণ্ডলিনীও ভগবৎ-শক্তির তৃতীয় অধোমুখী স্রোত। ইহা তড়িৎ বা প্রাণশক্তির সদৃশ নহে, উহা হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন, ইহার অতি তীব্র তেজ। কুণ্ডলিনী শক্তিকে জাগ্রত করিবার কয়েক প্রকার নিয়ম শাস্ত্রে দেখা যায়। কুণ্ডলিনী জাগ্রত হইলে উহার ঊর্দ্ধ ও অধোগতি হইয়া থাকে, সুচতুর সাধক স্বীয়গুরু উপদেশে উহার গতি সংযত করিয়া উহাকে আবশ্যক মতে চক্র হইতে চক্রান্তরে লইয়া যাইতে পারেন এবং উহাকে যথাস্থানে পুনরায় সংযত করিয়া রাখিতেও পারেন। এইরূপে এই কুণ্ডলিনী যে চক্রে যান, সেই চক্রটী ক্রিয়াশীল ও জীবিত হইয়া থাকে, অর্থাৎ সেই চক্রের সাহায্যে যে সকল ক্রিয়া হয়, সাধারণ লোক অপেক্ষা কুণ্ডলিনী-সিদ্ধ সাধকদের সেই চক্রের ক্রিয়ার সমধিক সম্প্রসারণ হইয়া থাকে। এইরূপে-কুণ্ডলিনী-শক্তি যত অধিকবার চক্রে যাইতে থাকেন, চক্রক্রিয়া ততই বিকাশপ্রাপ্ত ও প্রসারিত হয়। শেষে উহার ক্রিয়ার সম্পূর্ণ বিকাশ ও বিস্তার হইয়া থাকে।

উপরি উক্ত ষট্‌চক্রের মধ্যে মুলাধার বাদে অবশিষ্ট পাঁচটি চক্রের পাঁচটি বিশেষ শক্তির সহিত সম্বন্ধ রহিয়াছে। ভ্রূমধ্যস্থ আজ্ঞাচক্রের দৃষ্টিশক্তির সহিত সম্বন্ধ থাকায় এই চক্রকে কুণ্ডলিনী সাহায্যে জাগরিত

করিতে পারিলে, সাধকের দৃষ্টিশক্তির বিস্তার হইয়া থাকে। সাধক এই চক্র সিদ্ধ হইলে অর্থাৎ বহুবার এই চক্র মধ্যে কুণ্ডলিনাকে আনিয়া থাকিলে তাঁহার দিব্যদৃষ্টি লাভ হইয়া থাকে, তখন ইহাঁর দিব্যদৃষ্টি সম্পূর্ণ ভাবে বিস্তৃত হয়। দুই একবার কুণ্ডলিনা আজ্ঞা চক্রে আসিলেই সাধক নানা প্রকার জীব, নানাস্থান, জাগ্রত অবস্থায় যেন স্বপ্ন দেখিতেছেন এরূপ ভাবে দেখিতে আরম্ভ করেন; ক্রমে নানাবিধ দৃশ্য মেঘের মত অস্পষ্ট ভাবে চক্ষুর সম্মুখে প্রতিভাত হয়; শেষে চক্রে কুণ্ডলিনীর গতিবিধি বহুবার হইলে দিব্যদৃষ্টিশক্তি স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর হইয়া সম্পূর্ণ দিব্যদৃষ্টি লাভ হয়।

সাধারণতঃ দিব্যদৃষ্টি হওয়াকে লোকে তৃতীয় চক্ষু উন্মীলিত হওয়া বলে। জ্ঞানাঞ্জন-শলাকা দ্বারা তৃতীয় চক্ষুর উন্মীলন করা গুরুর কার্য্য। এই চক্ষু খোলার ব্যাপার এক ভাবে সত্য। দিব্যদৃষ্টি পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হইলে যথার্থই আজ্ঞাচক্র মধ্যে একটি চক্ষুর গঠন হয়। এই চক্ষু ইথিরিক পদার্থে গঠিত একটি অতি ক্ষুদ্র সর্পাকার নল (tube), ইহা হাতীর শুঁড়ের মত কমান বাড়ান ও ঘুরান ফিরান যায়। ইহা আজ্ঞাচক্র মধ্য হইতে উদ্ভূত হয়, এবং উক্ত নলের শেষ সীমায় চক্ষুর আকৃতি একটি পদার্থ বসান থাকে। এই চক্ষুর মত পদার্থটিকেও আবশ্যক মত ক্ষুদ্র বা বৃহৎ করা যায়। ইহারই নাম তৃতীয় চক্ষু। দিব্যদৃষ্টির পূর্ণ বিকাশে এই চক্ষুর বিকাশ হয়। ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র সূক্ষ্ম পদার্থ দেখিতে হইলে চক্ষুটিকে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র করিতে এবং কোন বৃহৎ পদার্থ দেখিতে হইলে চক্ষুটিকে অপেক্ষাকৃত বৃহৎ করিতে পারা যায়।

এই সর্পাকার তৃতীয় নয়ন অনুবীক্ষণের কার্য্য করে। ইহার সাহায্যে ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র অণুকে অপেক্ষাকৃত বৃহৎ করিয়া দেখা যায়। ইহাকে ইংরাজিতে ম্যাগ্‌নিফাইয়িং (Magnifying) ক্লেয়ারভয়ান্স্ বলে।

মানবদেহ সাতটি কোষে বিভক্ত। তলওয়ার যেরূপ খাপের মধ্যে থাকে, সেইরূপ আমাদের এই স্থূলদেহের মধ্যে একটির ভিতর আর একটি করিয়া ছয়টি কোষ বা দেহ আছে। উক্ত দেহ কয়টি আমাদের স্থূলদেহের অপেক্ষা ক্রমশঃ সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতর, সূক্ষতম বিধানে বা পদার্থে গঠিত, এবং এই দেহের সহিত ওতঃপ্রোত ভাবে (Interpenetrating) রহিয়াছে। মৃত্যুতে আমাদের স্থূলদেহের নাশ হইলে আমাদের অবশিষ্ট ছয়টি দেহের মধ্যে ইথিরিক দেহটিই সর্ব্বাপেক্ষা স্থূল বলিয়া এই ইথিরিক দেহেতেই আমরা প্রকাশিত হইয়া থাকি, অর্থাৎ আমাদের তখন স্থূলদেহধারী মানব না বলিয়া ইথিরিক দেহী বলে। তখন অবশিষ্ট পাঁচটি দেহ বা কোষ ইথিরিক দেহের ভিতর থাকে। আবার কিছু দিন পরে ইথিরিক দেহ নষ্ট হইলে আমাদের অন্য কয়েকটি অপেক্ষা স্থূল হেতু অ্যাষ্ট্র্যাল্ বা কামদেহে বিরাজ করিতে হয়, অবশিষ্ট চারিটি দেহ বা কোষ সূক্ষ্ম ও সূক্ষ্মতর বলিয়া তখন এই অ্যাষ্ট্র্যাল দেহরূপ বহিরাবরণের ভিতর থাকে। আবার বহুকাল পরে অ্যাষ্ট্র্যাল দেহের মৃত্যুতে উক্ত কোষটিও পড়িয়া যায়, জীব তখন মেণ্ট্যাল বা মনোময় কোষের মধ্যে থাকে। অবশিষ্ট তিনটি কোষ বা দেহও তখন উহার ভিতর থাকে।

উপরে যে ছয়টি চক্রের কথা বলা হইল, ঐ চক্র কয়টি আমাদের স্থূল দেহ মধ্যে নাই। উহারা আমাদের অপর ছয়টি কোষে বা দেহে আছে। উপরের কথিত ইথিরিক, অ্যাষ্ট্র্যাল, মেণ্ট্যাল প্রভৃতি দেহেই আছে। অর্থাৎ আমাদের ইথিরিক কোষে উক্ত ছয়টি চক্র যেমন আছে, তেমনি অ্যাষ্ট্র্যাল কোষেও উহার অনুরূপ স্থানে সেই ছয়টি চক্র আছে, এবং মনোময় কোষেও সেইরূপ আছে, অন্যান্য তিনটি কোষেও আছে।

জীবের ক্রম-বিকাশ বিধান অনুসারে (According to the law or evolution) অ্যাষ্ট্র্যাল কোষের উক্ত চক্র ছয়টি এখনকার শিক্ষিত

লোকদের প্রায় সকলেরই ধীরে ধীরে আপনা হইতে জাগ্রত হইয়াছে। সুদূর ভবিষ্যতে সাধারণতঃ ইথিরিক দেহের চক্র গুলিও ঐরূপে ধীরে ধীরে জাগ্রত হইবে, কিন্তু সে সময়ের অনেক বিলম্ব আছে। ধীরে, অতি ধীরে অ্যাষ্ট্র্যাল দেহের চক্রগুলি জাগরিত ও ক্রিয়াশীল হওয়া হেতু. আজ্ঞা চক্রের জাগরণের ফলে আমাদের দিব্যদৃষ্টি শক্তি অ্যাষ্ট্র্যাল দেহে বিকাশ হইয়াছে; কিন্তু তাহা আমরা অবগত হইতে পারি নাই, এবং আমরা স্থূলদেহে স্থূল ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়াশক্তি ব্যবহারে এতই ব্যস্ত ও অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছি যে, আমাদের উক্ত প্রচ্ছন্ন শক্তি-সকল ব্যবহারে আমরা অবসর পাই না, অব্যবহৃত অস্ত্রের মত উহা পড়িয়া রহিয়াছে। নিদ্রিতাবস্থায় বা মূর্চ্ছাবস্থায় কদাচ ঐ শক্তি, অ্যাষ্ট্র্যাল দেহে থাকাকালে, আমাদের ব্যবহার অনেকের হইয়া থাকে, কিন্তু আমাদের অ্যাষ্ট্র্যাল দেহের স্মৃতি (Consciousness), জাগ্রত অব-স্থায় ভৌতিক দেহের স্মৃতির সহিত মিশিতে না পারায়, নিদ্রাবস্থার ক্রিয়ার বিষয় জাগ্রত অবস্থায় আমাদের স্মরণ হয় না ও কাজেই আমরা তৎসম্বন্ধে অজ্ঞ থাকিয়া যাই। ইচ্ছা করিলেই যে দিব্যদৃষ্টি-শক্তি ব্যবহার করিব, এ ক্ষমতা কাজেই আমাদের নাই। নিদ্রিত অবস্থায় দিব্যদৃষ্টি সাহায্যে কি দেখিলাম, তাহা জাগরিত অবস্থায় আমরা মনে করিতে পারি নাই।

ইচ্ছা করিলেই দিব্যদৃষ্টি শক্তি ব্যবহার করিতে পারিব এবং দিব্য-দৃষ্টি প্রভাবে যাহা দেখিব, তাহা আমরা জাগ্রত অবস্থায়, জাগ্রত অবস্থায় কেন, সকল অবস্থাতেই স্মরণ করিয়া রাখিতে পারিব, এরূপ করিতে হইলে, আমাদের ইথিরিক দেহের আজ্ঞা চক্রকে জাগরিত ও ক্রিয়াশীল করিতে হইবে। অবশ্য ক্রমবিকাশের নিয়মে ধীরে ধীরে এইরূপ জাগ্রত অবস্থা এক সময়ে সকলেরই হইবে, অবশ্য ইহা বহুজন্মের পরের কথা।

ততকাল অপেক্ষা না করিতে ইচ্ছুক হইলে, আমাদিগকে সাধন করিতে হইবে। কুণ্ডলিনীকে মূলাধার চক্রে জাগ্রত করিয়া, উহাকে অন্যান্য চক্রের মধ্য দিয়া আজ্ঞাচক্রে লইয়া যাইয়া, ঐ চক্রকে জাগরিত করিতে হইবে। এইরূপ বিধানে ইথিরিক (পিণ্ড) দেহের আজ্ঞা চক্র জাগ্রত হইলে, আমরা জাগ্রত অবস্থায় দিব্যদৃষ্টি শক্তি ব্যবহার করিতে পারিব, এবং এই দর্শনের ফলে যে সকল জ্ঞানলাভ করিব, তাহা আমাদের স্মৃতি-পথে থাকিবে, ইহা স্থূল দেহের দৃষ্টিশক্তি ব্যবহারের মত প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিবে। ইহার সাহায্যে নানাবিধ গূঢ় তত্ত্বের সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারিব। *

(ক্রমশঃ)

শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

একটি মাদুলি।

"বাবু সাহেব! বাবু সাহেব!!"—আজ কয়েক মাস হইল, আমি কলিকাতা সহরের আলিপুর অঞ্চলে কোন নিভৃত পথে যাইতে যাইতে, হঠাৎ উপরোক্ত সম্ভাষণ শুনিলাম। ফিরিয়া দেখিলাম, একজন ফকির আমাকে ডাকিতেছেন। আমার কৌতূহল হওয়ায় দাঁড়াইলাম। ফকিরও অগ্রসর হইয়া, আমার নিকট দাঁড়াইলেন ও হিন্দুস্থানী ভাষায় বলিলেন, "তোমাকে ডাকিলাম বলিয়া কি তুমি অসন্তুষ্ট হইলে?"

আমি বলিলাম, "না। আপনার কি বলিবার ইচ্ছা, বলুন।"

* চক্র ও কুণ্ডলিনী সম্বন্ধে সমধিক জানিতে হইলে বর্ত্তমান সনের মে মাসের থিয়জফিষ্ট পত্রিকায় মাননীয় লেডবিটার মহোদয়ের প্রবন্ধ দেখিতে হইবে। এস্থলে সংক্ষেপে কতক উল্লেখ হইল মাত্র।

আমাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া, তিনি বলিলেন, "তোমার উপর সন্তুষ্ট হইয়া আমি তোমাকে এই দ্রব্যটি দিতেছি। মাদুলি করিয়া ধারণ করিও। ইহাতে তোমার মঙ্গল হইবে।"

আমি দ্রব্যটি লইলাম। দ্রব্যটি ছোট একটি মটরের মত বস্তু; মাদুলির ভিতর অনায়াসে রাখা যায়। অনেক কথাবার্ত্তার পর ফকির বিদায় লইলেন; আমিও ব্যাপারটা কি, ভাবিতে ভাবিতে গৃহে গেলাম। দ্রব্যটি নিজে রাখিতে ইচ্ছুক না হইয়া, কোন আত্মীয়া স্ত্রীলোককে দিলাম। ৮ দিন পরে ঐ ফকিরের সহিত পুনরায় সাক্ষাৎ হয়। সেবার আর তাঁহার প্রসন্ন মুখ নাই; ভারি বিরক্তিভাব। দেখা হইবামাত্র নানারূপ অনুযোগ করিতে লাগিলেন। কারণ কি জিজ্ঞাসা করায় বলিলেন,—"যে দ্রব্যটি তোমাকে দিয়াছিলাম, তাহা তোমার নিজের ব্যবহারের জন্য। অন্য লোককে কি জন্য দিয়াছ?"

আমি অবাক্ হইয়া কিয়ৎক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলাম। আমি যে, সে দ্রব্যটি অপর লোককে দিয়াছি ফকির কিরূপে জানিলেন? যাহা হউক, আমি ফকিরের নিকট প্রতিশ্রুত হইলাম যে, দ্রব্যটি আমি নিজেই রাখিব। ফকির সন্তুষ্ট হইলেন এবং বলিলেন, "তোমার উপর প্রসন্ন হইয়া দিয়াছি। তোমার নিজের রাখা কর্ত্তব্য।"

কয়েক দিন পরে আমার সেই আত্মীয়া স্ত্রীলোকের সহিত সাক্ষাৎ হইলে, তিনি নিতান্ত ভীতা হইয়া বলিলেন যে, একজন ফকির আমাকে স্বপ্নে দেখা দিয়া বলিলেন যে, "যে দ্রব্যটি তোমার নিকট আছে, তাহা তুমি কি জন্য রাখিয়াছ? আমি তোমাকেত দিই নাই। বাবুকে দিয়াছি। অবিলম্বে যাঁহার দ্রব্য তাঁহাকে দাও। তাঁহার উদ্দেশ্যে দিয়াছি। তোমাকে দিই নাই।" তিনি ঐ স্বপ্ন দেখিয়া, এত চঞ্চল হইয়াছিলেন যে, নিজের ব্যয়ে একটি মাদুলি গড়াইয়া তাহার ভিতর

দ্রব্যটি রাখিয়া আমাকে ধারণ করিতে দিলেন। স্বপ্নে যে ফকিরকে দেখিয়াছিলেন, তাঁহার অবয়ব অবিকল আমার দৃষ্ট ফকিরের মত বর্ণনা করিলেন। আমি দ্রব্যটি লইয়াছি ও ধারণ করিয়াছি। তাহার পর আর ঐ ফকিরকে দেখি নাই এবং আত্মীয়াও স্বপ্নে দেখেন নাই। মঙ্গল হওয়া না হওয়া ফকিরের আশীর্ব্বাদ ও ইচ্ছা; কিন্তু ব্যাপারটা কিছু অলৌকিক মনে হইল।

গল্পটি ছোট, কিন্তু ইহাতে কিছু চিন্তা করিবার বিষয় আছে। প্রথম, আমি যে দ্রব্যটি নিজে না রাখিয়া কোন আত্মীয়া স্ত্রীলোককে দিয়াছি, ফকির কিরূপে তাহা জানিলেন। আত্মীয়া অন্তঃপুর-বাসিনী; তাঁহার সহিত ফকিরের দেখা হয় নাই এবং দেখা হইবার সম্ভাবনাও ছিল না। দ্বিতীয়, আত্মীয়াকে স্বপ্নে ঐ দ্রব্য আমাকে ফিরাইয়া দিবার কথা বলা। কোন্ শক্তি বলে ফকির জানিলেন যে, আমি নিজে ধারণ না করিয়া, অপরকে দিয়াছি এবং যাঁহাকে দিয়াছি, তাঁহাকে স্বপ্নে জানাইলেন যে, তুমি নিজে রাখিও না; যাঁহার দ্রব্য তাঁহাকে দাও। এই শক্তি অলৌকিক বটে, কিন্তু অস্বাভাবিক নয়। সাধনের দ্বারা ঐ শক্তি উপার্জ্জন করা যায় এবং যাঁহারা সেই সাধন করেন, তাঁহাদের ঐ শক্তি আসে। জগতে অনেক অদ্ভুত শক্তি দেখিতে পাওয়া যায়, যাহার কারণ বুঝা যায় না। যখন ষ্টীম এঞ্জিন ছিল না, তখনকার লোক প্রথম ষ্টীম এঞ্জিন দেখিয়া ভৌতিক কাণ্ড মনে করিতেন। এখন সকলেই বুঝিতেছেন, কি শক্তি বলে রেলওয়ে ট্রেণ চলিতেছে।

প্রকৃতির অন্তরালে যে কত শক্তি প্রবাহিত হইতেছে, তাহা যাঁহারা আয়ত্ত করিয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষে উহা স্বাভাবিক; যাঁহারা করেন নাই বা কখন দেখেন নাই তাঁহাদের নিকট অস্বাভাবিক। স্থূল জগতের শক্তি ও সূক্ষ্ম জগতের শক্তি এতদুভয়ের মূল এক,—স্থূল সূক্ষ্ম ভেদ মাত্র। ষ্টীম

এঞ্জিন স্থূল শক্তি বলে চলে, আর যে শক্তিতে ফকির জানিতে পারিয়াছিলেন যে, দ্রব্য আমি রাখি নাই, তাহা সূক্ষ্ম-শক্তি-বলে জানিয়াছিলেন। একটি শক্তি ভূলোকের অপরটি ভুবর্লোকের। ভুবর্লোকে যাঁহাদের দৃষ্টি আছে, তাঁহারা ঐ শক্তিকে খুব স্বাভাবিক মনে করেন, আর যাঁহাদের তাহা নাই, তাঁহারা অলৌকিক মনে করেন। উভয়ই স্বাভাবিক।

শ্রীপ্রণবানন্দ শর্ম্মা।

অদ্ভুত পরিণয়।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

পীতাম্বর বালককে বুঝাইল যে, একটা মানুষ মশাল হস্তে করিয়া চলিয়া গেল। কিন্তু নিজে সেই অগ্নি মধ্যে একটী পরিচিত মূর্ত্তি দেখিয়া বিস্মিত হইল। তাহার আর বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। সে দেখিল, যেন সেই প্রণয়াকাঙ্ক্ষিণী যুবতী তাহার দিকে বাহু প্রসারণ করিয়া ছুটিয়া আসিতেছিল।

সে দিন ভ্রাতুষ্পুত্রটিকে লইয়া পীতাম্বর বাটী ফিরিল, কাহাকেও কিছু বলিল না। পর দিন একা সেই নির্জ্জন স্থানে অন্ধকার রাত্রিতে আসিয়া উপস্থিত হইল। পীতাম্বর সাহসী পুরুষ, তাই আজ সাহসে ভর করিয়া ব্যাপার কি জানিবার জন্য একাই আসিয়াছে। কিছুক্ষণ পরেই সেই দিনের মত একটা অগ্নিপিণ্ড সেই শ্মশান হইতে—যেখানে মোক্ষদাকে দাহ করা হইয়াছিল—সেইখান হইতে ধীরে ধীরে মনুষ্যমূর্ত্তি ধরিয়া পীতাম্বরের নিকট দাঁড়াইল। পীতাম্বর সবিস্ময়ে দেখিল, ইহা সেই মোক্ষদার অগ্নিময়ী সজীব মূর্ত্তি। মোক্ষদা বলিল—"আজ তুমি আমাকে বিবাহ কর। আমার এত প্রেম, এত ভালবাসা ঘৃণায় প্রত্যাখ্যান করিয়াছ, আমি সাধ্য সাধনা

করিয়া তোমার হইতে পারি নাই, আমার সেই তীব্র আকাঙ্ক্ষায় মৃত্যুর পরেও আমি জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিতেছি, কিন্তু এখন আর রক্ষা নাই। যদি আমাকে বিবাহ না করিতে চাও, এই দেখ আমার সর্ব্ব শরীরে অগ্নি, ইহার দ্বারা ভস্মীভূত করিয়া ফেলিব, অথবা তিল তিল করিয়া পোড়াইয়া মারিব। আজ তুমি আমার,—কিছুতেই ছাড়িব না।"

এই বলিয়া সে নিজের অগ্নিময়ী মূর্ত্তি দেখাইতে লাগিল। পীতাম্বর একটু ভীত হইল। পরক্ষণে সে বলিয়া উঠিল—"না, মা তোমাকে আমি বিবাহ করিব না। তুমি মরিয়াছ। তুমি ভিন্ন জাতি, তোমাকে স্পর্শ করিলেও আমার পাপ আছে।"

এই কথা শেষ হইতে না হইতেই সেই প্রেতমূর্ত্তি হি, হি করিয়া হাসিয়া উঠিল। সে হাসিতে পীতাম্বরের আত্মা শুকাইয়া গেল। সে চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখিতে লাগিল। পীতাম্বর ভীত হইয়া দৌড়াইয়া পলাইবার উদ্যোগ করিল; কিন্তু সেই প্রেতাত্মা তাহার পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, এবং বলিতে লাগিল—"আজ তুমি আমার হাতে পড়িয়াছ, যেরূপে হয় তোমাকে বশীভূত করিব।"

ধীরে ধীরে প্রেতমূর্ত্তি পীতাম্বরের শরীর স্পর্শ করিল, সেই স্পর্শে পীতাম্বর শিহরিয়া উঠিল। সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অবশ হইয়া আসিতে লাগিল। সে মন্ত্র-মুগ্ধের ন্যায় সেই প্রেত-মূর্ত্তির সহিত উন্মুক্ত আকাশের বিস্তীর্ণ আবরণের নিম্নে, চতুর্দ্দিক শৃগাল কুকুরের বিকট চীৎকারের মধ্যে, কি যেন কেমন একটা দুর্ব্বোধ্য শক্তিকর্ত্তৃক অভিভূত হইয়া, উন্মত্তের প্রায় আমোদে আত্মহারা হইয়া রহিল। তাহার যেন মনে হইল, অবয়ব-বিশিষ্ট সৌন্দর্য্যময়ী মোক্ষদা, সম্পূর্ণ অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাহার জঘন্য প্রবৃত্তি, তাহার আকাঙ্ক্ষিত পাপ-বাসনা, চরিতার্থ করিয়া লইতেছে।—কিছুতেই পীতাম্বর তাহার সেই আকর্ষণ হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারিল না।

সেই প্রেতিনীর সহিত পৈশাচিক ক্রীড়া করিতে দুই তিন মাস কাটিয়া গেল। রাত্রি হইলে, পীতাম্বর শত কার্য্য ফেলিয়া ছুটিয়া, সেই শ্মশানের নিকট আসিয়া উপস্থিত হয়। সেই সময়ে তাহার মনে হইত, কে যেন তাহাকে জোর করিয়া ঘরের বাহিরে লইয়া আইসে, কি যেন একটা তীব্র উন্মাদনায় সে শ্মশানের দিকে ধাবিত হয়। কত চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু কিছুতেই সে এই অলক্ষিত আকর্ষণের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পায় নাই। সোনার সংসার, সাধ্বী স্ত্রী, প্রাণপ্রিয় ভ্রাতুষ্পুত্রদ্বয়, কেহই সেই আকর্ষণের প্রতিরোধ করিতে পারে নাই। লজ্জায়, ঘৃণায়, ভয়ে, বিস্ময়ে, পীতাম্বর সহস্রবার প্রতিজ্ঞা করিয়াছে, ভগবানের নাম লইয়া, পত্নীর হাত ধরিয়া শপথ করিয়াছে; কিন্তু রাত্রি আসিলে, কেমন একটা মোহে আচ্ছন্ন হইয়া, ক্ষিপ্তের ন্যায় পীতাম্বর ছুটিয়া বাহির হইয়াছে, প্রতিজ্ঞা ভুলিয়াছে। তাহার সেই সুন্দর মূর্ত্তি কঙ্কালে পরিণত হইয়াছে, এখন পীতম্বরকে দেখিলে ভয় হয়। কে যেন ধীরে ধীরে, তাহার দেহের সমস্ত রক্ত, সমস্ত মাংসপেশী, শোষণ করিয়া লইতেছে। কাহার পাপ-সংস্পর্শে যেন পীতাম্বরের পবিত্র মুখে, সদা-সরল-গম্ভ, কর্ত্তব্য-পরায়ণতা এবং দৃঢ়তা-ব্যঞ্জক অবয়বে কালিমা পড়িয়াছে। যে তাহাকে দেখে, সেই এখন বিস্মিত হয়; সেই সন্দেহ করে—কাছে যাইতে ভয় পায়। এক দিন কোন রোজা তাহাকে দেখিতে আসিলেন। দেখিয়া বলিলেন,—"পীতাম্বর! তোমার ভীষণ আকৃতি দেখিয়া মনে হয়, নিশ্চয় তোমাকে প্রেতে আশ্রয় করিয়াছে। সে আর তোমাকে বেশী দিন সংসারে রাখিবে না। যদি মঙ্গল চাও, এখন হইতে সতর্ক হও, আপনাকে রক্ষা করার চেষ্টা কর, নতুবা তোমার রক্ষা নাই।"

পীতাম্বর নির্ব্বাক হইয়া রহিল।

আবার রোজা তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"তুমি হয়ত মনে

করিতেছ, আমি তোমাকে প্রবঞ্চনা করিতেছি, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। যদি তোমার এই ভয়াবহ জীবনের আনুপূর্ব্বিক কাহিনী আমাকে প্রকাশ করিয়া বল, তবে আমি তোমাকে রক্ষা করিতে পারি।”

পীতাম্বর তাহার পা জড়াইয়া ধরিল, আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বলিল। বলিল—“আমাকে রক্ষা কর। আমি দেবতা ছিলাম, পিশাচ হইয়াছি। আজ শ্মশান আমার সেই পৈশাচিক লীলাক্ষেত্র। যে পাপপ্রবৃত্তি আমার মনে কখনও স্থান পায় নাই, দরিদ্র আমি, অশিক্ষিত আমি—প্রাণপণে যে চরিত্র রক্ষা করিয়া আসিয়াছিলাম, জানিনা কোন্ এক শক্তি বলে—পিশাচিনীর কোন্ এক অমোঘ আকর্ষণে আমি তাহা বিসর্জ্জন দিয়া, নিত্য নিত্য পাপ কার্য্যে ডুবিয়া আছি। আমি সবই বুঝি; কিন্তু আর ফিরিবার উপায় নাই। কত চেষ্টা করিয়াছি,—প্রাণপণে এই পাপ কার্য্য হইতে বিরত থাকিবার জন্য চেষ্টা পাইয়াছি, কিন্তু কিছুতেই আমি সেই প্রেতিনীর আকর্ষণ হইতে অব্যাহতি পাই নাই।”

রোজা তাহাকে একটী মন্ত্রপূত তাবিজ ধারণ করিতে উপদেশ দিলেন, এবং বলিলেন,—“সেই প্রেতিনী এই তাবিজ ফেলিয়া দিবার জন্য অনুনয়, বিনয় করিবে, বহুপ্রকারে ভয়ভীতি দেখাইবে এবং নানাপ্রকার করুণ আর্ত্তনাদ করিয়া, তোমার দয়ার উদ্রেক করিতে প্রয়াস পাইবে; কিন্তু যে পর্য্যন্ত না তুমি এই তাবিজ পরিত্যাগ করিবে, সে পর্য্যন্ত তোমাকে স্পর্শ করিতে পারিবে না। কোন ক্রমে ইহা হস্তচ্যুত হইলে, তোমার জীবনের আশা নাই। সেই মুহূর্ত্তেই তোমার মৃত্যু নিশ্চয় জানিও।”

বাস্তবিকই তাহার পরের দিন যদিও অভ্যাস বশতঃ পীতাম্বর শ্মশানে যাইয়া উপস্থিত হইয়াছিল। কিন্তু প্রেতিনী তাহার নিকটে আসিতে পারে নাই। অন্যান্য দিনের মত সেই প্রেতিনী ধীরে ধীরে

অগ্নির একটা পিণ্ডের মত হইয়া তাহার মধ্য হইতে উঠিয়া আসিল, কিন্তু দূরে দাঁড়াইয়া রহিল। কত অনুনয় বিনয় করিয়া, কত ভয় দেখাইয়া, তাবিজ ফেলিয়া দিবার চেষ্টা পাইল, কিন্তু পীতাম্বর কিছুতেই ভীত হইল না। প্রায় দুই তিন ঘণ্টা এইরূপ অবস্থায় থাকিয়া, কাঁদিতে কাঁদিতে সেই প্রেতিনীর মূর্ত্তি বিলীন হইয়া গেল। যাইবার সময় চীৎকার করিয়া বলিয়া গেল,—"জন্মান্তরে ইহার প্রতিশোধ দিব।" পীতাম্বরের জীবিত অবস্থায় আর কোনও উপদ্রব হয় নাই। হুগলি জেলায় বহু ব্যক্তির মুখে এই কাহিনী শুনিতে পাওয়া যায়।

শ্রীসতীন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী।

অপূর্ণ বাসনা।

—:○:—

মৃত্যুকালে আমাদের যে বাসনাগুলি প্রবল ও অপূর্ণ থাকে, মৃত্যুর পরে তাহা পূর্ণ করিবার জন্য অনেক সময় খুব চেষ্টা করা হয়, ইহার কয়েকটি বৃত্তান্ত নিম্নে প্রদর্শিত হইল।

(১)

পিতা ও কন্যা।

মাইকেল কন্‌লি নামক এক ব্যক্তি আমেরিকার এক গ্রাম্য কৃষক। শরীর অসুস্থ হওয়ায় তিনি ১লা ফেব্রুয়ারী ১৮৯১ অব্দে বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য স্থানান্তরে গমন করেন এবং ৩রা তারিখে তথায় তাঁহার হঠাৎ মৃত্যু হয়। পুত্র তারযোগে এই মৃত্যু সংবাদ পাইয়া, সেইখানে উপস্থিত হইলেন এবং সৎকারের জন্য মৃত দেহ গৃহে আনয়ন করিলেন। মৃত

ব্যক্তির একটি কন্যা পিতার মৃত্যু সংবাদ পাইবামাত্র শোকে মূর্চ্ছিত হইলেন, এবং কয়েক ঘণ্টা অচেতন রহিলেন। সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হইয়া তিনি বলিলেন,—"পিতা আমার নিকট আসিয়াছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁহার পায়ে চটিজুতা এবং গায়ে সাদা কামিজ ও কাল পোষাক ছিল। তিনি বলিলেন যে, এক টুক্‌রা লাল কাপড় দিয়া কামিজের একটা পকেট তিনি নিজে প্রস্তুত করিয়াছিলেন, সেই পকেটে কিছু অর্থ আছে। অতএব শীঘ্র সেখানে কেহ যাও এবং ঐ বস্ত্রাদির অন্বেষণ করিয়া লইয়া আইস।"

ইহা শুনিয়া প্রথমে সকলে ভাবিলেন, তাঁহার মাথা খারাপ হইয়াছে। কিন্তু তাঁহার জিদ্ দেখিয়া অবশেষে একটি লোক পাঠান হইল। অনুসন্ধানে যাহা প্রকাশ পাইল, তাহা বড়ই বিস্ময়কর। মৃত্যুর পর যখন মৃতদেহ পরীক্ষার জন্য ডাক্তারের নিকট লইয়া যাওয়া হইয়াছিল, ডাক্তার শবের বস্ত্রাদি বড়ই ময়লা দেখিয়া উহা খুলাইয়া ফেলেন এবং ফেলাইয়া দেন। ঐ পরিত্যক্ত বস্ত্রাদি খুঁজিয়া আনা হইল, এবং দেখা গেল, কন্যা যাহা যাহা বলিয়াছিলেন, উহা অবিকল সেইরূপ—সেই সার্ট, সেই স্লিপার এবং সার্টে ঠিক সেই লাল পকেট। পকেটে কতকগুলি কাগজ পাওয়া গেল; দেখা গেল, উহার মূল্য বড় অল্প নহে—৩০ ডোলার।

(২)

শ্বশুর জামাই।

ব্যারন ভন ড্রিসেন নামক রুসিয়ার এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ১৮৯০ নবেম্বর মাসে এইরূপ লিখিয়াছেন:—

অলৌকিক ঘটনাতে আমার কখনও বিশ্বাস ছিল না এবং এখনও নাই। তবে নিম্নে যে বৃত্তান্তটি দিতেছি, তাহা কিরূপে ঘটিল বুঝিতে

পারি না। বোধ হয় তৎকালে আমার মস্তিষ্কের কোন গোলমাল হইয়া থাকিবে। সে যাহা হউক, ঘটনাটি এই :—নানা কারণে আমার শ্বশুরের সহিত মনান্তর ঘটিয়াছিল। কিন্তু যখন সংবাদ পাইলাম, তিনি মৃত্যুশয্যায় শায়িত, তখন ক্ষণবিলম্ব না করিয়া, সস্ত্রীক তাঁহার বাটীতে উপস্থিত হইয়া যতদিন তিনি জীবিত ছিলেন, তাঁহার সেবা শুশ্রূষা করিতে লাগিলাম। মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি পরিবারস্থ সকলকে (এবং আমাকেও) আশীর্ব্বাদ করিয়া বেশ শান্তভাবে দেহত্যাগ করিলেন। মৃত্যুর পর নবম দিবসে তাঁহার আত্মার সদ্গতির জন্য একটি ধর্ম্মকার্য্য, করা হইবে স্থির হইল। উহার ঠিক পূর্ব্বরাত্রিতে (অর্থাৎ অষ্টম দিনে) আমার বেশ স্মরণ আছে, আমি রাত্রি ১টার পর শয়ন করিলাম। আমার স্ত্রীও তথায় নিদ্রা যাইতেছিলেন। যেমন আমি বাতি নিবাইলাম, অমনই বোধ হইল, পাশের ঘরে কে যেন হাঁটিয়া আসিয়া আমার রুদ্ধ দরজার নিকট দাঁড়াইল। আমি জোরে বলিলাম "কেও?" কোন উত্তর নাই। তাড়াতাড়ি আলো জ্বালিয়া দেখি, অর্গল-বদ্ধ দ্বারের সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছেন—আমার মৃত শ্বশুর। একি তিনি? হাঁ তিনিই তো বটে। ঐ যে তাঁহার পরিচিত গাউন, ঐ যে সাদা ওয়েষ্ট কোট্ এবং কালো ট্রাউজার! বিন্দুমাত্র ভীত না হইয়া আমি বলিলাম "আপনি কি চান্?" ইহা শুনিয়া তিনি আরও দুইপদ অগ্রসর হইলেন এবং আমার শয্যার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া বলিলেন—"বেসিল্, আমি তোমার সহিত বড়ই অন্যায় ব্যবহার করিয়াছি। আমাকে মাপ কর; নচেৎ আমি এখানেও শান্তি পাইতেছি না"—এই বলিয়া তিনি বাম হস্তের দ্বারা উর্দ্ধদিক্ দেখাইয়া দক্ষিণ হস্ত বাড়াইয়া দিলেন। আমি তাঁহার শীতল দক্ষিণ হস্তটি ধরিলাম এবং নাড়া দিয়া বলিলাম "ভগবান্ জানেন, আপনার উপর আমার কোন ক্রোধ নাই।"

তখন তিনি একটু মস্তক অবনত করিলেন এবং বিপরীত দ্বার দিয়া আর একটি ঘরে প্রবেশ করিয়া অদৃশ্য হইয়া গেলেন। আমি পুনরায় বাতিটি নিবাইলাম এবং আমার কর্ত্তব্য পালন করিয়াছি ইহা ভাবিয়া আনন্দের সহিত নিদ্রা গেলাম। পরদিন নির্দ্দিষ্ট ধর্ম্মকার্য্যটি নির্ব্বিঘ্নে সম্পাদিত হইলে, পুরোহিত আমার নিকট আসিয়া চুপে চুপে বলিলেন,—"মহাশয় আপনার নিকট আমার কিছু কথা আছে।" তৎকালে আমার স্ত্রী কেবল আমার নিকট ছিলেন, সুতরাং আমি বলিলাম,—"এখানে স্বচ্ছন্দে বলিতে পারেন।" তখন পুরোহিত গম্ভীরস্বরে বলিলেন,—"কল্য রাত্রি প্রায় ৩টার সময় আপনার শ্বশুর আমার নিকট আসিয়াছিলেন এবং আপনাদের বিবাদ মিটাইয়া দিবার জন্য আমাকে বিশেষ অনুনয় করিয়া গিয়াছেন।"

(৩)

স্বপ্নে আদেশ প্রাপ্তি।

মেরী নাম্নী এক রমণী ব্রেজিল হইতে লিখিয়াছেন "১৮৯৪ জানুয়ারী মাসে আমার এক আত্মীয়ার মৃত্যু হয়। মৃত্যুর পর তাঁহার স্বামী সেই বাটী ছাড়িয়া কয়েক দিনের জন্য আমাদের বাটীতে বাস করেন। বোধ হয় মৃত্যুর দুইমাস পরে একদা রাত্রিকালে আমি একটা তামাসা দেখিতে যাই। ফিরিতে রাত্রি দুইটা হইয়াছিল; সুতরাং বিলম্ব না করিয়া নিদ্রা গেলাম। শেষ রাত্রিতে স্বপ্ন দেখিলাম, যেন আমার মৃতা আত্মীয়াটি আমার শয্যাপার্শ্বে বসিয়া বলিতেছে—"দেখুন, ঐ সিঁড়ির নীচে যে টিন বাক্সটি আছে, উহার মধ্যে একটি মোমের বাতি দেখিতে পাইবেন। ঐ বাতিটি একবার জ্বালাইয়াছিলাম। সে যাহা হউক উহা আমি দেবীকে (ভারজিন মেরীকে) উৎসর্গীকৃত করিয়াছি। অতএব উহা কোন

পুরোহিতের নিকট কৃপাপূর্ব্বক পাঠাইয়া দিবেন।" আমি সম্মত হওয়াতে আত্মীয়া "তবে আসি, পরলোকে সাক্ষাৎ হইবে" বলিয়া প্রস্থান করিলেন। স্বপ্নের পর আমার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। সে রাত্রিতে আর নিদ্রা হইল না। প্রাতঃকালে ষ্টিল বাক্সটি অনুসন্ধান করিয়া বাহির করিলাম। তাঁহার স্বামী অন্যান্য দ্রব্যাদির সহিত উক্ত বাক্সটি আমার বাটীতে আনিয়াছিলেন; সুতরাং এখানে উহা অদ্যাপি খোলা হয় নাই এবং উহার মধ্যে কি আছে, তাহাও জানিতাম না। সে যাহা হউক, বাক্সটি খুলিয়া দেখিলাম, বস্ত্রাদিতে পূর্ণ। তাহার মধ্যে যে একটা বাতি থাকিবে বিশ্বাস হইল না; কিন্তু তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিতে খুঁজিতে ঠিক সেইরূপ একটা বাতি পাওয়া গেল। উহা স্থানীয় পুরোহিতের নিকট পাঠাইয়া দিলাম।"

প্রেতাত্মার পতি-ভক্তি।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

যখন আমরা বাটী পৌঁছিলাম, তখন সূর্য্যদেব অস্ত গিয়াছেন। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ; সুতরাং হস্ত পদাদি প্রক্ষালন করিয়া সন্ধ্যা বন্দনাদি শেষ করিলাম। পরে কিঞ্চিৎ জলযোগ করিয়া রামলাল দাদার সহিত কেনারাম কাকার বাটীতে উপস্থিত হইলাম। কাকা তখন সন্ধ্যা পূজাদি করিতে বসিয়াছেন। তাঁহার পূজায় ব্যাঘাত না করিয়া, অন্দরের রকের একপার্শ্বে আমরা একখানি মাদুর পাতিয়া উপবেশন করিলাম। রকের নীচে প্রাঙ্গণে একটি সেফালিকা বৃক্ষ ও কয়েকটি বেল ফুলের ঝাড়। সকল

গুলিই ফুলে পরিপূর্ণ। ঐ ফুলের সৌগন্ধ বহন করিয়া সন্ধ্যা-সমীরণ শরীর স্নিগ্ধ ও মন মুগ্ধ করিয়া ক্ষণেকের জন্য আমাদের সমস্ত চিন্তা ক্লেশ দূর করিল। রামলাল দাদা একজন ভাবুক লোক, ঈশ্বরে অটল ভক্তি। তিনি বলিতে লাগিলেন—"আমাদের মঙ্গলের জন্য ঈশ্বর এই সমস্ত মনোরম ফল-পুষ্পাদিতে ধরাতল সুশোভিত করিয়াছেন। সমস্ত পদার্থই তাঁহার অসীম দয়ার সাক্ষ্য দিতেছে। যাহা কিছু তিনি করিয়াছেন ও করিতেছেন, সমস্তই জীবের মঙ্গলের জন্য। তথাচ লোক ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করে না, ইহাই আশ্চর্য্য! সন্ধ্যার সময় যখন পিপাসায় কাতর হইয়া বাটীতে আসিলাম, তখন একটি ডাব কাটিয়া মা ঠাকুরাণী তাহার ঠাণ্ডা জল ও নেওয়াপাতি খাইতে দিলেন। তাহাতে শরীর যে কি সুস্থ হইল, সে আর কি বলিব? ঈশ্বরের সৃষ্ট পদার্থ ব্যতীত আর কিছুতেই তেমন সুস্থ করিতে পারিত না। তাই বলিতেছিলাম, দয়াময়ের দয়ার সীমা নাই। এই দারুণ গ্রীষ্মের সময় শীতল পদার্থ ব্যতীত অন্য কিছু মনুষ্যকে তৃপ্ত করিতে পারে না, তা'ই গ্রীষ্মকালে নানাবিধ ফল ফুলের সৃষ্টি। মনে ভাব দেখি, কয়েকটি প্রস্ফুটিত পুষ্প আমাদের কত শান্তি দিতেছে! যেন স্পষ্ট বলিয়া দিতেছে যে, প্রকৃত সুখ ও শান্তি কেবল ঈশ্বরই আমাদিগকে দিতে পারেন। এ সকল দেখিয়াও আমরা তাঁহাকে ভুলিয়া অনিত্য সংসারে সুখের অনুসন্ধান করি।"

আমি। ঐ কথাটা আমি ভাল বুঝিতে পারিলাম না। তুমি বলিলে এবং অনেকেই বলে, ঈশ্বর যাহা কিছু করিতেছেন, সমস্তই জীবের মঙ্গলের জন্য। তবে কেন লোক দুঃখ পায়? সংসারে কেহ সুখী, কেহ দুঃখী হয় কেন?

রাম দাদা। সুখ দুঃখ যে ঈশ্বর সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা বোধ হয় না। উহা কেবল মনের অবস্থা; কারণ উহা হইতে উৎপন্ন, সুতরাং ক্ষণ-

স্থায়ী। যে কারণে উৎপন্ন, তাহা অন্তর্হিত হইলেই সুখ অথবা দুঃখের অবসান হয়। সহিষ্ণুতা ও ধৈর্য্য গুণ থাকিলেই দুঃখকে জয় করিতে পারা যায়। দুঃখকে যে দুঃখ বলিয়া বোধ না করে, সেই প্রকৃত সুখী। সুখ হইতে অনেক সময়ে দুঃখ হয়, আবার দুঃখ হইতেও কখনও কখনও সুখ হয়। ইন্দ্রিয়গণের বহির্বিষয়ের সংযোগজনিত যে সুখ অর্থাৎ ভোগ-বিলাসাদি, তাহা কেবল দুঃখের কারণ। তাহার অভাব হইলেই দুঃখ বোধ হয়। অতএব সুখে কি দুঃখে যাহার মন কোনরূপে বিচলিত না হয়, সেই ইহলোকে স্বর্গসুখ ভোগ করে। জীবগণকে সুখময় করিবার জন্যই বোধ হয় প্রথমে দুঃখ-সহিষ্ণুতা আছে। যেমন সোনা পুড়িয়ে খাঁটি করা। তবে আমরা মহাপাপী, আমাদের সে সহিষ্ণুতা কোথায়? কাজেই আমরা অল্প দুঃখে কাতর হইয়া সমস্ত দোষ ঈশ্বরের উপর চাপাই।

কথাগুলি বড় ভাল লাগিতেছিল। ইচ্ছা হইল, রামলালদাদাকে এ সম্বন্ধে আরও দুই চারিটা প্রশ্ন করি, কিন্তু কেনারাম কাকা তখনই পূজা শেষ করিয়া বাহিরে আসিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন "রকে কে বসে"?

আমি। আজ্ঞা আমি প্রিয়নাথ, আর মাঝের বাটীর রামলাল দাদা।

কেনা কাকা। প্রিয়নাথ এসেছ? কখন এলে? খবর কি বল দেখি?

আমি। প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা আগে এসেছি। খবর সমস্তই মঙ্গল। বধূ দিদির পীড়া যথার্থ হইয়াছিল বটে, এখন অনেক ভাল আছেন, ভয়ের আর কোন কারণ নাই।

কেনারাম কাকা বড়ই চিন্তিত হইলেন। আপনা-আপনি উদাস ভাবে বলিতে লাগিলেন "হুঁ ভয়ের কারণ নাই, হবে"। কিছু পরে জিজ্ঞাসা করিলেন "রামলালকে সমস্ত কথা বলেছ?

আমি। হ্যাঁ ব'লেছি, দোষ কি? রামলাল দাদা এ বিষয় ভাল বোঝেন। এ বিষয়ের অনেক পুস্তকাদি পড়িয়াছেন, অনেক অনুসন্ধান করিয়াছেন। সেই জন্য উহার সহিত পরামর্শ করা উচিত মনে করিয়াছিলাম।

কেনা কাকা। বেশ ক'রেছ, রামলাল বেশ বুদ্ধিমান লোক। পড়া শুন্যাও অনেক করেচে। ওরে বলে বড় ভালই করেচ। আচ্ছা রামলাল! তুমি কি বিবেচনা কর? তোমার সেজ খুড়ির আত্মা যে প্রত্যহ আসিয়া আমার সহিত কথা-বার্ত্তা কহিতেছে, সে বিষয়ে এখন কোন সন্দেহ আছে।

রাম দাদা। আজ্ঞা না, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

কেনা কাকা। কিন্তু ইহার কারণ কি? জীবিতাবস্থায় তাঁহাকে তোমরা সকলেই ভালরূপে জানিতে। তাঁহার মত পুণ্যবতী পতিব্রতা সতী বিরল। বলিতে পার, আমি মোহে মুগ্ধ হ'য়ে তাঁ'র দোষ দেখিতে পাইতেছিনা, কেবল গুণই দেখিতেছি। কিন্তু গ্রাম শুদ্ধ সকলেই তাঁহাকে ভালবাসিত, সকলেই তাঁহার সুখ্যাতি করিত। তবে তাঁহাকে প্রেত-যোনি প্রাপ্ত হইয়া থাকিতে হইল কেন?

রাম দাদা। খুড়িমা যে অতি পুণ্যবতী সতী ছিলেন, তাহা কেহই অস্বীকার করিবে না। তাঁ'র দয়া, দান, পরোপকার, পূজা পার্ব্বণ ইত্যাদি যে দেখেছে, সেই তাঁ'কে দেবী জ্ঞান করিত। তবে আমার বিবেচনায় কেবল যে পাপাত্মারাই প্রেতত্ব প্রাপ্ত হয়, তা' নয়। অনেক ভাল ভাল লোকের আত্মা মৃত্যুর পর আত্মীয় বন্ধুকে দেখা দিয়াছে, এরূপ শুনা যায়। কেবল মায়ার প্রাবল্যেই এরূপ হয়। জীবিতাবস্থায় খুড়িমা আপনাকে অত্যন্ত ভক্তি, অত্যন্ত যত্ন করিতেন। আপনার সেবা করা, আপনাকে সুখে রাখাই, তাঁহার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। ইহা

আমরা সকলেই জানি। সুতরাং তাঁহার মৃত্যুর পর আপনাকে অত্যন্ত কাতর দেখিয়া তাঁহার আত্মা আপনার সঙ্গ ত্যাগ করিতে পারিতেছে না। কিসে আপনি স্থির হন, সুখী হন, তাহারই চেষ্টা করিতেছেন।

কথাগুলি শুনিয়া কেনারাম কাকা কাঁদিয়া ফেলিলেন। একটু স্থির হইয়া ভাঙ্গা ভাঙ্গা স্বরে বলিতে লাগিলেন—"তার ভক্তির ও ভালবাসার তুলনা নাই। আমার সুখের জন্যই সে জীবন পাত করিয়াছে। সেই সকল স্মরণ করিয়াই যেন আমি এত কাতর হইয়া পড়িয়াছি। সে সকল কথা এখন উত্থাপন করিয়া কেবল কষ্ট পাওয়া মাত্র। এখন কিসে তাঁহার আত্মার মুক্তি হয়?"

রাম দাদা। আমার বোধ হয়, আপনি স্থির হইলেই, মন সংযত করিতে পারিলেই, তিনি উচ্চলোকে যাইতে পারেন। আপনি তখন আগে রামায়ণ, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি অনেক শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠ করিতেন। পুনরায় সেইরূপ পড়া শুনায় মন দিন না। তাহা হইলেই মন স্থির হইবে। তা'র পর আমাদের হিন্দুশাস্ত্রে যেরূপ গয়ায় পিণ্ড দিবার বিধি আছে, তাহারও ব্যবস্থা করুন।

কেনা কাকা। গয়ায় পিণ্ড দানের কথা রাজেন্দ্রকে বলিয়াছি কিন্তু এক বৎসর উত্তীর্ণ না হইলে হইবে না। আর পড়া শুনার কথা যাহা বলিলে, তাহাতে মন লাগে কৈ? পড়িতে গেলেই ঐ সকল কথা মনে পড়ে।

রাম দাদা। চেষ্টা করুন, চেষ্টা করিতে করিতেই মন লাগিবে। কখন কখন বা ইষ্টনাম জপ করিলেন, কখন কখন শাস্ত্র গ্রন্থ পাঠ করিলেন। এইরূপ করিতে করিতেই মন স্থির হইবে।

কেনারাম কাকা বলিলেন, "দেখি তা'ই করিব।" তারপর হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন "উঠানে কেও?"

যথার্থই উঠানে শিউলি গাছের তলায় কে বসিয়াছিল। উত্তর হইল "আজ্ঞা আমি রামদাস,প্রাতঃপ্রণাম"। রামদাসের নাম শুনিয়াই আমাদের সকলের মুখ শুখাইল। রামদাস জাতিতে নরসুন্দর (নাপিত), নিজ ব্যবসা ও একখানি মুদির দোকান করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে। কিন্তু তাহার দোকানখানি গ্রামের ইতর ভদ্র সকলের একটি প্রধান আড্ডা। সুতরাং পরনিন্দা ও পর কুৎসার একটি প্রধান আকর। রামদাস স্বয়ং একখানি সম্বাদপত্রের কার্য্য করে। নিজগ্রামের ও নিকটস্থ গ্রাম সমূহের ছোট বড় সমস্ত সমাচার তাহার দ্বারা প্রচার হয়। কেনারাম কাকার বিষয় রামদাস অন্ধকারে বসিয়া সমস্ত শুনিয়াছে সন্দেহ নাই; সুতরাং আর কিছুই গোপন থাকিবে না। সেই জন্যই আমাদের চিন্তা।

কেনা কা। কতক্ষণ এসেচ রামদাস? উঠানে কেন,রকের উপর এস।

রাম। আজ্ঞা এই ১০।১৫ মিনিট আগে এসেছি। দাদা ঠাকুরেরা শাস্ত্রের কথা বল্‌ছিলেন, তাই শুন্‌ছিলেম। বড় ভাল কথা বল্‌ছিলেন, শুন্‌লে শরীর মন পবিত্র হয়।

কেনা কা। চক্‌মকি লও,লইয়া এক ছিলিম তামাক সাজ দেখি। রামদাস তামাক সাজিয়া ২।৩বার উত্তমরূপ কলিকায় টান দিল; পরে হুকা দিয়া জিজ্ঞাসা করিল "খুড়া ঠাকুর! খুড়ি-ঠাক্‌রুণের কথা কি বল্‌ছিলেন? একি কখন সম্ভব! তাঁহার মত সতী লক্ষ্মী কি কখন ভূত প্রেত হ'য়ে থাক্‌তে পারেন! তা'হ'লে যে সৃষ্টি রসাতলে যাবে। ধর্ম্ম কর্ম্ম কি আর কেউ কর্‌বে?"

রাম দাদা। ও কিছু নয়। ওঁর মনের ভ্রম। কি শব্দ টব্দ ঘুমের ঘোরে শুনেছিলেন, তাই বল্‌ছিলেন।

কেনা কা। তা'ই হ'বে বোধ হয়। কারণ, বাড়ীর আর কেউ কিছু দেখ্‌লেনা শুন্‌লে না, শুদ্ধ আমারই কানে কেন গেল! তা' দেখ বাবা রামদাস! এ সকল কথা আর কাহাকেও ব'ল না। গ্রামের লোকের

স্বভাব তো জান, লোকের কুৎসা করিতে পার্‌লে আর কিছু চায় না। তিল্‌কে তাল ক'রে চারিদিকে রাষ্ট্র ক'র্‌বে।

রামদাস। (জিহ্বা কর্ত্তন করিয়া) একি আজ্ঞা ক'র্‌চেন! রাম রাম! একি লোকের কাছে বল্‌বার কথা। খুড়ি ঠাকুরাণীর কত খেয়েছি কত প'রেছি। তাঁর কুচ্ছ কর্‌ব, তা'হ'লে আমার নরকেও স্থান হবে না। কুম্ভিপাকে পাক খেতে হবে। (রামদাস কুম্ভিপাকের নামটা কোথায় শুনিয়াছিল, সুবিধা পাইলেই ঐ কথাটা ব্যবহার করিত)। সে বিষয় নিশ্চিন্ত থাক। ও কথা আর কেহ মুখে আন্‌লে তার কান ম'লে দেব। বল্‌ছিলাম কি, সেই টাকা ক'টার জন্য আজ আস্‌তে বলে-ছিলেন। তা আজ থাক। আজ আর আপনাকে বিরক্ত কর্‌ব না। এখন তবে আসি। প্রাতঃ প্রণাম।

রামদাস কিছু ব্যস্ত হইয়া চলিয়া গেল। পরে বুঝিতে পারিলাম, ঐ সকল কথা প্রচার করিবার জন্যই ব্যস্ততা।

রামলাল দাদা। কাকা ভাল কর্‌লেন না। উহাকে প্রচার করিতে নিষেধ না করিলেই হইত। ও সকল লোকের স্বভাব, যেটি বারণ করিবেন, সেইটি আগে করিবে। রাত্রি প্রভাত হইতে না হইতে শুনিবেন, কথাটা গ্রামময় রাষ্ট্র হইয়াছে।

কেনা কা। তাই তো, লোকটা কেমন অন্ধকারে চুপ করিয়া বসিয়া-ছিল। আমরা কেহই দেখিতে পাই নাই।

রামলাল দাদা। যাগ্‌, কি হ'বে, আর প্রকাশ হলেই বা কি বিশেষ ক্ষতি? এখন তবে আমরাও উঠি, কাল বৈকালে পুনরায় সাক্ষাৎ করিব।

কেনা কা। হ্যাঁ বাবা, তোমরা একবার একবার কাছে এসে বস্‌লে মনটা অনেক ভাল থাকে। (ক্রমশঃ)

শ্রীরাখালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

"পুনরাগমন"।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

বাড়ীতে আসিয়া দেখিলাম, যথার্থই পিতা মুমূর্ষু, মাতা, স্বামী ও পুত্র শোকে একরূপ সংজ্ঞা-হীনা। আমার গৃহ সমমর্ম্মীতে ভরিয়া গিয়াছে। আমার আকস্মিক অন্তর্দ্ধান ও পিতার সাংঘাতিক পীড়া, যুগপৎ সংঘটিত হইয়া সকলকেই বিস্ময়সাগরে ডুবাইয়াছে। আমার অন্বেষণে চারিদিকে লোক ছুটিয়াছে।

আমার অবর্ত্তমানে আমাদের আত্মীয় বন্ধুগণ যে যেখান হইতে সাহায্যার্থ আসিয়াছেন। ডাক্তার বাবু প্রাতঃকাল হইতে আমাদের বাড়ীতেই রহিয়া গিয়াছেন। ডাক্তার বাবুর স্ত্রী ও অন্যান্য অনেক কুল-মহিলা মাতাকে সান্ত্বনা দিবার জন্য সমবেত হইয়াছেন। আমাকে দেখিয়া বহুলোকে ব্যগ্র হইয়া প্রশ্ন করিতে আসিলেন। কেবল মাত্র আমার সহচরের অনুরোধে ও আমার মুখের অবস্থা দেখিয়া তাঁহারা নিরস্ত হইলেন।

আমি পিতাকে দেখিলাম। পিতা সংজ্ঞাহীন, স্পন্দহীন,—মৃতবৎ শয্যায় পড়িয়া আছেন। পিতার অবস্থা দেখিবামাত্র সর্ব্বশরীরে তড়িৎ প্রবাহ ছুটিয়া গেল। প্রিয় গুরুজন বিয়োগের শোকভারে আমি মুহূর্ত্ত মধ্যে অবসন্ন হইয়া পড়িলাম। ডাক্তার বাবু ও পিতার দুই একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু গৃহের ভিতরে অবস্থিত ছিলেন। শুধু তাঁহাদের বাধায় পিতৃবক্ষে আছাড় খাইয়া পড়িতে পাইলাম না। দূর হইতেই পিতাকে ডাকিলাম,—উচ্চৈঃস্বরে ডাকিলাম উত্তর পাইলাম না।

ডাক্তার বাবুর সান্ত্বনাবাক্যে অনেকটা প্রকৃতিস্থ হইলাম। তখন মায়ের কথা মনে পড়িল, আমা হইতেও তাঁর অবস্থা অধিকতর দুঃখের। দেখি মা আমার কি করিতেছেন!

মা যেখানে মহিলামণ্ডলী পরিবৃত হইয়া শুইয়াছিলেন, সেইখানে উপস্থিত হইলাম। আমাকে দেখিবামাত্র ডাক্তার বাবুর স্ত্রী মাকে কিয়ৎ পরিমাণে সান্ত্বনা দিবার জন্য আমার আগমন বার্ত্তা জ্ঞাপন করিলেন। মা মুখ ফিরাইলেন না।

ডাক্তার বাবুর স্ত্রী ও অন্যান্য মহিলা আমাকে দেখিবার জন্য মাকে বারংবার অনুরোধ করিলেন। মা মুখ ফিরাইলেন না।

এই সময়ে সংবাদ পাইলাম, সাহেব ডাক্তার আসিয়াছেন। সুতরাং মাতাকে আর বিরক্ত করিলাম না। তাঁহার মনের অবস্থা অনুমান করিয়া, তাঁহাকে তদবস্থায় রাখিয়া বাহিরে আসিলাম।

ডাক্তারের পরীক্ষায় স্থির হইল, রোগীর অবস্থা চিকিৎসার বার হইয়াছে। পিতার মৃত্যু নিশ্চয় বুঝিয়া, কাঁদিবার জন্য আমি নির্জ্জনে আসিয়া বসিলাম।

কতক্ষণ এই ভাবে উপবিষ্ট ছিলাম জানি না, ডাক্তার বাবুর কথায় আমার হুঁস হইল। মাথা তুলিয়া দেখিলাম, তিনি কালীঘাটের বন্ধুটিকে সঙ্গে লইয়া দাঁড়াইয়া আছেন। বন্ধুটি আমাকে নানা কথায় সান্ত্বনা দিয়া এবং পরদিন প্রাতঃকালে পুনরায় আসিবার অভিলাষ জ্ঞাপন করিয়া বিদায় লইলেন।

ডাক্তার বাবুও বিদায় লইতে চাহিলেন। আমি তাঁহার পা দু'টা জড়াইয়া ধরিলাম। বলিলাম—"আপনার ন্যায় মহদাত্মীয় আমি এখানে আর কাহাকেও দেখিতেছি না, আপনি এসময় আমাকে ত্যাগকরিবেন না।"

ডাক্তার বাবু কাঁদিয়া ফেলিলেন। আমাকে সান্ত্বনা দিতে গিয়া তাঁহারও স্বর বদ্ধ হইয়া আসিল। তিনি বলিলেন—"গোপীনাথ! যে ব্যবসা অবলম্বন করিয়াছি, তাহাতে অনেক মরণোন্মুখের শয্যায় বসিয়া, অনেক জনক জননী, সহোদর ভগিনী, পুত্র কন্যার রোদনধ্বনির মধ্যেও

আপনাকে প্রকৃতিস্থ রাখিয়া, রোগীর রোগ পরীক্ষা করিয়াছি। শুষ্ক চক্ষে কত আত্মীয়ের মৃত্যু দেখিয়াছি, কিন্তু আজ আমি প্রকৃতি হারাইলাম।"

ডাক্তার বাবুর কথা শেষ হইতে না হইতে, বিদায় গ্রহণেচ্ছু বন্ধুগণের সহিত আমার দেখা করিতে হইল।—সকলে যখন চলিয়া গেলেন, তখন আবার আমি ডাক্তার বাবুর হাত চাপিয়া ধরিলাম। বলিলাম,—"এ রাত্রিতে আমি আপনাকে ছাড়িব না।"

ডাক্তার বাবু বলিলেন,—"আমি স্ত্রীকে মায়ের কাছে রাখিয়া যাইতেছি।"

তথাপি আমি তাঁহাকে থাকিবার জন্য জেদ করিলাম। বলিলাম,—"আমি পুত্র হইয়াই পুত্রত্বের কোনও কাজ করিতে পারিলাম না,—আপনি পুত্র না হইয়াও তাহাই করিলেন।"

ডাক্তার বাবু ঈষদুত্তেজিত কণ্ঠে বলিলেন—"আমি পুত্র নই, তোমাকে কে বলিল? গোপীনাথ! যদবধি তোমরা কলিকাতায় আসিয়াছ, তদবধিই আমি তোমাদের গৃহে চিকিৎসা করিতেছি। আমার বহু আত্মীয় আছে, অনেকের সঙ্গে বহুকাল হইতে আমার চিকিৎসা সম্বন্ধও আছে। কিন্তু কি জানি, কেন তোমাদিগের মত আত্মীয় আমি আর কাহাকেও মনে করি না। আমারও বয়স হইয়াছে, মস্তকের সমস্ত কেশই শুভ্র হইতে চলিয়াছে, তথাপি, শুন গোপীনাথ, তোমার গর্ভ-ধারিণীকে আমিও নিজের গর্ভধারিণী ভিন্ন অন্য কিছু মনে করিতে পারি নাই। সেই জন্যইত বলিতেছিলাম—"আজ আমি প্রকৃতি হারাইলাম।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—"পিতার রোগ কি?"

ডাক্তার বাবু বলিলেন—"মায়ের যে রোগ হইয়াছিল, ইহাও তাই"।

"মাত বাঁচিয়াছেন—বাবাকি বাঁচিবেন না।"

"তোমার মাকে যিনি বাঁচাইয়াছেন, তিনি বাঁচাইলে বাঁচিতে পারেন।

একমাত্র ভরসা ঈশ্বর। মায়ের জীবন লাভের পর হইতে আমার দেবতার উপর বিশ্বাস আসিয়াছে। তৎপূর্ব্বে আমি কি ছিলাম, তোমার ত অজ্ঞাত নাই।”

আমি কোন উত্তর করিলাম না। কেবল মাত্র দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিলাম। মনে মনে ভাবিলাম,—“কই! আমারত কিছু হইল না! এত ঝড় ঝাপট আমার উপর দিয়া চলিয়া গেল, আসন্নবিপদ হইতে এতবার উদ্ধার পাইলাম, মৃত্যুমুখ হইতে মায়ের পুনরাবর্ত্তন দেখিলাম,—তাহাতে দেবতার হাত যেন দেখিতে পাইলাম, কিন্তু কই তবুও আমার দেবতাতে বিশ্বাস হইল না।”

ডাক্তার বাবু বলিতে লাগিলেন—“তুমিই আমাকে এই বিশ্বাস দান করিয়াছিলে। তাহার পূর্ব্বে ভগবানের অস্তিত্বেই আমার সন্দেহ ছিল। তোমার জননীর আরোগ্য লাভের আমি আজিও পর্য্যন্ত কোনও কারণ নির্ণয় করিতে পারি নাই। অন্ততঃ চিকিৎসা বিজ্ঞানেত ইহার কোনও কারণ নির্দ্দেশ করিতে পারে নাই। একমিনিট কাল হৃদয়ের স্পন্দন অনুভব করিতে পারি নাই। কার্য্যকারণ সম্বন্ধ যত বারই নিরূপণের চেষ্টা করিয়াছি, ততবারই কেবল আমি দেবতার হাত দেখিয়াছি।”

“আর কি দেখিতে পাইব না ডাক্তার বাবু?”

“তা কেমন করিয়া বলিব! তবে কি জান গোপীনাথ, মায়ের মুর্ত্তিতে বিধবার লক্ষণত কিছুই দেখিতে পাই না। এমন মা বিধবা হইবে!”

“কেন হইবে!” দেবতার আশ্বাস বাণীর ন্যায় কথা গৃহমধ্যে ধ্বনিত হইল। চমকিত হইয়া মাথা তুলিয়া দেখিলাম, আশ্বাস বাণী খুল্লপিতামহের মূর্ত্তি ধরিয়া যেন আকাশ ভেদ করিয়া সেই ম্লান গৃহে আবির্ভূত হইয়াছেন।

ডাক্তার বাবু সসম্ভ্রমে উঠিয়া খুল্লপিতামহের পদধূলি গ্রহণ করিলেন।

আমি আর পিতামহের প্রতি শ্রদ্ধাপ্রদর্শনের অবকাশ পাইলাম না। মাকে তাঁহার আগমন সংবাদ দিতে ছুটিলাম।

মা পূর্ব্ববৎ নিস্পন্দভাবে শুইয়াছিলেন। মহিলাগণ দুই একজন ব্যতীত যে যাহার গৃহে চলিয়া গিয়াছেন। ডাক্তার বাবুর স্ত্রী কেবল তাঁহার গাত্রে হস্ত সমর্পণ করিয়া বসিয়াছিলেন। আমি উপস্থিত হইবা-মাত্র তিনি মায়ের গা ঠেলিয়া বলিলেন—"মা পুত্র তোমার, বারংবার ব্যাকুল হইয়া তোমার কাছে আসিতেছে। একবার তাহার সঙ্গে কথা কও! তোমার মুখের কথা শুনিতে পাইলে সে বুঝি অনেকটা সান্ত্বনা পায়। মা! তাহাকে নিরাশ করিয়োনা।"

আমি মায়ের পদপ্রান্তে বসিয়া অনুচ্চস্বরে ডাকিলাম "মা!" জননী উঠিয়া বসিলেন, উদাসভাবে একবার আমার পানে চাহিলেন, গৃহের চতুর্দ্দিক চাহিলেন। পাছে অতি উল্লাসে তাঁহার স্বাস্থ্য হানি ঘটে, এই ভাবিয়া ধীরভাবে খুল্লপিতামহের আগমনবার্ত্তা আমি তাঁহার কাছে নিবেদন করিতে যাইতেছি, এমন সময়ে মা বলিলেন—"কই আমি তোমাকেত ডাকি নাই! আমি যাঁহাকে এতক্ষণ ধরিয়া একমনে ডাকিতেছি, তিনি কই? আমার গুরু, ইষ্টদেব,—তিনি কি কন্যার কথা শুনিতে পাইলেন না—আসিলেন না!"

"এই যে আসিয়াছি মা!"

মুহূর্ত্ত মধ্যে গৃহটার ভিতরে যেন বৈদ্যুতিক লীলা চলিয়া গেল। আমরা সকলেই যেন মন্ত্র মুগ্ধের ন্যায় যুগপৎ দাদার পদপ্রান্তে পতিত হইয়াছি। মা সাষ্টাঙ্গে ভূপতিতা,—সংজ্ঞাহীনা। ছোট টাকুরদা তাঁর মাথায় হস্ত দিয়া বলিলেন—"উঠ মা লক্ষ্মী! আত্মহারা হইতেত আমি তোমাকে শিক্ষা দিই নাই! উঠ প্রকৃতিস্থ হও,—আমার শিক্ষা পণ্ড করিও না।"

বাস্তবিকই মা প্রকৃতিস্থ হইয়া উঠিয়া বসিলেন। ডাক্তার বাবু ছোট ঠাকুরদার সঙ্গে সঙ্গেই আসিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন—"একবার রোগীর গৃহে পদধুলি প্রদান করুন।"

"চল যাই।" এই কথা বলিয়াই মাকে নির্দ্দেশ করিয়া তিনি আবার বলিলেন,—"আমি রাধানাথকে দেখিয়া আসি। ভয় কি! তোমার দেহে বৈধব্যের কোন চিহ্নত দেখিতে পাই নাই, তবে তোমাকে ভয় করিতে হইবে কেন?"

কে যেন আমার কানে বলিয়া গেল—"যা হতভাগা, তোর বাপ এ যাত্রা বাঁচিয়া গেল।" বুঝিলাম মনের বিশ্বাস আমার সহিত কানে কানে কথা কহিতেছে। বুঝিলাম পিতাকে ফিরিয়া পাইয়াছি।

(ক্রমশঃ)

শ্রীক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ।

স্বপ্ন-তত্ত্ব। *

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

তৃতীয় অধ্যায়।

১। স্বপ্ন-তত্ত্বের উদ্দেশ্য।

"স্বপ্ন" আমাদিগের নিকট একটা নূতন বিষয় নয়। আমাদিগের মধ্যে সকলেই কখনও না কখন স্বপ্ন দেখিয়াছেন। স্বপ্ন হইতে কত লোক জীবনের পূর্ব্বাভ্যস্ত পথ ত্যাগ করিয়া নূতন স্রোতে ভাসমান

* পূর্ব্ব সংখ্যার "মিলিন্দা" স্থানে মুদ্রাকরে "সিলিন্দা" হইয়াছে।

হইয়াছেন। স্বপ্নে মানুষকে কাঁদিতে হাসিতে, ভয়ে জড়সড় হইতে, ক্রোধের উত্তেজনায় আস্ফালন করিতে দেখা যায়। এই স্বপ্ন কি? উহার কতটা সত্য? কিরূপ কার্য্য করিলে স্বপ্নও আমাদিগের সাধনার সহায় হইতে পারে? স্বপ্নে কিরূপে আত্মানুশীলন হয়? এই সমস্ত তত্ত্ব সংক্ষেপে ব্যক্ত করাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

১। যে উপাধিগুলির সাহায্যে জীবাত্মা বিষয় ভোগ করেন,—ভাণ্ড, পিণ্ড ও সূক্ষ্মদেহ,—সেই উপাধিগুলির প্রথমে আমরা বিচার করিব।

২। তাহার পর দেখিব কিরূপে আমাদিগের চৈতন্য বা চিদণু এই সমস্ত উপাধির অধিপতি হইয়া, তাহাদিগকে কার্য্যে নিযুক্ত করে।

৩। নিদ্রাকালে চৈতন্যের ও দেহের কিরূপ অবস্থা হয়।

৪। মনুষ্য যত প্রকার স্বপ্ন দেখে, তাহারা কিরূপে নিদ্রাকালীন উপাধি ও চৈতন্যের অবস্থা হইতে স্বতঃই প্রসূত হয়।

২। উপাধি।

আমার দেশ, আমার বাড়ী, আমার ঘড়ি, আমার হাত, আমার পা, আমার দেহ, এইরূপ প্রয়োগ, আমরা অহরহঃ করিয়া থাকি। এইরূপ আমার সহিত অপর কোন বিষয়ের সম্বন্ধ স্থাপন লইয়াই আমার আত্মত্ব। ইহাই শাস্ত্রকারের "সংসার-প্রপঞ্চ"। দৃষ্টতঃ এই দুইটি বিভিন্ন পদার্থের, কিরূপে যোজনা হয়,—এটি অতি জটিল তত্ত্ব। এই তত্ত্বের মীমাংসা করিবার জন্যই সমস্ত দর্শন শাস্ত্রের সৃষ্টি। এই তত্ত্বের মীমাংসা করা, আমার প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। তবে এই মাত্র বলিতে পারি যে, "আমি" "আমার" এবং জগতের সমস্ত বস্তুর মধ্যে, একটা সাধারণ "কিছু" বর্ত্তমান আছে এবং তাহার জন্যই এই সমস্ত দৃষ্টতঃ বিভিন্ন পদার্থের মধ্যে স্বতঃই সম্বন্ধ স্থাপনের চেষ্টা দেখিতে পাওয়া যায়। যে শক্তি এক মূর্ত্তি জ[illegible] . তর আত্মীয়তা করাইতেছে, সেই যোজনা-শক্তি,

আর এক মূর্ত্তি ধারণ করিয়া, সাধারণ যাহাকে জড়জগৎ বলে, তাহার ভিতরে মাধ্যাকর্ষণরূপে লীলা করিতেছে। যে শক্তি প্রাণরূপে মূর্ত্তিমতী হইয়া জীব-দেহ সৃজন ও বর্দ্ধন করিতেছে, তাহাই আবার অপর মূর্ত্তিতে অণুরাশির সংযোজনা করিয়া, দানা (crystle) নির্ম্মাণ করিতেছে। এই সাধারণ 'কিছুটি' কি? শাস্ত্র তারস্বরে বলিতেছেন,—"ঈশাবস্যমিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ"।—জগতের যাহা কিছু গমনশীল, তাহার মধ্যেই ভগবান বিদ্যমান। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ বলিতেছেন,—"প্রকৃতির নিজের কোনও গতি নাই; ভগবান আছেন বলিয়াই তাহার গতি।" এই গতিই জড়জগতে আকর্ষণ বিকর্ষণ এবং মানবের রাগ দ্বেষ।

আমি পূর্ব্বে বলিতেছিলাম, আমি ও আমার দেহ, আমি ও আমার বেশ ভূষা। আমাদিগের বেশভূষা, জামা কাপড়ের সহিত, যেমন আমাদিগের সম্বন্ধ, আমাদিগের দেহের সহিতও আমাদিগের সম্বন্ধ অনেকটা সেইরূপ। জামা কাপড় জীর্ণ হইলে যেমন আমরা তাহা পরিত্যাগ করি, দেহ জীর্ণ বা আমার স্থিতির অনুপযোগী হইলেই আমরা তাহা পরিত্যাগ করি। একদিকে যেমন আমরা আবার নূতন বস্ত্র পরিধান করি, সেইরূপ কালে আবার নূতন দেহ অবলম্বন করিয়া আবির্ভূত হই। দেহকে পরিচ্ছদের সহিত তুলনা করা হইল সত্য, কিন্তু বস্তুতঃ আমরা তাহা ভাবিনা। পরিচ্ছদের সহিত আমাদিগের যে রকম সম্পর্ক, দেহের সহিত দেহীরও সেই রকম সম্পর্ক, কই আমরা ভাবিতে পারি? পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন করিলেও আমার আমিত্বের ত কোন ব্যবচ্ছেদ ঘটে না। দেহের সম্বন্ধেও কি তাই? দেহকে জামাকাপড় হইতে বিভিন্ন ভাবিবার একটা কারণ আছে। আমাদিগের যাহা কিছু জ্ঞান বা অনুভূতি হয়, তাহা সচরাচর দেহের সাহায্যেই হইয়া থাকে,—দেহ ছাড়িলে আমার কি অবস্থা থাকে, তাহা আমরা ভাবিয়াও বুঝিতে পারিনা।

অতএব দেহ ও আমি এ দুইটী অভিন্ন বলিয়া মনে হয়। দেহ গেলে আমার কি থাকে, আমার কিছু থাকে কিনা, তাহা আমরা অনুভব করিতে পারি না। তাই জড়বাদীরা বলিয়া থাকেন,—প্রকৃতির বিকারেই চৈতন্যের উদ্ভব হয়। অন্ন বিকার প্রাপ্ত হইলেই যেমন মদ্যে তাহার পরিণাম হয়, বাহির হইতে মদ্য-শক্তি আসিয়া তাহাতে আশ্রয় করিতেছে, এটা কল্পনা করিবার আবশ্যক হয় না, জীব-চৈতন্যেরও তাই হইয়া থাকে।

কিন্তু, তাঁহারা সেইটী প্রমাণ করিতে যাইয়া মহা গোলে পতিত হইয়াছেন। কি করিয়া বাহিরের নানারূপ স্পন্দন, আমাদিগের দেহে প্রতিঘাত হইয়া, জ্ঞানে পরিণত হয়, তাহা তাঁহারা বহু আয়াসেও প্রমাণ করিতে পারেন না। বাহিরের স্পন্দন দেহে স্পন্দন সৃজন করে; কিন্তু কোন শক্তির বলে সেই দেহস্থ স্পন্দন সমূহ আমাদিগের সুখ দুঃখ, আমাদিগের ভাব চিন্তা, জন্মাইয়া দেয়. এরহস্য উদ্ঘাটন করিতে তাঁহারা আজ পর্যান্ত সক্ষম হন নাই। মানবের স্বপ্নচৈতন্য, তাহার দিব্যদৃষ্টি, দিব্যশ্রুতি, তাহার চিন্তা ও ভাবরাশির অপর মানসে সঞ্চারণ, মৃত্যুর পরেও জীবাত্মার স্থিতি ও প্রেতযোনির ক্রিয়াকলাপ ইত্যাদি ইত্যাদি কিরূপে হইয়া থাকে, তাহা তাঁহারা বুঝাইতে পারেন না। অথচ এই সমস্ত ভিত্তিহীন বলিয়া তাঁহারা একেবারে উপেক্ষা করিতে পারেন না। মায়ার্স (Meyers), ক্রুক্স (Crocks), লজ্ (Lodge) প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকগণ বৈজ্ঞানিক উপায়ে এই সমস্ত বিষয়ের সত্যতা সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিতেছেন। এই জটিল তত্ত্বের সমস্যা প্রতীচীন-বিজ্ঞান-কল্পিত অভিব্যক্তি বাদের মূলভিত্তি স্বরূপ যোগ্যতমের উদ্বর্ত্তনে (Survival of the fittest), অথবা পরিবৃত্তি প্রণালীতে পাওয়া যায় না। তাহার সমস্যা ঋষি-দৃষ্ট দর্শনে মিলে। আমরা তাহার একটু আলোচনা করিব।

মানবের যাহা কিছু জ্ঞান, তাহা তাহার উপাধির উপর নির্ভর করে। ধূমময় অগ্নি,—অগ্নির এই ধূম-মল কোথা হইতে আসিল? আর্দ্রকাষ্ঠরূপ উপাধি হইতেই অগ্নি ধূমবান হইল। শাস্ত্র বলিয়াছেন, "জীব ও ব্রহ্ম উভয়ের ভেদ নাই। যেমন অগ্নি হইতে বিস্ফুলিঙ্গ নিঃসৃত হয়, সেইরূপ ব্রহ্ম হইতে জীব নিঃসৃত হইয়াছে।" * (ক) অগ্নির যাহা কিছু গুণ তাহাত বিস্ফুলিঙ্গে দৃষ্ট হয়; তবে ব্রহ্ম ও জীবে প্রভেদ কেন? শাস্ত্রকারেরা এই তত্ত্ব বেশ একটী উদাহরণ দ্বারা বুঝাইয়াছেন। এক সিংহ শিশু দৈবক্রমে এক মেষ-দলে প্রবিষ্ট হয়। সে মেষের সহিত লালিত পালিত হওয়ায় ভ্রান্তি বশতঃ আপনাকেও মেষ বলিয়া কল্পনা করিল, এবং মেষ-ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া বন্য জন্তুদিগের নিকট হইতে ভয়ে পলায়ন করিত। একদা কোনও কারণে সে জলাশয়ের ধারে উপস্থিত হইলে নিজের প্রতিবিম্ব দেখিয়া বুঝিল যে, সে মেষ নহে, সে সিংহ। তখন সে নিজের স্বরূপ বুঝিয়া অমিত তেজে হস্তী বাঘের সম্মুখীন হইতে লাগিল। জীবেরও ঠিক সেইরূপ হয়। জীব উপাধি-সংযোগে মোহ প্রাপ্ত হইয়া, সে যে নিজে ব্রহ্মেরই মত শুদ্ধ, বুদ্ধ ও মুক্ত, তাহা বিস্মৃত হয়, এবং ঈশ্বর ভাব ভুলিয়া মোহের অধীন হয়। পূর্ব্বে যে আমরা "ধূমময় অগ্নি" বলিয়াছি, তাহাই জীব। ব্রহ্মের সহিত অগ্নি, এবং ধূমের সহিত উপাধি-আবরণ-জীব রঞ্জিত-চৈতন্য ও আর্দ্র-কাষ্ঠের সহিত উপাধির তুলনা করিয়াছি।

"ভগবান আত্মারূপে সকল ভূতের আশয়ে প্রতিষ্ঠিত"। * খ

(ক) যোগবাসিষ্ঠে আছে ;—

স্বমরীচিবলোদ্ভূতাজ্জ্বলিতাগ্নেঃ কণা ইব।
সর্ব্বাএবোত্থিতা রাম! ব্রহ্মণো জীবরাশয়ঃ।—উৎপত্তি, ৯৪।২২

* খ—অহমাত্মা গুড়াকেশ! সর্ব্বভূতাশয়স্থিতঃ।

—গীতা ১০।১০]

যখন জ্যোতির্ম্ময় দর্পণ-প্রতিফলিত প্রতিবিম্ব, অন্য স্বচ্ছ পদার্থে প্রতিবিম্বিত হইয়া জ্যোতিঃ প্রসারণ করে; সেই জ্যোতিঃ, সূর্য্যও নয়; সূর্য্যের প্রতিবিম্বও নয়; সেই হৃদিস্থিত (গুহাস্থিত) আত্মা, প্রথমতঃ বুদ্ধিতে বা আনন্দময় কোষে প্রতিফলিত হয়। জলে যেমন সূর্য্যের প্রতিবিম্ব হয়, বুদ্ধিতে সেইরূপ পরমাত্মার প্রতিবিম্ব হয়; সেই প্রতিবিম্বই জীব। * ক

সেই জীবরূপী প্রতিবিম্বের ছায়া আবার পর পর বিজ্ঞানময়, মনোময়. প্রাণময় ও অন্নময় কোষে পতিত হইয়া আত্মারূপে আভাসিত হয়। * খ যে আত্মার প্রতিবিম্বের ছায়ার এই আভাসকে আমরা আত্মা বলিয়া মনে করি। সাধারণতঃ অন্নময় কোষের যে চিদাভাস (brain-consciousness) তাহাই আমাদিগের নিকট আত্মা বলিয়া প্রতীত হয়। সেইরূপ প্রাণময়, মনোময় ও বিজ্ঞানময় কোষের চিদাভাসকে আত্মা মনে করি। একটী দীপ শিখাকে যদ্যপি আমরা শ্বেতবর্ণের, হরিদ্রা বর্ণের, নীল বর্ণের, রক্তবর্ণের, কাচের দীপাবরণ দ্বারা আচ্ছাদন করি, তাহা হইলে যে আলোক-রশ্মি বাহিরে বিকীর্ণ হয়, তাহা যেমন কেবল

(ক)—১। আভাস এব চ।—২।৩।৫০ ব্রহ্মসূত্র।
২। অতএব চোপমা সূর্য্যকাদিবৎ।—৩।২।১৮ ঐ।]

(খ)—Suppose for instance, we compare the Logos itself to the Sun. Suppose I take a clear mirror in my hand, catch a reflection of the sun, make the rays reflect from the surface of the mirror—say upon a polished metallic plate—and make the rays which are reflected in their turn from the plate fall upon a wall. Now we have three images one being clearer than the other, and one being more resplendent than the other. I can compare the clear mirror to *Karana sharira*, the metallic plate to the astral body and the wall to the physical body. In each case a definite *bimbam* is formed, and that *bimbam* or reflected image is for the time being considerrd as the self. The *bimbam* formed in the astral body gives rise to the idea of self in it, when considered apart from the physical body; the *bim bam* formed in the *Karana sharira* gives rise to the most prominent form of individuality that man posseses.—Lectures on Bhagabad Gita" by T. Subba Row].

শ্বেত, পীত, নীল বা রক্তবর্ণের নয়,—সকল বর্ণের সমন্বয়ে সে একটা নূতন বর্ণের বলিয়া মনে হয়, জীব চৈতন্যের ও তাহাই হয়। আমরা এখানে দীপের সহিত পরমাত্মার ও আবরণের সহিত উপাধিগণের এবং দীপাবরণ হইতে নির্গত আলোকের সহিত স্থূল চৈতন্যের তুলনা করিলাম। এই সমস্ত উপাধিকে বেদান্ত "কোষ" নামে অভিহিত করিয়াছেন। বৈদান্তিকেরা কোষগুলিকে যথাক্রমে অন্নময় কোষ, প্রাণময় কোষ, মনোময় কোষ, বিজ্ঞানময় কোষ, আনন্দময় কোষ এই পাঁচ ভাগে বিভাগ করিয়াছেন।

এখানে এইটা বলিয়া রাখা কর্ত্তব্য যে কোষ ও শরীর বা দেহ এক নয়। মানব-চৈতন্যের কোষ পাঁচটি, কিন্তু মানবের শরীর তিনটী,—স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ। কোষ অর্থে আবরণ, শরীর অর্থে বাহন। কোষ চৈতন্যকে রঞ্জিত করে, শরীর সাহায্যে মানব নানা লোকে বিচরণ ও বিহার করে। ব্রহ্মাণ্ড যে যে উপাদানে গঠিত, মানব দেহও সেই সেই উপাদানে গঠিত। ব্রহ্মাণ্ডের যেমন ভূর্লোক, ভুবর্লোক, স্বর্গলোক ইত্যাদি ইত্যাদি পঞ্চ লোক আছে, মানব দেহেও ক্ষিতি, অপ, তেজ ইত্যাদি পঞ্চপ্রকার ভূত আছে। ক্ষিতি ভূত দিয়া তাহার স্থূল দেহ গঠিত; যেইরূপ অপ, মরুৎ, ইত্যাদি ভূত দিয়া তাহার অপর অপর দেহ গঠিত। আবার এই ভূলোক পাঁচ প্রকার পরমাণু দ্বারা গঠিত,—প্রস্তর, মৃত্তিকা প্রভৃতি কঠিন পদার্থের দ্বারা, জল, দুগ্ধ প্রভৃতি তরল পদার্থের দ্বারা, ধূম্র, বাষ্প প্রভৃতি বাষ্পীয় পদার্থের দ্বারা, এবং ইথিরিক পদার্থের দ্বারা সংগঠিত। ইহার মধ্যে প্রথম তিনটী, আমাদিগের নয়ন-গোচর হয়, ইথিরিক পদার্থ আমাদিগের চক্ষুরাদি স্থূল ইন্দ্রিয়ের অগোচর। তাহাদিগকেও ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম বলা হয়। আমরা যে ব্রহ্মাণ্ডের পঞ্চ বিভাগ করিলাম, কেহ কেহ তাহার স্থানে সপ্ত

বিভাগ করিয়া থাকেন,—যথা,—ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম, অনুপাদক ও আদি। সেইরূপ আবার ক্ষিতি, অপ প্রভৃতি আদি ভূতকে সপ্ত সপ্ত বিভাগ করেন। তাঁহাদিগের মতে ভূলোক কঠিন, তরল, বাষ্পীয় ও স্থূল সূক্ষ্মত্বের তারতম্যানুসারে চারি প্রকার ইথরের দ্বারা গঠিত। মানব স্থূলদেহেও এই সপ্ত প্রকার অণু আছে। তাহার যে অংশ কঠিন, তরল বাষ্পীয় পদার্থে গঠিত, তাহার নাম আমরা ভাণ্ডদেহ দিলাম; যে অংশ ইথরের দ্বারা গঠিত তাহাকে পিণ্ডদেহ বলিব। পিণ্ডদেহ ঈষৎ নীলাভ, স্থূল ইন্দ্রিয়াতীত, জ্যোতির্ম্ময় এবং আকৃতিতে ভাণ্ডদেহের অনুরূপ। ইহা সাধারণতঃ ভাণ্ডদেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকে না। ভাণ্ডদেহে যে প্রাণ শক্তি প্রবাহমানা তাহা এই পিণ্ডদেহ সাহায্যে হইয়া থাকে। তাই ইহাকে প্রাণের বাহন বা প্রাণ যান বলা হয়। আমরা এই তত্ত্ব বারান্তরে আলোচনা করিব। উক্ত উভয় শরীরের এরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ যে পিণ্ডদেহে আঘাত লাগিলে ভাণ্ডদেহেও সেইস্থানে অবিকল তদনুরূপ প্রতিঘাত দৃষ্ট হয়। এই পিণ্ডদেহ ভাণ্ডদেহ হইতে অল্প ব্যবধান মাত্র যাইতে পারে। ইহা যখন দেহ হইতে পৃথক হয়, তখন সূক্ষ্মদর্শীরা ইহাকে একটী সরুসূত্রের দ্বারা ভাণ্ডদেহের সহিত সংযুক্ত দেখেন। পিণ্ডদেহ যতই পৃথক হইতে থাকে, ভাণ্ডদেহ ততই প্রাণশূন্য হইয়া যায়,—চক্ষুর্দ্বয় মুমূর্ষু ব্যক্তির চক্ষের ন্যায় জ্যোতিঃ ও আভাশূন্য হয়, হৃৎপিণ্ডের ও ফুস্ফুসের ক্রিয়া অতি সামান্যরূপে চলিতে থাকে এবং ভাণ্ডদেহ জড়বৎ প্রতীয়মান হয়। এতদুভয় সংযুক্ত থাকে বলিয়াই তারকরাজ যোগীরা এতদুভয়ের সম্মিলনদেহের নাম স্থূলশরীর বলিয়াছেন। বস্তুতঃ চৈতন্য বিষয়ে উভয়ের কার্য্যকারিতা একই; তাই এই দুইটীকে বিভিন্নদেহ বলিয়া বিবেচনা করা সমীচীন নয়। পাশ্চাত্য প্রেততত্ত্ব

সম্বন্ধীয় ঘটনাবলীর অধিকাংশই এই পিণ্ডদেহের কার্য্য। উক্ত প্রেততত্ত্ব-বাদিগণের চক্রে আবিষ্ট ব্যক্তির (medium) ভাণ্ডদেহের বামপার্শ্ব হইতে উক্ত পিণ্ডদেহ বাহির হইয়া দর্শকমণ্ডলির চিন্তাপ্রবাহ দ্বারা উহা নানা আকার বিশিষ্ট হওতঃ তাহাদিগের নয়নগোচর হয়; তাহাকেই প্রেততত্ত্ব-বাদীরা মৃতব্যক্তির আত্মা বলিয়া থাকেন।

আমরা এই বার পৃথক পৃথক ভাবে এক একটী দেহ ও তত্ত্বের আলোচনা করিব। (ক্রমশঃ) * (ক)

শ্রীকিশোরীমোহন চট্টোপাধ্যায়।

"তিরুমন্ত্রং" হইতে সঙ্কলিত।

"ভক্তের যখন সৎকার্য্যাবলী, তাঁহার অসৎ কর্ম্মের সমমান হয়, তখন তাঁহার হৃদয়ে একটী শক্তি আবির্ভূত হয়। এই শক্তিই গুরুদেবের মূর্ত্তি ধারণ করিয়া, শিষ্যকে গুণের বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া দেয়। তখন ভক্ত ব্রহ্মবিদ্যা প্রাপ্ত হন। তখন তিনি নিজের জন্য আর কোনও কার্য্য করেন না। তাঁহার স্থিতি এখন হইতে পরার্থে আত্মবিসর্জ্জন!"

"বাসনাকে মন হইতে উৎপাটিত করিবে। ঈশ্বর বিষয়ের বাসনাও মনে আসিতে দিওনা; যতই বাসনা তোমার বর্দ্ধিতা হইবে, তোমার দুঃখও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে। যতই বাসনা ত্যাগ করিবে, সুখ ও আনন্দ সঙ্গে সঙ্গে বর্দ্ধিত হইবে।"

"কূপ-মণ্ডূক, তরঙ্গায়িত সাগর-মণ্ডূককে জিজ্ঞাসা করে,—"তোমার সাগর কি আমার এই কূপের মত মহান্?" সংসারনিমগ্ন মানব ও অনন্ত বোধাতীত ভগবানকে পার্থিব বর্ণে রঞ্জিত করে। কি তাহার ভ্রম!"

(ক) আমরা পরবারে ভাণ্ডদেহ, পিণ্ডদেহ এবং প্রাণ-শক্তি কিরূপে এক চক্র হইতে চক্রান্তরে প্রবাহিতা হইয়া মানবকে সঞ্জীবিত রাখে, তাহার আলোচনা করিব।

কি, মো, চ।

অলৌকিক রহস্য।

৬ষ্ঠ সংখ্যা] দ্বিতীয় ভাগ। [আশ্বিন, ১৩১৭।

মেসমেরিজম্ কি ?

মেসমেরিজমকে অনেকে "ভূতুড়ে কাণ্ড" বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকেন। তাহাতে তাঁহাদের যেন কতকটা অশ্রদ্ধার ভাবই প্রকাশ পায়। কিন্তু উহাকে "ভূতুড়ে কাণ্ড" অভিধানে অভিহিত করিতে আমরা বাস্তবিকই ব্যথিত হই। কেন ব্যথিত হই, তাহা পরে বলিতেছি।

অনেকে ইহাকে Subnambulism বা স্বপ্নাবস্থা বা সম্মোহন নামেও অভিহিত করিয়া থাকেন; কিন্তু আমরা ইহাকে তাহাও বলিতে পারি না। কারণ ইহা স্বপ্ন নহে; আমরা যে অবস্থার কথা বলিব, তাহা ইহার অনেক উচ্চে।

হয়ত Mesmerism এর আক্ষরিক বা প্রকৃত অনুবাদ স্বপ্নাবস্থা বা সম্মোহন হইতে পারে; আমরা তাহার কোন প্রতিবাদ করিতেছি না, বরং প্রথম অবস্থায় তাহাই বটে। কিন্তু অগ্রসর হইলে ভক্তি বিস্ময়ে হৃদয় প্লাবিত হইয়া যায়!

ঢাকার ৺কালী প্রসন্ন ঘোষ সি আই ই বিদ্যাসাগর মহাশয় "প্রেতত্ব" শব্দ ব্যবহার করিতেন না। তিনি "আত্মা" শব্দ ব্যবহার করিয়া পরলোকগত ব্যক্তিদিগের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। বাস্ত-

বিক শ্রদ্ধা-সমন্বিত হৃদয়ে চিন্তা করিলে পিতৃপুরুষগণের আত্মাকে "ভূত প্রেত" অভিধানে অভিহিত করিতে কষ্ট হয় না কি? সেই জন্য আমরা ইহাকে "আধ্যাত্মিক কাণ্ড" বলিয়া উল্লেখ করিতে চাই।

Mesmer সাহেব ইহার আবিষ্কারক বলিয়া ইহাকে Mesmerism বলে। ইহা কি হিন্দুর পক্ষে নূতন? কথাই নহে। তন্ত্রে ইহার উল্লেখ আছে। ইহাকে কতকটা "ভাব সমাধি" বলা যাইতে পারে, কিন্তু তাহাতেও অনেক বিষয়ে বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয়। বস্তুতঃ ইহা যে কি, তাহার নাম করণ হয় না। আমাদের দেশে এমন কত শত Mesmer জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। তাঁহারা প্রক্রিয়া-বিশেষে সংজ্ঞা লোপ করিয়া কত অদ্ভুত কাণ্ড সম্পাদন করিতেন; সুতরাং ইহা কোন ব্যক্তি বিশেষের নামে প্রচলিত হয় নাই। যাহাই হউক, ইহা যে যোগের নিম্নস্তর, তাহার আর সন্দেহ নাই।

ইহা বিলাসিতার উপকরণ বা বৃথা আমোদ উপভোগের সামগ্রী নহে। ইহাতে বিশেষত্ব লাভ করিতে হইলে সংযমী হইতে হয়—যোগী হইতে হয়, নতুবা "ভূতুড়ে কাণ্ডই" দেখিতে পাইবে। যাহারা "ভূতুড়ে কাণ্ডের" সংসাধক, তাহারা "ভূতের" নিকট গালি খায়; সুতরাং "ভূতের" কথা সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতেও পারে না। তাহারা যেমন "ভূত", তদ্রূপ "ভূতই" তাহাদিগকে আশ্রয় করে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যদি আত্ম-প্রসাদ লাভ করিতে চাও, যদি শক্তি-সঞ্চয় করিয়া আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ করিতে চাও, তবে ত্যাগী ও সংযমী হও। যদি বিলাসিতার আত্ম-বিক্রয় করিতে বাসনা থাকে, তবে এ কার্য্যে অগ্রসর হইও না—বিপন্ন হইবে।

আমরা অনেক দিন এ কার্য্যে লিপ্ত আছি। আত্মারা যাহা বলিয়া

যান, তাহা মিথ্যা হয় না। দুষ্ট আত্মা আমরা চিনিতে পারি ; তাহাদের কথা বিশ্বাসও করি না বা তাহাদিগকে স্থানও দিই না।

অনেকে মেসমেরিজমের সুন্দর ব্যাখ্যা করেন—কত সংজ্ঞা দেন। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে হয়ত ইহার সহিত কখনও তাঁহাদের দেখা শুনা হয় নাই। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরম হংসদেব বলিতেন, "নুণের পুতুল সমুদ্র মাপ্‌তে গিছ্‌ল ; সমুদ্রে গিয়ে যেমন নামা, অমনই গ'লে যাওয়া !" আর কেই খবর দেয় যে, সমুদ্রে কত জল? যাঁহারা এ কার্য্যে লিপ্ত আছেন, তাঁহারাই জানেন, ইহার সংজ্ঞা কি! অধিক বলা নিস্প্রয়োজন।

অদ্য আমরা কেবল সূচনা করিয়া রাখিতেছি মাত্র। ইহা যে কি পাঠক ক্রমে ক্রমে তাহার আস্বাদ পাইবেন।

আত্মিক জগতে আমাদের অনেকগুলি বন্ধু মিলিয়াছে। হয়ত একথা শুনিয়া পাঠক হাসিবেন যে, মৃতের সহিত জীবিতের আবার সখ্যতা কি? কিন্তু বলিতে কি, তাঁহাদের দ্বারা আমরা যতদূর উপকৃত হই, পার্থিব বন্ধুর দ্বারা ততদূর উপকৃত হইবার সম্ভাবনা নাই। সেই বন্ধুদিগের অন্যতম—আপনাদের সকলের বিশেষ পরিচিত রসিক, চূড়ামণি, নটকুল-গুরু, হাস্যরসিক ৺ অর্দ্ধেন্দু শেখর মুস্তফী মহাশয়!

আমরা তাঁহাকে সংক্ষেপে "মুস্তফী মহাশয়" বলিয়া থাকি।

জীবিত অবস্থায় আমার সহিত তাঁহার আলাপ ছিল না। থিয়েটারে কখনও দেখি নাই ; কারণ থিয়েটার দেখা বড় ঘটিয়া উঠিত না। তাঁহার পরলোক প্রাপ্তির পর তাঁহার সহিত আমার আলাপ হয়। কেমন করিয়া তাঁহার মৃত্যু হইল, মৃত্যু কালে তাঁহার কেমন অবস্থা হইয়াছিল, দেহ হইতে কেমন করিয়া বাহির হইলেন, তার পর কোন্ কোন্ স্থানে গমন করিলেন, শ্মশানে গিয়া দেহ দাহ পর্য্যন্ত কি কি কার্য্য করিয়াছিলেন, তাহা এমন মনোরম ও বিদ্রূপাত্মক ভাবে ব্যক্ত করিলেন যে,

তাহা শুনিয়া তাঁহার অঙ্গ-ভঙ্গি দেখিয়া হাসিয়া হাসিয়া পেটের নাড়ী ছিঁড়িয়া গিয়াছিল! তিনি যে কেমন রসিক ছিলেন, তাহা সেই দিন বিলক্ষণ বুঝিয়াছিলাম। সময়ান্তরে পাঠক বর্গকে তাঁহার সেই অমৃতোপম কথা শুনাইব।

মুস্তফী মহাশয়কে আমরা যে কত ভালবাসি, তাহা বলিতে পারি না। যে কেহ সে দৃশ্য দর্শন করে, যে কেহ আমাদের সংস্রবে আছে বা থাকে, তাহারা তাঁহাকে প্রাণের সহিত ভালবাসে ও শ্রদ্ধা করে। রমণীগণ মুস্তফী মহাশয়ের দর্শন পাইলে যে কত আনন্দিত হয়, তাহা লিখিয়া শেষ করিতে পারি না। মুস্তফী মহাশয়ের অমৃতোপম কথা শুনিবার জন্য, তাঁহার বিদ্রূপাত্মক শ্লেষ কণ্ঠস্থ করিবার জন্যই যেন তাহারা "মেস-মেরিজম" দেখিতে উপস্থিত হয়। আহা! সে দৃশ্য অতীব মনোহর! এক কথায় বলিতে গেলে বলিতে হয়, মুস্তফী মহাশয়কে তাহারা আপনার জন বলিয়া, মনে করে। তিনি তাহাদের কত প্রশ্নের উত্তর দেন তাহাদের সহিত কত হাস্য পরিহাস করেন, তাহার সংখ্যা নাই!

যাহাহউক, আমরা তাঁহাকে এত ভালবাসি যে, তাঁহার নামে আমাদের হৃদয় ভক্তি শ্রদ্ধায় আনত হইয়া পড়ে। তিনি আমাদের বন্ধু—উপদেষ্টা—গুরু—পিতা মাতা সদৃশ আত্মীয় স্বজন। আমাদের হিতে যেন তাঁহার হৃদয় আনন্দিত—আমাদের ব্যথায় যেন তাঁহার হৃদয় ব্যথিত হয়। তাঁহার সহিত কথা না কহিলে যেন আমাদের দিন অতি কষ্টেই অতি-বাহিত হয়। তিনি আমাদিগকে কত বিপদ হইতে রক্ষা করিয়াছেন এবং করিতেছেন, কত উপদেশ দিতেছেন এবং দিয়াছেন, তাহার সংখ্যা নাই! আমরা যে তাঁহার কত ভরসা করি, তাহা বলিতে পারি না!!

প্রবন্ধ দীর্ঘ হইয়া পড়িতেছে অতএব এ সব কথা পরে বলিব। কিন্তু

তবুও যেন চাপিতে পারি না, তাঁহাকে মনে পড়িলে বন্যার জলের ন্যায় কত কথা মনে আসে !

সেদিন বাড়ী গিয়াছি, কয়েকটী বন্ধু জিদ্ করায় "আধ্যাত্মিক কাণ্ডে" রত হইলাম। মিডিয়মকে আত্মাগণ "দেহী" বলেন। এই সংজ্ঞাটী বাস্তবিক উপযুক্ত। সুতরাং আমরা মিডিয়মকে "দেহীই" বলি। দেহ-শুদ্ধ চরিত্র, সরল হৃদয় না হইলে ফল ভাল হয় না। সেই জন্য আমরা বিশেষরূপে অবগত না হইয়া কাহাকেও এ কার্য্যের জন্য গ্রহণ করি না।

যাহাহউক, আমাদের "মিডিয়ম" বা দেহী ভাল। প্রক্রিয়া-বিশেষের আশ্রয় না লইয়া কেবলমাত্র মানসিক শক্তি দ্বারা তাহার সংজ্ঞা লোপ করিলাম।

শ্রীশ্রীরাম কৃষ্ণের আবির্ভাব।

পরে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবকে আহ্বান করাতে প্রথমেই তাঁহার আবির্ভাব হইল। তাঁহাকে জীবিত কালে কখনও দেখি নাই, কিন্তু তাঁহার শিষ্যানুশিষ্য বলিয়া আত্মগৌরবও করিয়া থাকি। সেদিন তাঁহার সহিত কথা কহিবার বড় ইচ্ছা হইয়াছিল।

তিনি অমৃত-মধুর স্বরে কর্ণকুহর পবিত্র করিয়া বলিলেন, "কিরে পাগলকে ডেকেচিস্ ?" তখন প্রাণ আনন্দে নৃত্য করিয়া উঠিল ; ইচ্ছা হইল—চীৎকার করিয়া ডাকি—পরমহংসদেবের শিষ্যানুশিষ্য কে কোথায় আছ ছুটিয়া আইস—অনেক দিনের পর আবার একবার প্রাণভরা মধুর কথা শুনিয়া যাও ! আহা সে কথায় কত মধুরতা ! কত আন্তরিকতা ! কত উদারতা—কত প্রীতি প্রেম ! তাঁহার চরণ স্পর্শ:করিয়া কৃতার্থ হই-লাম। তিনি তখন তেমনই মধুর ভাষায় বলিলেন "এগোও—এগোও—এগোও—যে পথে যাচ্ছ, সেই পথে এগোও !—তুই নাকি দাস হয়েচিস্ ? বেশ বেশ বেশ ! শীঘ্রই কয়েকজন সঙ্গী পাবি।" পরে কয়েকটি

উপদেশ দিয়া বিদায় লইলেন। ইতিপূর্ব্বে আমায় ব্রাহ্মণরূপে দর্শন দিয়াছিলেন, সে কথাও বলিলেন। বুঝিলাম, পরমহংসদেব স্বয়ং করুণাময় ঈশ্বর !!!

তাহার পর স্বামী বিবেকানন্দ ও শ্রীশ্রীকালীমাতার আবির্ভাব হয়। তাঁহারা গমন করিলে স্বামী অভেদানন্দ আমেরিকা হইতে আগমন করেন। তিনি আসিয়া ইংরাজীতে কথা বলেন। স্বামী অভেদানন্দ জীবিত। সমাধি অবস্থাতে দেহ-বিচ্যুত হইয়া আত্মা আসিয়াছিলেন। তিনি আসিয়াই বলিলেন, "আমায় কেহ স্পর্শ করিও না, আমি এখন সমাধিতে। বেশীক্ষণ থাকিতে পারিব না। সময়ান্তরে এইরূপ সমাধিতে থাকিলে আসিয়া বিস্তর কথা বলিবার বাঞ্ছা আছে।" তাঁহার সহিত বেশী কথা হয় নাই, পরমহংস দেব আসাতে তিনিও আসিয়াছিলেন।

তাহার পর আমাদের বান্ধব কয়েকটী আত্মা আগমন করেন। তাঁহারা নানা প্রকার উপদেশ দিয়া যান। যিনি যাহা জিজ্ঞাসা করেন, তাঁহাদের প্রশ্নের উত্তর দেন। একটী আত্মা তাঁহার পুত্রবধূকে তাঁহার বংশ রক্ষার জন্য কয়েকটি নিয়ম পালন করিতে উপদেশ দেন। অনন্তর মুস্তফী মহাশয় আগমন করেন। তিনি আমায় যাহা আজ্ঞা করিয়াছিলেন—অবশ্য আমার মঙ্গলের জন্য আমি তাহা পালন করিয়াছি বলিয়া তিনি আনন্দে আত্মহারা হয়েন! সে আনন্দ-বিবৃতি কি মধুর! কি স্বর্গীয় ভাবপূর্ণ! তিনি অনেক দিন পূর্ব্বে আমায় তাহা আদেশ করিয়াছিলেন, কিন্তু আমি সুবিধা মত তাহা পালন করিতে পারি নাই বলিয়া মধ্যে মধ্যে অনুযোগ করিতেন। আজ তাঁহার পূর্ণানন্দ! দেখুন দেখি এমন বন্ধু কে? আমাতে তাঁর কোন স্বার্থই নাই, অথচ তিনি আমার মঙ্গল সাধনে কত চিন্তিত!

আমাদের কোন পরিচিত আত্মা বলেন, আজ "দেহীর" হৃদয় বড়

স্নিগ্ধ বড় শীতল বোধ হইতেছে; বুঝিয়াছি আজ মহাপুরুষের (পরমহংস দেবের) আগমন হইয়াছিল,—তাই সকল পবিত্রীকৃত!

তাই বলিতেছি, যে কার্য্যের দ্বারা দেব দেবী বা মহাপুরুষগণের সাক্ষাৎকার লাভ হয়, তাহা কি "ভূতুড়ে কাণ্ড?"

অন্ধগণের হস্তী অনুভূতি কি প্রকৃত? কেহ হস্তীর পদ স্পর্শ করিয়া তাহাকে স্তম্ভ সদৃশ, কেহ তাহার কর্ণ স্পর্শ করিয়া তাহাকে শূর্প সদৃশ, কেহ তাহার পুচ্ছ স্পর্শ করিয়া তাহাকে সর্প-সদৃশ বলিয়া ব্যাখ্যা করে! কিন্তু হস্তী কি প্রকৃত পক্ষে তাই? হস্তীর রূপ জানিতে হইলে চক্ষুষ্মাণের শরণাপন্ন হওয়া তাহাদের কর্ত্তব্য। একদেশ-দর্শী হইলে প্রকৃত জ্ঞান জন্মে না।

আজ কেবল মাত্র পাঠকবর্গের সহিত পরিচয় করিয়া রাখিলাম। পরে আত্মা সম্বন্ধে অনেক অদ্ভুত কথা শুনাইবার ইচ্ছা আছে।

শ্রীমন্মথনাথ নাগ।
"মেদিনীপুর হিতৈষী" সম্পাদক, মেদিনীপুর।

ভূতের উপদ্রব।

বাঁকুড়া মিউনিসিপালিটীর অন্তর্গত রাজগ্রামে ১৪।১৫ বর্ষ বয়স্কা একটী স্ত্রীলোকের উপর উপদেবতার আশ্চর্য্য আক্রোশ হইয়াছে। প্রায় ৪ বৎসর পূর্ব্বে একদিন প্রাতঃকালে একটী শিবালয় ও নিম্ববৃক্ষের মধ্যবর্ত্তী স্থানে প্রস্রাবকালীন হঠাৎ একটী লোক তাহাকে বলে "এত বড় স্পর্দ্ধা যে, আমার সম্মুখে প্রস্রাব ত্যাগ করিস্?" এই ভৎর্সনা করিয়া সে অদৃশ্য হইয়া যায়। স্ত্রীলোকটী কাঁদিতে কাঁদিতে বাটী আসিয়া "আমার

ছেলে কোথা" এই কথা জিজ্ঞাসা করে ও তাহার ছেলেটীকে কাছে আসিলে বলে "ও আমার ছেলে নয়"। তা'র পর সারাদিন রোদন করে। বৈকালে ঘরের দরজার নিকট মূর্চ্ছিত অবস্থায় পড়িয়া বলে "আমি চলিলাম"। কিয়ৎক্ষণ পরে সে চৈতন্যলাভ করে।

এই সময় হইতে সে নদীর, পুষ্করিণীর বা কূপের জলে কার্ত্তিক মূর্ত্তি দর্শন করিত। মাঝে মাঝে মূর্চ্ছিত হইত ও আপনাকে মূর্চ্ছাবস্থায় সন্ন্যাসী বলিয়া পরিচয় দিত। অজ্ঞান অবস্থায় "দুর্গা, কালী প্রতিমাদি দেখ; এ মাটীর পুতুল নয়, জীবন্ত ঠাকুর" এ কথাও বলিত। স্ত্রীলোকটীর আত্মীয়েরা অজ্ঞাত সন্ন্যাসীর উদ্দেশে পূজা দিত, কিন্তু তাহাতে কোন ফল লাভ হয় নাই।

স্ত্রীলোকটী সুস্থ হইলে বলিত যে, ২৪।২৫ বৎসর বয়স্ক, গৌরবর্ণ, সামান্য জটাধারী কোন সন্ন্যাসী দুইটী কুৎসিত লোক সঙ্গে করিয়া তাহার নিকটে বল-প্রয়োগার্থে আসিলেই সে ভয়ে সংজ্ঞাহীন হয়। সে বলে যে, রাত্রিকালে প্রায়ই সে সন্ন্যাসী তাহার শিরোদেশে দাঁড়াইয়া থাকে।

একদিন স্ত্রীলোকটী অজ্ঞান অবস্থায় বাটীর ছাদ হইতে পড়িয়া যায়, কিন্তু কিছুই আঘাত পায় নাই। অন্য একদিন গৃহের উপর হইতে অধোমুখে ঝুলিতে থাকায়, তাহার আত্মীয়েরা তাহাকে রক্ষা করে।

মাঘ মাসের (১৩১৩) প্রথম সপ্তাহে একদিন বৈকালে স্ত্রীলোকটীর নিদ্রাবস্থায় সকলে দেখিল যে, তাহার শিরোদেশে আগুন জ্বলিতেছে। পুনরায় ১৫।১৬ দিন পরে তাহার শ্বশুর আলমারী হইতে কাপড় বাহির করিবার সময় দেখে যে কাপড়ে আগুন লাগিয়াছে। তাড়াতাড়ি জল আনিয়া আগুন নিবান হয়। এইরূপ মাঝে মাঝে বাক্সের ভিতর ও গৃহের নানাস্থানে অগ্নির উৎপাত হয়।

চৈত্রমাসের শেষে বাড়ীতে ঢিল পড়িতে থাকে। কিন্তু কাহারও গায়ে ঢিল পড়ে নাই।

ইহার পর বিষ্ঠার উপদ্রব হইতে লাগিল। কখন ভাতের হাঁড়ির ভিতর, কখন স্ত্রীলোকটীর খাইবার ভাতের ভিতর বিষ্ঠা দেখা যাইত। এইরূপ অবস্থায় স্ত্রীলোকটীর শ্বশুর নিজগৃহ ত্যাগ করিয়া অন্ত গৃহে আশ্রয় লইতে বাধ্য হয়। কিন্তু সেখানেও বিষ্ঠা ও ঢিলের উপদ্রব সমভাবে থাকায় একটী ওঝা আনাইলে ঢিলপড়া বন্ধ হয়। কিন্তু বিষ্ঠার উৎপাত না যাওয়ায় ও তিন দিন ঘরে আগুন লাগিয়া একটী ঘর একেবারে পুড়িয়া যাওয়ায়, তাহারা নিজগৃহে ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হয়।

সেখানেও বিষ্ঠার উপদ্রব সমভাবে চলে। (১৩১৪) জ্যৈষ্ঠমাসে একদিন স্ত্রীলোকটী আহারান্তে জল খাইতে যাওয়ার সময় তাহার পরিধেয় বস্ত্রে আগুন জ্বলিয়া উঠিল। তাহার স্বামী আগুন নিবাইয়া দিল। একটী ভদ্রলোক সেখানে কৌতুক দেখিবার জন্য বসিয়াছিলেন. তাঁহার সম্মুখে ৩.৪ বার ও শেষে তাঁহার গাত্রে সজোরে একবার বিষ্ঠা পড়িল।

আষাঢ় মাসের প্রথমে একদিন সন্ধ্যার সময় একটী ওঝা ঘরের মধ্যে পূজা করিতেছিলেন, এমন সময়ে একটী মালসা ওঝার সম্মুখে হঠাৎ আসিয়া পড়িয়া ভাঙ্গিয়া গেল। ঐ সময়ে অন্য ঘরে বিষ্ঠা পড়িতে লাগিল।

শুনিতে পাই যে, ওঝা লইয়া আসা সত্ত্বেও বিষ্ঠার উপদ্রব এখনও কমে নাই।

বাঁকুড়ার অনেক উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী ও সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক এই উপদ্রবের বিবরণ জ্ঞাত আছেন।

শ্রীচারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

———

অদৃশ্য জগৎ ভ্রমণ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

আমরা এইরূপে জীন পরী ইত্যাদি দেখিতে দেখিতে কামলোকের প্রান্তভাগে এক সুন্দর নদী দেখিতে পাইলাম। আর সেই নদীর উপরে একটী সুবর্ণ-নির্ম্মিত সেতুও দেখিতে পাইলাম।

সেই নদীর তীরে ও সুবর্ণ-সেতুর নিকটে যাইয়া দেখিলাম, অনেক গুলি পবিত্রাত্মা লোক সেই সুবর্ণ সেতু পার হইবার জন্য ব্যস্ত সমস্ত হৃদয়ে যেন কোন বিষয়ের প্রতীক্ষা করিয়া সমুৎসুক হইয়া রহিয়াছেন। আমি গুরুদেবকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "পিতঃ! ইহারা কে? এবং কি জন্যই বা স্বর্ণসেতুর উপর দিয়া যাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়াও যাইতেছেন না, এবং কিসের প্রতীক্ষা করিতেছেন?"

গুরুদেব কহিলেন "ইহারা ভূলোকে অনেক সৎকার্য্য করিয়াছেন এবং নিজ কর্ম্ম ফলে মর্ত্ত্যলোক পরিত্যাগের এক বৎসরের মধ্যে ভুবর্লোকের সপ্তম প্রদেশ পর্য্যন্ত অতিক্রমণ করিয়া এক্ষণে স্বর্লোকে গমন করিবার জন্য উৎসুক হইয়া সপিণ্ডীকরণের প্রতীক্ষা করিয়া রহিয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে কাহাকে একদিন, কাহাকে বা দুইদিন এবং কাহাকেও বা দশদিন মাত্র এই স্থানে প্রতীক্ষা করিতে হইবে, যতদিন পর্য্যন্ত ইহাদের পুত্রেরা ভূলোকে সপিণ্ডীকরণ ক্রিয়া সমাধা না করিবে। এইজন্য হিন্দুধর্ম্মে পিতৃযজ্ঞের বিধান আছে। এই সপিণ্ডীকরণ ক্রিয়া অতীব প্রয়োজনীয়। ইঁহাদের মধ্যে অনেকের পূর্ব্ব পুরুষেরা স্বর্গলোকের এক প্রান্তে পিতৃলোকে গমন করিয়া ইঁহাদের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন এবং কেহ কেহ বা তদূর্দ্ধে গমন করিয়া

স্বর্লোকে ইঁহাদের সেই সপিণ্ডীকরণ ক্রিয়ার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। কারণ, যেদিনে ইহাদের সপিণ্ডীকরণ ক্রিয়া হইবে, সেই দিনে তাঁহারা স্বপুত্র বা পৌত্রাদি দর্শনে সমধিক আনন্দ লাভ করিবেন, এক গণ্ডূষ গঙ্গাজলীয় তর্পণ ও যজ্ঞীয় ভাগ প্রাপ্ত হইবেন এবং শ্রদ্ধা, ভালবাসা প্রভৃতি অমূল্য রত্ন প্রাপ্তে পুলকিত হইয়া ইঁহাদের পুত্রদিগের প্রতি ভালবাসা, স্নেহ ইত্যাদি প্রত্যর্পণ করিতে পারিবেন, যাহাতে তাহাদিগের মঙ্গল লাভ হইবে।

আমি সেই সকল পবিত্রাত্মা লোকদিগকে বিশেষরূপে নিরীক্ষণ করিতে করিতে তন্মধ্যে একজন বন্ধুকে* দেখিতে পাইলাম। দেখিলাম তিনি ম্লান বদনে অধোমুখে নিরাশ হৃদয়ে বসিয়া আছেন। আমাকে দেখিবামাত্র তিনি প্রফুল্ল বদনে আমাকে বলিলেন, "তুমি এখানে কি করিয়া আসিলে? আমি জানি, তুমি এখনও ভূলোকে আছ, তোমার এখনও ভূলোকে ভোগ শেষ হয় নাই"। আমি বলিলাম "আমি গুরুদেবের অনুগ্রহে এবং তাঁহার সঙ্গে স্বর্লোক, মহর্লোক প্রভৃতি দর্শন করিতে যাইতেছি। পুনরায় ভূর্লোকে প্রত্যাগমন করিব, এবং প্রত্যাগমন করিবার সময় যদি গুরুদেবের ইচ্ছা হয়, তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া যাইব।" তিনি বলিলেন "ভাই! আমার মনোকষ্টের বিষয় তোমাকে বলি, তুমি ভিন্ন আমার আর গতি নাই। কি জানি, তোমার প্রত্যাগমনের সময় যদি আমার সহিত সাক্ষাৎ না হয়, অতএব এই সময় বলিয়া রাখি।—

"তুমি ভূলোকে প্রত্যাগমন করিয়া আমার পুত্রকে বলিও, যে,

---

* বলা বাহুল্য, ইনি ভূলোকে একজন ডাক্তার ছিলেন এবং দয়াপরবশ হইয়া অনেক অনাথ দরিদ্রদিগকে ঔষধ বিতরণ করিয়াছিলেন। সেই পুণ্যফলে তিনি অতি সত্বর এখানে আসিয়াছেন।

তোমার পিতা কামলোকের সপ্তম প্রদেশের সীমানায় ও স্বর্লোকের সম্মুখস্থ নদীর নিকটে বসিয়া আছেন। তিনি স্বর্লোকে যাইবার জন্য এই স্বর্ণ-সেতুর উপর উঠিয়াছিলেন। কিন্তু স্বর্গ-দূতেরা তাঁহাকে সেই স্বর্ণ সেতু হইতে বহিস্কৃত করিয়া দিয়াছে এবং কহিয়াছে 'তোমার পুত্র এখনও তোমার সপিণ্ডীকরণ করে নাই, সুতরাং তোমার স্বর্গে যাইবার অধিকার হয় নাই। অতএব তুমি এক্ষণে ঐ স্থানে অপেক্ষা কর। যতদিন পর্য্যন্ত তোমার সপিণ্ডীকরণ না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত তোমার ঐ স্বর্ণ-সেতুর উপর উঠিবার অধিকার নাই।' আমি সেইজন্য অধোমুখে বসিয়া আছি। জানিনা কতদিনে (অমুলা *) আমার সপিণ্ডীকরণ করিবে। তুমি জান, সে খুব পিতৃভক্ত। আমারই শিক্ষায় সে এক্ষণে একজন বিখ্যাত ডাক্তার হইয়াছে এবং এক্ষণে তাহার সুখ্যাতি এরূপ বৃদ্ধি হইয়াছে, যে, বোধ হয় সময়াভাবে সে আমার সপিণ্ডীকরণ করে নাই, অথবা ভুলিয়া গিয়াছে। তুমি ভূলোকে যাইয়া তাহাকে এ বিষয় স্মরণ করিয়া দিবে।" যাহা হউক, আমি তাহার এই কথা শুনিতে শুনিতে গুরুদেবের সঙ্গে সেই স্বর্ণ-সেতুর উপর উঠিলাম।

দেখিলাম, সেতুটী দেখিতে অতীব সুন্দর, তাহার দুইপার্শ্বের রেলিং গুলিও সুবর্ণ দ্বারা নির্ম্মিত। ঐ রেলিংএর মধ্যে মধ্যে একটী একটী স্বর্ণের স্তম্ভ ও তদুপরি স্বর্ণ-নির্ম্মিত টবের উপরে নানা রংঙ্গের মনোহর প্রস্ফুটিত পুষ্প সকল শোভমান রহিয়াছে। আমি ঐ সেতুটী দেখিয়া গুরুদেবকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "এইসেতু পার হইয়া কোথায় যাইবার পথ ?"

তিনি কহিলেন "এই সেতুটী "স্বর্গদ্বার"। এই সেতু পার হইয়া

---

* তাঁহার পুত্রের নাম অমূল্য।

স্বর্গ-লোকে যাইতে হয়। চল, এখানে আর বেশী বিলম্ব করিও না,, শীঘ্র আইস, আমি তোমাকে স্বর্গলোক দর্শন করাই।"

আমি সানন্দ মনে সেই সেতু পার হইয়া স্বর্গ-লোকে উপস্থিত হইলাম। গুরুদেব কহিলেন, "এই স্বর্গ-লোকও ভূবর্লোকের ন্যায় সপ্ত প্রদেশে বিভক্ত। এখানে দুঃখের লেশমাত্র নাই এবং এমন কোন পদার্থ নাই, যাহা মন্দ নামে অভিহিত হইতে পারে। এখানকার অধিবাসীরা স্বীয় মানসিক শক্তি অনুসারে সর্ব্বদাই সুখ ভোগ করিয়া থাকে। যাহাহউক আইস, তোমাকে ক্রমে ক্রমে একটী একটী প্রদেশ দেখাইতেছি। এই বলিয়া তিনি অগ্রসর হইলেন এবং আমি তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ এক আশ্চর্য্য আনন্দ উপভোগ করিতে করিতে চলিতে লাগিলাম। সে যে কি আনন্দ, তাহা আমার লেখনী দ্বারা প্রকাশ করিতে অক্ষম।

প্রথম প্রদেশে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, তথায় কোকিল-কূজিত ফলপূর্ণ রমণীয় বৃক্ষ, কানন-উপবন-সমন্বিত এক পৃথিবী এবং সেই পৃথিবীতে বড় বড় নদী, বাপী, কূপ, তড়াগ, পল্বল, নির্ঝর, স্ত্রী, পুরুষ সমস্তই রহিয়াছে।

তাহার পর সম্মুখেই দেখিলাম, দিব্য প্রাচীর-মণ্ডিত যজ্ঞশালা-যুক্ত নানাবিধ হর্ম্ম্য বিরাজিত রমণীয় এক নগর। সেই পুরী দেখিয়া আমার মনে হইল, ইহা স্বর্গই বটে। ইহা দেখিতে দেখিতে মুহূর্ত্ত কাল মধ্যে অন্য এক মনোরম স্থানে উপস্থিত হইলাম। তথায় একটী দিব্য নন্দন কানন দেখিতে পাইলাম। তথায় একটী পারিজাত বৃক্ষের ছায়াতে দেবগবী সুরভি বিশ্রাম করিতেছিলেন। তাঁহার নিকটে চতুর্দ্দন্ত একহস্তী রহিয়াছে এবং মেনকা প্রভৃতি অপ্সরাবৃন্দ নানাবিধ হাবভাব প্রকাশ পূর্ব্বক নৃত্য গীত ও ক্রীড়া করিতেছে। আবার মন্দারবাটিকা

মধ্যে শত শত, যক্ষ গন্ধর্ব্ব ও বিদ্যাধরগণ গান ও ক্রীড়া করিতেছে। তাহার মধ্যে প্রভু শতক্রতু পৌলোমীর সহিত অবস্থিত রহিয়াছেন। তৎপরে বরুণ, কুবের, যম, সূর্য্য ও হুতাশন প্রভৃতি দেবগণকে দেখিয়া আমি অতীব বিস্মিত হইলাম। (ক্রমশঃ)

শ্রীদুর্গাচরণ চক্রবর্ত্তী (রায় সাহেব)

স্বপ্ন—কথা।

১। মাতা ও পুত্র।

অধ্যাপক এবারক্রম্বি তাঁহার Intellectual powers নামক গ্রন্থে নিম্নলিখিত স্বপ্নটির উল্লেখ করিয়াছেন। রেভারেণ্ড উইল্ কিন্স একজন শিক্ষিত ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তি ছিলেন। ১৭৫৪ খৃষ্টাব্দে যৎকালে তিনি ডিবন্ সায়ারে বাস করিতেছিলেন, এক রাত্রিকালে একটি অদ্ভুত স্বপ্ন দেখেন। রেভারেণ্ডের নিজের পত্র হইতে আমরা ইহার বিবরণ উদ্ধৃত করিলাম।

"আমি নিদ্রা যাইবার অল্পক্ষণ পরেই স্বপ্ন দেখিলাম, যেন আমি লণ্ডনে যাইতেছি। যাবার পথেই গ্লশেষ্টার সায়ার অবস্থিত। এই স্থানেই আমার পিতা ও মাতা বাস করিতেন। সুতরাং ভাবিলাম, তাঁহাদের সহিত একবার সাক্ষাৎ করিয়া যাইব। রাস্তায় কি ঘটিয়াছিল অথবা কি দেখিয়াছিলাম, স্মরণ নাই। একেবারেই তাঁহাদের দরজার সম্মুখে উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম, সম্মুখের দ্বার বন্ধ, চেষ্টা করিয়াও খুলিতে পারিলাম না। কাজেই পশ্চাতের দরজা খুলিয়া বাটীতে ঢুকিলাম।

কিন্তু যে ঘরে যাই, সেই ঘরেই দেখি, সকলে ঘুমাইতেছে। এইরূপে একঘর হইতে আর একঘরে যাইতে যাইতে, উপরতালার, যে ঘরে পিতা ও মাতা শয়ন করিয়াছিলেন, সেই খানে উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম পিতা নিদ্রিত, কিন্তু মাতা জাগিয়া আছেন। তাঁহাকে বলিলাম 'মা, আমি অনেক দূরে যাইতেছি, তাই তোমার নিকট বিদায় লইতে আসিয়াছি।' ইহা শুনিয়া মা আমার দিকে চাহিয়া একেবারে চমকিয়া উঠিলেন এবং বলিলেন 'হায়, হায় পুত্র, তবে তুমি কি জীবিত নাই?'

ইহার পরেই আমার নিদ্রাভঙ্গ হইল। একটা সামান্য স্বপ্ন বলিয়া ২।৩ দিন এ সম্বন্ধে কোন চিন্তা করি নাই। কিন্তু শীঘ্রই পিতার নিকট হইতে এই মর্ম্মে এক পত্র পাইলাম—'বৎস, তুমি জীবিত আছ কি না জানি না। যদি জীবিত থাক, ইহা পাঠমাত্র স্বহস্তে কুশল সংবাদ লিখিবে। তোমার মাতা তোমার জন্য বড়ই ব্যাকুল হইয়াছেন। তাহার কারণ এই :—অমুক রাত্রিতে (যে রাত্রিতে আমি স্বপ্ন দেখিয়াছিলাম) আমি ঘুমাইতেছিলাম এবং তোমার মা জাগিয়া ছিলেন! তিনি শুনিলেন কে একজন সদর দরজা ঠেলাঠেলি করিল, কিন্তু ইহা আবদ্ধ দেখিয়া পিছনের দ্বারের নিকট আসিল এবং ইহা খুলিয়া বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিল। ক্রমশঃ উপর তালায় পদশব্দ শোনা গেল এবং অকস্মাৎ তুমি তাঁহার শয্যাপার্শ্বে দাঁড়াইয়া বলিলে 'মা, আমি অনেক দূরে যাইব, তোমার নিকট বিদায় লইতে আসিয়াছি।' ইহা শুনিয়া তোমার মা ভয়ে চীৎকার করিয়া বলিলেন 'হায় তবে কি তুমি জীবিত নাই!' এই কথা হইবামাত্র তুমি হঠাৎ অদৃশ্য হইয়া গেলে, তিনি আর কিছুই দেখিতে বা শুনিতে পাইলেন না। এই আকস্মিক ও অস্বাভাবিক ব্যাপারের পর হইতে তোমার মা, তোমার জন্য সর্ব্বদাই চিন্তিত আছেন। ইতি—'

পিতার এই পত্র পাইয়া আমি অবাক্ হইলাম। আমার বাসস্থান

হইতে তাঁহাদের গৃহ প্রায় ১০০ মাইল দূরে অবস্থিত এবং আমি শয্যায় নিদ্রিত! অথচ মাতা আমাকে দেখিতে ও আমার কথা শুনিতে পাইলেন কিরূপে ?" *

২। শেষ সাক্ষাৎ।

ধর্ম্মভীরু ও ভক্ত ব্যাক্‌ষ্টারের নাম বোধ হয় অনেকেই অবগত আছেন। ইনি তাঁহার একটি বন্ধুর নিকটে যে এক অপূর্ব্ব স্বপ্ন বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার একখানি পুস্তকে প্রকাশিত করিয়া গিয়াছেন। ঘটনাটি এই। রোচেষ্টার নিবাসী গফ্ সাহেবের পত্নী মেরি কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হওয়ায়, ছোট ছোট দুইটি ছেলেকে এক আয়ার অধীনে রাখিয়া নিজ পিত্রালয়ে চলিয়া আসেন। পিত্রালয় তাঁহার বাটী হইতে ৯ মাইল মাত্র দূরে অবস্থিত। এই স্থানেই তিনি ১৬৯১ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা জুন মারা যান। মৃত্যুর পূর্ব্বদিন (৩রা জুন) তিনি শিশু দুইটিকে একবার দেখিবার জন্য বড়ই কাতর হন। যিনি তাঁহার নিকট আইসেন, তাঁহাকেই তিনি কাকুতি মিনতি করিয়া বলেন "আমার ছেলে দুটিকে

---

* মাতা জাগরিতা, অথচ দ্বারে আঘাত, পদ শব্দ, ও বিদায় বাক্য শ্রবণ করিলেন। তবে কি পুত্রের সূক্ষ্মদেহ কিয়ৎ কালের জন্য স্থূলত্ব প্রাপ্ত (temporarily materialized) হইয়াছিল ? ইহা অসম্ভব নহে। কিন্তু সূক্ষ্মদেহে গৃহে প্রবেশ করিতে হইলে দরজা খুলিবার প্রয়োজন কি ? বোধ হয় বদ্ধমূল সংস্কারই ইহার কারণ। আমরা স্থূলদেহে যেরূপে গৃহে প্রবেশ করি, সূক্ষ্মদেহে সেরূপ করিবার প্রয়োজন না থাকিলেও, সংস্কার বশতঃ আমাদের মনে হয় যে সেইরূপই করিতে হইবে। এই জন্যই বোধ হয় পুত্রের সূক্ষ্মদেহ (যদিও উহা অনায়াসে দেয়াল ভেদ করিয়া গৃহে প্রবেশ করিতে সমর্থ) বাটীর নিকটস্থ হইয়া ভাবিল দরজা খুলিতে হইবে। সে যে সূক্ষ্ম মনোময় দেহ, তাঁহার গতি যে অবারিত—অব্যাহত,তাহা সে জানে না, সে আপনাকে স্থূল বলিয়াই ভাবিতেছে। যেমন দরজা খুলিবার প্রবল ইচ্ছা হইল, অমনি তাহার হস্ত (বা সর্ব্বশরীর) ক্ষণকালের জন্য স্থূলত্ব পাইল। সে দ্বারে ধাক্কা দিল, খট্ খট্ করিয়া উপরে উঠিল, কথা কহিল। কিন্তু আর স্থূল থাকিতে পারিল না, পুনরায় সূক্ষ্ম হইল। তাই মাতা আর কিছুই দেখিতে পাইলেন না।

একবার দেখাও, তোমাদের পায়ে পড়ি। অথবা আমাকে সেখানে লইয়া চল। আমি একবার তাহাদিগকে দেখিলে সুখে মরিব। ইত্যাদি।" রাত্রি দশটার সময় একজন পুরোহিত তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলে তিনি বলিলেন "ভগবানের অসীম কৃপার উপর আমার অটল বিশ্বাস আছে এবং মরিতেও আমি সম্পূর্ণ প্রস্তুত। কিন্তু ছেলে দুটিকে একবার শেষ দেখিব ইহাই ইচ্ছা।" কিন্তু শিশুদ্বয়কে সে রাত্রিতে আনিবার সুবিধা হইল না এবং তাঁহাকেও স্থানান্তরিত করিতে ডাক্তারেরা পরামর্শ দিলেন না। সেযাহা হউক রাত্রি ১টা হইতে ২টা পর্য্যন্ত তিনি এক প্রকার নিস্পন্দ ও অচেতন ভাব প্রাপ্ত হইলেন। যিনি তাঁহার নিকট বসিয়াছিলেন, তিনি বলেন, তৎকালে তাঁহার চক্ষু স্থির, হস্তপদ অসাড় ও নিশ্বাস প্রশ্বাস রুদ্ধ ছিল। ধীরে ধীরে চৈতন্য ফিরিয়া আসিল এবং প্রাতঃকালে তিনি হাস্যমুখে সকলকে বলিলেন "আমি ছেলে দুটিকে দেখিয়া আসিয়াছি।" ইহা বিকারের প্রলাপ ভাবিয়া আত্মীয়গণ দীর্ঘ-নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

এদিকে আয়া সন্ধ্যার পর ছেলে দুটিকে ঘুম পাড়াইয়া বড়টিকে একটি ঘরে শয়ন করাইলেন এবং ছোটটিকে পার্শ্বের ঘরে নিজের কাছে শোয়াইলেন। রাত্রি ২টার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে হঠাৎ তাঁহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল এবং তিনি যাহা দেখিলেন, তাহাতে ভীত ও স্তম্ভিত হইয়া পড়িলেন। তিনি দেখিলেন, বালকদিগের মাতা মেরি যে ঘরে বড়টি ঘুমাইতেছিল সেই ঘর হইতে ধীরে ধীরে বাহির হইয়া তাহার শয্যা পার্শ্বে দাঁড়াইলেন এবং ছোট শিশুটির দিকে এক দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন। আয়া লক্ষ্য করিলেন, মাঝে মাঝে মেরির চক্ষুর পলক পড়িতেছে ও মুখ নড়িতেছে, কিন্তু কোন কথা বাহির হইতেছে না। এইরূপে প্রায় ১৫ মিনিট কাটিল এবং আয়াও ক্রমশঃ ভয়-বিহ্বল হইতে লাগিলেন। অবশেষে সাহসে

ভয় করিয়া তিনি উচ্চস্বরে ভগবানের নাম উচ্চারণ করিয়া বলিলেন "তুমি কি ?" ইহাতে মূর্ত্তিটি অদৃশ্য হইয়া গেল। আয়া চতুর্দ্দিকে খুঁজিয়া যখন উহা আর দেখিতে পাইলেন না, তখন আরও ভীত হইয়া বাহিরে পলাইয়া গেলেন এবং নিকটস্থ নদীতটে অবশিষ্ট রাত্রি যাপন করিয়া প্রত্যুষে প্রতিবেশী দিগকে ইহা জ্ঞাপন করিলেন। একজন প্রতিবেশী মেরির পিত্রালয়ে তাঁহার সংবাদ লইতে গিয়া দেখিলেন, মেরির শেষ মুহূর্ত্ত উপস্থিত—সেই দিন অপরাহ্ণে মেরি ইহধাম ত্যাগ করিলেন।

শ্রীমাখনলাল রায় চৌধুরী।

সাক্ষাৎ দেবী-দর্শন ও তাঁহার সহিত কথোপকথন।

জেলা মেদিনীপুরের অন্তর্গত গড়ধুমুর্দ্দা গ্রামে বহুকাল হইতে আমাদের পূর্ব্ব-পুরুষ চৌধুরী উপাধিধারী মিত্র-বংশীয় জনৈক কায়স্থ বসবাস করিয়াছিলেন। তিনি সেই গ্রামে কতকগুলি ব্রাহ্মণকে ব্রহ্মোত্তর প্রদান করিয়া বাস করান; এবং কতকগুলি দেবদেবী স্থাপিত করিয়া তাঁহাদের সেবার জন্য দেবোত্তর সম্পত্তি দিয়া চিরস্থায়ীরূপে দেবসেবার বন্দোবস্ত করিয়া যান। দেবদেবীগণের মধ্যে ৺সিদ্ধেশ্বরী দেবী গ্রামের মধ্যস্থলে প্রতিষ্ঠিত। সেই দেবীর সহিত শীতলা, গণেশ, পঞ্চানন্দ, প্রভৃতি সেই মন্দিরে রহিয়াছেন। দেবীর মণ্ডপের পূর্ব্বদিকে কুণ্ড এবং তাহার পূর্ব্ব ঈশানকোণে পূজক ব্রাহ্মণদিগের বাস।

দেবীর নিত্য সেবা ভিন্ন প্রতি অমাবস্যাতে দুইটী পাঁটা দেওয়ার

বন্দোবস্ত আছে। চৌধুরীবংশের পূর্ব্বপুরুষেরা এইরূপ বন্দোবস্ত করিয়া গিয়াছেন যে, কোন ব্যক্তির মানসিক পূজা দিবার আবশ্যক হইলে কাহাকেও কোন বিষয়ের জন্ম কষ্টভোগ করিতে হয় না। পূজক, পরিচারক, মালাকার, হানৎকার, বাদ্যকার সকলেরই বসতি দেবী মন্দিরের চতুষ্পার্শ্বে এবং সকলেই জায়গীর-ভোগী। পূজার নিয়ম—সমস্ত বস্তু দুইটার কমে হইবে না, পাঁটাও অন্ততঃ দুইটী দিতে হইবে, একটী আমাদের সরকারে আসিবে, অন্যটী বা অন্যগুলি পূজা দাতা পাইবেন।—

দেবী মন্দিরের নিকটে গেলেই, সেথান সিদ্ধস্থান বলিয়া স্বতঃ মনে উদয় হয়। তথন শরীর রোমাঞ্চ হইতে থাকে ও পুষ্পের এবং অন্য সুগন্ধি দ্রব্যের সৌরভে মনকে মাতাইয়া তুলে। মন্দিরের সম্মুখে সুবৃহৎ অশ্বথ বৃক্ষ, তদুপরি মালতীলতা নিজ বার্দ্ধক্যের পরিচয় দিয়া জড়িত হইয়া রহিয়াছে; কতস্থানে কত প্রকার আকার ধারণ করিয়াছে বলা যায় না। কোথাও দোলার ন্যায়,কোথাও বেদিকার ন্যায় হইয়াছে। পুষ্পে অশ্বথ বৃক্ষকে এরূপ আচ্ছাদন করিয়া রহিয়াছে যে, দেখিলে বোধ হয় অশ্বথ বৃক্ষশ্রেষ্ঠ বলিয়াই যেন মালতী পুষ্প-নির্ম্মিত ছত্র দ্বারা তাহাকে রৌদ্রের আতপ হইতে রক্ষা করিতেছে। পুষ্পে এবং ত্রিপত্র সংযুক্ত মালতী বীজে তলা বিছাইয়া রহিয়াছে। দেবী-মন্দিরের দক্ষিণে এই অশ্বথ এবং পূর্ব্ব পার্শ্বে একটী বকুল বৃক্ষ রহিয়াছে, তাহাও মাধবীলতা জড়িত। এই মাধবী মালতী অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহে। মন্দিরের দক্ষিণপার্শ্বে এক অতি বিস্তীর্ণ স্থান পড়িয়াআছে, ঐ স্থানের উপর শনিবার ও বুধবার একটী হাট হয়। ঐ হাটের উপর কতকগুলি বৃহৎ বৃহৎ অশ্বথ ও বটবৃক্ষ থাকাতে রৌদ্রের সময় উহা যেরূপ মনোরম হয়, রাত্রিতে তদ্রূপ ভয়ঙ্কর দেখায়। গভীর রাত্রিতে সেই স্থান দিয়া গমন করিলে প্রাণ কাঁপিতে থাকে। এই স্থানের অনতিদূরে শ্মশান-ভূমি।

দেবী সিদ্ধেশ্বরী সর্ব্বসিদ্ধিদা, এজন্য বহু দূর দেশ হইতে মানসিক পূজাদি আসিয়া থাকে, শনি মঙ্গলবার প্রায় পূজা বাদ যায় না।

মিত্র-বংশীয়দিগের বংশ বৃদ্ধি হওয়ায় তাঁহারা তিন অংশে বিভক্ত হইয়াছেন, তদনুসারে পূজকও তিনজন রহিয়াছেন। তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ অংশের পূজকের নাম মৃত্যুঞ্জয় মিশ্র; ইঁহাকে সকলে মুচিরাম বলিয়া ডাকিত। ইঁহার স্বভাব অতি উদার এবং সিদ্ধেশ্বরীর প্রিয় পূজক বলিয়া অনেকে জানিত। ব্রাহ্মণ ব্যাকরণ-জ্ঞান-হীন, কিন্তু পূজা করিবার সময়ের সেই অশুদ্ধ মন্ত্রপাঠ শুনিলে এবং তাঁহার ভক্তি দেখিলে বোধ হইত, যেন দেবী সাক্ষাৎ আসিয়া পূজা গ্রহণ করিতেছেন। মুচিরাম যে সকল কথা বলিতেন, তাহা শুনিয়া প্রায় অনেকে তাঁহাকে উপহাস করিত, কিন্তু সেজন্য তিনি ক্ষুব্ধ হইতেন না। আমি তাঁহার কথা অবজ্ঞা করিতাম না, এজন্য তিনি যখন যাহা দেখিতেন, শুনিতেন বা করিতেন, তাহা অকপটভাবে আমার নিকট সমস্ত প্রকাশ করিতেন। আমি তাঁহার কথা গুলি মনোযোগপূর্ব্বক শ্রবণ করিয়া তাঁহার সত্যতা উপলব্ধি করিতাম। দেখিতাম, কথা গুলি ঠিক ফলিত, এজন্য তাঁহার প্রতি আমার বিশ্বাসও ছিল।

ব্রাহ্মণ দেবীকে সিদু বলিয়া সম্বোধন করিতেন। কারণ তিনি বলিতেন, দেবী সর্ব্বদা তাঁহাকে বাবা বলিয়া সব কথা বলিতেন। তিনি কন্যাভাবে কোন কোন দিন মুচিরামের বাড়ীতে যাইতেন; এবং কোথাও যাইতে হইলে তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতেন। এইরূপে এক এক রাত্রিতে নানা দেশের বৃত্তান্ত ও পূজার কথা বলিতেন, এবং কোন্ কোন্ স্থানে কোন্ দিন পূজা দিতেছে, তৎসমস্তও বলিতেন। যেদিন তিনি দেবীর সহিত যাইতেন, তৎপরদিবস তাঁহাকে ক্লান্ত থাকিতে দেখা যাইত। তিনি এই সকল কথা কাহারও নিকট গোপন করিতেন না

বলিয়া সকলে তাঁহাকে আড়খেপা নামে অভিহিত করিত এবং উপহাসও করিত।

১। একদিন বৈশাখ মাসে দিবা দুই প্রহরের সময় প্রখর রৌদ্রে দেবী একাকিনী আসিতেছেন, পথিমধ্যে বৃদ্ধা মালিনীর সহিত সাক্ষাৎ হইল। মালিনী, তাঁহার গমনীয়পথের অগ্রবর্ত্তী ছিল। তিনি আসিয়া মালিনীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা, তুমি আমার বাপের বাড়ী দেখাইয়া দিতে পার?" মালিনী উত্তর করিল, "মা, কে তোর বাপ, আমি ত জানি না, তবে যদি নাম বলিতে পার, তাহা হইলে দেখাইয়া দিতে পারি।" তখন দেবী কহিলেন, "আমি মুচিরাম মিশ্রীর কন্যা, তুমি তাঁহার ঘরটী জান ত, দেখাইয়া দাওনা মা।" তখন মালিনী বলিল, "তুমি আমার সঙ্গে এস, আমি তোমাকে তাঁহার বাড়ীতে ছাড়িয়া যাইব।" তৎপরে মালিনী মুচিরামের বাড়ীর বাহিরে গিয়া বলিল, "এই তোমার বাপের বাড়ী; ভিতরে যাও।" এই বলিয়া মালিনী, মুচিরাম, মুচিরাম বলিয়া ডাকিতে লাগিল। মেয়ে ছেলেটী বাড়ীর ভিতরে গেল। মুচিরাম বাড়ীর ভিতর হইতে কে ডাকে, কে ডাকে বলিয়া বাহিরে আসিল. এবং মালিনীকে জিজ্ঞাসা করিল, "কি জন্য আমায় ডাকিলে?" মালিনী বলিল, "বাবু তোমার কন্যাটী রাস্তা জানে না, আমাকে তোমার বাড়ী দেখাইয়া দিতে বলায়, আমি তাই দেখাইয়া দিতে আসিয়াছিলাম।" মুচিরাম বলিল, "ওগো, আমার কন্যা কে? তোমার কি ভ্রম হইল নাকি? আমার ত কন্যা নাই।" মালিনী বলিল "আচ্ছা, এই যে ভিতরে গেল, আমি দাঁড়াইয়া আছি, তুমি দেখ ত সেটী কে?" মুচিরাম ভিতরে গিয়া বাড়ীর ভিতর অনুসন্ধান করিয়া কাহাকেও দেখিতে পাইল না। পুনরায় বাহিরে আসিয়া বলিল, "ক'ই, কাহাকেও ত দেখি না।" "ওগো নিশ্চয় ভিতরে গিয়াছে, তবে তোমার দেখা না পেয়ে বোধ হয়, তোমার

জ্ঞাতিদের বাড়ীর দিকে চ'লে গিয়েছে।" ব্রাহ্মণ একটুকু স্তম্ভিত হইল; এবং জ্ঞাতিদিগের বাড়ীতে অনুসন্ধান করিয়া তৎক্ষণাৎ মায়ের মন্দিরে চলিয়া গিয়া দেখে, মায়ের গাত্র হইতে স্বেদ-বারি বহিতেছে। তখন বুঝিতে পারিয়া পাখার দ্বারা কিয়ৎক্ষণ বাতাস করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন! বলিলেন, "মা, আমি বুঝিতে পারি নাই।" সেই দিন রাত্রিতে দেবী বলিলেন, "বাবা, "আমি রৌদ্রে অত্যন্ত কাতর হইয়া তোমার বাড়ীতে গিয়াছিলাম, তুমি একবারেই বলিলে 'আমার কন্যা নাই.' তাহাতেই আমি মন্দিরে চলিয়া আসিলাম।" তখন ব্রাহ্মণ বলিল, "মা, আমি অপরাধ করিয়াছি, আমায় ক্ষমা করুন।"

২। মুচিরাম মিশ্রকে আমি বামুনদাদা বলিতাম। একদিন আমার নিকট আসিয়া বসিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "বামুনদাদা! খবর কি?" তিনি বলিলেন "ভাই! সে সব কথা কি বলিব? খানিক রাত্রে আমাকে আসিয়া উঠাইয়া লইয়া গেলেন, আমি চলিলাম! এমন একস্থানে গিয়া উপস্থিত হইলেন, যে, দেখিয়াই আমার চক্ষুস্থির! সে স্থানের কোন বর্ণনা আমি করিতে পারিব না। সে সব মণিমুক্তা-খচিত গৃহ দর্শন করিলে দৃষ্টি ঝলসিয়া যায়। কত দেবদেবী সেখানে উপস্থিত তাহা বলিতে পারি না! আমি এক পার্শ্বে বসিয়া সমস্ত দেখিতেছি ও শুনিতেছি। এক প্রকার সূক্ষ্ম সানুনাসিক (খনা রকম) স্বরে দেবভাষায় তাঁহাদের যে কি কথা হইতে লাগিল, আমি তাহার কিছুই বুঝিতে পারিলাম না; কখন কখন দুই একটী শব্দ আমার বোধে আসিল। এইরূপ তাঁহাদের কথাবার্ত্তা হওয়ার পর, আমায় বলিলেন 'বাবা! চল।' আমি তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে আসিলাম। পথিমধ্যে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'মা! ইঁহারা কে? এবং কিজন্য এখানে আসিয়াছিলেন?' তখন তিনি অনেক দেবদেবীর নামোল্লেখ করিলেন এবং

বলিলেন 'বসন্ত পাঠাইবার উদ্যোগ হইতেছে, শীঘ্র বসন্ত ফুটিবে। যেদিন আনিতে যাইব সেইদিন আমরা তোমায় সঙ্গে লইয়া যাইব।"

৩। বসন্ত আনিতে যাইবার দিন দেবী বলিলেন "বাবা! এখানে কাহার ঘরে ভাল বলদ আছে দেখিয়া আইস। যাহার ঘরে থাকিবে, তাহাকে বলিবে, 'তোর বলদটা দিন দুই আবশ্যক আছে, হারা হইলেও দুইদিন খোঁজ লইবিনা, তৃতীয় দিন না পাইলে খোজ করিবি।' তদনুসারে মুচিরাম একজন তৈলিকের বাড়ীতে বলিয়া আইসে। যাইবার দিন বলদ লইয়া সকলে বসন্ত আনিতে গেলেন। গৃহস্বামী পরদিবস বলদ দেখিতে না পাইয়া অনেক অন্বেষণ করে এবং কে লইয়াছে বলিয়া অনেক গালাগালিও করে। তৎপরে বসন্ত লইয়া তাঁহারা উপস্থিত হইলে শুনিতে পাইলেন, বলদের স্বামী অনেক গালাগালি করিয়াছে। তখন সমস্ত বসন্ত তাহারই বাটীর নিকট রাখিয়া বলদটী ছাড়িয়া দেওয়া হইল। বলদ আপন গোয়ালে গিয়া আশ্রয় লইল। দেবী বলিলেন "আমি শুনিতে পাইলাম যে, আমায় অনেক গালাগালি করিয়াছে। উহার বিস্তর ধনগর্ব্ব হইয়াছে। অদ্য হইতে উহার বাড়ীতে জ্বর প্রেরণ কর, পরশুদিন যেন উহার ঘরে বসন্ত দেখা দেয়। উহাকে সবংশে নিপাত করিব।" এই সমস্ত শুনিয়া তৎপর দিন মুচিরাম আমার নিকট বসিয়া বলিল, "ভাই! আর রক্ষা নাই, এবার কি হয় দেখ। বসন্ত পঁহুছিয়াছে, অমুক জায়গায় ঢালা হইয়াছে। অমুকের ঘরে কল্য জ্বর হইয়া দুইদিন পরে বসন্ত হইবে, একটীও আরোগ্য হইবে না, সবংশে নিপাত হইবে।" ক্রমে এই কথা প্রস্ফুট হইল, শুনিয়া কেহ ভীত হইল, কেহ ঠাট্টা করিতে লাগিল। পর দিন প্রকৃতই জ্বর দেখা গেল, ক্রমে বসন্ত হইয়া সবংশে নিপাত হইল। এইরূপ ক্রমে বিস্তার হওয়াতে আমরা ভীত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম

"আমাদের গ্রামের নিকট হইতেছে, আমাদের গ্রামে হইবে কি ?" বলিলেন "না, আমাদের গ্রামে মায়ের অনুগ্রহে কিছু হইবেনা।" বাস্তবিক হইল না।

৪। কোন সময়ে মুচিরাম একদিন আমার বাড়ীর নিত্যপূজা সারিয়া জলযোগ করিতে বসিয়াছেন, এমন সময়ে আমি তাঁহার নিকট বসিলাম। তখন তিনি বলিলেন, "ভায়া ! বড় বিপদ, সাবধান ! মায়ের নিকট মানসিক কর, তবে রক্ষা। আমি তোমাদের জন্য অনেক করিয়া বলিতেছি, যাহা হয় পরে বলিব।" আমি ব্যস্ত ও ভীত হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম "বামুনদাদা,ব্যাপারটা কি ? বলিতে হইবে।" তিনি তখন কুণ্ঠিত ভাবে বলিলেন "কলেরা আরম্ভ হইবে। তোমাদের জ্ঞাতিদের বাড়ীতে হইবে, দুই একটী মারাও যাইবে। তোমার বাড়ীতে না আসে, এজন্য অনেক করিয়া বলিয়াছি। যাহারা উপহাস করে, দেখ অগ্রেই তাহারা যায়।" দেখিতে দেখিতে দুই একদিন পরেই এক জ্ঞাতির বাড়ীতে কলেরা আরম্ভ হইল ! তখন ভয়ে ভাবনায় অস্থির হইলাম। বামুনদাদা কি হইবে ? সিদ্ধেশ্বরীর পূজা দেওয়া হইবে। সকলে ভাল থাক্, মানসিক করিলাম। ছেলেপিলে লইয়া কোথায় যাইব ? বামুনদাদা ভরসা দিলেন, বলিলেন "কোন ভয় নাই, আমি মাকে বলিয়া রক্ষা করিব।" এইরূপে দুই একটী গিয়া কলেরা বন্ধ হইয়া গেল।

৫। আমাদের বাড়ীর পূর্ব্ব পার্শ্বে এক অতি বিস্তীর্ণ জলা ভূমি আছে। উহাকে "বার চৌকার" জলা বলে। উহা বর্ষাকালে জলে প্লাবিত হইয়া গাঙ্গের ন্যায় দেখায়। উহার পরিধি তখন প্রায় ৪।৫ মাইল হইয়া থাকে। বর্ষাকালে নৌকায় বেড়াইবার ও নৌকায় যাওয়া আসা করিবার বিশেষ সুবিধা। ঐ জলার দক্ষিণ পার্শ্বে বাঁধের উপর পাণীশ্বরী নামে এক দেবী আছেন। একদিন মুচিরাম প্রত্যূষে আমার

বাড়ীতে পঁহুছিয়াছেন। আমি দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম "ব্যাপার কি ?" তখন তিনি বলিলেন "ভাই সমস্ত রাত্রি নৌকায় জলে জলে বেড়াইতেছেন। পাণীশ্বরীর সহিত দেখা করিয়া সেখানে তাঁহাদের কথাবার্ত্তা হইল। আসিবার সময় নৌকা হইতে উঠিতে যান, দেখিলেন এমন সময়ে এক খানি অলঙ্কার কোথায় পড়িয়া গিয়াছে। তাই যাইতেছি, কোথায় পড়িয়াছে দেখি।" যেখানে নৌকা হইতে উঠিয়াছিলেন, সেখানে খোঁজ করিয়া না পাইয়া পাণীশ্বরীর নিকট পর্য্যন্ত যান, সেখানে উক্ত অলঙ্কার খানি পড়িয়াছিল, আনিয়া সকলকে দেখাইয়া লইয়া গেলেন।

৬। প্রায় ৩০ বৎসর হইল, আমি স্কুল ছাড়ার পর অবধি নানা শাস্ত্রীয় গ্রন্থের আলোচনা করি, তন্মধ্যে জ্যোতিষ তন্ত্র অধিক দেখিতাম। কলিকাতা, কাশী, বম্বে, আগরা, নিজাম প্রভৃতি হইতে নূতন ভাল ভাল গ্রন্থের সন্ধান পাইয়া আনাইয়া দেখিতাম। সর্ব্বদা এই মনে হইত যে, জ্যোতিষ এতগুলি দেখিলাম, কিন্তু কোন ব্যক্তি কিছু জিজ্ঞাসা করিলে যদি আমার উত্তরটা না মিলে তাহাহইলে সকলের নিকট উপহাসাস্পদ হইতে হইবে এবং লোকে এখন যেটুকু গণ্য মান্য করিতেছে, তাহাও ভ্রষ্ট হইয়া যাইবে। তবে সিদ্ধবিদ্যার স্বরূপ এমন কোন বিষয় জানিতে পারিতাম ; সর্ব্বদা এই মনে হইত। এক দিন মুচিরাম আমার নিকট বসিয়া গল্প করিতেছেন, এমন সময়ে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি সিদ্ধেশ্বরীর নিকট জানুন, আমার মনের ভাব কিরূপে সিদ্ধ হইতে পারে।" তখন তিনি বলিলেন, "আচ্ছা ভাই আমি বলিব। প্রতিদিন ত হয়না, যখন নানা দেবদেবীর সহিত একত্র মিলিত হন, তখন তাঁহাদের কথাবার্ত্তা আমি কিছুই বুঝিতে পারিনা ; তবে ঘর ফিরিবার সময় পথিমধ্যে দুই একটা কথা জিজ্ঞাসা করি।"

আমি দুই এক দিন অন্তর ঐরূপ এক এক বার তাড়া দিতে লাগিলাম। একদিন তিনি নিজেই বলিলেন "হাঁহে ভাই, তোমার কথা কল্য জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। তিনি বলিলেন 'যে কথা সে জিজ্ঞাসা করিয়াছে, তাহা সে জানে; তবে ততদূর লক্ষ্য করে নাই। আচ্ছা একদিন বলিব।"

পুনশ্চ একদিন মুচিরাম বলিলেন, "ভায়া! তোমার সব খবর আজ আমি পাইয়াছি।" তখন আমি আগ্রহ সহকারে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম "কি বলুন্ বলুন্।" তখন বলিলেন—"আমার সঙ্গে তাঁহার কথা বার্ত্তা হওয়ায় আমি বলিলাম "ত্রৈলোক্য ভায়া কি বলে, তাহার কথাটার কি হইল?" তখন তিনি বলিলেন 'জান বাবা তার ইচ্ছাটী কি? সে সর্ব্বদা মনে করে 'আমাকে সকলে যে জ্যোতিষ জানি বলে মান্য করে, সেস্থলে আমার কথাটা যদি মিথ্যা হয়,তবে বড় অপমানের বিষয়। অতএব কিরূপে আমি সমস্ত সত্য বলিতে পারি?' তুমি তাহাকে বলিবে, যে বিষয় তাহাকে কেহ জিজ্ঞাসা করুক (* * * *) করিয়া অসঙ্কুচিত চিত্তে, সেই বিষয়ের উত্তর তাহার যাহা মনে হইবে, তাহাই বলিবে, কখন মিথ্যা হইবে না। আর নাগরাক্ষরের একখানি বই, যাহাতে মরা বাঁচার খবর আছে, সেই বইখানি ভাল করিয়া দেখিতে বলিবে। তাহাতে তাহার অন্য প্রার্থিত বিষয়টী পাইবে। তবে জীবহানির আশঙ্কা।' শেষ কথাটা জীবহানির আশঙ্কা অতি অস্পষ্ট ও মৃদুভাবে বলায় মুচিরামের উহা স্পষ্টভাবে কর্ণগোচর হয় নাই। তিনি তৎপরে আমার নিকট এই সকল কথা বলিলেন, আরও বলিলেন যে, জীব সম্বন্ধে কি একটা কথা অস্পষ্টভাবে বলিলেন তাহা আমি ভাল করিয়া শুনিতে পাই নাই। আমি তখন ভাবিলাম এমন ত শতাধিক পুস্তক রহিয়াছে দেবনাগরী পুস্তক সকলের মধ্যে কোন্ পুস্তক যাহার মধ্যে মরা বাঁচার

খবর আছে! ভাবিয়া ভাবিয়া পুস্তকখানি স্থির করিলাম। তৎপরে কার্য্যগতিকে আমাকে একটি মহলে যাইতে হইল। আমি সেই পুস্তকখানি সঙ্গে লইয়া গেলাম। সেখানে উহা আদ্যোপান্ত দেখিতে আরম্ভ করিলাম। কিয়দ্দূর পড়িয়াই আমার যাহা উদ্দেশ্য ছিল, তাহা পাইয়া পরমানন্দ লাভ করিলাম। কিন্তু যেদিন পাইলাম, সেই দিবস আমার বাড়ীতে স্থিত একটী ময়ূর রাত্রিতে অকস্মাৎ ছটফট করিয়া প্রাণ ত্যাগ করে। কিজন্য এরূপ হইয়া মরিল, তাহার কোন কারণ নির্ণয় হইল না। দুই চারি দিন পরে আমি বাড়ী আসিলে, মুচিরাম সাক্ষাৎ করিয়া বলিল "ভায়া, তুমি অমুক দিন সেই বিষয়টী পাইয়াছ।" আমি স্বীকার করিলাম। তখন তিনি বলিলেন, "ময়ূরটী সেই জন্যই মরিয়াছে। প্রাণীর হানি বলিয়া কি বলিয়াছিলেন, অস্পষ্ট বশতঃ তাহা আমি ভাল শুনিতে পাই নাই। তজ্জন্য ভরসা করিয়া কোন কথা বলিতে পারি নাই। যাহা হোক্, এই ফাঁড়া উতুরে গেল।"

তৎপরে প্রাপ্ত বিষয়টী কার্য্যে পরিণত করিতে আরম্ভ করিলাম, পরক্ষণেই একটী বাধা পড়িল। আমার একটী পগেয়া গাভী ছিল, সেটী অকস্মাৎ মারা গেল। তথাপি শুনিলাম না কার্য্যটী করিতে থাকিলাম। দিন দুই চারি পরে পুনঃ একটী বাধা পড়িল। পুষ্করিণীতে কতকগুলি মৎস্য ছিল, অকস্মাৎ সমস্ত গুলি ভাসিয়া মরিয়া গেল। তখন মনে ভাবিলাম, এইবারই ফাঁড়া গেল, কেননা খেচর ভূচর জলচর তিনপ্রকার প্রাণীই যখন বিনাশ হইল, তখন বোধহয় আর কোন বাধা হইবে না। পুনরায় করিতে আরম্ভ করিলাম, ছাড়িলাম না। তৎপরে একটা শোচনীয় ব্যাপার ঘটিল। আমার পরিবারের গর্ভ ছিল। আমি ৭।৮ মাস পর্য্যন্ত বাড়ী হইতে কোথাও দূরে যাই নাই। কিন্তু অকস্মাৎ একটী কুটুম্ব বাড়ীর বিবাহের নিমন্ত্রণ উপলক্ষে একবারেই বেহারা

পাল্‌কী লইয়া আসাতে অগত্যা ফিরাইতে পারিলাম না,—যাইতে হইল। যেদিন গিয়াছি তৎপরদিন অকস্মাৎ রক্তস্রাব হইয়া ২।৩ ঘণ্টার মধ্যে পরিবার মারা গেল। তখন আর করিতে সাহস করিলাম না অগত্যা ছাড়িয়া দিলাম।

অন্যান্য প্রকৃত ঘটনাগুলিও ক্রমশঃ লিখিব লেখার দোষ গুণ বা রচনার দোষ গুণ ধরিবেন না, সংশোধন করিয়া লইবেন। সময়াভাব বশতঃ তাড়াতাড়ি লেখায় কোন বিষয়ে দৃষ্টি রাখি নাই, মূল কথার দিকে গিয়াছি।

শ্রীচৌধুরী ত্রৈলোক্যনাথ মিত্র।
পোঃ খড়ইগড়, গড়ধুর্দ্দা।

স্বামী সচ্চিদানন্দ বালকৃষ্ণ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

চিন্তা-মূর্ত্তি।

স্বামীজী লিখিতেছেন।—

"বোলপুর গ্রামে একটি বৃহৎ প্রান্তর আছে, তন্মধ্যে শ্যামাকান্ত পণ্ডিত নামক জনৈক ব্যক্তি কুটীর নির্ম্মাণে বসবাস করেন। তিনি সংসার-ত্যাগী সন্ন্যাসী এবং আমার গুরুভাই হয়েন। একদা আমার তাঁহার সহিত দেখা করিতে ইচ্ছা হওয়ায় তথায় যাইবার জন্য ট্রেণে চাপিলাম। ট্রেণে যাইতে যাইতে মনে হইল, আমাদের গুরু ভাইদের মধ্যে কিরূপ পরস্পর যোগ হইয়াছে দেখা যাউক। আমি যাইবার অগ্রেই

তিনি আমাকে দেখিতে পান কি না। এই উদ্দেশ্যে মনে মনে সূক্ষ্ম শরীরে দর্শন দিবার ক্রিয়া করিলাম। পরে ষ্টেশনে নামিলে, জনৈক ব্যক্তি আমাকে থাকিবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করিল। আমি শ্যামাকান্তকে দেখিবার জন্য বড়ই ব্যাকুলিত থাকায় উহার নিমন্ত্রণ গ্রহণ না করিয়াই একেবারে শ্যামাকান্তের কুটীরে চলিয়া গেলাম। শ্যামাকান্তের সহিত কথাবার্ত্তায় তিনি যে ইতিপূর্ব্বেই আমাকে দেখিয়াছিলেন ও তদনুসারে আমার আগমন প্রতীক্ষায় ছিলেন তাহা জানা গেল। কয়েক দিন যাবৎ উহাঁর কুটীরে অতি যত্নসহকারে তিনি আমাকে রাখিয়াছিলেন। এস্থানে থাকা কালে অনেক অলৌকিক ঘটনা ঘটিয়াছিল।"

শ্যামাকান্ত পণ্ডিত মহাশয় স্বামীজীর যে মূর্ত্তি তাঁহার যাইবার পূর্ব্বেই দেখিয়াছিলেন, ঐ শ্রেণীর মূর্ত্তিকে চিন্তামূর্ত্তি বা thought bodies কহে। যদ্যপি কোন ব্যক্তি কোন স্থানে না যাইয়াও সেই স্থানে উপস্থিত হইয়াছেন, এইরূপ মনে মনে দৃঢ়ভাবে চিন্তা করেন, কিম্বা কোথাও যাইয় উপস্থিত হইবার জন্য দৃঢ়ভাবে মনে মনে ভাবনা বা ইচ্ছা করেন, এই ভাবনা, চিন্তা বা ইচ্ছা বশতঃ একটি চিন্তা মূর্ত্তি গঠিত হইয়া থাকে। এই মূর্ত্তির আকার প্রায়শঃ চিন্তাকারক ব্যক্তির আকৃতির অনুরূপ হয়। এই মূর্ত্তি অভীপ্সিত স্থানে যাইয়া উপস্থিত হইবেই হইবে। চিন্তা-প্রসূত মূর্ত্তি সকলের এইপ্রকার গতি শক্তি হইয়া থাকে। চিন্তার গভীরতা অনুসারে এই মূর্ত্তির স্থায়িত্ব কালের কম বেশী হইয়া থাকে। এই চিন্তামূর্ত্তি সাধারণতঃ নয়নগোচর হয় না। এই মূর্ত্তি ভুবর্লোক ও স্বর্গলোকের সূক্ষ্ম ও সূক্ষ্মতর পদার্থে গঠিত হওয়ায় ভূলোকের স্থূল চক্ষের গোচর হয় না। দিব্যদৃষ্টি থাকিলে দেখিতে পাওয়া গিয়া থাকে। অনেক স্থলে এইরূপ মূর্ত্তি অনেকে দেখিতে পায় এবং যাহার মূর্ত্তি,সেই লোক আসিয়াছে বলিয়া ভ্রমে পতিত হয়। যাহাদের দিব্যদৃষ্টি নাই (ক্লেয়ার ভয়াণ্ট নহে) এরূপ

লোকে দেখিতে পাইবে এইরূপ ইচ্ছা করিলে, চিন্তা মূর্ত্তিটি, যাহা সূক্ষ্ম পদার্থে গঠিত, তাহার উপর স্থূল চক্ষুর দৃষ্টি-যোগ্য স্থূলপদার্থের আবরণ দিতে হইবে। অর্থাৎ পার্থিব পদার্থ মূর্ত্তিটীর চতুর্দ্দিকে লাগাইয়া দিতে হইবে। এইরূপ করাকে মেটিরিয়ালাইজ্ (materialize) করা কহে। অল্পক্ষণস্থায়ী স্থূল আবরণ দেওয়া সাধ্য। এইরূপ করিলে চিন্তা মূর্ত্তিটি, সেস্থলে উপস্থিত সকলেই দেখিতে পাইয়া থাকে। সাধক যাঁহাকে দেখা দিবার ইচ্ছা করিয়াছেন, তাঁহার মনোমধ্যে সাধকের মূর্ত্তি কল্পনা করিবার ভাব নিজ মেসমেরিক শক্তি (mesmeric influence)সাহায্যে উৎপাদন করিতে পারিলে কেবলমাত্র সেই ব্যক্তিই সাধকের চিন্তামূর্ত্তিটি দেখিতে পাইবে। যাহাদের মধ্যে রক্তের যোগ আছে, অথবা যাঁহারা এক গুরুর শিষ্য, এইরূপ ব্যক্তিদের মধ্যে পরস্পর এইরূপ মেসমেরিক শক্তি প্রয়োগ সহজসাধ্য। কোনস্থলে এইরূপ শক্তি প্রয়োগের অসুবিধা ঘটিলে অভীপ্সিত দর্শনকারীর স্থূল ইন্দ্রিয়শক্তি সকলকে কিছুকালের জন্য দমন করিয়া তাঁহার গূঢ়স্থিত সূক্ষ্ম শক্তির বিকাশ করাইলে সে ব্যক্তি সাধকের চিন্তামূর্ত্তি দর্শনে সমর্থ হয়। সমধিক শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি অপেক্ষাকৃত হীন-শক্তিধর লোকের উপর এই ক্রিয়া সহজে করিতে পারেন।

স্বামীজী যে সূক্ষ্ম শরীরে দর্শন দিবার ক্রিয়া করার বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে তিনি স্পষ্ট করিয়া বেশী বলেন না। তিনি নিজ চিন্তা-মূর্ত্তিটিকে;ভৌতিক আবরণে আবৃত করিয়া মেটিরিয়ালাইজ করিয়া-ছিলেন, কি শ্যামাকান্তের মনোমধ্যে স্বামীজীর মূর্ত্তি চিন্তার ভাব উদয় করিয়াছিলেন, কি শ্যামাকান্তের গূঢ় সূক্ষ্ম শক্তির ক্ষণিক বিকাশ করাইয়া ছিলেন, তাহা স্বামীজী জানেন।

আমরা এ স্থলে আর একটি চিন্তা-মূর্ত্তির বিষয় উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। তত্ত্ববিদ্যা-সমিতির মাননীয় শ্রীযুক্ত লেড্‌বিটার

মহোদয় পূর্ব্বে যখন গির্জায় ধর্ম্মযাজকের (পাদরির) কার্য্য করিতেন, সেই সময়ে এক রবিবার তাঁহার দেহ এতই অসুস্থ ও দুর্ব্বল হয় যে, তিনি রবিবারের গির্জার কাজ করিতে অসমর্থ বোধ করেন। তথাচ তিনি নিতান্ত ক্লান্ত চিত্তে ও দুর্ব্বল দেহে কোনগতিকে কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে প্রবৃত্ত হন। কার্য্য যতই শেষ হইয়া আসিতে লাগিল, ততই তাঁহার ক্লান্তি ভাব বেশী হওয়ায়, কার্য্য শেষে বিশ্রামের ইচ্ছা প্রবল হইতে থাকে। কার্য্য শেষ হইলে তিনি দ্রুতবেগে বিশ্রাম-গৃহে চলিয়া গেলেন। যাইয়া দেখেন, তথায় যে কেবলমাত্র একখানি চেয়ার তাঁহার বিশ্রামজন্য ছিল, তাহাতে তাঁহার মত সমুদয় পোষাক পরিহিত কোন লোক বসিয়া আছে। লোকটি দেখিতে অবিকল তাঁহার মত, লোকটি একদৃষ্টে তাঁহার দিকে চাহিয়া আছে। যাহা হউক, তিনি অতিশয় ক্লান্ত থাকায় কিছু গ্রাহ্য না করিয়া চেয়ারে ঐ মূর্ত্তিটির উপর বসিয়া পড়িলেন। দশ মিনিট পরে উঠিয়া দেখিলেন, মূর্ত্তিটি আর চেয়ারে নাই। "The other side of death" নামক পুস্তকের ১৭০ পৃষ্ঠায় এই ব্যাপারটী তিনি নিজে উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, বোধহয় বক্তৃতা করিবার কালে আমার মনের অন্তরালে বক্তৃতান্তে চেয়ারে বসিয়া বিশ্রাম করিবার বাসনা বরাবর জাগরূক ছিল, এই বাসনা ক্রমে বক্তৃতার শেষে ক্লান্তিবৃদ্ধিবশতঃ দৃঢ়তর ও তীব্র হওয়ায় ইহার ফলে আমার চিন্তামূর্ত্তি গঠিত হয় এবং বিশ্রামের ঘরে উক্ত মূর্ত্তি যাইয়া উপস্থিত হয় ও চেয়ারে বসে। স্থূল দেহের অসুস্থতা ও নিরতিশয় ক্লান্তিবশতঃ আমার সূক্ষ্মদেহের শক্তিসমূহের ক্ষণিক বিকাশ করিয়া থাকিবে। এই জন্যই আমি ঐ চিন্তামূর্ত্তি দর্শনে সমর্থ হইয়া থাকিব।

একদা স্বামীজী আমার হাবড়ায় বাটীতে আসিয়াছিলেন। সন্ধ্যা-কালে আমার আফিস ঘরে তক্তপোশের উপর বসিয়া গোষ্ঠ-গান

করিতেছিলেন, আমার মাতুল অতি নিকটে বসিয়া গান শুনিতেছিলেন। তিনি দেখিলেন যে, তাঁহার চক্ষের সম্মুখ দিয়া রাখালবালক গাভী কৃষক প্রভৃতির চিত্র চলিয়া যাইতেছে। বায়স্কোপে যেরূপ ছবি দেখা যায়, চিত্রগুলি তদনুরূপ পর পর চলিতে লাগিল। স্বামীজী স্থিরচিত্তে নিবিষ্ট মনে গোষ্ঠ সম্বন্ধে গান করা হেতু তাঁহার গোষ্ঠচিন্তা-প্রসূত গোষ্ঠের মূর্ত্তি সকল হইয়াছিল, এবং স্বভাবতঃই উহারা গতিশীল থাকায় শূন্য-মার্গে চলিয়া যাইতেছিল। স্বামীজী একজন শক্তিধর সাধক; উঁহার মধ্যে যে মহাশক্তি খেলিতেছে, সেই শক্তির কেন্দ্রের মধ্যে মাতুল মহাশয় বসিয়া থাকায় ঐ শক্তিতে তাঁহারও তৎকালীন সূক্ষ্মশক্তির বিকাশ আপনা-আপনিই হইয়া থাকিবে। এই কারণেই তিনি সূক্ষ্মলোকের এই চিন্তামূর্ত্তি দর্শনে সমর্থ হইয়াছিলেন।

একটী রহস্য ;—সাধক সাংসারিক কার্য্য শেষ করিয়া স্থির ও শান্ত-মনে নির্জ্জন স্থানে বসিয়া ব্যক্তিবিশেষের মূর্ত্তি ধ্যান করিবেন। এইরূপে গাঢ়ধ্যান হেতু সাধকের নিকট উক্ত ব্যক্তির মূর্ত্তি আসিয়া উপস্থিত হইবে। যে সময় ঐ ব্যক্তিটি নিদ্রিত থাকে, এইরূপ সময়ে এই কার্য্য করিতে পারিলে আরও ভাল হয়; কারণ তাহা হইলে নিদ্রিত ব্যক্তির সূক্ষ্ম শরীর (Astral body) আকর্ষিত হইয়া আসিয়া সাধকের কল্পিত ঐ চিন্তামূর্ত্তি মধ্যে প্রবিষ্ট হইবে ও মূর্ত্তিটিকে সজীব করিয়া তুলিবে। এই মূর্ত্তি সম্মুখে রাখিয়া সাধক তাহাকে উপদেশ দিতে আরম্ভ করিবেন। লোকটি যত্তপি মদ্যপায়ী হয় এবং সংসারের লোকদের খাওয়াইবার টাকাকড়ি সমুদয় মদে খরচ করিতে থাকে ও পরিবার বর্গকে মারধর করে, তবে তাহাকে মদ্যপানের যাবতীয় দোষ ও সংসারে তাহার কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব সম্বন্ধে সমুদয় বিষয় তর্ক ভাবে না কহিয়া কেবল সরল ভাবে নিবেদন মত কহিলে, ঐ মাতালের মনোমধ্যে ঐ সকল ভাব তাহার জাগ্রত অবস্থার

সকল সময়ে উদয় হইবে ও এইরূপ ভাবে ধ্যান ও নিবেদন কয়েক দিন করিতে করিতে শেষে তাহার পানাসক্তি ও অর্থনাশ ইচ্ছার দমন হইবে, ও উহার সুমতি হইবে। এরূপে লোকটিকে সৎপথে আনিতে সাধক সক্ষম হইবেন। এই পরিবর্ত্তনের মূল কারণ ও কর্ত্তা কে, তাহা কেহ জানিতে পারিবে না। এইরূপে রোগে, শোকে, ও নানাবিধ ইন্দ্রিয়ের কার্য্যে আসক্ত, পীড়িত লোকদের উপকার আপন বাটীতে বসিয়া চিন্তা-সাহায্যে করা যাইতে পারে। জগতে এইভাবে অনেকে সাধন করিতেছেন ও আমাদের কল্যাণ করিতেছেন।

শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

ভূতের বন্ধু দর্শন। *

আমার নিবাস যশোহর জেলার অন্তঃপাতী নলদী গ্রামে। উক্ত গ্রামের জমিদার ও কলিকাতা হাইকোর্টের সুযোগ্য ব্যারিষ্টার মিঃ এইচ্ সি ঘোষ মহাশয়ের খুল্লতাত-পুত্র ৵ ক্ষিতীশচন্দ্র ঘোষ আমার আন্তরিক বন্ধু। শৈশবের কোমল-প্রাণের কোমল-ভালবাসা ও অকৃত্রিম প্রণয় লইয়া আমরা উভয়ে গ্রামস্থ পাঠশালার পাঠ সমাপনান্তে নিকটবর্ত্তী মধ্য ইংরাজী স্কুলে অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করি। তথাকার পাঠও উক্ত রূপ উভয়ের আন্তরিক স্নেহ ও ভালবাসার ভিতর দিয়া সমাপ্ত করিয়া আমরা উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে প্রবেশার্থ পরস্পর বিচ্ছিন্ন হই। তদবধি আমাদের সেই শৈশব, বাল্য ও কৈশোরের খেলা ধূলা শেষ হয়। আমরা

---

* ঘটনাটী এত দিন সাধারণে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা ছিল না। তাই এত দিন ইহা প্রকাশ করি নাই। সম্প্রতি কয়েকজন বন্ধুর সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে প্রকাশ করা গেল। লেখক।

তখন উভয়ের প্রতি কি জানি কি এক অজ্ঞাত প্রেম-সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলাম যে, দিনান্তে কেহ কাহাকে একবার দর্শন না করিলে প্রাণের আবেগ প্রশমন করিতে পারিতাম না। কিন্তু কর্ত্তব্য কাহাকেও মায়া মমতা বা স্নেহে আবদ্ধ থাকিতে দেয় না। তাই এক দিন আমরা পরস্পর পরস্পরকে প্রাণ বিনিময় করিয়া স্ব স্ব কর্ত্তব্য সাধনে ভিন্ন ভিন্ন পথে অগ্রসর হইলাম। সে আজ ৫ বৎসরের কথা। তখন স্বদেশী আন্দোলনের প্রবল বন্যায় আসমুদ্র কুমারিকা প্লাবিত। তাই জানি না, বিধাতা আমার দ্বারা দেশের কোন্ ভাবী কার্য্যের সহায়তা করাইবেন বলিয়া আমাকে জাতীয় বিদ্যালয়ে আহ্বান করিলেন—আমি কলিকাতায় আসিলাম এবং অনতি বিলম্বে অধ্যয়ন আরম্ভ করিলাম।

এ দিকে ক্ষিতীশচন্দ্র ক্রমে নড়াইল ভিক্টোরিয়া কলেজ হইতে সেনহাটী (খুলনা) স্কুলে প্রবেশ করিল। আমাদের সেই দেখাই শেষ দেখা; যদিও আমি শিক্ষার্থী তথাপিও গ্রীষ্ম ও পূজার অবকাশে কখনও বাটী যাই নাই। মধ্যে মধ্যে দুই একবার যাহা গিয়াছিলাম, তাহাতে ক্ষিতীশ চন্দ্রের সন্দর্শন লাভ আমার ভাগ্যে ঘটে নাই।

গত বৎসর এক দিন (মাস ও তারিখ আমার ঠিক স্মরণ নাই) অপরাহ্ণে আমি বিডন উদ্যান হইতে বক্তৃতা প্রদান করিয়া আমাদের ৫৪।৫ মানিকতলা ষ্ট্রীটস্থ মেসে ফিরিয়াই দেখি, আমার পর্য্যঙ্কের উপর উপাধানে মস্তক রাখিয়া কে একজন শায়িত রহিয়াছে। আমি প্রথমে তাহাকে পরিষ্কাররূপে চিনিতে পারিতেছিলাম না। এক দৃষ্টে কিয়ৎক্ষণের জন্য তাহার মুখ পানে নিরীক্ষণ করিতেছিলাম। তদ্দর্শনে সে গম্ভীর ভাবে বলিল "কি চিনিতে পারিতেছ না ?"

আমি—কে ক্ষিতীশ ! বহু দিন পরে আজ তোমার সহিত দেখা হ'লো ! ভাল আছ ত ?

ক্ষিতীশ—"না ভাই, তত ভাল নয়।" এই বলিয়া সে উঠিয়া বসিল। আমি তাহাকে অভূতপূর্ব্ব গম্ভীর দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—

"তোমাকে অত (grave)গম্ভীর দেখা যাইতেছে কেন?" ক্ষিতীশ তাহার কোন উত্তর করিল না। কেবল একটি দীর্ঘশ্বাসের সহিত তাহার ডাগর ডাগর চক্ষু দুইটী হইতে দুই ফোটা অশ্রু নিপতিত হইল। বন্ধুর এই আকস্মিক দুঃখের কারণ নির্দ্দেশ করিতে না পারিয়া আমার মনে কি যেন এক ভাবের তরঙ্গ উত্থিত হইল। তাহাকে পথশ্রান্তে অতীব ক্লান্ত বোধে অধিক প্রশ্ন করিয়া অধিকতর ক্লান্ত করা অবিধেয় বিবেচনা করতঃ আমি কালবিলম্ব না করিয়া মেসের চাকরকে কিঞ্চিৎ জল খাবার আনিবার জন্য পয়সা দিতে নিম্নতলে যাইলাম। যাইবার সময়ে ক্ষিতীশ আমাকে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিল যে, সে কিছুই খাইতে ইচ্ছুক নহে। আমি সে আব্দার রক্ষা করিলাম না।

প্রায় ১০ মিনিট পরে চাকর খাবার আনিয়া আমার হস্তে অর্পণ করিল। আমি উপরিতলে যাইয়া দেখি, ক্ষিতীশ ত দূরের কথা, তাহার পুস্তকের বোচ্‌কাটী পর্য্যন্ত তথায় নাই। আমি তন্ন তন্ন করিয়া সমস্ত বাড়ী অনুসন্ধান করিলাম। কিন্তু তাহার কোনই সন্ধান পাইলাম না।

আমি তন্মুহূর্ত্তেই রাস্তায় বহির্গত হইলাম। যে যে বাটী অথবা মেসে তাহার যাইবার সম্ভাবনা ছিল, সেই সেই বাটী ও মেস অনুসন্ধান করিলাম; কিন্তু কোনই সন্ধান পাওয়া গেল না।

আমার চিন্তার আর পরিসীমা রহিল না। আমি একরূপ অন্যমনস্ক ভাবে বাসায় ফিরিয়া রাত্রিটুকু নানা দুশ্চিন্তায় অতিবাহিত করিলাম; তৎপরে প্রভাতে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক নিয়মিত মুখ প্রক্ষালনাদি সমাপন পূর্ব্বক পড়িতে বসিয়াছি, তখন আমার পিতা ঠাকুর মহাশয়-প্রেরিত একখানি টেলিগ্রাম পাইলাম। তাহাতে লিখিত ছিল;—

Kshitish died yesterday morning পড়িবামাত্র আমি সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়িয়া গেলাম। সংজ্ঞাবস্থায় কি হইয়াছিল আমার মনে নাই। মানুষ মরিলেও যে তাহার হৃদয় হইতে বন্ধুপ্রীতি দূরীভূত হয় না উল্লিখিত প্রত্যক্ষ ঘটনাই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। শ্রীশ্যামলাল গোস্বামী।

"পুনরাগমন"।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

(৩১)

আমরা সকলে পিতামহের অনুসরণ করিলাম। তিনি পিতার গৃহে প্রবিষ্ট হইয়াই ডাকিলেন—"রাধানাথ!" পিতা পূর্ব্ববৎ নিস্পন্দ। খুল্ল পিতামহ পিতার শয্যায় উপবিষ্ট হইয়া দ্বিতীয়বার ডাকিলেন—"রাধানাথ!"—উত্তর পাইলেন না। পিতার বক্ষে হস্ত দিয়া তৃতীয়বার ডাকিলেন—"রাধানাথ!" পিতার শরীরটা একবার শিহরিলমাত্র তার পর সেই পিতার দেহ আবার স্পন্দন রহিত হইয়া গেল।

গৃহ লোকপূর্ণ, কিন্তু নিস্তব্ধ। পিতামহের ক্রিয়া কলাপ আমরা যেন নিশ্বাস বন্ধ করিয়া দেখিতেছি। প্রথমে আশার আবেগে কতকটা উল্লাসিত হইয়াছিলাম। এখন আবার হতাশার অবসাদ আসিল।

খুল্ল পিতামহও কিয়ৎক্ষণ নির্ব্বাক রহিলেন। পিতার পার্শ্বে বসিয়া তাঁহাকে দেখিতে লাগিলেন।

অনেকক্ষণ এই ভাবে কাটিয়া গেল।—ডাক্তার বাবু দাঁড়াইয়া পুর-মহিলারা সকলে দাঁড়াইয়া, কাহারও মুখে কোনও কথা নাই। শুধু মা বসিয়াছিলেন—বসিয়া স্থির নেত্রে পিতামহের মুখ পানে চাহিয়াছিলেন। যেন চিত্রপুত্তলিকা! এরূপ আগ্রহের সহিত দৃষ্টি—কোনও সন্তান

কোনও কালে কোনও জননীর কাছে পাইয়াছে কি না সন্দেহ। অন্ততঃ আমার ভাগ্যে আমার জ্ঞানতঃ ঘটে নাই। কলুষিত অন্তর—আমি মায়ের মুখের ভাব দেখিয়া কাঁপিয়া উঠিলাম। মুহূর্ত্তের জন্য পিতার ব্যাধির কথা মন হইতে দূর হইয়া গেল। ভাবিলাম, তবে কি গত রাত্রিতে মায়ের প্রতি পিতা যে সকল কঠোর বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলেন, তাহার মূলে কিছু সত্য আছে! অত্যধিক মনোভঙ্গেই কি পিতার আজ এইরূপ অবস্থা! অতি ক্লেশে দরিদ্র পল্লীবাসী ব্রাহ্মণ প্রভূত অর্থ উপার্জ্জনে নিজের সংসারকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। যাহার জন্য তাঁহার এত ক্লেশ, এত পরিশ্রম সেই জননীই কি তাঁহাকে বলপ্রয়োগে অকালে সংসার হইতে বিদূরিত করিয়া দিতেছেন! মনে মনে পিতার মর্ম্মবেদনা কথঞ্চিৎ অনুমান করিয়া সাগ্রহনেত্রে একবার মুমূর্ষু পিতার পানে চাহিলাম। দেখিলাম, সংসারের সঙ্গে বাক্ সম্বন্ধ দর্শন সম্বন্ধ, ইহ জীবনের জন্য ত্যাগ করিয়া দাবদগ্ধ কুরঙ্গের ন্যায় দর্শন-ভীতি হইতে নিস্তার পাইবার জন্যই যেন নিমীলিত নেত্রে সংসার হইতে তিনি অপসৃত হইতেছেন।

মায়ের এই নির্লজ্জার আচরণ বড়ই আমার দৃষ্টি যাতনা উৎপাদন করিতে লাগিল। ভাবিলাম, গৃহমধ্যস্থ পুরমহিলারা মায়ের এরূপ অবস্থিতি দেখিয়া কি মনে করিবে! ডাক্তার বাবুই বা কি মনে করিবেন!

পূর্ব্বেই বলিয়াছি—কলুষিত অন্তর—মায়ের চিত্রার্পিতের ন্যায় অবস্থিতির আমি কোনও সদর্থ গ্রহণ করিতে সক্ষম হইলাম না।

হতভাগ্য আমি—সারা জীবন কেবল অন্তরের সঙ্কীর্ণতার জন্যই যন্ত্রণা পাইয়াছি। আমার এই বৃদ্ধ বয়সের দীর্ঘ উষ্ণশ্বাস সেই দূর অতীতের অশুভক্ষণ পর্য্যন্ত পৌঁছিয়া যদি আমার সেই মলিনতা দূর করিতে পারিত, তাহা হইলেও বুঝি আমি কতকটা নিশ্চিন্ত হইতে পারিতাম! কিন্তু যাক, আমি সাধারণ মানবের চিত্তের—অনুদার, সন্দিগ্ধ, দুর্ব্বল অথচ

অভিমান পূর্ণ চিত্তের প্রতিনিধিত্ব গ্রহণ করিয়া আত্মকাহিনী প্রকাশ করিতেছি। যে চিত্তের অধিকারী হইবার পর হইতে আমাদের ধর্ম্ম সংঘের ন্যায় সুপ্রতিষ্ঠিত শান্তির নিলয় আর্য্যগৃহ অশান্তির তৃণাবর্ত্তে নিত্য উৎপীড়িত হইতেছে, আমি সেই চিত্তের ম্লান ছবি তোমাদের সম্মুখে ধরিতেছি—জানি আমাকে তিরস্কার করিতে যাইয়া তোমরা কেবল আত্মতিরস্কারই করিবে।

আমি মনে মনে মায়ের উপর ক্রুদ্ধ হইলাম। মনে করিলাম, পিতার দেহত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে আমিও এ গৃহ ত্যাগ করিব। মায়ের এই পবিত্রতাময়ী মূর্ত্তির আবরণ মধ্যে লুক্কায়িত বিকট ছলনাকে স্মরণ করিয়া আমি এ গৃহে অবস্থান করিতে পারিব না।

চিন্তার আবেগে আন্তরিক ক্রোধ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। মায়ের পানে আর একবার চাহিলাম, দেখিলাম মা ঠিক সেই ভাবে বসিয়া। ভাবিলাম, নির্লজ্জা মাকে একবার বলি—সকল লোকের সমক্ষে একবার শুনাইয়া দিই—"তুমিই আমার পিতাকে হত্যা করিয়াছ।"

"ঠিক"—কি এক অপূর্ব্ব স্বর গাম্ভীর্য্যে ঘরের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ হইয়া গেল।—একটি গভীর দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া ছোট ঠাকুরদা বলিলেন— "ঠিক! মালক্ষ্মী! তুমিই তোমার স্বামীকে হত্যা করিয়াছ।" সর্ব্বশরীরটা শিহরিয়া উঠিল, হৃদয়ের গ্রন্থি যেন শিথিল হইয়া গেল! ছোটঠাকুরদাদা কি অন্তর্য্যামী! মনে হইল হেঁটমুণ্ড ব্রাহ্মণ আমার মনের প্রতি অক্ষর তীব্র দৃষ্টিতে পাঠ করিতেছেন। হায়, মনটাকে যদি সাগরগর্ভে ডুবাইয়াও পিতামহের চক্ষের অন্তরাল করিতে পারিতাম। মনের এই ভাব অধিকক্ষণ থাকিলে, আমি সেখানে দাঁড়াইতে পারিতাম না। সন্দিগ্ধ অন্তর আমাকে প্রকৃতিস্থ হইবার সহায়তা করিল। পরক্ষণেই

'আমার মনে হইল, হঠাৎ কেমন করিয়া আমার মনের কথার সঙ্গে পিতা-মহের কথা মিলিয়া গিয়াছে। সেই বিশ্বাসে সুস্থির হইলাম। পিতা-মহের কথা শুনিতে লাগিলাম।

পিতামহ বলিলেন—"মালক্ষ্মী! তুমিই তোমার স্বামীকে হত্যা করিয়াছ।"

মাতা বলিলেন—"আমি!"

"একটু চিন্তা করিয়া দেখ দেখি কোনও দিন স্বামীর প্রতি মর্ম্মান্তিক ক্রুদ্ধ হইয়াছিলে কিনা।"

"হইয়াছিলাম! কোনও দিন কেন—কাল—রাত্রিকালে। স্বামীর উপর অভিমানে নিজের আশু মৃত্যু কামনা করিয়াছি।"

"ভাল কর নাই। আত্মহত্যার তুল্য পাপ আর নাই। নিজের মৃত্যু কামনাও মহাপাপ—আত্মহত্যা অপেক্ষা বড় কম মনে করিও না।"

"স্বামী বড়ই মর্ম্মভেদী তীব্র বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলেন।"

"স্বামীর তিরস্কার আশীর্ব্বাদ স্বরূপ গ্রহণ করা তোমার কর্ত্তব্য ছিল। মা তুমিও সাধারণ স্ত্রীলোকের মত আত্মহারা হইলে, স্বামীকে মানুষ মনে করিয়া তাঁহাকে ঘৃণা করিলে! সেই পাপে তোমার আজ এই শাস্তি হইয়াছে।"

"কই বাবা, আমিত স্বামীকে ঘৃণা করি নাই। নিজের অদৃষ্টকেই ঘৃণা করিয়াছি। স্বামী আমার গুরু নিন্দা করিয়াছিলেন।"

"আত্মহারা রমণী! তোমাকে কি উপদেশ দিয়াছিলাম? স্বামীর তুল্য গুরু স্ত্রীলোকের কি আর আছে!"

"বেশ আমি নিজের মৃত্যু কামনা করিয়াছিলাম;—তবে আমার মৃত্যু না হইয়া স্বামীর এ দশা হইল কেন?"

"স্বামীর প্রতি অনুরাগে কি মৃত্যু কামনা করিয়াছিলে, না দ্বেষপরবশ হইয়া করিয়াছিলে ?"

"এখন উপায়! আমি অবোধ কন্যা, না হয় ভুল করিয়াছি—আপনি আমার মঙ্গলময় পিতা—ইষ্টদেব—আপনি ত উপস্থিত হইয়াছেন।"

"সেই জন্যইত তোমাকে তিরস্কার করিতে ইচ্ছা হইতেছে। আমি আসিয়া তোমার বিশেষ উপকার করিতে পারিতেছি কই! দেখিতেছি, হতভাগ্য ভ্রাতুষ্পুত্র তীব্র তিরস্কারে তোমার মনোবেদনা উপস্থিত করিয়াছে। মা, তুমিত জাননা, সতীর মনোবেদনা যে কি তীব্র ফল উৎপাদন করে, তাহাত তোমার বিদিত নাই। জানিলে তুমি স্বামীর উপর কখনই মর্ম্মান্তিক অভিমান করিতে না। জগন্মাতা সে অভিমান গ্রহণ করিয়াছেন. আমি কি করিব!"

"তবে কি আমি বিধবা হইব ?"

"বৈধব্যকে তুমি ডাকিয়া আনিয়াছ।"

মা আর কোনও উত্তর না করিয়া ছোট ঠাকুরদাদার পা দুটা জড়াইয়া ধরিলেন। আমরা সকলেই দাঁড়াইয়া দেখিতেছি, কি পুরুষ, কি স্ত্রীলোক কাহারও মুখে কোনও কথা নাই—অথবা কথা কহিবার শক্তি নাই।

অনেকক্ষণ স্থির থাকিয়া ছোট ঠাকুরদা আমাকে বলিলেন—"গোপীনাথ! কাল যখন আমি আহ্নিকে বসিয়াছিলাম, তখন কোন সন্ন্যাসীনীকে কি তুমি দেখিয়াছ ?"

"দেখিয়াছি! শুধু কাল নয়, আজও দেখিয়াছি।"

উল্লাসের সহিত ছোট ঠাকুরদা বলিয়া উঠিলেন—"আজও দেখিয়াছ ?"

আমি বলিলাম—"শুধু দেখা নয়, সেই বেটীই আমাকে আজ সমস্ত দিন বাড়ী ছাড়া করিয়াছে, এবং এই দুর্দ্দশায় ফেলিয়াছে।" এই বলিয়া তাঁহাকে মুখের অবস্থা দেখাইলাম। আর বলিলাম—"এখন বুঝিতে পারিতেছি, সেই বেটীই আমাদের এই অনিষ্ট করিয়াছে।" সে আমাকে শুনাইয়া বিড়বিড় করিয়া যাহা বলিয়াছিল, এখন তাহার মর্ম্ম-গ্রহণ করিতেছি।"

"তাহাকে কোথায় দেখিয়াছ ?"

"কালীতলায়।"

"তোমাকে আর একবার তাঁর কাছে যাইতে হইবে।"

'মা'ই মরুন, আর বাবাই মরুন, তার কাছে আমি যাইতে পারিব না।"

মা বলিলেন—"অনুমতি করুন, আমি যাই।"

পিতামহ বলিলেন—"তোমার যাওয়া হইতে পারে না।"

ডাক্তার বাবু বলিলেন—"বেশ আমিই যাইতেছি।"

ছোট ঠাকুর দাদা এ প্রস্তাবে সম্মত হইলেন—ডাক্তার বাবুও বুড়ীকে আনিতে চলিলেন। যাইবার পূর্ব্বে একবার দাদাকে জিজ্ঞাসা করিয়া লইলেন—যদি তাহাকে দেখিতে না পাওয়া যায়, তাহা হইলে তিনি কি করিবেন।

ছোট ঠাকুর দাদা বলিলেন—"তাঁহাকে না পাইলে রোগীর জীবন কিছুতেই রক্ষা হইবে না।"

ডাক্তার বাবুর ফিরিতে প্রায় আধ ঘণ্টা সময় লাগিল। তিনি একাকী আসিতেছেন দেখিয়া, আমরা মনে করিলাম বুঝি তিনি বৃদ্ধাকে দেখিতে পান নাই। তাঁহার স্ত্রী তাঁহাকে সেই প্রশ্নই করিলেন।

তিনি বলিলেন—"দেখা মিলিয়াছে, কিন্তু তিনি কিছুতেই আসিতে

চাহিলেন না। তাঁহাকে বারংবার অনুরোধ করিতে আমার সাহস হইল না।”

ছোট ঠাকুর দা বলিলেন—“আমার নাম করিয়া আসিতে বলেন নাই কেন!”

“অবশেষে আপনার নাম করিয়াছিলাম, তথাপি তিনি আসিলেন না।”

“তবে আর কি করিব মা, তোমার স্বামীর পরমায়ু ফুরাইয়াছে।” এই বলিয়া খুল্ল পিতামহ গাত্রোত্থান করিলেন।

গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইবার জন্য তিনি দুই চারিপদ দ্বারের দিকে অগ্রসর হইলেন। মা জিজ্ঞাসা করিলেন, “আপনি কোথায় যাইতেছেন?”

ছোট ঠাকুর দাদা বলিলেন—“তোমার পুত্র গোপালের বিবাহসম্বন্ধ স্থির হইয়াছে। কিন্তু আমি দেখিতেছি, আজ রাত্রির মধ্যেই রাধানাথের দেহত্যাগ হইবে। অশৌচ অবস্থায় যাহাতে শুভকার্য্য না হয়, সেই জন্য কন্যার পিতামহকে আমি নিষেধ করিতে যাইব।”

মা আর কোনও কথা কহিলেন না—অপর কেহও কোন কথা কহিলেন না, কিন্তু খুল্ল পিতামহের এই নিষ্ঠুরের মত আচরণ দেখিয়া তাঁহার উপরে আমার ক্রোধ জন্মিল, তাহার উপর বিবাহের কথা উঠিবামাত্র আমার মনের অবস্থাটা যেন কেমন একরকম হইয়া গেল। সত্য কথা বলিতে কি আমি পিতার আসন্ন মৃত্যু ভুলিয়া গেলাম, ঈষৎ রুক্ষকণ্ঠে বলিলাম—“কাল এ সংবাদ দিলে চলিত না!”

“ঠাকুরদাদা মুখ ফিরাইয়া বলিলেন—“তা চলিতে পারে, কেননা বিবাহ পূর্ণিমার তিথিতে হইবে। তবে সে ব্রাহ্মণ আগে হইতেই আয়োজনাদি করিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হইবে কেন!”

"তা বলিয়া এরূপ অবস্থায় আমাদের ফেলিয়া যাওয়া আমি আত্মীয়ের কাজ বলিয়া মনে করি না।"

"কোনও ত কাজে আসিলাম না—"

"বেশ যান—তবে যাইতে যাইতে, এই মুমূর্ষু কর্ত্তৃক আপনাদের পিতাপুত্রের যদি একবিন্দুও উপকার হইয়া থাকে, তাহা স্মরণ করিতে করিতে যাইবেন।" আরও দুই এক কথা বলিতে যাইতেছিলাম। ডাক্তার বাবু আমার মুখটা চাপিয়া ধরিলেন।

মা বলিলেন--"একবার দাঁড়ান, প্রণাম করি।"

দাদা প্রণতা জননীর মস্তকে করস্পর্শ করিয়া বলিলেন—"যাহা ঘটিবার তাহা ঘটিবেই। মা, শোক করিয়ো না।"

মায়ের হইয়া আমি উত্তর করিলাম—"এরূপ উপদেশ দিতে মায়ের অনেক আত্মীয় আছে।" ডাক্তার বাবু আবার আমার মুখে হাত দিলেন। আমি কিন্তু এবারে হাত সরাইয়া দিলাম; এবং বলিলাম—আমাদের দুরবস্থার সংবাদ পাইয়া, অবসর বুঝিয়া জ্ঞাতিত্ব সাধিতে আসিয়াছেন। অকৃতজ্ঞ চাকরটাকে এই জন্যই সঙ্গে আনিতে সাহস করেন নাই। পুত্রের বিবাহের কথা শুনাইবার আর বুঝি সময় পাইলেন না!

"ক্রোধের কি করিয়াছি গোপীনাথ?"

"কি করিয়াছেন, তাহা আপনাকে কি বুঝাইব! চাকরটা আসিত, তাহা হইলে বুঝিতেন। পাদুকাতে সেই বেইমানের মুখ বিক্ষত করিয়া দিতাম।"

"মা বলিলেন, "আপনি চলিয়া যান।"

আমি গত রজনীতে পিতার সমস্ত কথার মর্ম্মগ্রহণ করিয়াছি। বুঝিয়াছি,দস্যুর আক্রমণ হইতে আরম্ভ করিয়া এ পর্য্যন্ত যে সমস্ত ঘটনা ঘটি-

য়াছে,সমস্তই এই ছদ্মবেশী ব্রাহ্মণের ষড়যন্ত্র। এমনও মনে হইল, কৌশলে কোন বিষ প্রয়োগে ইহারা পিতাপুত্রে আমার পিতাকে জন্মের মত নির্ব্বাক করিয়াছে। তিরস্কারের অবসর পাইয়াছি, দু'কথা বুজরুক ব্রাহ্মণকে বলিতে ছাড়িব কেন ?

ছোট ঠাকুর দাদা ঈষৎ হাসিয়া উত্তর করিলেন—"গোপীনাথ তোমার ক্রোধ মূল্যহীন। যদি কোনও উপকার করিতে পারিতাম, তাহা হইলে তোমার আর এক মূর্ত্তি দেখিতাম।"

"আপনি কি উপকার করিবেন ? বড় বড় ডাক্তার প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াও যাঁহাকে রক্ষা করিতে পারিলেন না,আপনি নিরক্ষর ব্রাহ্মণ গোটা কতক অর্থহীন বুজরুকীর কথা বলিয়া তাঁহার কি করিতে পারেন ?"

ডাক্তার বাবু আমাকে তিরস্কার করিলেন—মেয়েরাও সে তিরস্কারে যোগ দিলেন। মা কেবল ছোট ঠাকুরদাদাকে গৃহত্যাগ করিতে সাগ্রহ অনুরোধ করিলেন।

এইরূপ তীব্র তিরস্কারেও খুল্ল পিতামহ ক্রোধের সামান্য মাত্রও লক্ষণ দেখাইলেন না। তিনি হাসিতে হাসিতেই উত্তর করিলেন—"গোপীনাথ! ঠিক বলিয়াছ। তুমি আমার চোখ ফুটাইয়া দিলে, দিয়া পরমাত্মীয়ের কার্য্য করিলে। আমি অহংজ্ঞানে মত্ত হইয়া কি করিতে-ছিলাম! ক্ষুদ্র আমি, আমার উপকার করিবার শক্তি কই। মা জগ-দম্বা যাহাকে রক্ষা না করেন, তাহাকে আর কে রক্ষা করিতে পারে!" তাহার পর মায়ের দিকে ফিরিয়া তিনি বলিতে লাগিলেন—"কিন্তু মা লক্ষ্মী, আজ মহানবমীর পুণ্যময়ী রজনী, মা পার্ব্বতী বিশ্ববাসী সন্তানের উপর আশীর্ব্বাদ ঢালিয়া স্বগৃহে কৈলাসে গমন করিতেছেন। সেই আশীর্ব্বাদের উপর নির্ভর করিয়া আমি তোমাকে আশ্বাস দিতে আসিয়া-ছিলাম।—মা আনন্দময়ি, তোর ভক্ত—কন্যার গৃহই আজ নিরানন্দময়

রহিবে। মা বরাভয়করা একবার এখানে শ্রীচরণের ধূলি দিয়া যা!" কহিতে কহিতে ব্রাহ্মণের মুখ যেন উন্মত্তের ভাব ধারণ করিল। উচ্চ-কণ্ঠে ব্রাহ্মণ আর একবার কাহাকে যেন সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"একবার আয়। এই অবিশ্বাসী পাষণ্ডের গৃহে তোর মহিমা প্রকাশ করিতে একবার আয়। আমাকে ঋণদায় হইতে মুক্ত কর্।"

কি বলিব! গৈরিক পরিধায়িনী, ললাটে ত্রিপুণ্ড্রধরা, ত্রিশূলকরা, সেই কপালিনী কোথা হইতে গৃহমধ্যে উপস্থিত হইয়া বলিলেন—"রমানাথ! আমি আসিয়াছি।"

খুল্লপিতামহ তাঁহাকে দেখিবামাত্র সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন। পিতা-মহকে প্রণাম করিতে দেখিয়া আমাদিগের সকলকেই অন্ততঃ বাধ্য হইয়া ভূমিতে গড়াগড়ি খাইতে হইল।

দাদা বলিলেন—"কি মা আসিয়াছ?"

বৃদ্ধা বলিলেন—"আসিয়াছি। আসিবার ইচ্ছা ছিল না। কেবল তোমার মর্য্যাদা রাখিতে তোমার দামোদর জোর করিয়া আমাকে এখানে পাঠাইয়াছেন। যেখানে সাধ্বী রমণীর অসম্মান হয়, সেখানে আমাদের আসিতে নাই।" এই বলিয়া বুড়ী কট্‌মট্‌ করিয়া একবার আমার পানে চাহিল। ভয়ে আমার আত্মাপুরুষ শুকাইয়া গেল। তাহার পর ছোট ঠাকুরদাদাকে বুড়ী তিরস্কার করিতে লাগিল—"বেটা! আজ নবমীর নিশি না হইলে, তোর বুক আমি এই ত্রিশূল দিয়া বিঁধিয়া দিতাম। এতকাল সাধন করিয়াও তোর মোহ ঘুচিল না!" কে মরিতেছে—তুই কাকে বাঁচাইতে ব্যাকুল হইয়াছিস্?"

দাদা হাঁ, কি না কোনও উত্তর করিলেন না—শুধু হেঁটমুণ্ডে দাঁড়াইয়া রহিলেন। দাদার প্রতি তিরস্কার কার্য্য সমাধা করিয়া, বুড়ী আমাদের সকলের প্রতি এক একবার তীব্র কটাক্ষে চাহিল। সকলেই ভয়ে আড়ষ্ট

—অথচ বৃদ্ধা শীর্ণা—দেখিলে মনে হয়, যেন আমাদের অঙ্গুষ্ঠের ভার সহনে অক্ষম, কিন্তু তাহার চক্ষের জ্যোতির সম্মুখে স্থির হইয়া দাঁড়ায় কাহার সাধ্য! সকলেই ভয়ে আড়ষ্ট!

আর কোনও কথা না কহিয়া বৃদ্ধা বরাবর রোগীর শয্যাপার্শ্বে চলিয়া গেল। মুমূর্ষু পিতাকে কিয়ৎক্ষণ স্থির হইয়া দেখিতে লাগিল। তারপর মায়ের দিকে ফিরিয়া বলিল—"কিরে বেটী, ঘর ছাড়িতে পারবি ?"

মাতা তাহার কথার অর্থ বুঝিতে না পারিয়া ছোট ঠাকুরদার মুখ পানে চাহিলেন। ছোট ঠাকুরদা বৃদ্ধাকে বলিলেন—"ঘর কি না ছাড়িলে চলিবে না ?"

বৃদ্ধা বলিল—"চলিবে না।" এই বলিয়া মাকে আবার বলিল—"ঘর ছাড়িতে পারিস্ত, বল্,—তোর স্বামীকে বাঁচাইয়া দিই।"

আমি একথায় চুপ করিয়া থাকিতে পারিলাম না—ঈষৎ ব্যঙ্গচ্ছলে বলিলাম—"মা ঘর ছাড়িয়া কোথায় যাইবে ? তোমার সঙ্গে ত্রিশূল হাতে পথে পথে ঘুরিবে নাকি।"

বুড়ী ত্রিশূল লইয়া মারিতে আসিল। বলিল—"আমি তোমারই মুণ্ডপাত করিতে আসিয়াছি।" আমি একদৌড়ে ঘরের এক কোণে উপস্থিত হইলাম। বুক্‌টা ধড়াস্ ধড়াস্ করিতে লাগিল। না সরিলে ত্রিশূলের খোঁচা খাইয়া বুঝি মরিতে হইত! সেইখান হইতে বলিলাম—"ছোট ঠাকুরদা! পাগলটীকে ঘর হইতে লইয়া চলিয়া যাও। আমার পিতাকে বাঁচাইবার প্রয়োজন নাই।"

ডাক্তার বাবু আমাকে নীরব থাকিতে ইঙ্গিত করিলেন। ছোট ঠাকুরদা মাকে বলিলেন—"মা লক্ষ্মী! স্বামীর ব্যাধি নিজে লইতে পারিবে! স্বামীর প্রাণ রাখিতে নিজে দেহত্যাগ করিতে পারিবে ?"

মা উত্তর করিলেন—"খুব পারিব, এখনি আমার প্রাণ লইয়া স্বামীর প্রাণরক্ষা করুন।"

বৃদ্ধা আমাদিগকে গৃহত্যাগ করিতে আদেশ করিল।

মা ও খুল্লতাত ব্যতীত আমরা সকলেই অন্য গৃহে চলিয়া আসিয়াছি। সকলেই দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া কথা কহিবার অবকাশ পাইয়াছে। স্ত্রীলোকেরা বলিতে লাগিলেন—"একি! এরকম ব্যাপার ত কখন দেখি নাই"

কেহ বলিল—"এও কি কখন হয়। ডাক্তারেরা যাহাকে ত্যাগ করিয়াছে; তাহাকে বৃদ্ধা কেমন করিয়া বাঁচাইবে।"

কেহ বলিল—"তা আর আশ্চর্য্য কি, দৈববলে না হইতে পারে কি! এইরূপ যে যাহার মত প্রকাশ করিতে লাগিলেন। কেহ আশ্বাস দিলেন, কেহ বিভীষিকা দেখাইলেন। আমার মাতার সে গৃহে অবস্থান কেহ কেহ যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিলেন না। ডাক্তার বাবু তাঁহার স্ত্রীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"গৃহিণী! তর্কনিধি মহাশয় যদি বাঁচেন, তাহা হইলে ডাক্তারের ব্যবসা ত্যাগ করিয়া তোমাকে লইয়া কাশী যাইব।"

তাহাদের কথাবার্ত্তা শেষ হইতে না হইতে, মা আসিলেন। সকলেই সোৎসুকে তাঁহাকে রোগীর অবস্থা জিজ্ঞাসা করিলেন। মা বলিলেন—"এখনও কোন পরিবর্ত্তন দেখি নাই। তাঁহারা দ্বারবদ্ধ করিয়া কি ক্রিয়া করিতেছেন। আপনারা সকলে অনাহারে আছেন, আমি আহারের বন্দোবস্ত করিতে আসিয়াছি।"

সকলেই আহারে অনিচ্ছাপ্রকাশ করিলেন, কিন্তু মায়ের জেদ—কেহ এড়াইতে পারিলেন না।

রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর অতীত হইয়া গেল, তথাপি গৃহের দ্বার উন্মুক্ত

হইল না। অপেক্ষায় অপেক্ষায় আমরা সকলেই ক্লান্ত হইয়া পড়িলাম। সকলেরই বিশ্রাম লইবার অভিলাষ জাগিল।

বিশ্রাম লইতে গিয়া আমি ঘুমাইয়া পড়িয়াছি। মায়ের মৃদু করস্পর্শে আমার ঘুম ভাঙিল। মা অনুচ্চস্বরে আমাকে বলিলেন, "তাঁহারা চলিয়া গিয়াছেন।"

"তারপর?"

"আমিত কিছু বলিতে পারি না। আমি গৃহে প্রবেশ করিতে সাহস করি নাই।"

আমি উঠিলাম। উঠিয়া ডাক্তার বাবুর নিদ্রাভঙ্গ করিলাম। তাঁহাকে সঙ্গে লইলাম। একাকী গৃহমধ্যে প্রবেশ করিতে আমার সাহস হইল না।

সভয়ে উভয়ে গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইলাম। শয্যাপার্শ্বে গিয়া দেখিলাম, পিতা পূর্ব্ববৎ।

ডাক্তার বাবু বলিলেন—"কি দেখিতেছ, রোগী জীবনহীন। এখন বুঝিতেছি, কতকগুলা ভণ্ড আমাদিগকে প্রতারিত করিতে আসিয়াছিল।"

হৃদয় শোকের আবেগে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। অর্দ্ধরুদ্ধ কণ্ঠে একবার ডাকিলাম—"বাবা!"

"গোপীনাথ! বড় পিপাসা!"

একবার ডাক্তার বাবুর দিকে চাহিলাম। দেখিলাম, তিনি পালঙ্কের একাংশ ধরিয়া অতি কষ্টে কম্পিত দেহকে ভূপতন হইতে রক্ষা করিতেছেন।

শ্রীক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ।

অলৌকিক রহস্য।

৺গয়া মাহাত্ম্য।

কন্যার গর্ভে জননীর পুনর্জ্জন্ম।

২৪ পরগণার অন্তর্গত দমদমার এলাকাধীন সিঁথি নামক গ্রামে নিম্নলিখিত আশ্চর্য্য ঘটনাটি সংঘটিত হইয়াছিল। তথায় আমার মাতুলালয় বলিয়া, আমি উহা শ্রবণ করিয়াছিলাম। যাঁহার নিকট হইতে শুনিয়াছিলাম, তিনি আমার একজন বিশেষ সম্মানার্হ আত্মীয় ও বিশ্বস্ত ব্যক্তি। তিনি যে আমার নিকট একটা কল্পিত গল্পের অবতারণা করিয়া আমাকে প্রতারণা করিবেন, এরূপ আমি কিছুতেই সন্দেহ করিতে পারি না। আমি যে ঘটনাটির বিষয় লিখিতেছি, তাহা সহজে কেহ বিশ্বাস করিতে পারিবেন না, কিন্তু তাহাতে আমার কোন ক্ষতি-বৃদ্ধি নাই, তবে আমি যাহা শুনিয়াছি এবং সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছি, তাহা বিন্দুমাত্র রঞ্জিত না করিয়া নিম্নে বিবৃত করিলাম। যদি কোন সত্যান্বেষী প্রকৃতজিজ্ঞাসু ব্যক্তি এসকল তত্ত্ব অবগত হইবার নিমিত্ত উৎসুক হন, তাহা হইলে তিনি এতত্ত্ববিশারদ কোন বিশিষ্ট পণ্ডিতের আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারেন।

শুনিলাম, মদীয় মাতুলালয়ের পারিপার্শ্বিক কতিপয় প্রতিবেশী গদাধরের পাদপদ্মে পরলোকগত আত্মীয় স্বজনগণের পিণ্ডপ্রদানোদ্দেশ্যে ৺গয়াধামে গমন করিয়াছিলেন। যাঁহারা যাইতে পারেন নাই, তাঁহারা স্বীয় পরলোকগত আত্মীয়গণের পিণ্ডার্থে তাঁহাদের নাম, ধাম ইত্যাদি তীর্থযাত্রীদিগের নিকট প্রদান করিয়াছিলেন। ঐ সকল তীর্থযাত্রিগণের মধ্যে একজন বৃদ্ধা বিধবা রমণী গিয়াছিলেন। তাঁহাকে সকলে "মুড়ী-ওয়ালীর বৌ" বলিয়া ডাকিত। তাঁহার এক প্রতিবেশী স্ত্রীলোক তাহার পরলোকগতা জননীর পিণ্ডের নিমিত্ত তাঁহাকে বিশেষ অনুরোধ করায়, তিনিও তাহার অনুরোধ প্রতিপালনার্থ প্রতিশ্রুতা হয়েন।

তীর্থযাত্রিগণ যথাসময়ে ৺গয়াধামে গিয়া উপস্থিত হইলেন। যে দিবস পিণ্ডক্রিয়া আরম্ভ হইবে, তৎপূর্ব্ববর্ত্তী রজনীতে পূর্ব্বোল্লিখিত "মুড়ীওয়ালীর বৌ" একটি আশ্চর্য্য স্বপ্ন দর্শন করিলেন। তিনি স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন, যেন তাঁহার শিয়রদেশে উপবিষ্ট হইয়া কে একজন স্ত্রীলোক পরিচিত স্বরে তাঁহার নাম ধরিয়া বারম্বার ডাকিতেছে, যেন তাহাতে তাঁহার নিদ্রা ভঙ্গ হইল; কিন্তু কাহাকেও তিনি দেখিতে পাইলেন না। যেন পুনরায় তিনি শয়ন করিলেন এবং অনতিবিলম্বে সেই পরিচিত স্বর যেন পুনরায় তাঁহার শ্রবণ বিবরে প্রবিষ্ট হইল;—কে যেন এই কথাগুলি বলিতেছে,—"ও মুড়ীওয়ালীর বৌ, মুড়ীওয়ালীর বৌ, হ্যাগা তুই এখানে এলি, তা' আমার জন্যে একটু দোক্তা এনেছিস্ কি? আমি অনেক দিন দোক্তা খেতে পাইনি, যদি এনে থাকিস্, তো আমায় একটু দে।" এই কথা বলিয়া, যেন ক্ষণকাল সে নীরব রহিল। খানিক পরে পুনরায় বলিতে লাগিল,—"ওগো, ও মুড়ীওয়ালীর বৌ, মুড়ীওয়ালীর বৌ, দ্যাখ্ আমার বড় খিদে পাচ্ছে, আমায় একটু দুধ খাইয়ে দেনা বৌ?" মুড়ীওয়ালীর বৌ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন,—"আচ্ছা,

তুমি কে বল দেখি? তুমি একবার আমাকে দোক্তা চাহিলে, আবার আমাকে এখন দুধ খাইয়ে দিতে বলিতেছ!" সে উত্তর করিল,—"কেন! তুই আমায় চিন্‌তে পাচ্ছিস্‌ না? আমি যে, — র মা; আমি যে এখন তা'র মেয়ে হ'য়ে জন্মেছি, তাই দুধ খেতে চাচ্ছি। তা' তুইতো আমার পিণ্ডি দিয়ে যাবি, তাই একবার দোক্তা চাইলাম, আর একবার দুধ খেতে চাচ্ছি।" মুড়ীওয়ালীর বৌ তখন অত্যন্ত বিস্মিতা হইয়া যেন ভাবিতে লাগিলেন,—"সত্য সত্যই তো তা'র (যেস্ত্রীলোকটি তাহার মায়ের পিণ্ডি দিবার নিমিত্ত তাঁহাকে অনুরোধ করিয়াছে) তিন মাসের মেয়ে দেখে এসেছি—পিণ্ড দিলে সে কি আর বাঁচ্‌বে!" যেন তাঁহার মনের ভাব জানিতে পারিয়া সেই স্বপ্নে দৃষ্ট মুড়ীওয়ালীর বৌকে বলিল,— "তুই ভাবছিস্‌ কি? আমায় পিণ্ডি দিতে ভুলিস্‌ নি; আমি আর কষ্ট সহ্য করিতে পারি না—তা'র মেয়ে হ'বার সাধ ছিল—সে সাধ এখন মিটেছে—বৌ আমার পিণ্ডি দিয়ে যাস্‌,—আমি আর কষ্ট সহ্য করিতে পারি না!" এমন সময় মুড়ীওয়ালীর বৌএর নিদ্রা ভঙ্গ হইল—তখন প্রায় ভোর হইয়া আসিয়াছে।

উক্ত প্রকার স্বপ্নদর্শনে তিনি অত্যন্ত ভীত, বিস্মিত ও বিশেষ চিন্তিত হইলেন। বিশেষতঃ, ভোরের স্বপ্ন প্রায় সত্য হয়, এইরূপ তাঁহার একটা ধারণা ছিল। তিনি কিয়ৎক্ষণ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়া হইয়া নানারূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন। অবশেষে পার্শ্বস্থিত সহযাত্রিবর্গকে জাগাইয়া উক্ত স্বপ্নবৃত্তান্ত অবগত করিলেন। তারপর তাঁহারা সকলে তথাকার পাণ্ডার নিকট আদ্যোপান্ত সমস্ত বিবৃত করিলেন। পাণ্ডা মহাশয় সমস্ত শ্রবণ করিয়া উত্তর করিলেন যে, তিনি যখন স্বয়ং পিণ্ড প্রার্থনা করিতেছেন. তখন তাঁহাকে বঞ্চিত করা যুক্তিসঙ্গত নহে; তাঁহার নামে পিণ্ডপ্রদান করিতেই হইবে। যদি না করা হয়, তাহা হইলে মহাপাপ হইবে এবং বিশেষ

অনিষ্ট সংঘটনের সম্ভাবনা রহিবে। তিনি আরও বলিলেন যে, পিণ্ডপ্রদান করিলে সেই মেয়েটি কিন্তু তৎক্ষণাৎ মারা যাইবে।

যাত্রিবর্গ অত্যন্ত চিন্তিত হইলেন। কোন্ জ্ঞানে তাঁহারা জনক-জননীর স্নেহময় ক্রোড় হইতে সেই শশিকলার ন্যায় বর্দ্ধিতা কন্যাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া মৃত্যুর করালকবলে প্রেরণ করিবেন? কোন্ প্রাণে তাঁহারা সেই সন্তানবিয়োগবিধুরার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া বলিবেন যে, তাঁহারাই তাহার কন্যার মৃত্যুর কারণ? এই সকল চিন্তায় তাঁহারা অত্যন্ত অভিভূত হইয়া পুনরায় পাণ্ডা মহাশয়ের নিকট গমনপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহার কোন উপায়ান্তর আছে কি না? পাণ্ডা মহাশয় তাঁহাদিগকে আশ্বস্ত করিয়া বলিলেন যে, পিণ্ড-প্রদানের পর এখানকার অক্ষয়বট তরুতলায় আঁচল বিছাইয়া বসিলে যদি কোন পত্র কিংবা ফল পড়ে, সেই পাতা কিংবা ফল সেই স্ত্রীলোকটিকে দিলে, তাহার আবার সন্তান হইতে পারে।

যথাসময়ে সকলের পিণ্ডক্রিয়া সমাপন হইয়া গেল। পাণ্ডা-মহাশয়ের উপদেশ মত মুড়ীওয়ালীর বৌ সেই অক্ষয়-বট তরুতলায় আঁচল বিছাইয়া সেই স্ত্রীলোকটির সন্তান-কামনায় নিবিষ্টচিত্তে উপবিষ্ট রহিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে তাঁহার আঁচলের উপর একটি ফল পড়িল; সেইটি অতি যত্নসহকারে তিনি আঁচলে বাঁধিয়া রাখিলেন।

তীর্থ-প্রত্যাগমনের অব্যবহিত পরে মুড়ীওয়ালীর বৌ সেই স্ত্রীলোকটির সহিত সাক্ষাৎ-মানসে তাহার গৃহে পদার্পণ করিবামাত্র সে উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিল। মুড়ীওয়ালীর বৌ দেখিলেন যে, সত্যসত্যই কন্যাটি জননীর ক্রোড় শূন্য করিয়া অমরধামে গমন করিয়াছে! তাহাকে সান্ত্বনা করিয়া বলিলেন,—'দিদি, আমি সব জানি, আর কেঁদে কি কর্বে বল? তোমার জন্য এই ফল এনেছি,—এটি যত্ন ক'রে রেখে দাও।'

তার পর মুড়ীওয়ালীর বৌ ও অন্যান্য সহযাত্রিগণ সেই স্ত্রীলোক ও তাহার স্বামীর নিকট স্বপ্নবৃত্তান্ত ও পাণ্ডা মহাশয়ের আদেশ উপদেশ প্রভৃতি আদ্যোপান্ত বিবৃত করিলেন। স্ত্রীলোকটির গর্ভে যে তাহার জননী আসিয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, ইহা শুনিয়া সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। তাহার পর সকলে বুঝিতে পারিলেন যে, যেদিন যে সময়ে পিণ্ড-প্রদান করা হইয়াছিল, ঠিক্ সেই দিন সেই সময় মেয়েটি মারা গিয়াছিল! সকলে শুনিলেন যে, উহার পূর্ব্বে মেয়েটি বেশ হাসিতেছিল—খেলিতেছিল; তার পর তাহার জননী তাহাকে দুধ খাওয়াইয়া দেওয়ায় সে ঘুমাইয়া পড়িলে, বিছানায় তাহাকে শোয়াইয়া রাখিয়া, তিনি আহার করিতে বসিলেন। আহার করিতে করিতে বোধ হইল, কে যেন তাঁহার পৃষ্ঠদেশে একটা প্রকাণ্ড চপেটাঘাত প্রদান করিয়া গেল। সেই সঙ্গে তাঁহার যেন একটা চমক্ ভাঙ্গিল!—সেই সময় তাঁহার মনে হইল, সেই চপেটাঘাতের দ্বারা কে যেন তাঁহাকে ইঙ্গিত করিয়া বলিয়া গেল,—"তুই এখানে সুখে আহার করিতেছিস্, কিন্তু তোর যে কি সর্ব্বনাশ হইয়াছে, তাহা এখনও জানিতে পারিস্ নাই!" এইরূপ মনে হওয়াতে তিনি আহার পরিত্যাগ করিয়া একবার মেয়েকে দেখিতে গেলেন, সে ঘুমাচ্ছে কি জেগে উঠেছে। কিন্তু হায়! তিনি তথায় গিয়া দেখিলেন যে, দু'বার দুধ তুলিয়া তাঁহার মেয়ের চোখ উল্টাইয়া পড়িল! হঠাৎ তাঁহার মেয়ের কেন এরূপ হইল, কেহই স্থির করিতে পারিলেন না। তৎক্ষণাৎ তাহাকে বাহিরে আনা হইল, কিন্তু কোন প্রতিকারের পূর্ব্বেই সে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল।

উক্ত ঘটনার বৎসরদ্বয় পরে সেই স্ত্রীলোকটি পুনরায় গর্ভবতী হইলেন এবং যথাসময়ে তাঁহার একটি পুত্রসন্তান ভূমিষ্ট হইল। পরে যে পাণ্ডার উপদেশে বটবৃক্ষ হইতে ফল প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছিল এবং যাহার মহিমায়

এই নবসন্তান লাভ হইল, সেই পাণ্ডার নাম চিরস্মরণীয় করিবার নিমিত্ত তাঁহার নামানুকরণে পুত্রের নাম "বেণীমাধব" রাখা হইল। পরে সেই পুত্র জনক-জননীর আনন্দবর্দ্ধন করিতে করিতে কালক্রমে সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে লাগিল। এই পুত্রের পর সেই স্ত্রীলোকটির একটি কন্যা হইয়াছিল। ভ্রাতা ও ভগ্নী উভয়েই নিরাপদে জীবনযাত্রা অতিবাহিত করিতে লাগিল।

এস্থলে ইহা বলা আবশ্যক যে, মুড়ীওয়ালীর বৌ যে প্রকার স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন, উক্ত স্ত্রীলোকটি সে প্রকারের কোন স্বপ্ন দর্শন করেন নাই, কেবলমাত্র তাঁহার পূর্ব্ববর্ণিত চিত্ত-বৈলক্ষণ্য উপস্থিত হইয়াছিল। আরও শুনিলাম যে, অতি শৈশবাবস্থায় ঐ স্ত্রীলোকটির মাতৃ-বিয়োগ হয়—এমন কি তাঁহার মাতার আকৃতি পর্য্যন্ত তাঁহার স্মরণ ছিল না। যদিও তাঁহার বাল্যকালে বিবাহ হইয়াছিল, তথাপি মাতৃ-বিয়োগের অন্ততঃ দশ বার বৎসর পরে তাঁহার প্রথম গর্ভ-সঞ্চার হয় এবং সেই গর্ভে তাঁহার জননী কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ; তবে কি তিনি এতকাল প্রেতলোকেই অবস্থিতি করিতেছিলেন ? জানি না, এ রহস্য কেহ উদ্‌ঘাটন করিতে পারেন কি না, কারণ এ বৈচিত্র্যময় জগতে সকলই বিচিত্র।

শ্রীঅমৃতলাল দাস।

"ভূতের অদ্ভুত প্রতিহিংসা।"

বীরভূম জেলার অন্তর্গত কোন একটী ক্ষুদ্র পল্লীতে রাখালচন্দ্র পাল নামক একটী বলিষ্ঠ ও সাহসী যুবক বাস করিত। সে প্রায়ই জ্যোৎস্না রাত্রে পল্লীর সকলে নিদ্রিত হইলে, একটী ছিপ হাতে করিয়া মাছ ধরিবার জন্য তাহার বাটী হইতে কিঞ্চিৎ দূরে "চাপাপুকুর" নামক একটি

বৃহৎ পুষ্করিণীতে যাইত। একদিন রাত্রি দুই প্রহর কিম্বা একটার সময় সে একটি বড় কাৎলা মাছ ধরিয়া বাটীতে প্রত্যাগমন করিতেছিল।

পুষ্করিণী হইতে কিয়দ্দূরে একটা বাঁশবন আছে। যখন সেই ব্যক্তি সেই স্থান অতিক্রম করিতেছিল, সেই সময় যেন তাহার বোধ হইল, কেহ পশ্চাৎ হইতে তাহার নিকট 'মাছ দিয়ে যা' 'মাছ দিয়ে যা' বলিয়া তাহাকে ডাকিতেছিল; কিন্তু সাহসী যুবক তাহাতে দৃক্‌পাত না করিয়া দ্রুতপদে নিজ গৃহাভিমুখে ধাবিত হইল। সেই ভূত অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিয়া শেষে বিফল-মনোরথ হইয়া বলিল, "তুই যেমন আমাকে মাছ দিলি না, দেখিস্ ভবিষ্যতে আমি তোর ভয়ানক অনিষ্ট করিব।" সেই যুবক এই সকল কথা শুনিয়া নির্ভীক-চিত্তে বাটীতে আসিয়া তাহার স্ত্রীকে বলিল, "এই মাছ কুটিয়া এখন রন্ধন কর।" রন্ধন-গৃহে কাঠ, দেশালাই, পাতা প্রভৃতি সমস্ত ছিল, তাহার স্ত্রী তাড়াতাড়ি চুলাতে অগ্নি-সংযোগ করিয়া দিল এবং মাছ কুটিতে আরম্ভ করিল। ইত্যবসরে সেই রন্ধনশালার কিছু বিবরণ জানা আবশ্যক। রন্ধন-শালার চাল তৃণাচ্ছাদিত, চতুর্দ্দিক টিন দিয়া মোড়া ও ধূম বহির্গত হইবার জন্য চারিধারে চারিটি জানালা আছে। তাহার স্ত্রীর মাছ কুটা হইলে তিনি রন্ধন করিতে আরম্ভ করিলেন। যখন মাছ ভাজা হইতেছে, তখন চুল্লীর উপরে যে জানালা আছে, তাহার মধ্য দিয়া কে যেন মাঝে মাঝে হাত বাড়াইতেছে; তাহা দেখিয়া তিনি ভীত হইয়া তাহার স্বামীকে আহ্বান করিলেন।

স্বামী আসিয়া বলিলেন "উহা কিছুই নয়"। তখন স্বামী ও স্ত্রী উভয়ে মিলিত হইয়া রন্ধন সমাপন করিলেন এবং তৃপ্তির সহিত ভোজন করিয়া প্রায় রাত্রি ২টা কিম্বা ২॥ টার সময় শয়নাগারে গমন করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া শয়ন করিলেন।

ভোর ৪টার সময় হঠাৎ সেই যুবক বিসূচিকা রোগাক্রান্ত হয় এবং গত রাত্রে যে সমস্ত ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহা আদ্যোপান্ত বর্ণন করিয়া দুই ঘণ্টার ভিতর ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া যান। রাত্রি প্রভাত হইলে প্রতিবাসীরা আসিয়া সমবেত হন এবং তাহার স্ত্রীর মুখে রাত্রির ঘটনা আদ্যোপান্ত শুনিয়া সকলেই "ভূতের অদ্ভুত প্রতিহিংসা" বলিয়া স্বীকার করেন। তাহার পর সেই শবদেহ দাহ করিবার জন্য শ্মশানে লইয়া যাওয়া হয়—আমার বন্ধু সেই সময় তাঁহাদের সহযাত্রী হন। শব চিতায় শয়ন করাইয়া স্তূপাকারে কাষ্ঠ সাজাইয়া অগ্নিসংযোগ করা হয়, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যত কাষ্ঠ দেন, তত কাষ্ঠই পুড়িয়া যায় মাত্র, অথচ শবটী ঠিক যেরূপ ছিল, অবিকল সেইরূপই থাকে, কেবল তাহার মুখটী পশ্চাতের দিকে উল্‌টাইয়া যায়।

তখন তাঁহারা অনেক কষ্টে শবটীকে চিতা হইতে বাহির করিয়া, কুঠার দিয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া, তাহা দাহ করিয়া বাটীতে প্রত্যাগমন করিলেন। এই শবদেহটি দাহ করিতে প্রায় সন্ধ্যা হইয়া গেল। যখন তাঁহারা শ্মশান হইতে গৃহে ফিরিতেছিলেন, তখন কে যেন তাঁহাদের অলক্ষিতে বলিল, "দেখ্‌লি আমি কিরূপে আপনার প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিলাম!" তাহার স্ত্রী বলেন, এই ঘটনার পর হইতে প্রায় পাঁচ, ছয় মাস রন্ধনগৃহে রাত্রিকালে কে যেন ঢিল ছুড়িত, ধুলা ফেলিত এবং কখন বা বিকট শব্দ করিত। শেষে প্রতিবাসীরা সমবেত হইয়া একটী সুদক্ষ ওঝা আনিয়া এই উৎপাত হইতে তাহাদের পরিবারবর্গকে রক্ষা করেন।

শ্রীগৌরীকুমার চৌধুরী।

স্বপ্ন ও বাসনার সফলতা।

আমার জীবনের ঘটনাটি আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে ঐ সম্বন্ধে আমার কিছু জিজ্ঞাস্য আছে। স্বপ্ন ও বাসনার সফলতা একই নিয়মেই সংঘটিত হয় কি না? কয়েক মাস পূর্ব্বে "অলৌকিক রহস্যের" এক সংখ্যায় স্বপ্নের সফলতা সম্বন্ধে একটু আলোচনা ছিল। ভূলোকে যাহা কিছু ঘটিয়া থাকে, তাহা সমস্তই ভুবর্লোকে প্রতিফলিত হয়—তাহাই আমরা স্বপ্নাবস্থায় দেখিয়া থাকি; একথা সেখানে বলা হইয়াছিল। ইহা যদি সত্য হয় তবে,—

(১) স্বপ্নাবস্থা ছাড়া অন্য সময়েও আমরা সেই সকল প্রতিফলিত ঘটনাবলী না জানিতে পারিব কেন? অবশ্য এজন্য মনের সম্যক্ অনুশীলন প্রয়োজন। তাহা হইলে ভবিষ্যৎ ঘটনাবলী আমরা মানস-নেত্রে দেখিতে পাই কি না?

(২) আমাদের বাসনার উদ্ভব ব্যাপার, সেই ভুবর্লোকে প্রতিফলিত ঘটনার সহিত সম্পর্ক-বিশিষ্ট কি না? মানব যাহা ইচ্ছা করে, তাহাই ভুবর্লোকে প্রতিফলিত হয়; না, ভুবর্লোকে প্রতিফলিত ঘটনাবলী বাসনা রূপে বা অন্য কোন ভাবে মানব-মনে উদয় হয়? পূর্ব্বোক্ত কথাটি যদি সত্য হয়, তবে মানবের ইচ্ছাশক্তি সম্যক্ অনুশীলিত হইলে, তাহা যাহা ইচ্ছা তাহাই সম্পন্ন করিতে সক্ষম কিনা?

(৩) কারণ-শরীরের পরিপুষ্টতায় উপরন্তু মানবের ইচ্ছার উদ্ভব হইবার কারণ নির্ভর করে কিনা? সকল মানবের মনে সকল প্রকার ইচ্ছার উদ্ভব হয় না কেন?

এ সকল বিষয় সম্যক্ আলোচনার প্রয়োজন। সে ভার কোন

যোগ্যতর ব্যক্তির হস্তে ভার রাখিয়া, আমি আমার জীবনের স্বপ্ন ও বাসনার সফলতা সম্বন্ধে যে ঘটনাটি ঘটিয়াছিল, তাহাই বলিয়া আজ আমার কথা শেষ করিব।

আমার বিবাহের এক বৎসর পূর্ব্বে একদিন আমি স্বপ্নে দেখিলাম, একটী নদীর তীরে শত শত বাণিজ্য-তরণী নঙ্গর করিয়া রহিয়াছে। তীরে একটী দ্বিতল অট্টালিকার জানালার পাশে দাঁড়াইয়া, আমি ও আমার স্ত্রী নদীর শোভা দেখিতেছি। আকাশে চাঁদ হাসিতেছে, তাহার কিরণ নদীতে পড়িয়া ঢেউগুলিতে রূপালি রং ঢালিয়া দিয়াছে। দূরে পরপারে বৃক্ষশ্রেণী ও মাঠ সকল চন্দ্রালোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। মৃদু মন্দ বসন্ত পবন বহিয়া যাইতেছে। আমি দাঁড়াইয়া আছি, পাশে আমার স্ত্রী হাসি হাসি মুখে, প্রেমবিহ্বল নেত্রে আমার বুকে মাথা রাখিয়া দাঁড়াইয়া ঐ সকল দেখিতেছে।

এই স্বপ্ন দেখিবার এক বৎসর পরেই আমার বিবাহ হয়। বিবাহের পর আরও বৎসর দুই কাটিয়া গেল। আমি তখন কলিকাতাতে এফ্.এ পড়িতেছিলাম, এই সময় অর্দ্ধোদয় যোগ উপলক্ষে কলিকাতা ও গঙ্গার তীরবর্ত্তী অন্যান্য নগরীতে বহু যাত্রীর সমাগম হইয়াছিল। আমার স্ত্রী, মাতৃদেবী এবং অন্যান্য পরিজন সমভিব্যাহারে এই যোগ উপলক্ষে বহরমপুর গিয়াছিলেন। স্নানের গোল মিটিয়া গেলে, আমার একটী ভাগিনেয়ীর পুত্রের অন্নপ্রাশন উপলক্ষে তাঁহারা সকলে বহরমপুরেই অবস্থিতি করিতেছিলেন। সেই ব্যাপারে যোগদান করিবার জন্য আমিও কলিকাতা হইতে বহরমপুর গিয়াছিলাম।

যে বাড়ীতে আমরা ছিলাম, তাহা গঙ্গানদীর তীরেই অবস্থিত ছিল। একদিন জ্যোৎস্নালোক-বিভাসিত রজনীতে আমি ও আমার স্ত্রী উভয়ে সেই বাড়ীর দ্বিতল কক্ষে একটী জানালার পাশে দাঁড়াইয়া গঙ্গার দৃশ্য

দেখিতেছিলাম। এতদিন আমার ঐ স্বপ্ন কথা মোটেই মনে ছিল না। ঠিক ঐ ভাবে দুই জনে দাঁড়াইয়া গঙ্গার দিকে তাকাইতেই আমার স্বপ্নদৃষ্ট সেই দৃশ্যের কথা অবিকল মনে পড়িয়া গেল। দেখিলাম প্রায় সকলই মিলিয়াছে :—সেই স্বচ্ছ জলরাশি—সেই ঢেউগুলির মধ্যে চাঁদের আলো তেমনই খেলিতেছে—সেই পরপারে বৃক্ষশ্রেণীর মধ্যে ও বিস্তীর্ণ মাঠে চাঁদের আলো তেমনিই হাসিতেছে,—সেইরূপ নৌকাশ্রেণী তীরে লাগান রহিয়াছে। তখন ফাল্গুন মাস। বসন্ত পবন সেই রূপ বহিয়া বহিয়া আমার স্ত্রীর কেশগুচ্ছ আদরে নাড়িয়া দিতেছে। সে সময় স্ত্রী আমার বুকে মাথা রাখিয়া গঙ্গার দিকে তাকাইয়া গঙ্গার একটী স্তোত্র মুখস্থ বলিতেছিল। এই স্তোত্রের শেষে এক স্থানে "মাতঃ শৈলসুতে! অন্তিমে আমাকে তোমার ক্রোড়ে স্থান দিও" এই রকমের একটী প্রার্থনা ছিল। যেখানে এই কথা ছিল, সেই অংশটী তদ্‌গতভাবে বলিতে বলিতে স্ত্রীর নয়ন-পল্লব ভিজিয়া উঠিল। দেখিলাম, হাস্যময়ী গম্ভীরমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। প্রেমবিহ্বলা যেন কি এক ভবিষ্যতের ছবি কল্পনা করিতে করিতে বিষাদিনী হইয়াছে—এ সুখ চিরদিন বিধাতা সহিবেন না, যেন সেই আশঙ্কায় ক্লিষ্ট হইতেছে। তখন সেই আর্দ্র নয়নপল্লব ও ক্লিষ্ট মূর্ত্তি দেখিয়া ভাবি নাই যে, ইহা ভাবী অননুভবনীয় দুর্ঘটনার সূচনা হইতেছে।

আরও পাঁচ বৎসর,—বড় সুখের পাঁচটী বৎসর সুখের স্বপ্নের মত চলিয়া গেল। আমার স্ত্রী একটী কন্যা প্রসব করিয়া ভীষণ জ্বরে আক্রান্ত হইল। তখন সে তাহার পিত্রালয় টাঙ্গাইলের নিকটবর্ত্তী কোন একটী পল্লীগ্রামে ছিল। তথাকার চিকিৎসায় কোন ফল না হওয়ায় তাহাকে কলিকাতা আনিয়া বড় বড় চিকিৎসকগণদ্বারা চিকিৎসা করান হইল। অনেকটা সুবিধা বোধ হইলে, চিকিৎসকগণের পরামর্শে তাহাকে বহরম-

পুরে লইয়া যাওয়া হইল। হায়! কোথায় টাঙ্গাইলের একটী ক্ষুদ্র পল্লী, আর কোথায় তেরনদী পার বহরমপুর!! মানবের ইচ্ছাশক্তির কি এতই প্রভাব? বুঝি বা নিয়তিকেও উহা অতিক্রম করিতে পারে।

সেইখানে যাইয়া প্রায় সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভের পর, হঠাৎ আবার রোগ ফিরিয়া দাঁড়াইল; তখন আমি কলিকাতায়। দাদার টেলিগ্রাম পাইয়া যাইয়া দেখি, কয়েকদিন অনবরত দাঁতের গোড়া হইতে রক্ত পাতে, তাহাকে একবারে শয্যাশায়ী করিয়াছে,—মৃত্যু শিয়রে বসিয়া অপেক্ষা করিতেছে।

অল্প কয়েকদিন পরেই মাতা শৈলসুতা তাহাকে ক্রোড়ে স্থান দান করিলেন। তখন বুঝিলাম, পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে দ্বিতল অট্টালিকার জানালা-পাশে দাঁড়াইয়া কি ছায়া তাহাকে বিষাদিনী ও ক্লিষ্টা করিয়াছিল।

শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র বক্সী।

স্বপ্ন-কথা। (১)

সিপাহী-বিদ্রোহ।

সেনাপতি টরেন্সের পত্নী বিলাতে বাস করিতেছিলেন এবং তাঁহার কন্যা ও জামাতা সন্তানাদি লইয়া ভারতবর্ষে ছিলেন। সিপাহী-বিদ্রোহের সূচনা হইবার প্রায় এক বৎসর পূর্ব্বে টরেন্স-পত্নী এক রাত্রে স্বপ্ন দেখিলেন, যে তাঁহার কন্যা ও জামাতা সিপাহী-কর্তৃক আক্রান্ত হইয়াছেন। একটি ভীষণ সংগ্রাম উপস্থিত হইল এবং এই সংগ্রামে তাঁহার জামাতা সিপাহী-কর্ত্তৃক নিহত হইলেন। এই স্বপ্ন দেখিয়া তিনি অত্যন্ত ব্যাকুল হইলেন এবং জামাতাকে সবিশেষ অনুরোধ করিয়া

লিখিলেন, "তুমি অবিলম্বে স্ত্রীপুত্রাদি লইয়া বিলাতে চলিয়া আইস।" শ্বাশুড়ীর একান্ত জিদে তিনি পুত্রকন্যাদিগকে জল-জাহাজে পাঠাইয়া দিলেন। তাঁহার পত্নী তাঁহার সহিত রহিলেন। যথাসময়ে সিপাহী-বিদ্রোহ আরম্ভ হইলে এই জামাতা (কাপ্তেন্ হেস্) সস্ত্রীক লক্ষ্ণৌএর ভীষণ অবরোধে বন্দী হইলেন। সিপাহীগণ তাঁহাকে ধরিয়া প্রথমে তাঁহার চক্ষু দুইটী অন্ধ করিয়া দিয়াছিল এবং তৎপরে প্রাণবধ করিয়াছিল।

নিগ্রো চাকর।

এবারক্রম্বি এই স্বপ্নটির উল্লেখ করিয়াছেন। একটি সম্ভ্রান্ত স্ত্রীলোক এক রাত্রে স্বপ্ন দেখিলেন যে, তাঁহার বৃদ্ধা মাতা শয্যায় নিদ্রা যাইতেছেন এমন সময় একটি নিগ্রো চাকর সেই ঘরে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে খুন করিল। এই স্বপ্নটি সেই রাত্রিতে পুনঃ পুনঃ দেখিলেন। ইহাতে তিনি অত্যন্ত ভীত হইয়া পরদিন মাতার বাটীতে উপস্থিত হইলেন। সেখানে গিয়া প্রকৃতই এক নিগ্রো চাকর দেখিয়া বিস্মিত হইলেন' বলিলেন, 'এ নিগ্রো কোথা হইতে আসিল? ইহাকে তো পূর্ব্বে দেখি নাই।' মাতা বলিলেন, 'ইহাকে সম্প্রতি নিযুক্ত করিয়াছি।' তখন তিনি মাতাকে আর কিছুই না বলিয়া অপর এক জনকে পার্শ্বের ঘরে শয়ন করিতে ও সমস্ত রাত্রি জাগিয়া থাকিতে বলিয়া গেলেন। রাত্রি প্রায় ৩ টার সময় ঐ ব্যক্তি সিঁড়িতে কাহার পদশব্দ শুনিয়া ধীরে ধীরে ঘর হইতে বাহির হইলেন এবং দরজার নিকট অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। দেখিলেন, নিগ্রো চাকর কাপড়ে কতকগুলি কয়লা বাঁধিয়া প্রভুর ঘরের দিকে যাইতেছে। "কোথায় যাইতেছ?" এই প্রশ্নে নিগ্রো যেন হতবুদ্ধি হইয়া গেল। এঁ্যা ম্যোঁ করিয়া সে বলিল, "প্রভুর ঘরে আগুনটা জ্বালাইয়া দিতে যাইতেছি।" "এই গ্রীষ্মকালে আগুনের দরকার

কি ?” ইহার কোন উত্তর দিতে পারিল না। পরে অনুসন্ধান করিয়া দেখা গেল, কয়লার মধ্যে একখানি তীক্ষ্ণ ছোরা রহিয়াছে।

ইহার বহুকাল পরে ঐ নিগ্রো আর একজনকে খুন করে এবং তাহার ফাঁসি হয়। ফাঁসির পূর্ব্বে তাহাকে পূর্ব্বোক্ত রাত্রির কথা জিজ্ঞাসা করা হয়। “তুমি সে রাত্রে কয়লা লইয়া যাইতেছিলে কেন ?” সে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করে, প্রভুকে হত্যা করাই তাহার অভিপ্রায় ছিল। *

স্বপ্ন-কথা। (২)

দেশীয় স্বপ্ন-বৃত্তান্ত।

পূর্ব্বে আমরা যে স্বপ্নগুলি দিয়াছি, তাহা সমস্তই বিদেশীয়। ইহা দেখিয়া কোন কোন পাঠক হয়ত জিজ্ঞাসা করিবেন, “আমাদের দেশে ঐরূপ স্বপ্ন কেহ কখন দেখেন না কি ?” ইহার উত্তরে আমরা এই মাত্র বলি যে, সকল দেশে সকল সময়ে মানব ঐরূপ স্বপ্ন দেখিয়াছেন ; তবে আমাদের দেশের দুর্ভাগ্য এই যে, কোন ঘটনা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখা আমাদের রীতি নহে। এই কুরীতি-নিবন্ধন শত শত বৎসর ধরিয়া দেশের যে কি বিষম অনিষ্ট হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। আর্য্যযুগে পুরাণ ছিল, ইতিহাস ছিল, প্রাকৃতিক ঘটনা নিচয় সযত্নে রক্ষিত হইত, সুতরাং বিজ্ঞান ছিল, দর্শন ছিল। পরবর্ত্তীকালে যেমন

---

* এই স্বপ্নটিতে এবং ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী স্বপ্নে ভবিষ্যৎ ঘটনা স্পষ্টরূপে সূচিত হইয়াছে। এই ভবিষ্যৎ জানিতে পারিলেও সর্ব্ব সময়ে তাহা খণ্ডন করা যায় না। সিপাহীকর্ত্তৃক কাপ্তেনের হত্যাই তাহার প্রমাণ। আবার চেষ্টা করিলে কোন কোনটি নিবারিত হইতে পারে, যেমন নিগ্রো কর্ত্তৃক বৃদ্ধার হত্যা, নৌকাডুবি হইতে ডেকারের প্রাণরক্ষা (গত পৌষ সংখ্যা, “স্বপ্ন কথার” ১ম স্বপ্ন), ইত্যাদি। অ, র, সং।

আমাদের ইতিহাস লেখা বন্ধ হইল,—যেমন আমরা যুগে যুগে সমাজের পরিবর্ত্তন, ধর্ম্মের পরিবর্ত্তন, জল, বায়ু, ভৌগোলিক অবস্থা, রাজনীতি প্রভৃতির পরিবর্ত্তন লিপিবদ্ধ রাখিতে অবহেলা করিলাম, সেই দিন —সেই মুহূর্ত্ত হইতে আমাদের দুর্দ্দশার সূত্রপাত হইল, আমাদের মৌলিক চিন্তা রুদ্ধ হইল, আমাদের বিজ্ঞান ও দর্শন বিদায় গ্রহণ করিল।

সে যাক্। এখন পাঠকদিগের নিকট আমার অনুরোধ এই যে, যদি তাঁহাদের কিম্বা বন্ধু বান্ধবের মধ্যে সফল স্বপ্নের ইতিবৃত্ত থাকে, সাধারণের হিতার্থে তাঁহারা সেগুলি কোন পত্রিকাতে প্রকাশিত করুন। কারণ এ সম্বন্ধে যতই আলোচনা হয়, ততই ভাল। আমার আত্মীয় ও বন্ধুদিগের মধ্যে এইরূপ দুই একটি ঘটনা ঘটিয়াছে। তাহা নিম্নে প্রকাশিত করিলাম।

স্বপ্নে গুরুলাভ।

কলিকাতা নিবাসী আমার জনৈক বন্ধু ও আত্মীয় (ইনি নাম ধাম প্রকাশ করিতে অনিচ্ছুক) বাল্যকাল হইতে খুব নিষ্ঠাবান্ ও ধর্ম্মপরায়ণ। ইনি প্রথমে কুলগুরুর নিকটে দীক্ষাগ্রহণ করিয়া খুব উৎসাহের সহিত সাধন কার্য্যে প্রবৃত্ত হন। এইরূপে বহুবর্ষ কাটিল; কিন্তু শান্তি পান না, বরং অশান্তি বাড়িতে লাগিল। ইহা দেখিয়া তিনি যোগমার্গে দীক্ষিত হইলেন, কয়েক বৎসর সতেজে যোগ অভ্যাস করিলেন। কিন্তু ইহাতেও তাঁহার ধর্ম্মপিপাসা মিটিল না, সর্ব্বদাই যেন একটা অভাব বোধ করিতে লাগিলেন, প্রাণ যেন আর একটা কিছু চায়। এই অশান্তি ও ব্যাকুলতা ক্রমে এতই প্রবল হইল যে, কয়েক দিন তিনি সমস্ত সাধন কার্য্য ত্যাগ করিয়া ভগবানের নিকট কেবল

শান্তি ভিক্ষা করিতে লাগিলেন। ঠিক এই সময়ে একরাত্রে তিনি স্বপ্ন দেখিলেন যে, রেলগাড়ীতে তিনি কোথায় যাইতেছেন। গাড়ী একটা ষ্টেশনে থামিল। ষ্টেশনটি বামদিকে। তিনি অবতরণ করিলেন এবং বাগানের মধ্যস্থিত এক সুঁড়ি রাস্তা দিয়া কোথায় যাইতে লাগিলেন। রাস্তার দুইদিকে আম, নারিকেল ও সুপারি বৃক্ষ অবস্থিত। কিয়দ্দূর গিয়া তিনি এক ইষ্টক-নির্ম্মিত বাড়ী দেখিতে পাইলেন। ইহার একটি দরজার উপর কয়েকটি কৃষ্ণবর্ণা যুবতী দাঁড়াইয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে একজন বন্ধুর দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া হাসিতে লাগিলেন। বন্ধুর মনে হইল, ইঁহারা চণ্ডালকন্যা। সে যাহা হউক, তিনি এই বাটীর একটি ঘরে প্রবেশ করিলেন এবং দেখিলেন, এক দীর্ঘকায়, দীর্ঘকেশ ও দীর্ঘশ্মশ্রু মহাপুরুষ উপবিষ্ট রহিয়াছেন। বন্ধু ভক্তিগদ্গদ চিত্তে তাঁহার পদপ্রান্তে আশ্রয় লইলেন।

এই স্বপ্ন দেখিয়া তিনি প্রথমে বুঝিতে পারেন নাই, ইহার অর্থ কি। কিন্তু কিছুকাল পরে এরূপ এক ঘটনা ঘটিল, যদ্দ্বারা তিনি স্বপ্নের সার্থকতা পূর্ণভাবে উপলব্ধি করিলেন। একটি নিমন্ত্রণ রক্ষা করিবার জন্য কয়েকটি বন্ধুর সহিত আমাকে কোন দূর দেশে যাইতে হইল। যে দিন আমরা যাত্রা করিব, সেই দিন প্রাতঃকালে উক্ত আত্মীয় ঘটনা ক্রমে আমাদের বাটীতে উপস্থিত হইলেন। আমাদের সহিত তাঁহার যাইবার কোন কথা ছিল না, এমন কি তিনি জানিতেন না যে, আমরা সে দিন দূর দেশে যাইব। এদিকে আমাদেরও একটি সঙ্গীর অভাব হইল, যাঁহাদের যাইবার কথা ছিল, তাঁহাদের একজন যাইতে পারিলেন না। সুতরাং উক্ত আত্মীয়কে আমরা বলিলাম "চল, অমুক স্থানে বেড়াইয়া আসি।" তিনি সানন্দে সম্মত হইলেন, কিন্তু উপযুক্ত বস্ত্রাদি সঙ্গে আনেন নাই। "তা'র জন্য চিন্তা কি" বলিয়া আমরা তাঁহার যাহা

প্রয়োজন প্রদান করিলাম। যথাসময়ে ট্রেনে উঠিয়া রাত্রি-কালে আমরা এক ষ্টেশনে নামিলাম। ষ্টেশনটী আমাদের বাম দিকে ছিল। গন্তব্য স্থানে সে রাত্রি অতিবাহিত হইল। পরদিন প্রাতে সে বাটীর কোন ব্যক্তি-মুখে শুনা গেল যে, নিকটবর্ত্তী গ্রামে এক সাধু বাস করেন। শুনিবা মাত্র ঐ আত্মীয়টি বলিলেন "চল, তাঁহাকে দেখিতে যাই।" আমরা সকলেই বাহির হইলাম। প্রথমে আমাদিগকে ষ্টেশনে আসিতে হইল। ষ্টেশন মাষ্টারের সহিত সাধুর আলাপ পরিচয় ছিল, সুতরাং তাঁহাকেও সঙ্গে লইয়া এক উদ্যান-মধ্যস্থ অপ্রশস্ত পথ ধরিয়া আমরা গমন করিতে লাগিলাম। কিয়দ্দূর গিয়াই এক ইষ্টক-নির্ম্মিত বাটী দেখাইয়া ষ্টেশন মাষ্টার বলিলেন "এইখানেই তিনি থাকেন।" এই সময়ে আমাদের আত্মীয়ের কিছু ভাবান্তর লক্ষিত হইল। তিনি যেন কেমন উন্মনা ও ভক্তিতে বিভোর হইয়া গেলেন। এখন পর্য্যন্ত তাঁহার স্বপ্নবৃত্তান্ত আমরা কিছুই শুনি নাই, সুতরাং তাঁহার ভাবাধিক্যের যে কোন অস্বাভাবিক কারণ আছে, তাহা বুঝিতে পারি নাই।

সে যাহা হউক, আমরা গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলাম। দেখিলাম, এক সুবিশালবপু, উন্নতললাট, প্রশান্ত মূর্ত্তি, সদানন্দ পুরুষ বসিয়া আছেন! তাঁহার পরিধানে গৈরিক বসন এবং দীর্ঘ কেশরাজি মস্তকোপরি চূড়াকারে বদ্ধ। আমাদিগকে দেখিবামাত্র তিনি হাস্যমুখে ও সাদরে সকলকে নিজের কাছে বসাইলেন। আমাদের আত্মীয়টি সাষ্টাঙ্গে তাঁহার পদপ্রান্তে লুটাইয়া পড়িলেন। তখন মহাপুরুষ তাঁহার সুবিশাল বাহুদ্বারা আত্মীয়কে একেবারে বুকের মধ্যে টানিয়া লইলেন, যেন কতদিনের আলাপ, কত কালের পরিচয়! যেন তাঁহার হৃদয় হইতে স্নেহ উথলিয়া পড়িতে লাগিল, প্রেমে নয়ন উজ্জ্বল হইল। এ দৃশ্য বড়ই মধুর! আমরা ক্ষণকালের জন্য অবাক্ হইলাম। অতঃপর ধর্ম্ম সম্বন্ধে

কিয়ৎক্ষণ মধুর আলাপের পর তাঁহার পদধূলি লইয়া আমরা বিদায় গ্রহণ করিলাম এবং সেইদিনই বৈকালের ট্রেনে কলিকাতার জন্য রওনা হইলাম। ট্রেনে উঠিয়া আমাদের আত্মীয়টি তাঁহার বহুকালের স্বপ্নটি বিবৃত করিয়া বলিলেন "আমরা যখন বাগানের সুড়ি রাস্তা দিয়া যাইতে লাগিলাম, তখন যেন আমার কেমন কেমন বোধ হইতে লাগিল, যেন কোন কোন স্থান, কোন কোন গাছ পরিচিত বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। কিন্তু কোথায় এরূপ দেখিয়াছি বা কবে দেখিয়াছি, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। অবশেষে সেই ইট্ বেরুনো বাড়ীটি এবং কোণে আম গাছ যেমন দেখা, অমনি চিনিতে আর কিছুই বাকি রহিল না, স্বপ্নের সকল কথা মনে পড়িল! তখন প্রাণের মধ্যে একটা আনন্দের ঢেউ উঠিল। তার পর ঘরে ঢুকিয়া যখন দেখিলাম যে, স্বপ্নে যাঁহাকে দেখিয়াছিলাম, ইনি সেই বটেন,—সেই মুখ, সেই চোক্, সেই দীর্ঘ শরীর, তখন আর আমায় পায় কে ?"

আত্মীয়টি ঐ সাধুর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়া তাঁহারই উপদেশ মত এখন কার্য্য করিতেছেন। তিনি বলেন, এখন তিনি বেশ আনন্দ পাইতেছেন। তাঁহার স্বপ্নের চণ্ডাল-কন্যার কথা জিজ্ঞাসা করায়, তিনি বলিলেন, "আমি যে দিন দীক্ষা গ্রহণ করি, সেই দিন ঠিক ঐরূপ ঘটিয়াছিল, সুতরাং উহা মিথ্যা হয় নাই।"

শ্রীমাখনলাল রায় চৌধুরী।

"ভূতের পত্নীপ্রেম"

প্রায় ৫ বৎসর পূর্ব্বের কথা—মানদাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় নামক আমার জনৈক বন্ধু, চিকিৎসা-বিদ্যা শিক্ষা করিতেছিলেন। তৎকালে মেস্‌মেরিজম (সম্মোহন বিদ্যা), নিজ চিকিৎসা ব্যাপারে ব্যবহার করিবার অভিপ্রায়ে উহা অভ্যাস করিবার জন্য অনেক সময় অতিবাহিত করিতেন। কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া Spiritualism-(প্রেততত্ত্ব) এর তথ্য অবগত হইবার মানসে নানারূপ প্রক্রিয়া দ্বারা মৃতব্যক্তির প্রেতাত্মা সম্মোহিত medium-এর উপর আবির্ভাব করাইবার চেষ্টা করিতেন।

কতিপয় বন্ধুদ্বারা অনুরুদ্ধ হইয়া একদিন তিনি mesmerism ও Spiritualism বিষয়ক কতিপয় experiment দেখাইতে যাইয়া যে সকল আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিয়াছিল, তদুপলক্ষে কিরূপে একটী লুক্কায়িত সত্যের আবিষ্করণ হওয়ায় সকলেই বিস্ময়ান্বিত হইয়াছিলেন, তদুল্লেখই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

একদিন রবিবারে তিনি কলিকাতায় চোরবাগান-স্থিত একটী মেসে বেলেসিকিরা নিবাসী শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত মুখোপাধ্যায় নামক একটী বালককে medium নির্ব্বাচিত করিয়া দিবা দ্বিপ্রহরের সময় এক নির্জ্জন প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন, এবং তাঁহার বন্ধুদের মধ্যে কাহাকেও তথায় উপস্থিত থাকিতে নিষেধ করিয়া, একাকী নানারূপ প্রক্রিয়াদ্বারা সেই বালককে সম্মোহিত করিবার পর সকলকে তথায় উপস্থিত থাকিবার অনুমতি প্রদান করিলেন। পরে নানারূপ কৌশল দেখাইতে লাগিলেন। সেখানে উপস্থিত হইয়া তাঁহার বন্ধুগণ নলিনীকান্তকে ঘোর নিদ্রায়

অচেতন মনে করিলেন ; কিন্তু আমার বন্ধু তাহাকে যে সকল প্রশ্ন করিতে লাগিলেন, সে তাহার যথাযথ প্রত্যুত্তর প্রদান করিতে লাগিল, পরন্তু আর কাহারও কথায় কর্ণপাত করিলনা। ইহা দেখিয়া নলিনীকান্তের দাদা মনে করিলেন যে, পূর্ব্ব হইতে শিক্ষিত হইয়া সে ঐরূপ করিতেছে। তিনি আমার বন্ধুর কার্য্য প্রবঞ্চনা মনে করিয়া তাঁহাকে সকলের সাক্ষাতে অপদস্থ করিবার অভিপ্রায়ে নলিনীকান্তকে উঠিয়া বসিবার আদেশ প্রদান করিতে লাগিলেন। কিন্তু আমার বন্ধু তাহাকে (medium) তাঁহার নিজের আদেশ ভিন্ন অপর কাহারও আজ্ঞা পালন করিতে নিষেধ করিলেন। সে সময় নলিনীকান্তের মুখমণ্ডল কষ্টজ্ঞাপক বিকৃত ভাবাপন্ন হইল। এমন সময় আমার বন্ধু mediumকে বুঝাইয়া বলিলেন যে, তাঁহার কথা ভিন্ন অপর কাহারও কথা বা কোনরূপ শব্দ তাহার কর্ণগোচর হইবেনা এবং তাহার শরীরের উপর স্পর্শজ্ঞান লোপ পাইবে। ঠিক সেই সময়েই নলিনীকান্তের বিমর্ষভাব অপনীত হইল। আমার বন্ধু আরও বলিলেন যে, তাহার শরীরে অস্ত্রাঘাত বা অগ্নি প্রয়োগ করিলেও তাহার কিছু মাত্র কষ্টবোধ হইবেনা। ইহার পর medium অসাড় অবস্থায় পড়িয়া রহিল। কিন্তু তাহার দাদা ছাড়িবার পাত্র নহেন। তিনি তাঁহার ভ্রাতার হস্ত ধরিয়া উঠাইয়া বসাইয়া দিবার জন্য পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করিতে লাগিলেন, এবং চীৎকার করিয়া ভ্রাতাকে জাগরিত করিবার বৃথা প্রয়াস পাইতে লাগিলেন। আমার বন্ধুর কার্য্যের উপর অবিশ্বাস করিয়া ঐরূপ করিতেছেন দেখিয়া আমার বন্ধু যোগীন্ বাবুকে (নলিনীকান্তের দাদা) একটু শিক্ষা দিবার অভিপ্রায়ে যোগীন্ বাবুকে আঘাত করিবার জন্য mediumকে আদেশ করিলেন। যে ব্যক্তি ক্ষণ কাল পূর্ব্বে ঘোর নিদ্রায় অচেতনবৎ প্রতীত হইতেছিল, সে এখন দন্ত কড় মড়ি করিয়া তাহার দাদাকে এক চপেটাঘাত করিল।

পূর্ব্বে যে তাহার দাদাকে অতিশয় ভক্তি করিত, এমন কি মুখ তুলিয়া তাঁহার সহিত কথা পর্য্যন্ত কহিতে সাহস করিত না, সে যে আর একজনের ইচ্ছাক্রমে তাহার দাদাকে অপমান করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইল না, ইহাতে যে কোন গূঢ় কারণ নিহিত আছে, তাহা নিশ্চিত মনে করিয়া দর্শকমণ্ডলী স্তম্ভিত ও মোহিত হইল। তখন আমার বন্ধু বলিলেন যে, তাঁহারা ইচ্ছা করিলে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন যে, অস্ত্রাঘাতেও নলিনীকান্ত সম্পূর্ণ নির্ব্বিকার থাকিবে। তখন কেহ কেহ সামান্যরূপে তাহার পরীক্ষা করিয়া সন্তুষ্ট হইলেন। তিনি আরও বলিলেন যে, যদি তিনি ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে নলিনীর গাত্রে ছুরিকা দ্বারা গভীর ক্ষত করিয়া দিলেও তাহা হইতে রক্ত নির্গত হইবেনা। কারণ তাহার মন এখন তাঁহার সম্পূর্ণ আয়ত্তাধীন। কিন্তু ঐরূপ বিপজ্জনক পরীক্ষা করিতে কেহই সাহসী হইলেন না।

এখন medium চক্ষু মুদিত করিয়া যেন ঘোর নিদ্রায় অভিভূত। তাহার চেতনা সম্পাদন করা প্রয়োজন বিবেচনা করায় আমার বন্ধু Telepathy বিষয়ক একটী experiment দেখাইলেন। উহা Telepathy বিষয়ে অনভিজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রের নিকট অতীব আশ্চর্য্যজনক বিবেচিত হইবে সন্দেহ নাই। mediumএর পশ্চাতে একটী টাইমপিস্ ঘড়ি স্থাপন করিয়া আমার বন্ধু বলিলেন্ যে, নলিনীকান্ত ৮টা ৫মিনিটের সময় হঠাৎ জ্ঞান লাভ করিবে এবং জাগ্রত হইয়া উঠিয়া বসিবে। সকলে ভাবিলেন, সে পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনা (দাদাকে প্রহার ইত্যাদি) স্মরণ করিয়া লজ্জিত হইবে ; কিন্তু আমার বন্ধু বলিলেন যে, সম্মোহিত অবস্থায় সে যাহা করিয়াছে. তাহার কিছুমাত্র স্মরণ থাকিবে না। এক্ষণে তিনি সকলকে নিস্তব্ধ থাকিবার অনুরোধ করিয়া Time pieceএর প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, ঠিক নির্দ্ধারিত

সময়ে নলিনীকান্ত একেবারে উঠিয়া বসিল। তাহাকে সমবেত সকলে ইতিপূর্ব্বের ঘটনা সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে সে সম্পূর্ণ অজ্ঞতা প্রকাশ করিল, এবং এরূপ ভাব প্রকাশ করিল, যেন কিছুই ঘটে নাই।

প্রায় ১০ মিনিট সময় কাটিয়া গেল। এদিকে আরও কিছু বিস্ময়কর বিষয় প্রত্যক্ষ করিবার জন্য সকলের ঔৎসুক্য বাড়িতেছে দেখিয়া, মানদা বাবু নলিনীকে স্থিরভাবে বসিতে অনুমতি করিয়া এক মনে তাহার কোন মৃত আত্মীয়ের বিষয় ভাবিতে বলিলেন এবং পুনরায় তাহার প্রতি আপনার সম্মোহন ক্ষমতা প্রয়োগ করিলেন। কিছুক্ষণ পরেই তাহার বাহ্য জ্ঞান লোপ পাইল। তৎপরে সে বিকট মুখভঙ্গী করিয়া ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিল দেখিয়া সকলে বুঝিলেন যে, নলিনীকান্তে মৃত আত্মার আবির্ভাব হওয়াতেই তাহার এইরূপ যন্ত্রণা হইতেছে। তাহার এবম্বিধ ভাব দর্শনে তিনি আপন তেজোবলে তাহাকে শান্ত করিয়া প্রশ্ন করিলেন, কিন্তু নলিনীকান্ত কষ্টব্যঞ্জক গোঁ গোঁ শব্দ করিয়া মৌখিক উত্তর প্রদানে অসম্মতি প্রকাশ করায় তাহাকে কাগজ পেন্‌সিল দেওয়া হইলে, সে নিম্নলিখিতরূপ উত্তর গুলি কাগজে লিখিয়া জানাইতেছিল।

প্রশ্ন—কি নাম ও নিবাস কোথা ?

উত্তর—পূর্ব্বজন্মে আমার নাম ছিল——, বাড়ী——গ্রামে।

প্রশ্ন। তোমার মৃত্যু কিসে হইয়াছিল এবং মৃত্যুর পরেই বা তুমি কি করিতেছ ?

উত্তর। আমাদের গ্রামের নিকটস্থ কোন গ্রামে যাইবার মানসে কয়েক বৎসর পূর্ব্বে বৈশাখের একদিন বাড়ী হইতে বাহির হইলাম। আমি আফিম খাইতাম। পথে একটি গাছতলায় এক ডেলা আফিম মুখে ফেলে দিলাম। তখন বুঝি নাই যে, মাত্রা এত বেশী হইয়াছিল। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই আমার শরীর অবসন্ন হইয়া পড়িল এবং সেই

স্থানেই আমার মৃত্যু হইল। পরে সাধারণে প্রকাশ হইল যে, কলেরায় আমার মৃত্যু হইয়াছে; কারণ আমি ৪।৫ বার সেই স্থানেই মলত্যাগ করিয়াছিলাম। তৎপরে আমি কিছুদিন ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলাম, কিন্তু আমি আমার স্ত্রীর অভাব অনুভব করিতাম এবং তাহা অনুভব করিয়া বড়ই যাতনা পাইতাম। আমার স্ত্রীকে অহরহঃ চোখে চোখে রাখিতাম, কিন্তু তাহাকে বড়ই ভাল বাসিতাম বলিয়া আমার এত যন্ত্রণা সত্ত্বেও, তাহার বিন্দুমাত্র অনিষ্ট করিতে আমার প্রবৃত্তি হয় নাই। যতই দিন যাইতে লাগিল, আমার কষ্টও যেন ততই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। শেষে আর থাকিতে পারিলাম না, লোভসংবরণ আমার পক্ষে অসম্ভব হইল, পর বৎসর বৈশাখ মাসে একদিন দুপুর বেলায় তাহাকে পায়খানার ভিতর একাকী পাইলাম এবং সেই স্থানেই তাহাকে সংহার করিয়া আমার স্ত্রী লইয়া আসিলাম। তাহার কিসে যে মৃত্যু হইল, পরে সে সম্বন্ধে ডাক্তারেরাও কোনরূপ সন্তোষজনক স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই। সেই অবধি আমরা বেশ সুখে আছি।

প্রশ্ন। তোমার স্ত্রীর কি নাম?

উত্তর। আমার স্ত্রীর নাম——দেবী।

প্রশ্ন। তোমরা কিরূপ ভাবে এখন সময় অতিবাহিত কর?

এই কথায় নলিনীকান্তের মুখমণ্ডল রক্তিমাভ হইল এবং তাহাকে দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল, যেন সে বড়ই ক্রুদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু পরক্ষণেই সুবোধ বালকটির মত লিখিয়া দিল "অনর্থক কেন আর আমাকে কষ্ট দিচ্ছ। আমি আর কোন কথা বলিব না। আমাকে বেশী ঘাঁটাইও না, সাবধান।" শেষের এই অংশ টুকু বড়ই জড়ানে জড়ানে ভাবে লিখিত হইয়াছিল।

এরূপ স্থলে এ প্রক্রিয়া আর অধিকক্ষণ স্থায়ী করা তাঁহার ও নলিনী-

কান্ত উভয়েরই ক্ষতিকর বিবেচনা করায় তিনি কিছুক্ষণ যাবৎ নিজশক্তি প্রয়োগে তাহার চৈতন্য সম্পাদন করিলেন। কিন্তু সে তখন বড়ই দুর্ব্বল— ঘুমাইয়া পড়িল।

পরদিবস প্রাতে নলিনীকান্তের নিকট গত দিবসের সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করা হইলে, সে বলিল যে, তাহার দূরসম্পর্কীয় মৃত আত্মীয়ের নাম মাত্র সে জানে, কিন্তু তাঁহার স্ত্রীর নাম বা তিনি মারা গিয়াছেন কিনা কিছুই জানে না। পরে অনুসন্ধানে প্রকাশ পাইল যে, সত্য সত্যই তিনি পায়খানার ভিতর কোনরূপে মারা গিয়াছিলেন এবং তাহার নামও——দেবী।

আমাদের ঘটনার বিবরণ এইখানেই শেষ হইল। কিন্তু এস্থলে আর একটু বলা প্রয়োজন, যে নলিনীকান্ত ও যোগীন্ বাবু এখনও কলিকাতা-তেই বাস করিতেছেন। যদিও মানদা বাবু সেই বৎসরই কালেজের শেষ পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হইয়া স্বর্ণপদক উপহার পাইলেন, কিন্তু সেই ঘটনার দিবস হইতে তাঁহার শরীরে নানারূপ ব্যাধি আশ্রয় লইল। তাঁহার স্বাস্থ্য একেবারে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে এবং শরীর ক্রমশঃই অস্থিচর্ম্ম-সার হইতেছে। তাঁহার এই স্বাস্থ্য ভঙ্গের কারণ সেই দিবসের প্রহেলিকাময় ঘটনার সহিত কোন প্রকারে বিজড়িত কি, না, তাহা একমাত্র ভগবানই জানেন।

শ্রীমোহিনীমোহন মুখোপাধ্যায়।

———

সাধুদর্শন।

একদিন বৈশাখ মাসের শেষে অপরাহ্ণে রৌদ্রের উত্তাপ অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়াছে। মার্ত্তণ্ডের উত্তাপে আমার বাঙ্গলার সম্মুখস্থ দামোদরের বালুরাশি প্রচণ্ড বায়ুবেগে উড্ডীয়মান হইয়া যেন অগ্নিবর্ষণ করিতেছে, প্রাণ আই ঢাই করিতেছে। বাটীর পরিবারেরা, বৈশাখ পুণ্যাহমাস বিধায়, গঙ্গাস্নানাদি ব্রত নিয়ম করিবার উদ্দেশ্যে, দেশে গিয়াছে। আমি একাকী বসিয়া আছি, সময় কিছুতেই অতিবাহিত হইতেছে না। কিয়ৎকাল নিস্তব্ধভাবে স্থির হইয়া বসিয়া থাকিয়া ভাবিলাম, অনর্থক কেন সময় অতিবাহিত করিতেছি, কোন একখানি ধর্ম্মপুস্তক লইয়া পাঠ করিলে বোধ করি মনে আনন্দ হইতে পারিবে। এই ভাবিয়া সম্মুখস্থ একখানি গীতা লইয়া পড়িতে বসিলাম।

গীতাখানি খুলিয়াই ৮ম অধ্যায়ের অষ্টাদশ শ্লোকটী সম্মুখে পড়িল। পড়িলাম,—

অব্যক্তাদ্ ব্যক্তয়ঃ সর্ব্বাঃ প্রভবন্ত্যহরাগমে।
রাত্র্যাগমে প্রলীয়ন্তে তত্রৈবাব্যক্তসংজ্ঞকে॥

কিন্তু কিছু মানে বুঝিতে পারিলাম না।

বাঙ্গালা অনুবাদ দেখিলাম, লেখা আছে,—

কারণরূপ অব্যক্ত হইতেই এই চরাচর প্রাণিগণ ব্রহ্মার দিবসের উপক্রমে প্রাদুর্ভূত হয় এবং ব্রহ্মার রাত্রির উপক্রমে পুনরায় সেই অব্যক্তেই প্রলীন হয়।

পড়িয়াই মাথা ঘুরিয়া গেল। ভাবিয়াছিলাম, গীতা পাঠ করিয়া মনে আনন্দানুভব করিব, তাহার পরিবর্ত্তে, "কারণরূপ অব্যক্ত" কিরূপ, ইহা

ভাবিতে ভাবিতে মাথা ধরিল। সুতরাং গীতাখানি হস্তে করিয়া বাটীর বাহিরের রাজপথে যাইয়া আম্র ও অশ্বত্থ বৃক্ষের ছায়াতে পাদ-চারণ করিয়া বেড়াইতে লাগিলাম এবং "কারণরূপ অব্যক্ত" কি প্রকার, ইহাই ভাবিতে লাগিলাম।

কিছুক্ষণ পরেই জীর্ণমলিন-বসন-পরিধৃত এক ব্রাহ্মণ আমার নয়ন-পথে পতিত হইল। তিনি আমাকে দেখিয়াই বলিলেন, "বাবা, আমার অত্যন্ত পিপাসা হইয়াছে, আমাকে একটু জল খাওয়াইবে?" আমি সেই কথা শুনিয়া তাঁহার আপাদ-মস্তক একবার দৃষ্টি করিলাম।' দেখিলাম, ব্রাহ্মণের উত্তরীয় যজ্ঞোপবীত সূত্র ও মলিন বসন ভিন্ন আর কিছুই সঙ্গে নাই। তখনই বলিলাম, বাটীর মধ্যে আসুন, আপনাকে জল দিতেছি। ইহা বলিয়া আমি বাটীর মধ্যে চলিলাম, তিনি আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিলেন। বৈঠক-খানার ঘরের চেয়ারের উপর দুজনে বসিলাম এবং ভৃত্যকে খাবার জল আনিতে বলিলাম। ভৃত্যও তখনই জল আনিয়া দিল। তিনি জল পান করিয়া কিঞ্চিৎ সুস্থ হইলে, আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম "ঠাকুর আপনার গীতা টীতা পড়া শুনা কিছু আছে?" তিনি বলিলেন, 'কিছু কিছু জানা আছে।' আমি বলিলাম, "গীতার একটী শ্লোকে লেখা আছে, "অব্যক্তাদ্ ব্যক্তয়ঃ সর্ব্বাঃ।"—আমি এইকথা বলিতে না বলিতেই তিনি বলিলেন, "গীতার ৮ম অধ্যায়ের অষ্টাদশ শ্লোকের কথা বলিতেছ? উহা বুঝা বড়ই শক্ত। সহস্র যুগ পর্য্যন্ত ব্রহ্মার যে একটি দিন তাহা যাঁহারা জানেন এবং সহস্র যুগান্ত যে রাত্রি তাহাও যোগবলে যাঁহারা জানেন, সেই সর্ব্বজ্ঞ ব্যক্তিরাই বস্তুতঃ অহোরাত্রবেত্তা। তোমার আমার পক্ষে বুঝা বড়ই কঠিন।"

এই কথা বলিয়াই তাঁহার বাম হস্ত হইতে একখানি সুন্দর বৃহৎ গীতা বাহির করিয়া, ৮ম অধ্যায়ের অষ্টাদশ শ্লোকটী আবৃত্তি করিয়া আমাকে

বুঝাইতে লাগিলেন। আমি তাঁহার বাম হস্ত হইতে একখানি সুবৃহৎ গীতা পুস্তক বাহির করিতে দেখিয়া স্তম্ভিত ও আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। একি! ইহাঁর হস্তে বা নিকটে কোন বস্তু ত ছিলনা, তবে এরূপ পুস্তক ইনি কোথা হইতে বাহির করিলেন? যাহা হউক, তাঁহাকে কিছু না বলিয়া ঐ শ্লোক-টীর ব্যাখ্যা শুনিতে লাগিলাম। তিনি প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা ঐ শ্লোকের ব্যাখ্যা করিতে করিতে বাম হস্ত হইতে আর একখানি সুন্দর কাঠের মলাটযুক্ত ও তুলট কাগজের লেখা পুঁথি বাহির করিয়া, "কারণরূপ অব্যক্ত" কিরূপ তাহাই ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। আমি ঐরূপ তুলটের পুঁথি দেখিয়া আরও আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। কিন্তু কোন কথা না বলিয়া তাঁহার ব্যাখ্যা শুনিতে লাগিলাম।

কিয়ৎক্ষণ ব্যাখ্যা করার পর তিনি বলিলেন, "বাবা! আমার কিছু ক্ষুধা বোধ হইয়াছে, যদি আমাকে কিছু দুগ্ধ দেও, তবে সেবন করি। আমি অন্ন কিছু আহার করিনা, কেবল দুগ্ধ ও জল খাইয়া থাকি।" আমি বলি-লাম, "এ অপরাহ্ণ সময়ে আমি দুগ্ধ কোথায় পাইব?" তিনি বলিলেন, "তোমার ভাণ্ডারে কোন জিনিসের অভাব নাই। তুমি গৃহ মধ্যে যাইয়া দেখিতে পাইবে যে, তোমার লৌহের কড়াতে যথেষ্ট দুগ্ধ আছে।" আমি বলিলাম, "আমি এই মাত্র বাটীর ভিতর গিয়াছিলাম, দ্বিপ্রহরের সময় আমার জন্য যে দুগ্ধ জ্বাল দেওয়া হইয়াছিল, তাহার সরের দাগ মাত্র কড়াতে আছে দেখিয়াছিলাম।" তিনি বলিলেন, "কড়াতে যে দুগ্ধের অবশিষ্ট সরের দাগ আছে, তাহাতেই জলদিয়া লইয়া আইস। আমি উহাই পান করিব, এবং উহাতেই আমার ক্ষুধা শান্তি হইবে।" আমি অগত্যা তাঁহার কথায় বাটীর মধ্যে গিয়া কড়াখানি দেখিলাম, ও কড়ার মধ্যে এককড়া পরিপূর্ণ উত্তম জ্বাল-দেওয়া দুগ্ধ দেখিতে পাইলাম। দেখিয়া অতীব আনন্দিত ও আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। যাহা হউক, কাহাকেও কিছু না বলিয়া একটী

বাটী দুগ্ধ পরিপূর্ণ করিয়া লইয়া তাঁহার সম্মুখে রাখিয়া, তাঁহার পাদ-পদ্মে প্রণাম করিলাম। তাঁহার দুগ্ধ পান করা হইলে, জিজ্ঞাসা করিলাম, "বাবা! আমি অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছি! আপনি ঐ গীতা খানি এবং ঐ তুলটের পুঁথি খানি কোথা হইতে পাইলেন এবং আমার কড়াতেই বা এ অসময়ে কিরূপে জ্বাল-দেওয়া দুগ্ধ আসিল? আপনার আসিবার সময় আপনার হস্তে আমি কোন জিনিস দেখি নাই।" তিনি বলিলেন, "কৈ, আমার নিকট ত গীতা বা তুলটের পুঁথি নাই!" এস্থানে বলা বাহুল্য, আমি ঐ গীতা খানি বা তুলটের পুঁথি খানি পুনরায় দেখিবার জন্য অনেক অনুসন্ধান করিলাম, কিন্তু কিছুই দেখিতে পাইলাম না। দেখিলাম, কেবল আমার গীতা খানি পড়িয়া আছে। ইহাতে আমি সবিস্ময়ে এসকল অলৌকিক ঘটনার রহস্য জিজ্ঞাসা করিলাম।

তিনি বলিলেন, "বাবা এ কিছুই নহে। ইহা এক প্রকার সিদ্ধি। সাধনা দ্বারা এপ্রকার সিদ্ধি লাভ করা যায়। জিতেন্দ্রিয়, স্থিরচিত্ত, জিত-প্রাণ, ভগবানে ধৃত-চিত্ত যোগিদিগের নিকটে সিদ্ধি সকল স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত হয়; কিন্তু তাহা পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য।"

আমি বলিলাম, "বাবা! যোগিদিগের কতপ্রকার ও কি কি সিদ্ধি এবং কি প্রকার সাধনা দ্বারা তাহা সিদ্ধ হয়, তাহা বোধ হয় আপনি জানেন। অতএব তাহা বলিতে আজ্ঞা হয়।"

তিনি বলিলেন, "যোগপারগ ঋষিগণ বলিয়াছেন, সিদ্ধি অষ্টাদশ প্রকার ও ধারণাও অষ্টাদশ প্রকার, তাহাদিগের মধ্যে আটটী প্রধান।

"দেহের সিদ্ধি তিন প্রকার। অণিমা, মহিমা ও লঘিমা। ইন্দ্রিয়ের সহিত তত্তদধিষ্ঠাতৃ দেবতারূপে সম্বন্ধ সিদ্ধির নাম ব্যাপ্তি। শ্রুতদৃষ্ট বিষয়ে ভোগদর্শন সমর্থ সিদ্ধির নাম প্রাকাম্য। মায়াশক্তির প্রেরয়িতা সিদ্ধির নাম ঈশিতা। বিষয় ভোগেতে অসঙ্গ সিদ্ধির নাম বশিতা। কামনার

বিষয়ীভূত সুখ প্রাপয়িতা সিদ্ধির নাম কামাবসায়িতা। যেরূপ ধারণা দ্বারা যে সিদ্ধি যেরূপে সম্পন্ন হয়, শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থে তাহা বিশেষরূপে কথিত আছে। তুমি তাহা পাঠ করিয়া সেইরূপ যোগ সাধনা অভ্যাস কর, নিশ্চয়ই ঐ সকল সিদ্ধি লাভ করিতে পারিবে।"

এই কথা বলিয়াই তিনি বাটীর বারেন্দায় গমন করিলেন। আমিও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিলাম। কিন্তু বারেন্দার বাহির হইয়া আর তাঁহাকে দেখিতে পাইলাম না।

(রায় সাহেব) শ্রীদুর্গাচরণ চক্রবর্ত্তী।

স্বপ্ন-তত্ত্ব।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

চতুর্থ অধ্যায়।

১। ভাণ্ড-দেহ।

আমি পূর্ব্ব অধ্যায়ে মানবের স্থূলদেহের কথার উল্লেখ করিয়াছি। তাহা সাতপ্রকার পরমাণুদ্বারা গঠিত,—কঠিন, তরল, বাষ্পীয় ও চারি প্রকার ইথিরীয় পদার্থ। বৈজ্ঞানিকেরা পূর্ব্বে ইথরকে কঠিন তরলাদির মত পদার্থের যে একটী অবস্থান্তর, তাহা মানিতেন না।*

---

* I make a sharp distinction between ether and matter"—Dalham's Matter, Ether Function.

এখন তাঁহাদিগের সেই ভ্রম কিয়ৎপরিমাণে তিরোহিত হইয়াছে।* তাঁহারা যাহাকে পূর্ব্বে অভ্যুপগমিক ইথর (Hypothetical Ether) নাম দিয়াছিলেন, এখন সেই ইথরকে তাহার অপেক্ষা আরও সূক্ষ্মতর পদার্থের সমষ্টিতে সৃষ্ট এই কল্পনা করেন। একজন বিশিষ্ট বিজ্ঞানবিদ্ লিখিয়াছেন,—"যাহাকে বৈজ্ঞানিকেরা ইথর বলেন, তাহা একটী মৌলিক পদার্থ নহে—তাহা কতকগুলি সূক্ষ্মতর পদার্থের সমষ্টি মাত্র। ইথেরন্ সাগরের ঘূর্ণায়মান স্রোতে ডিম্বাকার ইথর-অণুর সৃষ্টি হয়।"† অতএব আমরা দেখিলাম, কঠিন, তরল ও বাষ্পীয় ব্যতিরেকে পদার্থের আর দুই প্রকার বিভিন্ন অবস্থার কথা বিজ্ঞান অনুমোদন করিতেছে। এই দুই অবস্থাকে বিজ্ঞান ইথর ও ইথেরন্ নামে অভিহিত করিয়াছেন। ইথরের আর যে দুই প্রকার সূক্ষ্মতর অবস্থা আছে, বৈজ্ঞানিকেরা এখনও তাহার অনুসন্ধান পান নাই। আমরা যাহাকে কঠিন বলিলাম, প্রাচীন আর্য্যেরা তাহাকে "ক্ষিতি" বলিতেন। সেইরূপ পার্থিব পদার্থের অপর ছয় প্রকার অবস্থাকে তাঁহারা অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম, অনুপাদক ও আদি নামে আখ্যাত করিয়াছেন।‡ এই সাত প্রকারের উপাদানের মধ্যে প্রথম তিন প্রকার, অর্থাৎ ক্ষিতি অপ ও তেজ দিয়া যে দেহ গঠিত, তাহাকে ভাণ্ড-দেহ বলিব। এক

---

* "I am convinced that there does exist matter which is not subject to Neuton's Law of Gravitation."—Lord Kelvin.

"Matter is either ponderable or imponderable. The latter is generally termed ether."—Dr. Lander

† The so. called Ether is a composite body . . . Ether is a structure of vortices in a fluid called Etheron."—Dr. R. A. Fosunder.

‡ "তত্র যৎ কঠিনং সা ক্ষিতিঃ যদ্ দ্রবং তদ্ আপঃ যদ্ উষ্ণং তৎ তেজঃ।"

গর্ভোপনিষদ্।

খণ্ড মাংসের কঠিন অংশের নাম ক্ষিতি, তরল অংশের নাম অপ্ ও বাষ্পীয় অংশের নাম তেজ। অতএব এই ক্ষিত্যপতেজময় মাংস, অস্থি, রক্ত, মজ্জা সমন্বিত আমাদিগের স্থূল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য যে মানব দেহ, তাহারই নাম ভাণ্ড-দেহ।

স্থূলদেহের সূক্ষ্মতর অংশ, অর্থাৎ যাহা পূর্ব্বোক্ত চারিপ্রকার ইথরীয় অণুদ্বারা গঠিত, তাহাকে আমরা পিণ্ড-দেহ বলিব। ইহাতে পার্থিব মরুৎ, পার্থিব ব্যোম, পার্থিব অনুপাদক ও পার্থিব আদি-ভূত আছে। আমরা এবিষয় পূর্ব্বাধ্যায়ে আলোচনা করিয়াছি। আমরা আরও বলিয়া আসিয়াছি যে, ইহার আকার ভাণ্ড-দেহেরই অনুরূপ। পিণ্ডদেহই আমাদিগের প্রাণের বাহন। প্রাণশক্তি ইহারই সাহায্যে ভাণ্ড-দেহকে জীবিত রাখিয়াছে। ইথর পৃথিবীর সর্ব্বত্রই ব্যাপ্ত রহিয়াছে। স্থূল জড়ের প্রত্যেক কণা ইথর-সাগরে ভাসমান। প্রত্যেক অণু ইথরের আবরণে আবরিত, প্রত্যেক অণুদ্বয়ের মধ্যে ইথরের ব্যবধান বিদ্যমান। এইরূপ ভাবে আছে বলিয়াই প্রাণ-শক্তি ভাণ্ডদেহে কার্য্য করিতেছে। ইথরকে, অর্থাৎ পিণ্ড-দেহকে ভাণ্ড-দেহ হইতে সম্পূর্ণরূপে পৃথক্ করিয়া ফেলিলে আর প্রাণশক্তি ভাণ্ডদেহের উপর কোনও কার্য্য করিতে পারে না। তখন ভাণ্ড-দেহের কিরূপ অবস্থা হয়, তাহা পূর্ব্বাধ্যায়ে বলিয়া আসিয়াছি। বৈজ্ঞানিকেরা সম্প্রতি এই পিণ্ড-দেহকে প্রত্যক্ষীভূত করিয়াছেন। আচার্য্য এলমার্ গেট্‌স্ (Prof. Elmer Gates) একপ্রকার আলোক-রশ্মির আবিষ্কার করিয়াছেন, যাহা জীবনীশক্তিদ্বারা প্রতিহত হয়। মানবের চক্ষুর সারভূত অংশ হইতে রোডপ্‌সিন্ (Rhodopsin) নামক পদার্থ সংগৃহীত করিয়া, তদ্দ্বারা একটী জমি প্রস্তুত করা হয়; উহার বিশেষত্ব এই যে, সামান্য আলোক-রশ্মি পতিত হইলেই

তাহার বর্ণের পরিবর্ত্তন হয়। এই জমির নিকট উভয়দিকে বদ্ধ কাচের নলের মধ্যে একটী জীবিত ইন্দুরকে নবাবিষ্কৃত রশ্মির পথে রাখা হয়। যতক্ষণ ইহা জীবিত থাকে, ততক্ষণ রোডপসিন্ (Rhodopsin) ক্ষেত্রে তাহার ছায়া পড়ে। কিন্তু ইন্দুরটী মরিলে আর তাহার ছায়া পড়ে না, তখন উহা স্বচ্ছ বলিয়া মনে হয়। আরও মৃত্যুর পরক্ষণেই ইন্দুরের মত একটী ছায়া বদ্ধ কাচ-নলের ভিতর দিয়া উর্দ্ধমুখে উঠিতেছে, এটী সুস্পষ্ট দেখা যায়। ইহাতে কি প্রমাণিত হইল? ইন্দুরের আকৃতির মত তাহার একটী সূক্ষ্মদেহ আছে এবং ইহাতেই তাহার প্রাণশক্তি আবদ্ধ। মৃত্যু আর কিছুই নহে— এই সূক্ষ্ম দেহ হইতে তাহার ভাণ্ডদেহের বিচ্ছেদ। ইহাই আমাদিগের আলোচ্য পিণ্ড-দেহ বা ছায়া-শরীর। ইহাই প্রাণের বাহন।

এইবার আমরা ভাণ্ড-দেহটী একটু বিশেষ ভাবে আলোচনা করিব। তবে, পাঠকপাঠিকাদিগের প্রতি আমার সবিনয় নিবেদন যে, তাঁহারা যেন আমার উদ্দেশ্য না ভুলিয়া যান। আমি স্বপ্ন-তত্ত্ব লিখিতে বসিয়াছি, শরীর-তত্ত্ব লিখিবার আমার উদ্দেশ্য নাই। তাই শরীরের যে অংশ ও ক্রিয়া জানিলে স্বপ্ন-তত্ত্ব বুঝিতে সুগম হইবে, আমি কেবল তাহারই একটু বিশদ আলোচনা করিব। তাহাতে শরীর-সম্বন্ধে সমস্ত জ্ঞাতব্য বিষয় না বলায় যে অসম্পূর্ণতা-দোষ ঘটিবে, তাহার জন্য আমি সবিনয়ে আপনাদিগের নিকট আমার ক্রটী-মার্জ্জনা চাহিতেছি।

আমাদিগের ভাণ্ড দেহ অসংখ্য জীবাণুর আবাস-ভূমি। এই জীবাণু-দেহগুলির নাম cell বা জীবাণুকোষ। আমি যে ক্ষিতি, অপ্ ও তেজের কথা বলিয়াছি, তাহাদিগের দ্বারাই এই অসংখ্য জীবাণু-কোষের সৃষ্টি হইয়াছে। তাহাদিগের

সমষ্টিই আমাদিগের ভাণ্ড-দেহ। তাহারা প্রত্যেকেই স্বাধীন ও সজীব, অথচ কি এক আশ্চর্য্য শক্তির দ্বারা তাহারা সকলে একত্র হইয়া পরস্পরের সাহায্যে সমষ্টিভাবে মানবরূপ এক মহত্তর জীবের দেহ সৃষ্টি করিয়াছে। প্রত্যেক কোষ আবার বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অণুর সমষ্টি; প্রত্যেক অণু আবার ক্ষুদ্রতর অণুর সংযোগে সৃষ্ট। ক্ষুদ্রতর অণুগুলির জীবন-সমষ্টিই বৃহত্তর অণুর জীবন; বৃহত্তর অণুগুলির জীবন-সমষ্টিই কোষাণুর জীবন।

আমাদিগের দেহস্থিত কোষাণুগুলি আমাদিগের দেহযন্ত্রকে চালাইতেছে, অতএব তাহারা ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া দেহ হইতে বিচ্যুত হইতেছে। তাই, আমাদিগের আহারের প্রয়োজন। ইহাতে নষ্ট অণুর অভাব মোচন হয়। যাহা যায়, তাহার পরিবর্ত্তে আবার নূতন কোষাণুর সৃষ্টি হয়। এইরূপে অহরহঃ আমাদিগের দেহের সহিত বহির্জগতের আদানপ্রদান চলিতেছে।

"কার্য্যের সহিত ক্ষয়ের নিত্যসম্বন্ধ"—যেমন একটী প্রকৃতির নিয়ম, সেইরূপ প্রকৃতির আর একটী নিয়ম, 'ভূতের স্মৃতি-সংরক্ষণ'। মনে করুন, একখণ্ড প্রস্তর লইয়া তাহাকে অগ্নিতে উত্তপ্ত, নদীগর্ভে নিমজ্জিত ও লৌহদণ্ডদ্বারা তাড়িত করিলেন। এই যে তাহার উপর এতগুলি ক্রিয়া হইল, তাহাতে তাহার একটীরও নাশ হয় না; সমস্তগুলিই প্রস্তর অণুতে অঙ্কিত হইয়া যায়। ইহাকেই আমরা ভূতের স্মৃতি-সংরক্ষণ বলিয়া আসিয়াছি। যেমন শ্রুত-শব্দ-লেখক-যন্ত্র (phonograph) সাহায্যে অঙ্কিত অতীত শব্দ পুনরুদ্গারিত হয়, সেইরূপ একখণ্ড প্রস্তর যে যে অবস্থায় পড়িয়াছিল, তাহা, তাহার গুপ্ত অঙ্কিত চিত্র দেখিয়া বলিতে পারা যায়। যিনি এই গুপ্ত চিত্র পাঠ করিতে পারেন, তিনি একখণ্ড প্রস্তর লইয়া, ইহা কোথা হইতে আসিয়াছে, কোন্ আগ্নেয় গিরির অগ্ন্যুৎগমনের সময় গিরিমুখ হইতে বিচ্যুত হইয়া, নদীস্রোতে প্রবাহিত

হইয়াছিল, তাহার পর কোন্ তটদেশে তাহা রক্ষিত হয়, আবার কোন্ দস্যু তাহা কুড়াইয়া লইয়া, তাহার দ্বারা কোন কামিনীর প্রাণ বধ করিয়া, তাহার অলঙ্কারাদি অপহরণ করে,—এই সমস্ত চিত্রই ইহাতে অঙ্কিত দেখিতে পান। এই যে গুপ্তচিত্র পাঠ করিবার শক্তি ইহাকেই যথার্থ Clairvoyance (অতীন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ-শক্তি) বলে ! ইহাই যোগ দর্শনের সবিতর্ক-সমাধির অন্তর্গত। এই শক্তির সাহায্যে জগতের অতীত ইতিহাসের উদ্ধার হয়। এই সব কথা এখন থাক্। আমরা এই মাত্র বুঝিলাম যে, ভূতের অর্জ্জিত স্মৃতি নষ্ট হয় না। তাহা-হইলে, বহিস্থ যে সমস্ত অণু আসিয়া আমাদিগের শরীর পুষ্ট করিতেছে, তাহারা তাহাদিগের সমস্ত অতীত স্মৃতি লইয়াই আসে ; আবার সেইরূপ আমাদিগের দেহে থাকিয়া তাহাদিগের যে সমস্ত অভি-জ্ঞতা জন্মিয়া থাকে, সে সমস্ত গুহ্যভাবে সেই অণুগুলিতে নিহিত থাকে। আবার যখন তাহারা আমাদিগের দেহ ত্যাগ করিয়া অপর দেহ আশ্রয় করে, তাহারা এই সমস্ত অঙ্কিত স্মৃতি লইয়া যায়। আমাদিগের পূর্ব্বকথিত শ্রুতি-শব্দ-লেখক-যন্ত্র (Phonograph) যেইরূপ অঙ্কিত শব্দ পুনরুদ্গারিত করে, এই সমস্ত অণুগুলিও অনুকূল সুযোগ পাইলেই তাহাদিগের কোনটী না কোনটী অভিজ্ঞানের পুনরভিনয় করে।

এক সর্ব্বপ্রসারী, বিশ্বব্যাপী নিয়মের উপর বিশ্ব প্রতিষ্ঠিত। কোথাও তাহার ব্যতিক্রম হয় না। যে নিয়মের উপর কোটি কোটি জীবের উৎপত্তি, তাহারই উপর আবার তাহাদিগের ধ্বংস নির্ভর করিতেছে। সেই নিয়মের একটী নাম অভিব্যক্তি, অথবা ঈশ্বরমুখীন মহাযাত্রা। সৃষ্টির একাংশ দেখিলে যেমন মনে হয় ইহা মায়াবরোধ, তেমনি অপর দিক দিয়া দেখিলে মনে হইবে যে ইহাই মায়া-বন্ধন-মোচন লীলা। এই যে কোটি কোটি প্রাণী প্রতি নিশীথে আলোক-শিখায় প্রাণ বসির্জ্জন করিতেছে, তাহা কি নিরর্থক ? না, তাহার কি কোনও উদ্দেশ্য

নাই? তাহাদিগের এই জীবন-যজ্ঞের পরিণামে আমাদিগের দাহজনিত বোধশক্তি জন্মিয়াছে। যে অণুসমষ্টিতে তাহাদিগের দেহ গঠিত ছিল, তাহাই আবার কালে আমাদিগের দেহ গঠন করিয়াছে; ইহাতেই আমাদিগের দেহ দাহ, অনুভব করাইয়া দিতে পারিতেছে। এইরূপে আমাদিগের অপর অপর ইন্দ্রিয়বোধ আসিয়াছে।

এইবার আমরা মানবের স্নায়বীয়-বিধান (Nervous system) আলোচনা করিব। পাশ্চাত্য শরীরতত্ত্ববিৎ জানেন যে, স্নায়বীয় বিধান সাধারণতঃ দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়,—মাস্তিষ্ক্য-কশেরুকামাজ্জেয় স্নায়ু-বিধান (Cerebro-spinal nervous system) এবং সমবেদক স্নায়ু-বিধান (Sympathetic nervous system)। প্রথমোক্ত স্নায়ুবিধানের উপর আমাদিগের জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়ের ক্রিয়া নির্ভর করিতেছে; দ্বিতীয় স্নায়ুবিধান আমাদিগের দেহ-যন্ত্রটির রক্ষণ ও পোষণ করিয়া থাকে। মস্তিষ্ক, কশেরুকা-মজ্জা (Spinal chord) এবং উহাদিগের স্নায়ুসকল দ্বারা মাস্তিষ্ক্য-কশেরুকা-মাজ্জেয় স্নায়ুবিধান নির্ম্মিত। মস্তিষ্ক ও কশেরুকা মজ্জাকে স্নায়ুমূল বলে, কারণ স্নায়ুসকল এই দুইটি হইতে উৎপন্ন। মস্তিষ্ক করোটীর অস্থিময় প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত, এবং কশেরুকা মজ্জা পৃষ্ঠবংশের প্রণালী মধ্যে অবস্থিত থাকে। এই উভয় কেন্দ্রীয় স্নায়ুবিধান ফোর‍্যামেন্ ম্যাগ্নাম্ নামক বৃহৎ রন্ধ্র মধ্যদিয়া পরস্পরে সংযুক্ত থাকে।

এই স্নায়বিক অক্ষরেখা (Central axis of nervous matter) হইতে অনেক স্নায়ুসূত্র জালের মত দেহের সর্ব্বাংশে ব্যাপ্ত আছে। বহিস্থ যাবতীয় বিষয়ের অস্তিত্ব জ্ঞান এই সূত্র গুলি মস্তিষ্কে আনয়ন করে, তাহা হইতেই আমাদিগের বহির্বিষয়ের অনুভূতি হয়। মনে করুন, আমরা কোনও উষ্ণ পদার্থে হস্ত দিলাম, তৎক্ষণাৎ আমাদিগের এই পদার্থের উষ্ণতা অনুভূতি হইল। এই অনুভূতি কে করাইয়া দিল? ইহা কি হস্ত? না, ইহা হস্ত নহে। এই পদার্থের উষ্ণতাত্মক স্পন্দন আমাদিগের

হস্তের স্নায়বিক সূত্র সমষ্টির উপর আঘাত করায়, এই সূত্র গুলিও স্পন্দিত হইতে থাকে; পরে সেই তরঙ্গ সমূহ এই সূত্র সাহায্যে মস্তিষ্কে আসে; তাহা হইতেই আমাদিগের উষ্ণতানুভূতি হয়। বৈদ্যুতিক তারের এক স্থানে বৈদ্যুতিক উপায়ে তরঙ্গ তুলিলে, যেইরূপে সেই বার্ত্তা দূরস্থ স্থানে নীত হয়, স্নায়বিক সূত্রগুলিও তাহাই করিয়া থাকে।

এই সকল স্নায়বিক সূত্র-পুঞ্জের কোনও আকারগত বা উপকরণ-গত পার্থক্য নাই,—তাহারা সকলেই সমান। তবে এক একটি সমষ্টি এক এক ভাবে বহির্বিষয়ের উপলব্ধি জন্মাইয়া দেয়। উদাহরণ স্বরূপ আমরা যদ্যপি মাস্তিষ্ক্য স্নায়ুর কার্য্য দেখি, তাহা হইলে আমাদিগের এই উক্তির সত্যতা উপলব্ধি হইবে। মাস্তিষ্ক্য স্নায়ু সকল সম্পূর্ণরূপে বা অংশতঃ কয়েকটী গহ্বর মধ্যে মাস্তিষ্ক্য বা স্নায়ুবিধানের কেন্দ্র হইতে উৎপন্ন। বিশিষ্ট ইন্দ্রিয় সম্বন্ধীয় স্নায়ু সকল মাস্তিষ্ক্য স্নায়ুর অন্তর্গত। তাহাদিগের নাম,—ঘ্রাণ সম্বন্ধীয় (Olfactory), চাক্ষুষ (Optic), এবং শ্রবণ সম্বন্ধীয় (Auditory) স্নায়ু। যে স্নায়বিক সূত্র সমষ্টির সাহায্যে রেটিনা পর্দ্দায় প্রতিঘাত আলোক তরঙ্গ, মস্তিষ্কে আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহাকে আমরা চাক্ষুষ স্নায়ু বলিলাম। এই সূত্র সমষ্টি কেবল আলোক তরঙ্গের কার্য্য করিতেই অভ্যস্ত। ইহাদিগের দ্বারা অপর কোনও ইন্দ্রিয় ব্যাপার সংসাধিত হয় না। সেইরূপ শ্রবণ সম্বন্ধীয় স্নায়ু (Auditary nerve), ঘ্রাণ সম্বন্ধীয় স্নায়ু (Olfactory nerve), ইহারা সকলেই এক একটি নির্দ্দিষ্ট অনুভূতি জন্মাইয়া দেয়। তাহাদিগের এই গুণ-বৈষম্য চিরাগত অভ্যাস হইতে জন্মায়। ইংরাজিতে ইহাকে টেম্পার (Temper)বলে। একই ধাতু-নির্ম্মিত বিবিধ সূত্র, গুণে ও আকৃতিতে এক প্রকার হইলেও বিবিধ শক্তি প্রকাশের সহায়তা করিতে অভ্যস্ত হইলে, তাহারা প্রত্যেকে, দীর্ঘাভ্যস্ত সেই সেই নির্দ্দিষ্ট শক্তি প্রকাশ করিতে যেই-রূপ সহজে সক্ষম হয়, অপরটি সেইরূপ হয় না। এটি একটি বৈজ্ঞানিক

সত্য কথা। সকলেই জানেন, একখণ্ড লৌহের সহিত চুম্বক ঘর্ষণ করিলে লৌহও চুম্বুকের মত কার্য্য করে; আবার সময়ে লৌহের সেই চৌম্বুক শক্তি নষ্ট হয়। যে লৌহ খণ্ডে এইরূপে বার বার চৌম্বুক শক্তি আরোপিত হয়, বৈজ্ঞানিকেরা জানেন যে, সেই লৌহ খণ্ড অতি সহজে চৌম্বুক শক্তি প্রকাশ করিতে সক্ষম হয়। অপর একটী নূতন লৌহ খণ্ড সেইরূপ পারে না। যে তাম্রসূত্র সাহায্যে প্রায় বৈদ্যুতিক স্রোত প্রবাহিত হয়, তাহা বৈদ্যুতিক স্রোত প্রবাহনে অপর সূত্রের অপেক্ষা অল্প বাধা দেয়,—একথাও বৈজ্ঞানিকেরা অবগত আছেন। খ্যাতনামা বাদ্যকর তাহার জীর্ণবীণা হস্তান্তরিত করিয়া যে নূতন বীণা গ্রহণ করেন না, ইহার মূলেও এই সত্য নিহিত আছে। তাঁহার নিজের বীণা খানি যেমন তাঁহার হস্তে সুর দেয়, তাহার দ্বারা তিনি যে মূর্চ্ছনা বাহির করেন, অপর একটি নূতন বীণা সেইরূপ পারে না, তাঁহার এই ধারণা নিতান্ত অমূলক নহে। এই বীণাটি তাঁহার হস্তে যেন সঞ্জীবিত হইয়াছে। ইহার মূলেও সেই অভ্যাস।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি দর্শনাদি ইন্দ্রিয় ব্যাপার সাধন করাইতে কিরূপে ভূত অভ্যস্ত হইয়াছে। তাহারা ধাতুর দেহ, উদ্ভিদের দেহ, পশুর দেহ ইত্যাদি এক একটি দেহের উপাদান ভূত হওয়ায়, তাহাদিগের ভিতরে যে চৈতন্য-ক্রিয়া হইয়াছে, তাহার দ্বারাই সেই সেই চৈতন্য-ক্রিয়া প্রকাশ-শক্তি উদ্বোধিত করিয়াছে। অনাদিকাল হইতে অসংখ্য জীব যে ভূতের এক একটি শক্তি বিকাশ করিয়া আত্মজীবন বিসর্জ্জন করিয়া আসিয়াছে, তাহার পরিণামেই মানব-দেহ। মানব-শরীর এই অনন্ত জীব-যজ্ঞের ফল। আমরা যে পূর্ব্বে অগ্নিতে নিশাযোগে অসংখ্য কীটাণুর মৃত্যু বর্ণনা করিয়াছি, ইহা তাহার একটি উদাহরণ। অতএব আমরা দেখিতেছি যে, আমরা যে দেহ লাভ করিয়াছি, তাহার জন্য অসংখ্য প্রাণীর নিকট আমরা কিরূপে ঋণী। তাহাকে আর্য্যশাস্ত্র ভূতঋণ

বা জীব-ঋণ বলিয়াছেন এবং সেই সমস্ত জীবের জন্য নিত্য তর্পণ করিয়া আমাদিগের ঋণ-মুক্তির উপায় নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। এই সমস্ত ভূত দিয়াই আমাদিগের কোষাণুর সৃষ্টি এবং কোষাণু সমষ্টিতেই আমাদিগের স্নায়বিক সূত্রগুলি নির্ম্মিত হইয়াছে। কোষাণু-দেহের ভূতের শক্তিগুলিকে কোষাণু-প্রাণ একত্র করে এবং মানব-প্রাণ-সূত্রের দ্বারা অক্ষ যেইরূপ সংযোজিত হয়, সেইরূপ কোষাণুগুলির শক্তিকে একত্র করে। তাই মানব স্নায়বিক সূত্রের দ্বারা দেখিতে পায়, শুনিতে পারে, স্পর্শ অনুভব করিতে পারে। এইখানে বিজ্ঞানবিদের সহিত শাস্ত্রকারের মত-বিভিন্নতা। বৈজ্ঞানিক বলেন, মানবের দর্শন শ্রবণাদি ব্যাপার সমস্তই মস্তিষ্ক ও স্নায়ু সূত্রের কার্য্য। শাস্ত্রকার বলেন, সেই সমস্ত আত্মার চৈতন্য-শক্তি। ছান্দোগ্যোপনিষদে আছে, "যিনি এই দেহে দ্রষ্টা, তিনিই আত্মা, চক্ষু দর্শনের সাধন, যিনি এই দেহে ঘ্রাতা, তিনিই আত্মা, ঘ্রাণ গন্ধ গ্রহণের সাধন; যিনি এই দেহের শ্রোতা, তিনিই আত্মা, শ্রবণ শ্রবণের সাধন।"* চক্ষু বা চাক্ষুক স্নায়ু ইত্যাদি, ইহা সাধন বা উপাদান কারণ মাত্র।

এইবার আমরা মস্তিষ্কের স্বাভাবিক কার্য্যের কিরূপে বিকৃতি হয়, তাহার আলোচনা করিব। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, এই মস্তিষ্ক, স্নায়ুর কেন্দ্রস্থল। ইহা সামান্য কারণে বিচলিত হয়। স্বাস্থ্যের অবস্থার পরিবর্ত্তনের সহিত, বিশেষতঃ মস্তিষ্কে প্রবাহিত রুধিরের তারতম্য অনুসারে ইহার কার্য্যের পরিবর্ত্তন হয়। মস্তকের রুধির-ভাণ্ডে রুধির-প্রবাহ স্বাভাবিক থাকিলে, মস্তিষ্ক, অতএব স্নায়ুমণ্ডলিও স্বাভাবিকভাবে কার্য্য করে। প্রবাহের গতির পরিবর্ত্তন, রুধিরের হ্রাসবৃদ্ধি বা তাহার অবস্থার তারতম্য হইলে মস্তিষ্ক ও স্নায়ুমণ্ডলির ক্রিয়াও অস্বাভাবিক হয়।

---

* ছান্দোগ্যোপনিষৎ—৮ম অধ্যায়, ১২শ খণ্ড, ৪ শ্লোক।

যদ্যপি মস্তকে অধিক পরিমাণে রক্ত প্রবাহিত হয়, তাহা হইলে রুধিরভাণ্ড বিস্ফারিত হয়, এবং তাহার ফলে মস্তিষ্কের কার্য্যও বিকৃত হয়; সেইরূপ যদ্যপি অল্প পরিমাণে রক্ত সঞ্চালিত হয়, তাহা হইলে মস্তিষ্কে প্রথমতঃ অবসাদ লক্ষিত হয়, পরে আবার তাহা উত্তেজিত হয়। আবার প্রবাহিত রুধিরের প্রকৃতির উপর মস্তিষ্কের কার্য্য নির্ভর করে। রুধির-প্রবাহের দুইটি বিশেষ কার্য্য আছে,—ইহা অম্লজান দান করে এবং দেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদির পুষ্টি সাধন করে। এই দুইটি কার্য্যের কোনও একটি সাধনে যদ্যপি ইহার ত্রুটী হয়, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ একটি গোলযোগ বাধিয়া যায়। যদ্যপি রুধিরে অম্লজানের (Oxygen) অংশ অল্প থাকে, তাহা হইলে ইহাতে অতিশয়িত ভাবে দ্যম্লাঙ্গার (Carbon dioxide) মিশ্রিত হওয়ায় মস্তিষ্কের কার্য্যও বিকৃত হয় এবং শীঘ্রই জড়তা আসিয়া পড়ে। আবদ্ধ গৃহে বহুলোক অবস্থান করিলে যে নিদ্রাবেশ ও জড়তা আসিয়া থাকে, তাহা অনেকেই উপলব্ধি করিয়াছেন।

আবার রুধির-প্রবাহের গতির হ্রাসবৃদ্ধির সহিত মস্তিষ্কের কার্য্যের অনেক সম্বন্ধ। প্রবাহ-গতির বৃদ্ধি হইলে, শরীরের উত্তাপের বৃদ্ধির সহিত মস্তিষ্কও উত্তেজিত হয়। সেইরূপ প্রবাহ-গতির হ্রাস হইলে অবসাদ আসিয়া পড়ে। অতএব আমরা দেখিলাম,—যে মস্তিষ্কের সাহায্যে মানবের বহির্বিষয়ের অনুভূতি হয়, তাহা কত অল্প কারণে বিচলিত হয়। জাগ্রতকালেই যখন অনেক সময় আমরা এই সামান্য কারণ উপলব্ধি করিতে পারি না, নিদ্রার সময় আমরা সে বিষয়ে কতটা যে অন্ধ থাকি, তাহা ভাবিলেই বুঝা যায়।

আমরা আর একটি বিষয় আলোচনা করিয়া এই ভাণ্ড-দেহ সম্বন্ধীয় বিচার শেষ করিব। তাহা এই,—দেহ যদ্যপি কোনও কারণে একরূপে পরিস্পন্দিত হইতে অভ্যস্ত হয়,—তাহা হইলে সেই উত্তেজক

কারণ অন্তর্হিত হইলেও, তাহার সেইরূপে স্পন্দন করিবার প্রবণতা থাকে। এই মহানীতির জন্যই এমন অনেক অভ্যাস মস্তিষ্কের যেন প্রকৃতি-গত হইয়া যায়, এবং তাহা আমরা প্রবল ইচ্ছাশক্তির দ্বারাও অনেক সময়ে ব্যাহত করিতে পারিনা। আমরা পরে দেখাইব, নিদ্রাকালীন ইহার শক্তি কিরূপ প্রবল, কারণ তখন মানবের ইচ্ছাশক্তি তাহার স্থূল-দেহের উপর সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কোনও কার্য্য করে না। ক্রমশঃ

শ্রীকিশোরীমোহন চট্টোপাধ্যায়।

"প্রেত-তত্ত্ব"

অথবা

মানব দেহে প্রেতাত্মার আবির্ভাব সম্বন্ধে কয়েকটি প্রত্যক্ষ ঘটনার বিবরণ।

হিষ্টিরিক ফিট।

আমাদের প্রেত-তত্ত্বের আলোচনার আরম্ভেই হিষ্টিরিক ফিট কথা লেখা দেখিয়া বোধ হয় অনেকেই ভ্রু-কুঞ্চন না করিয়া থাকিতে পারিবেন না। কিন্তু কি করিব, আমাদের প্রেততত্ত্বের প্রথম অধ্যায়ই হিষ্টিরিক ফিট অবলম্বন করিয়া ; সুতরাং লোকে উহাকে ভূতাবেশ মনে করুন আর না-ই করুন, আমি কিছুতেই উহাকে বাদ দিতে পারি না।

অনেক চিকিৎসকই এই সম্বন্ধে তর্ককরিয়া হাসিয়া চলিয়া গিয়াছেন, যেহেতু তাঁহাদের মনে দৃঢ় ধারণাই এই যে, ইহা ব্যাধি ; কিন্তু আমার এই কয়েক বৎসরের অভিজ্ঞতায় যাহা দেখিলাম, তাহাতে আমারও দৃঢ় প্রতীতি এই যে, প্রায় শতকরা ৯৯ জনই ভূতাবিষ্ট। ছোটবেলায় একবার এইরূপ একটি রোগীর দৈবচিকিৎসা দেখিয়াই উহা শিক্ষা

করিবার জন্য প্রবল পিপাসা জন্মে, কিন্তু তাহা এতকাল ঘটিয়া উঠে নাই।

আজ প্রায় তিন চারি বৎসর হইল, একজনকে একটা গাছের শিকড়ের সাহায্যে কুণ্ডলী দিয়া ভূত আবদ্ধ করিতে দেখিয়া, নানাপ্রকার তোষামোদ করিয়া উহা তাহার নিকট হইতে শিক্ষা করি। ইহাই আমার প্রথম ও প্রধান প্রেততত্ত্বের অবলম্বন। ১৯০৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথম ভাগে আমি একটি হিষ্টিরিয়া রোগীকে কুণ্ডলী দিয়া আবদ্ধ করি, এবং তাহার সহিত আলাপও হয়। যখন একটি রোগীকে প্রেতাবিষ্ট বলিয়া প্রমাণ করিলাম, তখন কোথায় অন্য রোগী লইয়া তাহার সহিত আলাপ করিব, সে জন্য বড়ই উৎকণ্ঠা উপস্থিত হইল। যাহা হউক, আমার এই অযাচিত চিকিৎসার আদর অতি সত্বর বৃদ্ধি পাইল। কয়েক দিন পরে আমার একটি আত্মীয়ার ফিট হয়, সেখানেও ঐ ভাবে আবদ্ধ করি এবং তাহার সহিতও রীতিমত কথাবার্ত্তা হয়। এই ঘটনা হইতেই আমার এই বিষয়ের বিশেষ শিক্ষার বন্দোবস্ত হয়। সেই প্রেতাত্মা একদিন আমাকে বলিল যে, "তুমি ভূত তাড়াতে নেমেছ, অথচ তুমি কিছুই জান না। তুমি কাগজ কলম নিয়ে এস, আমি কিছু কিছু লিখে দিই।" ঐ দিন তিনি যাহা লিখিয়া দিয়াছিলেন, তাহা অবলম্বন করিয়াই আমার যাহা কিছু উন্নতি। শেষে তাঁহার সহিত কথা রহিল যে, আমি যখনই তাঁহাকে আহ্বান করিব, তিনি তখনই আসিয়া আমার সহিত আলাপ করিবেন। এইরূপ আলাপের দ্বারা আমার যাহা কিছু ভুল ভ্রান্তি সকলই সংশোধন করিয়া লইবার সুবিধা পাইয়াছি। আমি ক্রমে ক্রমে তাঁহার নিকট হইতেই, প্রেততত্ত্ব সম্বন্ধে যতদূর সাহায্য আবশ্যক, তাহাই লাভ করিয়াছি এবং চিরজীবনই তাহার সাহায্য পাইব, এমন আশা রাখি। প্রেতাত্মা আনয়ন সম্বন্ধে সম্প্রতি আমরা যে পথ অবলম্বন করিয়াছি, উহা তাঁহারই উপদিষ্ট

এবং সম্পূর্ণরূপে নূতন। এই প্রক্রিয়া অনুসারে প্রেতাত্মা আনিতে এক মিনিটও আবশ্যক করে না এবং এক সময়ে বহুসংখ্যক প্রেতাত্মা আহ্বান করা যায়। আর একটি সুবিধা এই যে, মধ্যস্থ (Medium) আত্মাদিগকে দেখিয়া তাহাদের সহিত কথা কহিতে পারে।

আজকাল এই নূতন প্রক্রিয়া দ্বারা সপ্তাহে দুই তিন দিন করিয়াই প্রেতাত্মা আনা হয় এবং নানা প্রকারের নূতন নূতন তত্ত্বের সংগ্রহ হইতেছে। ক্রমে এই সমুদায় সংগ্রহও আমাদের প্রেততত্ত্বেই সন্নিবেশিত হইবে।

ফিটের রোগীর ভিতরে কোন্‌টির ফিট এবং কোন্‌টির ভূতাবেশ, তাহা পরীক্ষার একটা উপায় আছে। সেই প্রক্রিয়া অনুসারে আবেশ পরীক্ষিত হইলেই তাহাকে আবদ্ধ করিয়া, সহজে কথা না কহিলে একটুকু যাতনা দিলেই কথা কহিতে থাকে। অনেক প্রেতাত্মা কুণ্ডলী করিলেই মধুর ভাষায় গালাগালি আরম্ভ করে; কিন্তু, যাহারা একটুকু ভদ্র শ্রেণীর আত্মা, তাহারা প্রায়শঃই কোন গোলযোগ না করিয়াই রীতিমত প্রশ্নের উত্তর দিতে আরম্ভ করে।

১৯০৮ সনের ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথম ভাগে আমার একজন বন্ধুর স্ত্রীর ফিটই প্রথম পরীক্ষিত হয়। তাঁহার ফিট ৭।৮ বৎসর যাবৎই হইতেছিল। আবেশ অনুভব করিয়াই আবদ্ধ করিলাম, কিন্তু প্রথম দুই তিন দিন সামান্য দু একটি কথা ভিন্ন অন্য কোনই কথা পাইলাম না। তাহার মধ্যে, যাইবার জন্য ব্যগ্রতার কথাটাই বেশীর ভাগ। ৫।৬ দিন পরে (সে দিন রবিবার ছিল), বেলা একটার সময় আবার ফিট হয়, খবর পাইয়াই তাড়াতাড়ি যাইয়া তাহাকে আবদ্ধ করিলাম। এই দিবসই আমার চেষ্টা অনেক পরিমাণে সফল হইয়াছিল। প্রথমে কিছুতেই কথা কহিতে চাহে না, কিন্তু একটুকু যাতনা দিতেই আমাদের প্রশ্নের উত্তর দিতে আরম্ভ করিল।

প্র। তোমার নাম কি?

উ। আমার নাম * * *।

প্র। ইনি তোমার কেউ হন্?

উ। হাঁ, আমার সন্তান।

প্র। তুমি কোথা হ'তে এসেছ?

উ। পাবনা হ'তে এসেছি।

প্র। কতদিন যাবৎ এভাবে আছ?

উ। আট বৎসর।

প্র। মা হ'য়ে সন্তানকে কষ্ট দাও কেন?

উ। আমি এর (অশিষ্টাচার) ব্যবহারে অসন্তুষ্ট।

প্র। কি হইলে ইনি আরোগ্য হ'তে পারেন?

উ। দীক্ষিত হলেই আরোগ্য হ'তে পারে।

আমি অনেক দিন স্বপ্নে এ'কে দেখা দিয়ে বলেছি, কিন্তু এরা স্বপ্নাদেশ বিশ্বাস করে না।

প্র। মন্ত্র গ্রহণ ক'রলে তোমার লাভ কি?

উ। আমি এর মঙ্গলকামী। ২রা শ্রাবণ ভালদিন আছে, সে দিন একে দীক্ষা করাও।

প্র। তুমি যে এর মা, সে কথা বিশ্বাস করি কি দিয়ে? তুমি এর জীবনের সব কথা ব'লতে পার?

উ। হাঁ সব পারি।

এই সময়ে আবিষ্টার জীবনবৃত্তান্ত এবং তাহার পারিবারিক অনেক ঘটনার উল্লেখ করিয়া যাহাতে আমাদের বিশ্বাস হইতে পারে, তাহাই করিল। আবিষ্টার স্বামীও তখন সেই খানেই উপস্থিত ছিলেন।

প্র। কেবল কি এর মঙ্গলের জন্যই আস, না অন্য কোনও উদ্দেশ্য আছে?

উ। এই প্রশ্নের পর কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিতে আরম্ভ করিল।

মৃত্যু কালে আমাকে অপর জাতিতে স্পর্শ করিয়াছিল, সে জন্যে আমার অধোগতি হ'য়েছে। তা'র পর আমার শ্রাদ্ধাদিও ভালমত হয় নাই। এখন আমি বড়ই কষ্টে আছি। (এই সময়ে চখের কোণে জল দেখা দিল।) স্বপ্নে এ সব অনেকবারই ব'লেছি, কিন্তু এরা বড়ই অবিশ্বাসী, স্বপ্নাদেশ বিশ্বাস করে না। এ সংসারে আমার এই মেয়ে ভিন্ন এমন কেউ নাই, যে আমায় একটুকু জল দিতে পারে। আমি আট বৎসর একে এইরূপ ভাবে কত কষ্ট দিলাম, কিন্তু একদিনও কেউ খবর নেন নাই যে, কেন এর এমন হয়। এরা যদি গয়াতে পিণ্ড দেয়, তবেই আমি মুক্ত হ'তে পারি। তার পর আর আমি এখানে আস্‌ব না।

প্র। এখান থেকে এখন কোথায় যাবে?

উ। পাব্‌নায়।

প্র। সেখানে কি কর?

উ। সর্ব্বদা সেখানেই থাকি।

প্র। সেখানেও কি কারো দেহে প্রবিষ্ট হও?

উ। হাঁ।

প্র। তুমি এরূপ ভাবে মানুষকে কষ্ট দাও কেন?

উ। মানুষের শরীরে ঢুক্‌লে কতকটা শান্তিতে থাকি।

প্র। এখানে আর কখনও আস্‌বে কি?

উ। না ডাক্‌লে আস্‌ব না।

এই সময়ে কোনও প্রশ্নের অপেক্ষা না করিয়াই নিজে নিজে বলিতে আরম্ভ করিল।

তাহার অধিকাংশ কথাই আমাদের সাংসারিক কথা। সুতরাং উহার যতটুকু প্রকাশযোগ্য তাহাই লিখিলাম।

"তোমাদের শীঘ্রই খুব নাম হবে"

প্রঃ। কেন?

উঃ। এমন কোনও একটা ঘটনা হবে, যাতে দেশশুদ্ধ লোক তোমাদের জান্‌তে পারে।

প্রঃ। কি হবে ব'লতে পার?

উঃ। তা খু'লে ব'ল্‌তে পারব না। তবে কোনও ভয়ের কথা নহে, জে'নে রেখ। তোমরা যে কাজে হাত দিয়েছ, তাতে তোমাদের মঙ্গল হবে।

প্রঃ। কি কাজে হাত দিয়েছি?

উঃ। কেন, যে কাজের জন্যে এখন লেখাপড়া হ'চ্ছে।

প্রঃ। খু'লে বল।

উঃ। তোমাদের কাজ বাড়াবার জন্যে লেখাপড়া হ'চ্ছে। কিন্তু একটা লোকের সায় পাচ্ছো না ব'লে দেরী হ'য়ে যাচ্ছে। সে যদি একটু খাটে, তা হ'লেই সব হ'য়ে যায়।

প্রঃ। সে কে?

উঃ। কাল রাত্রিতে তুমি তার সঙ্গে দে'খা ক'রে এসেছ। তার নাম * * *

প্রঃ। এই কাজ কতদিনে ঠিক হবে?

উঃ। ছয় মাসে। (আট মাসে হইয়াছে)

প্রঃ। * * * কখন বদ্‌লি হবেন।

উঃ। আগষ্ট মাসে। (ঠিক তাহাই হইয়াছে।)

এইরূপে প্রায় দুই ঘণ্টা আলাপ হইল; তখন প্রেতাত্মা আর থাকিতে চাহে না, যাইবার জন্য বড়ই ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে।

প্রঃ। আবার কখন আস্‌বে?

উঃ। না ডাক্‌লে আস্'ব না।

প্রঃ। তুমি চ'লে গেলে ইনি (আবিষ্টা) বড়ই কাতর হ'য়ে পড়েন, আজ এমন ক'রে দিয়ে যাও, যেন শরীরে কোন গ্লানি না থাকে।

উঃ। হাঁ, আজ এর শরীর খুব ভাল থাক্‌বে।

তখনই কুণ্ডলী কাটিয়া দিলাম এবং প্রেতাত্মাও প্রস্থান করিল। সে দিবস আবিষ্টা শরীরে কোন গ্লানিই অনুভব করেন নাই। আবিষ্ট অবস্থাতে ইনি এত জোরে হাত পা ছুড়িতে থাকেন যে, ৪।৫ জন বলিষ্ঠ লোকও ধরিয়া রাখিতে পারে না। কিন্তু কুণ্ডলী করিলেই আর সে শক্তি থাকে না। জ্ঞান লাভ করিলেই প্রত্যহই শরীর-বেদনায় বড়ই কাতর হইয়া পড়েন। কিন্তু সে দিন তিনি মোটেই তাহা অনুভব করেন নাই।

এই ঘটনার ১৫।১৬ দিবস পরে এমন একটা ঘটনা হয়, যাহাতে আত্মার ঐ কথা (শীঘ্রই তোমাদের খুব নাম হবে) সম্পূর্ণ সত্য হইয়াছে। ক্রমে এইরূপ আরও অনেক কথারই সত্যতা উপলব্ধি করিয়াছি। ক্রমশঃ।

শ্রীসুরেশচন্দ্র গাঙ্গুলী।

একটি পুরাতন অলৌকিক ঘটনা।

অন্যূন চল্লিশ বৎসর অতীত হইল, যখন আমরা হুগলি কলেজে অধ্যয়ন করি, তখন এই ঘটনাটী হয়। তৎকালে হুগলীর ছোট আদালতের জজ খ্যাতনামা ৺পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়, তাঁহার কোর্টে এই মোকদ্দমা হয়; অতএব ঘটনার সত্যাসত্য সম্বন্ধে সন্দিহানব্যক্তিগণ উক্ত আদালতের দস্তাবেজ দেখিলে বুঝিতে পারিবেন। ঘটনাটী এই :—

হুগলী জেলার কোন গ্রামস্থ একটী ব্রাহ্মণ উক্ত সময়ে গ্রামান্তরে যাইতেছিলেন, পথিমধ্যে বেলা অধিক হওয়াতে কোন এক আত্মীয় ব্রাহ্মণের বাটীতে আতিথ্য স্বীকার করিলেন। ব্রাহ্মণ যথোচিত সমাদরে আগন্তুককে গ্রহণ করিলেন এবং কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তার পর উহাকে স্নানাদি করিতে অনুরোধ করিলেন। ঐ ব্রাহ্মণের বাটীতে একটী পালিত কুকুর

ছিল। আগন্তুককে দেখিয়া অবধি সে মহানন্দে কখন তাহার পদতলে লুণ্ঠিত, কখন বা তাহার গাত্রলেহন করিতে উদ্যত হইল। ব্রাহ্মণ তৈল মাখিয়া পুষ্করিণীতে স্নানাদি সন্ধ্যাবন্দনা করিতে গেলেন, কুকুরটী সঙ্গে সঙ্গে মহানন্দে চলিতে লাগিল। তিনি স্নানাদি সমাপনান্তে বাটী প্রত্যাগমন করিলেন, কুকুরও সঙ্গে সঙ্গে আসিল। পরে মধ্যাহ্ন আহার করিলেন কুকুরও স্বক্কণী পরিলেহন করিতে করিতে তথায় বসিয়া রহিল। পরে আহারাদি করিয়া চণ্ডীমণ্ডপে আসিয়া শয়ন করিলেন এবং বেলা পড়িলে উদ্দিষ্ট স্থানে যাইবার মনস্থ করিয়া নিদ্রার উদ্যোগ করিলেন, কুকুরটীও তাঁহার শিরোদেশে উপবেশন করিয়া রহিল। ব্রাহ্মণ কিয়ৎক্ষণ নিদ্রা যাইয়া হঠাৎ চমকিত ভাবে উঠিয়া বসিয়া কুকুরটীর দিকে অনিমিষ লোচনে চাহিয়া রহিলেন ও কি ভাবিতে লাগিলেন। তিনি স্বপ্ন দেখিয়াছেন যে, ঐ কুকুরটী যেন তাঁহাকে কহিতেছে যে "পূর্ব্বজন্মে আমি তোমার পিতা ছিলাম, নিমন্ত্রণ হইলে পীড়ার ব্যপদেশে ৺ঠাকুরের ভোগের ও ব্রাহ্মণ ভোজনের পূর্ব্বেই আহার করিতাম, সে জন্য আমার কুকুর যোনি হইয়াছে। আমি বড় কষ্ট পাইতেছি, অতএব আমাকে গয়া দেও"। এই স্বপ্ন দেখিয়া অবধি চিত্ত অত্যন্ত বিচলিত হইল। সেদিন গ্রামান্তরে যাওয়া স্থগিত রাখিয়া সেই স্থানেই অবস্থিতি করিলেন এবং অষ্টপ্রহর ঐ এক চিন্তায় চঞ্চল হইয়া সময় অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। সায়াহ্ন সময়ে পুনরায় পুষ্করিণীতে যাইয়া সায়ংকৃত্য সমাপন করিলেন। কুকুরটী একবারও সঙ্গ পরিত্যাগ করে নাই। পুনরায় যথা সময়ে আহারাদি করিয়া বহির্দ্দেশে চণ্ডীমণ্ডপে আসিয়া শয়ন করিলেন, কুকুরও শিরোদেশে আসিয়া বসিল। কিঞ্চিৎ নিদ্রার পর তিনি স্বপ্ন দেখিলেন, কুকুর পুনরায় বলিতেছে, "তুই আমার কথায় বিশ্বাস করিলি না, এই দণ্ডেই গয়া যাও পিণ্ডদান কর। যদি অর্থের অনাটন হয়, আমার বাটীতে অমুক ঘরে অমুক কোণে আমার টাকা পোঁতা আছে, লইয়া এইক্ষণে চলিয়া যাও"

তখন হঠাৎ ঘুম ভাঙ্গিয়া উঠিয়া দেখিলেন কুকুর সেই ভাবেই বসিয়া আছে। তখন তিনি আর সময় নষ্ট না করিয়া অতি প্রত্যুষে গৃহস্থের সহিত সাক্ষাৎ না করিয়াই গয়া প্রস্থান করিলেন, এবং তথায় যথানিয়মে পিণ্ডদান করিয়া যথাসময়ে বাটী না যাইয়া ঐ গৃহস্থের বাটী উপস্থিত হইয়া কুকুরটীর কথা জিজ্ঞাসা করায় গৃহস্থ কহিল "অমুক দিন বেলা দ্বিপ্রহরের সময় বিনা-রোগে হঠাৎ ঐ কুকুরটী ঐ গাছতলায় ছটফট করিয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছে"। শুনিয়া ব্রাহ্মণ স্বপ্নবৃত্তান্ত আনুপূর্ব্বিক সমস্ত কহিলেন এবং ঐ দিন ঐ সময় তিনি গয়ায় পিণ্ডদান করিয়াছিলেন, তাহাও ঠিক মিলিয়া গেল। তখন ব্রাহ্মণ নিজগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক পৈতৃক ধন প্রাপ্ত হইলেন, এবং ঐ টাকায় ইষ্টকালয় প্রস্তুত করিয়া সুখে বাস করিতে লাগিলেন। কিছু-কাল পরে তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিদেশ (কর্ম্মস্থান) হইতে লোকপরম্পরায় উক্ত সংবাদ পাইয়া ভ্রাতার নিকট পৈতৃক ধনের অর্দ্ধেক দাবী করিল। জ্যেষ্ঠ কহিলেন, "যাহা পাইয়াছি, তাহাতে বাটী প্রস্তুত হইয়াছে, অবশিষ্ট কিছুই নাই।" ইহার পর তিনি কহিলেন "আইস, আমরা দুই ভাই ইহাতে বাস করি, অথবা বাটীর অর্দ্ধেক ভাগ করিয়া লও।" কনিষ্ঠ লোকপরম্পরায় শুনিয়াছিল যে, জ্যেষ্ঠ প্রভূতধন পাইয়াছে, সুতরাং সে সম্মত না হইয়া আদালতে নালিশ করিল। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সমস্ত স্বপ্নবৃত্তান্ত ও অর্থপ্রাপ্তি ও তাহা কিরূপে ব্যয়িত হইয়াছে, আদ্যোপান্ত আদালতে জানাইয়া তাঁহার গয়া যাওয়া ও যে গৃহস্থের বাটীতে কুকুর ছিল, উহাদের সাক্ষী দেওয়াইয়া মোকদ্দমায় জয় লাভ করিলেন, এবং ভ্রাতাকে বাটীর অর্দ্ধাংশ দিয়া বাস করিতে লাগিলেন।

শ্রীবিধিনাথ চট্টোপাধ্যায়।

অলৌকিক রহস্য।

৮ম সংখ্যা] দ্বিতীয় ভাগ। [অগ্রহায়ণ, ১৩১৭।

প্রেত-তত্ত্ব।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

(২)

আমাদের কোনও কার্য্য সহজে সম্পাদিত না হইলে, আমরা যেমন প্রায়ই উহাতে কৌশল অবলম্বন করিয়া থাকি, সময় সময় প্রেতাত্মগণও সেইরূপ কৌশল অবলম্বন করিয়া তাহাদের কাজ গুছাইয়া লয়। ইহ-জীবনের কর্ম্ম সমূহ যেমন প্রবৃত্তির তাড়নাতেই প্রতিনিয়ত প্রলুব্ধ করিয়া থাকে এবং যত্তদিন উহা সুসিদ্ধ না হয়, ততদিন যে কোন প্রকারে হউক উহাকে আয়ত্ত করিবার প্রবল ইচ্ছা থাকে; প্রেতাত্মগণও সেইরূপ বাসনা-মুগ্ধ হইয়া তাহাদের অভিলষিত বস্তুর চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়ায়। আর ইহজীবনের অপূর্ণ প্রবৃত্তি সমূহ যে প্রেতজীবনেও বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ, আমার প্রেততত্ত্বের অনেক ঘটনাই তাহার জলন্ত সাক্ষ্যস্বরূপ।

আমরা সাধারণ চেষ্টায় এবং কৌশল অবলম্বন করিয়াও যখন কোনও কার্য্যে সফল-মনোরথ হইতে পারি না, তখন অনেক সময় অত্যাচারের ভয় দেখাইয়া কিম্বা অত্যাচার করিয়াও যেমন অনেক কাজ করিয়া থাকি, সেইরূপ প্রেতাত্মাগণও আপনাদের প্রবৃত্তির দুর্নিবার শাসনে পড়িয়া নানা

খেলাই খেলিয়া থাকে। নিম্নলিখিত ঘটনা হইতে তাহার যৎকিঞ্চিৎ আভাস পাইবেন।

পূর্ব্বেই বলিয়া রাখিতেছি যে, বাল্যকাল হইতেই, আমার তন্ত্রোক্ত ক্রিয়াদিতে বেশ বিশ্বাস আছে এবং সর্ব্বদাই ঐ সমুদায় সম্বন্ধে যতদূর সাধ্য তন্ত্র মন্ত্র সংগ্রহ করিতেও ক্রুটি করি নাই। আমার প্রবন্ধ সমূহে সেই সমুদায় তন্ত্রোক্ত ক্রিয়াদি সম্বন্ধেও অনেক প্রত্যক্ষতার প্রমাণ আছে। মন্ত্রাদি দ্বারাও যে প্রেত জগতে নানা প্রকার শক্তির পরিচালনা সম্ভব, ক্রমে সেই সম্বন্ধেও অনেক কথার সন্নিবেশ দেখিতে পাইবেন।

বিগত ১৯০৮ সনের ২৪ শে জুন, রাত্রি দশ ঘটিকার সময় সংবাদ পাইলাম যে, একটি স্ত্রীলোককে সর্পে দংশন করিয়াছে এবং আমাকে সেখানে যাইতে হইবে। তখন বড়ই বৃষ্টি হইতেছিল। যাহা হউক, শতবিঘ্ন হইলেও যাইতে হইবে বলিয়াই, তখনই রওয়ানা হইলাম।

ভিজিতে ভিজিতে যাইয়া সেই বাড়ীর সীমানায় পঁহুছিয়াই শুনিতে পাইলাম যে, সর্পদষ্টা ভয়ানক চীৎকার করিতেছে। তখন তাড়াতাড়ি সেখানে যাইয়াই বিষ নামাইবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইলাম। কিন্তু কণ্টক বিদ্ধ করিয়া বিষ নামাইতে উদ্যত হইয়াছি, এমন সময় সেই স্ত্রীলোকটি, একটা অস্বাভাবিক চীৎকার করিয়াই অজ্ঞান হইয়া পড়িল। তখন বাড়ীর লোকদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম যে, পূর্ব্ব হইতেই উহার হিষ্টিরিয়া ছিল। বিষ নামান হইল সত্য, কিন্তু তাহাতে বিষের মত কিছুই দেখিতে পাইলাম না। স্বাভাবিক রক্তের মতই ঐ দষ্ট স্থান হইতে কিয়ৎপরিমাণে রক্তপাত হইল মাত্র।

যাহা হউক, তখন সর্পদংশন চিকিৎসা পরিত্যাগ করিয়া, হিষ্টিরিয়ার চিকিৎসাই আরম্ভ করিলাম। পরীক্ষা করিয়া বুঝিলাম যে, উহা ডাক্তারি-হিষ্টিরিয়া নহে—"ভূতাবেশ"। তখনই তাহাকে আবদ্ধ করিয়া, অনেকক্ষণ

যাতনা দিবার পর, যথাশক্তি অভদ্রভাষায় গালাগালি করিয়া খুব রাগত স্বরে দু একটি করিয়া কথা কহিতে আরম্ভ করিল।

প্রঃ। তুমি কে ?

উঃ। আমি পিশাচী।

প্রঃ। পিশাচের ত আর বংশ নাই। মানুষ ম'রেই পিশাচ হয়। বল্, তোর নাম কি ?

উঃ। রঙ্গমালা।

প্রঃ। কোন্ জাতি।

উঃ। যোগী।

প্রঃ। তোর পিতার নাম কি ?

উঃ। ব'লব না।

প্রঃ। নাম ধাম খু'লে বল্, আমি তোর পিণ্ড দিয়ে দিব। তোর মুক্তি হ'বে।

উঃ। আমার মুক্তির দরকার নাই।

প্রঃ। তুই এর (আবিষ্টার) শরীরে ঢুক্‌লি কেন ?

উঃ। এলো চুলে আমার পাশ দিয়ে গেল কেন ?

প্রঃ। তা'তে তোর কি অনিষ্ট হ'য়েছে যে, তুই একে কষ্ট দিবি ?

উঃ। আমার ইচ্ছা।

প্রঃ। মানুষের দেহে ঢু'কে তোদের লাভ কি ?

উঃ। মানুষের শরীরে ঢুক্‌লে আমরা বড়ই শান্তি পাই।

প্রঃ। আজ কি একে সত্যই সাপে কেটেছিল ?

উঃ। না।

প্রঃ। তবে এই দংশন-চিহ্ন কিসের ?

উঃ। আমিই একটা আঁচড় দিয়েছিলাম।

প্রঃ। তাতে তোর কি লাভ হ'ল ?

উঃ। এর শরীরে ঢুক্‌বার সুবিধার জন্তে আঁচড় দিয়েছি।

প্রঃ। কেমন ক'রে সুবিধা হ'ল ?

উঃ। যতক্ষণ মানুষের প্রাণে বল থাকে, ততক্ষণ আমরা কিছুতেই মানুষের শরীরে ঢুক্‌তে পারি না। তাই পায়ে একটা আঁচড় দিতেই দেখ্‌লুম, ভয়ে বড়ই অস্থির হ'য়ে প'ড়েছে, তখনই এর শরীরে ঢুকেছি।

প্রঃ। এখন চ'লে যা।

উঃ। না—আমি যাব না।

প্রঃ। না গেলে তোকে কষ্ট দিব ?

উঃ। হাজার হ'লেও যাব না।

এই কথার পর তাহাকে কিয়ৎ কাল রীতিমত যাতনা দিতেই সে বলিল, "তোদের পায়ে পড়ি, আমায় ছেড়ে দে"। ইতিমধ্যে বড়ই একটা হাস্তজনক ব্যাপার হইতেছিল। কয়েকটি দুষ্ট বালক আবিষ্টার পশ্চাতে বসিয়া বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইতেছিল। আবিষ্টা তখনও চক্ষু মুদিত অবস্থাতেই বসিয়াছিল; কিন্তু যখনই তাহারা ঐরূপ করিতেছিল, আবিষ্টাও তাহা-দিগকে যাহা মুখে আসিল, তাহাই বলিয়া গাল দিতেছিল এবং দু একটা চড়ও মারিতেছিল। কতক্ষণ এইরূপ হাসি তামাসা করিয়া, শেষে যাইবার জন্য সে বড়ই ব্যগ্রতা প্রকাশ করিতে লাগিল।

প্রঃ। আমাদের প্রশ্নের উত্তর না দিলে যে'তে দিব না।

উঃ। বল্‌ তোরা কি ব'ল্‌বি। আমি যা জানি, তার উত্তর দিব।

প্রঃ। তুই কোথায় থাকিস্‌।

উঃ। চাঁদপুর বাজারের দক্ষিণ দিকে একটা বট গাছে।

প্রঃ। তোকে ছেড়ে দিলে, এখন কোথায় যাবি ?

উঃ। যেখানে ব'ল্‌বে, সেখানেই যা'ব।

প্রঃ। ফরিদপুর যাবি।

উঃ। আচ্ছা, সেখানেই যা'ব।

প্রঃ। প্রতিজ্ঞা কর্, আর এদেশে আস্‌বি না।

উঃ। আমায় ছেড়ে দাও, আর কখনও এদেশে আস্‌'ব না।

প্রঃ। তুই কি আর কা'কে কখনও ধরেছিলি ?

উঃ। কত লোককে ধ'রেছি।

প্রঃ। সব যায়গা থে'কেইত তাড়ায়ে দিয়েছে ? তবু তোর আক্কেল হয় না ?

উঃ। কি ক'রব, লোভ ছাড়াতে পারি না।

প্রঃ। একে (আবিষ্টাকে) কি পূর্ব্বেও তুইই ধরেছিলি ?

উঃ। হাঁ, আমি আগা গোড়াই আছি।

প্রঃ। রাস্তা ঘাটে আমায় মার্‌বি না ত ?

উঃ। না, তোমায় মারব' না।

প্রঃ। তা হ'লে এখন যা।

উঃ। ছাড়্‌লেই যেতে পারি।

এইরূপে প্রায় দুই ঘণ্টা আলাপের পর তাহাকে ছাড়িয়া দিলাম। এই সময়ে অনেকেই অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে সাংসারিক এবং রোগ শোকের কথাই বেশী। সুতরাং সে সব কথা প্রকাশ করিতে পারিলাম না। যে সমুদায় প্রশ্নের উত্তর পাইয়াছিলাম, তাহার অনেক কথা সত্যও হইয়াছে, মিথ্যাও হইয়াছে। তবে সুখের বিষয় এই যে, সেই স্ত্রীলোকটি অদ্য পর্য্যন্ত আর সেইরূপ ভাবে আবিষ্টা হয় নাই।

ক্রমশঃ

শ্রীসুরেশচন্দ্র গাঙ্গুলি।

ভৌতিক মূর্ত্তি দর্শন।

চৈত্র মাস, বিলক্ষণ গ্রীষ্ম বাড়িয়াছে। সন্ধ্যার অব্যবহিত পরে, আমি আমার বাসগৃহের অনতিদূরে শৌচে বসিয়াছি। যে ক্ষেত্রে বসিয়াছি, উহা বাসার সংলগ্ন হইলেও, স্বতন্ত্র বেড়া দ্বারা পরিবেষ্টিত। ক্ষেত্রখানি নূতন কর্ষিত, একটী তৃণও নাই। কেবল ক্ষেত্রের দক্ষিণ পূর্ব্বভাগে একটী পত্রহীন বিল্ববৃক্ষ দণ্ডায়মান। পরিষ্কার জ্যোৎস্না খেলিতেছে, সর্ব্ব ভাগেই আমার দৃষ্টি অপ্রতিহত। আমি একটী আম্র বৃক্ষের ছায়ায় বসিয়াছি। বৃক্ষটী, আমার বাসা ও ঐ ক্ষেত্রের মধ্যস্থ বেড়া-সংলগ্ন।

ঐ সময় গৃহমধ্যে আমার বালক বালিকা, স্ত্রী ও অন্য একটী বালক বসিয়া দশপঁচিশ খেলিতেছিল, পার্শ্বে বৃদ্ধা ভগিনী তাহা দেখিতেছিলেন।

আমি আম্র বৃক্ষের ছায়ায় বসিবার এক মিনিট পরে, নিকটস্থ বাজারের রামলাল বণিক আমার ৪।৫ হাত দূর দিয়া বরাবর দক্ষিণ দিকে গেল ও পূর্ব্বোক্ত বেল গাছের ৭।৮ হাত দূরে শৌচে বসিল। ছায়ায় বসিলেও, সে যাইবার সময় আমাকে দেখিয়াছিল বলিয়া, আমার বিশ্বাস। রামলাল সম্পূর্ণ চন্দ্র-রশ্মি তলেই বসিয়াছিল। সুতরাং তাহার প্রত্যেক অঙ্গ-সঞ্চালন পর্য্যন্ত আমার চক্ষুর উপর।

রামলালের নিকট হইতে প্রায় বিংশতি হস্ত দূরে দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে সীমাসংলগ্ন একটী ঘনপত্র-সমন্বিত শাঁড়া গাছ গাঢ় তিমির কোলে করিয়া দণ্ডায়মান। হঠাৎ সেই দিক্ হইতে একটী দীর্ঘ স্ত্রীমূর্ত্তি, আপাদ-মস্তক শুভ্র-বসনাবৃত হইয়া রামলালের দিকে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছে, দেখিলাম।

ভৌতিক দশার অস্তিত্বে আস্থা থাকিলেও, ভৌতিক দেহ ধারণসম্বন্ধে,

এতাবৎ আমার বিশ্বাস ছিল না। সুতরাং উক্ত রমণী-মূর্ত্তি দেখিয়া উহা তাদৃশ কিছু বলিয়া মনে উদয়ই হয় নাই। মনে বিষম সংশয় জন্মিল। মনে হইল, রামলাল বুঝি আমাকে দেখে নাই। স্ত্রীলোকটী কোন গণিকা, পশ্চাতের দিকের পথ দিয়া রামলালের ইঙ্গিতমতেই আসিয়াছে।

এস্থলে রামলালের একটু পরিচয় দেই। তাহার বয়স ৪৫।৪৬ বৎসর, সবল, সুরূপ, বিপত্নীক। তাহার কনিষ্ঠভ্রাতাকে বেশ্যাসক্ত বলিয়া সর্ব্বদা তিরস্কার করে ও নিজে খুব "সাচ্চা" বলিয়া গর্ব্ব করে। তাহার মনিহারীর দোকান আছে।

ধীরে ধীরে স্ত্রীমূর্ত্তি রামলালের দিকে যতই অগ্রসর হইতে লাগিল, আমার কুতূহল ততই বাড়িতে লাগিল। রামলালের এতাদৃশ গুপ্তস্বভাব স্বচক্ষে দেখিয়া আমেরিকা আবিষ্কারের আনন্দ উপভোগ করিলাম। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! রামলাল অণুমাত্রও আকিঞ্চন প্রকাশ করিতেছে না কেন? নিঃসন্দেহ, পূর্ব্ব ইঙ্গিতমতে রমণী তথায় আসিয়াছে। কিন্তু আমি উপস্থিত, তাহা রামলাল জানে, রমণী জানিতে পায় নাই। তাই রামলাল কোনরূপ ইঙ্গিতাদি করিতে অবকাশও পাইতেছে না! মনে মনে এইরূপ তর্কবিতর্ক করিতেছি, এমত সময় দেখিলাম—রমণীমূর্ত্তি বিল্ববৃক্ষের নিকট পৌঁছিল। রামলাল তাহার ৬।৭ হস্ত মাত্র দূরে আছে, অথচ ভ্রমেও সে দিকে চক্ষু ফিরাইতেছে না! আমার দিব্যচক্ষুঃ নির্নিমেষে রমণীমূর্ত্তির প্রতি স্থাপিত। তথাচ এই সতর্ক দৃষ্টি অতিক্রম করিয়া চক্ষুঃ পালটিতে রমণী কোথায় লুকাইল? পরিষ্কৃত প্রাঙ্গণের ন্যায় জ্যোৎস্না ক্ষেত্র! রামলালও ত কিছুমাত্র ব্যাকুলতা দেখাইল না!

মুহূর্ত্ত পরে রামলাল জলশৌচ করিয়া নিকট দিয়াই চলিয়া গেল। আমার মাথা ঘুরিয়া গিয়াছে। প্রাণের ভিতর বিষম তুফান বহিতে লাগিল। আমি ইতিপূর্ব্বে চক্ষুর উপর ভূত ছাড়াইতে দেখিয়াছি।

ভূতে যে ঠিক মনুষ্যরূপ ধারণ করে, এরূপ বিস্তর গল্প শুনিয়াছি! কিন্তু কখনও দেখি নাই। সেরূপ ধারণাও ছিল না।

যাহা হউক, সন্দেহ-দোদুল্যমান হৃদয় লইয়া বেড়া পার হইয়া ঘরে প্রবেশ করিলাম। তখনও সকলে বসিয়া পূর্ব্ববৎ দশ-পঁচিশ খেলিতেছে—কেহই নড়ে নাই। আমার স্ত্রী বড়ই ভীরুপ্রকৃতির লোক, বিশেষতঃ ছোট ছোট সন্তানগণ। কোন কথা প্রকাশ না করিয়া জানিলাম,—কেহই খেলা ছাড়িয়া উঠে নাই। ইহাও অধিকন্তু, কারণ তাদৃশ মূর্ত্তি কাহারই ছিল না। বিশেষতঃ বাটীর বাহিরে কখনই কেহ ঐ ক্ষেত্রে যায় না। পরদিন রামলালকে জিজ্ঞাসা করায় জানা গেল, সে কিছুই দেখে নাই। সুতরাং প্রেতমূর্ত্তি বলিয়াই বিশ্বাস করিতে বাধ্য হইলাম।

ইহার কয়েক মাস পূর্ব্বে ঐ ক্ষেত্রের পার্শ্বস্থ রাস্তায় বাজারের তুষ্ট পেশাকর আর ২।৩ জন গণিকাসহ শৌচ হইতে প্রত্যাবর্ত্তনকালে সহসা অজ্ঞান হইয়া ভূপতিতা হয় ও মুহূর্ত্তমধ্যেই মরিয়া যায়। আমি স্বচক্ষে তাহাও দেখিয়াছি। ঠিক সন্ধ্যাকালে এই ঘটনা ঘটে। অনেকে সন্ধ্যার পর ঐরূপ রমণী-মূর্ত্তি ঐরূপ বিচরণ করিতে দেখিয়াছে। মূর্ত্তির সহিত প্রোক্ত তুষ্ট পেশাকরের সাদৃশ্যই বটে। বাসার নিকট বলিয়া এতদিন মনে উহা স্থান দেই নাই।

সাধারণের বিশ্বাস—শাঁড়া গাছই ভূতের প্রিয় আবাস। আমার বাসার একখানা ঘরে নায়েব মহাশয় তাঁহার পীড়িতা স্ত্রীকে চিকিৎসার জন্য আনেন। তিনি আসিয়াই বাসার নিকটস্থ ঐ গাছটী কাটিয়া ফেলাইলেন। পরে আর কোনদিন কোন অপচ্ছায়া দেখি নাই।

শ্রীবিধুভূষণ ঘোষ, হেডমাষ্টার,
বসুন্দিয়া স্কুল।

—

'জাতিস্মর'।

যে ব্যক্তি বাল্যকালাবধি পূর্ব্বজন্মের কথা বলিতে পারে এবং উভয় জন্মের স্মৃতি সমান ভাবে মস্তিষ্কে ধারণ করিতে সক্ষম হয়, আমরা তাহাকে 'জাতিস্মর' বলি। আমাদের চোখে সচরাচর এ ঘটনা পড়ে না, তাহা ঠিক; কিন্তু ভগবানের রাজ্যে এরূপ অলৌকিক ঘটনা অপ্রতুল নহে—ইহা দেখাইবার জন্যই বর্ত্তমান প্রবন্ধের অবতারণা।

(১)

মিঃ টাকার (W. H. Tucker) ব্রহ্মদেশের অন্তর্গত পেগু জেলার পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ছিলেন। ১৮৯৪ সালে ২০শে আগষ্ট তারিখে ইনি পেগুখালের তীরবর্ত্তী ওয়াগ্রামে কতকগুলি ডাকাইত কর্ত্তৃক নিহত হন। তাঁহার খণ্ডবিখণ্ডিত দেহ পেগুনগরের ইংরাজদিগের গোরস্থানে সমাহিত হয়; সে সময় এই লোমহর্ষণ ঘটনার জন্য দেশে মহাহুলস্থুল পড়িয়া যায়। পার্থিব সকল বিষয়ের ন্যায় কালে লোকে ইহাও ভুলিয়া যায়। কিন্তু এক্ষণে একটী রহস্যজনক ঘটনাবশতঃ উহা আবার লোকের আলোচনার মধ্যে আসিয়াছে। টাকার সাহেবের পুনর্জন্ম ইহার কারণ।

পেগু জেলার অন্তর্গত কোন গ্রামে মৃত টাকার সাহেব "জাতিস্মর" হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, বালকের বয়স এখন ১৩।১৪ বৎসর। তাহার বর্ণ, কেশ ও চক্ষুর্দ্বয় ঠিক ইংরাজের মত। সর্ব্বোপরি বিশিষ্ট প্রমাণ তাহার শারীরিক চিহ্নগুলি এবং দক্ষিণ হস্তে কনিষ্ঠাঙ্গুলির অভাব। হত্যাকালে টাকার সাহেব দেহের যে যে স্থানে যেরূপ আঘাত পাইয়াছিলেন, সেই সেই স্থানে তদ্রূপ চিহ্নসমূহ বর্ত্তমান। তাঁহার দক্ষিণ হস্তের কনিষ্ঠাঙ্গুলি দা দ্বারা কাটিয়া ফেলা হয়। এই বালক তিন চারি বৎসর বয়সের সময় নানাবিধ আইনঘটিত জটিল প্রশ্নের সমীচীন উত্তর

প্রদানে শ্রোতৃবর্গকে স্তম্ভিত করিত। টাকার সাহেব জীবদ্দশায় যে সকল ঘটনার সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে সম্বদ্ধ ছিলেন, উক্ত বালক তৎসমস্ত সঠিক বর্ণনা করিয়া আত্মীয়স্বজনের চিত্তাকর্ষণ করিয়াছিল।

গ্রামস্থ ব্যক্তিগণ এবং বালকের পিতামাতা এই গভীর রহস্যের চূড়ান্ত মীমাংসার উদ্দেশ্যে উহাকে লইয়া পেগুনগরে উপস্থিত হইলে চারি বৎসরের শিশু ঠিক্‌ঠাক্ বলিতে লাগিল। অমুক বাঙ্গলাতে আমি অবস্থিতি করিতেছিলাম,—সেখানে অমুক সাহেবের সহিত আমার প্রথম সাক্ষাৎ হয়, অমুক স্থানে, অমুক সময় বন্ধুগণ সহ একদিন আমরা বনভোজন (picnic) করিয়াছিলাম। ইহার পর শিশু প্রশ্ন করিতে আরম্ভ করিল—অমুক সাহেব এখনও পেগুতে আছেন কিনা—ব্লাঙ্ক সাহেবের পদোন্নতি হইয়াছে কিনা ইত্যাদি। ডাকাইতগণ যথায় টাকার সাহেবকে হত্যা করিয়াছিল, শিশুকে তথায় লইয়া গেলে কম্পান্বিত কলেবরে আদ্যোপান্ত সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করিয়া উপস্থিত ব্যক্তিগণকে চমকিত করিল। অবশেষে গোরস্থানে উপস্থিত হইলে টাকার সাহেবের গোরস্থান দেখাইয়া বলিল—"এই স্থানে আমার দেহ সমাহিত হয়।"

এই ত গেল বিদেশের কথা।

(২)

এখন আমাদের দেশীয় কথা বলিয়া এ প্রবন্ধের উপসংহার করিব। স্বর্গীয় বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী আমাদের দেশের একজন প্রসিদ্ধ লোক ছিলেন। তাঁহার সম্বন্ধে কলিকাতার বিখ্যাত ডাক্তার শ্রীযুক্ত বিপিন-বিহারী মৈত্র এম, বি, মহাশয় নিম্নলিখিত বিবরণ লিখিয়াছেন—

গয়া হইতে ৩ ক্রোশ ব্যবধানে একটী জঙ্গলময় স্থান আছে। সন্ন্যাসীরা তথায় অনেক সময় আসিয়া থাকেন। নিকটে লোকের বসবাসও আছে। একদিন গোস্বামী মহাশয় একটী লোক সঙ্গে করিয়া ঐ স্থানে যান। তথায়

পৌঁছিয়া তাঁহার মনে হইতে লাগিল,—আমি বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী নহি— 'অন্য কোন ব্যক্তি।' তিনি বলিলেন,—'বিশেষ চেষ্টা করিয়াও আমি মনের বিচিত্রভাব দমন করিতে পারিতেছি না।' সেই স্থানে পৌঁছিবার পর ঐভাব মনে আরও প্রবল হইল। নিকটে বৃক্ষতলে একজন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বসিয়াছিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখানে যে দুইটী সন্ন্যাসী ছিলেন, তাঁহারা কোথায় গেলেন।" ব্রাহ্মণ বলিলেন "কিনকীবার পুছতে হাঁয় ?" "য়ে লোগতো বহুত পহিলে মর গয়ে।" গোস্বামী আবার বলিলেন, "এই স্থানে হনুমানজীর মন্দির আছে ?" ব্রাহ্মণ বলিলেন, "আগে হাত মিলেগা।" গোস্বামী হনুমানজীর মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করিবামাত্র তাঁহার পূর্ব্বজন্মের স্মৃতি মনে জাগিয়া উঠিল। তিনি এবং আর দুই ব্যক্তি সন্ন্যাসী হইয়া এই মন্দিরে বাস করিতেন। যে ঘরে বাস, যে ঘরে শয়ন, যে ঘরে পাঠ করিতেন, সব মনে উদয় হইল। তত্রস্থ সমুদয় গৃহগুলি পর্য্যটন করিয়া দেখিলেন। তৎপরে মনে পড়িল, নিকটস্থ একটী পুষ্করিণীতে তাঁহারা তিনজনে স্নান করিতেন। তিনি সেই পুষ্করিণীও দেখিলেন। আবার মনে পড়িল—একটী বৃক্ষের গায় তিনি কিছু লিখিয়াছিলেন, অনুসন্ধান করিতে করিতে সেই বৃক্ষটিও পাইলেন। বৃক্ষটি একটী প্রকাণ্ড বটবৃক্ষ; যখন ছোট ছিল, তখন তাহার ছাল কাটিয়া "ওঁ রামঃ" এই কয়টি কথা লিখিয়াছিলেন। অক্ষরগুলি এখন বাঁকা-চোরা হইয়া গিয়াছে। তথাপি বেশ বুঝিতে পারিলেন। তিনি ফিরিয়া আসিয়া গুরুকে আদ্যোপান্ত সকল বৃত্তান্ত বলিলেন।

(৩)

সম্প্রতি সংবাদপত্রে আমাদের দেশের আর একটী জাতিস্মরের কাহিনী প্রকাশিত হইয়াছে——

২৪ পরগণা জেলার ভাঙ্গোড় থানার অধীন ক্রোড়বেড়ে নামে একটী গ্রাম আছে। ঐ গ্রামে পোদ জাতীয় রামসদয় রাজবংশীর বাস। ১২।১৩ বৎসর পূর্ব্বে এই রামসদয়ের স্ত্রীর মৃত্যু হয়। মৃত্যুর কয়েক মাস পরেই নিকটস্থ অন্য এক পোদগৃহস্থের ঘরে একটী বালিকা জন্মগ্রহণ করে। বালিকাটি কথা বলিতে আরম্ভ করিয়াই বলিতে থাকে ;—'পূর্ব্ব জন্মেও আমি পোদ ছিলাম। এই ক্রোড়বেড়ের রামসদয় রাজবংশী আমার পূর্ব্ব জন্মের স্বামী। আমাকে উহার সঙ্গে বিবাহ দিতে হইবে।' বালিকার এই অদ্ভুত কথা রাষ্ট্রময় হইলে দেশবিদেশের অনেক লোক তাহাকে দেখিতে আসিতে লাগিল। রামসদয়ও আসিল। রামসদয়কে দেখিয়াই বালিকা বলিয়া উঠিল 'ঐ আমার স্বামী আসিতেছেন। উহার সঙ্গে আমার বিবাহ দিতে হইবে।' এই বলিয়া নিজ পূর্ব্বজন্মের অনেক বিবরণ, অনেক গৃহস্থালীর কথা এবং অনেক গোপনীয় সংবাদ (যাহা রামসদয় ও তাহার পূর্ব্বজন্মের স্ত্রী ব্যতীত আর কেহ জানিত না) হুবহু বলিতে আরম্ভ করিল। বালিকার কথা শুনিয়া উপস্থিত সকলে বিস্ময়-স্তম্ভিত হইয়া গেল। স্বয়ং রামসদয়ও যেন কেমন অন্যমনস্ক হইয়া পড়িল। তাহার আর কোন সন্দেহই রহিল না।

মাস দুই পূর্ব্বে রামসদয়ের পুত্র শিয়ালদহে রেজেষ্টারী আফিসে একখানি দলিল রেজেষ্ট্রী করিতে আসিয়াছিল। তাহাকে জিজ্ঞাসা করায়, সে বলিল 'জাতিস্মরা বালিকাকে দেখিতে অবিকল আমার মৃতা গর্ভধারিণীর ন্যায়—কেবল একটু বেশী ময়লা। আমার পিতা বালিকার নির্ব্বন্ধাতিশয্যে তাহাকে বিবাহ করিতে সম্মত হইয়াছেন, কিন্তু বালিকার জননী জেদ ধরিয়াছে যে, তাহাদের জাতির মধ্যে কন্যা পণ প্রচলিত আছে, এই কন্যাকে সে ১০।১২ বৎসর প্রতিপালন করিয়াছে। তাহার বিবাহ দিয়া সে ১০০৲ শত টাকা পণ পাইত। সে টাকা কিছুতেই

ছাড়িবে না। তবে দশজনের অনুরোধে ৪০৲ টাকা কম লইবে। ৬০৲ টাকা তাহাকে দিতেই হইবে। না দিলে সে কন্যার বিবাহ দিবে না। আমার পিতা এই জাতিস্মরা বালিকাকে তাঁহার পত্নীরূপে গ্রহণ করিলে ৫/ বিঘা জমী তাহার ভরণ পোষণের জন্য লেখাপড়া করিয়া দিতে প্রস্তুত। নগদ টাকার সঙ্গতি সমাবেশ না থাকায় দিতে অক্ষম।'

সংবাদ পত্রে এই বিবরণ দেখিয়া কৌতূহলী হইয়া রামগোপালপুরের রাজা শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী বাহাদুর পণের সমগ্র ৬০৲ টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। এখন রামসদয়ের সহিত এই বালিকার বিবাহ হইয়া গেলে জগতের ইতিহাস-পৃষ্ঠায় এক অলৌকিক রহস্যকাহিনী রহিয়া যাইবে, সন্দেহ নাই।

এই সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া, বিশ্বপাতা ভগবানের বিশেষত্ব ভাবিয়া বিস্ময়ে অবাক্ হইতে হয়। ক্ষুদ্র মানব আমরা, ভগবানের মহিমা কি বুঝিব!

শ্রীঅশ্বিনীকুমার সেন।

অপূর্ণ বাসনা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

ধোপানীর অশান্তি।

এক ক্যাথেলিক পুরোহিত লিখিয়াছেন:—"১৮৩৮, জুলাই মাসে আমি এডিনবরা নগর হইতে পার্থ সহরে গমন করি। কয়েকদিন পরে আনি সিম্‌সন নামে এক রমণী আমার নিকট আসিয়া বলিল "মহাশয়,

গত ৭।৮ দিন ধরিয়া আমি বড়ই উত্ত্যক্ত হইতেছি। মালয় নামে এক ধোপানী আমার পরিচিত ছিল। সে সম্প্রতি মারা গিয়াছে। আজ ৮।১০ দিন প্রতিরাত্রিতে সে আমাকে বিরক্ত করিতেছে। সে বলে, সে কাহার নিকট ৩শিলিং ১০ পেনি ঋণী আছে। এই ঋণ পরিশোধ না হইলে সে শান্তি পাইতেছে না। কোন পুরোহিতকে বলিয়া ইহার ব্যবস্থা করিবার জন্য সে আমাকে প্রত্যহ পীড়াপীড়ি করে। ইহার একটা উপায় না করিলে, আমার নিদ্রা যাওয়া ভার।" আমি অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলাম। জানা গেল যে, উক্ত নামে একটা স্ত্রীলোক প্রকৃতই মরিয়াছে। ক্রমশঃ অন্বেষণ করিতে করিতে প্রকাশ পাইল যে, একটা মুদীর সহিত তাহার লেনা দেনা ছিল। ঐ মুদীর নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম "মালয় নামে কোন স্ত্রীলোকের নিকট তোমার কিছু পাওনা আছে?" সে তাহার খাতা পত্র কিছুক্ষণ উল্টাইয়া বলিল "হাঁ, মহাশয়! ৩শিলিং ১০ পেনি।" আমি তৎক্ষণাৎ উহা চুকাইয়া দিলাম। ২।১ দিন পরে সিম্‌সন্ আসিয়া বলিল "মহাশয়, বাঁচিয়াছি। মালয় আর বিরক্ত করে না।"

প্রতিজ্ঞা-পালন।

কতকগুলি ব্যক্তি জীবিত অবস্থায় অঙ্গীকারবদ্ধ হইয়াছিলেন যে, তাঁহাদের মধ্যে অগ্রে যাঁহার মৃত্যু হইবে, তিনি পরলোক হইতে আসিয়া জীবিত বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া যাইবেন। এইরূপ অনেক প্রতিজ্ঞা যথাযথ পালিত হইয়াছে। নিম্নে আমরা কয়েকটি মাত্র সংক্ষেপে বর্ণন করিব।

লর্ড ব্রুহাম জনৈক বন্ধুর নিকট এক প্রতিজ্ঞাপত্রে আবদ্ধ হন। ঐ অঙ্গীকার পত্রটি তাঁহাদের রক্তের দ্বারা লিখিত হইয়াছিল। দু'জনেই

প্রতিজ্ঞা করেন যে, যিনি অগ্রে মরিবেন, তিনি ফিরিয়া আসিয়া পরলোক-অস্তিত্ব বিষয়ে বন্ধুর সন্দেহ মোচন করিবেন। লেখাপড়া হইবার পর অনেক বৎসর কাটিয়া গেল, ক্রুহাম সুইডেনে গেলেন, বন্ধুটি ভারতবর্ষে আসিলেন। তাঁহাদের দেখা সাক্ষাৎও বহু বৎসর হয় নাই। ১৯শে ডিসেম্বর, (১৭৯৯) রাত্রি দুইটার সময় ক্রুহাম গরম জলে গা ধুইতে ছিলেন, এমন সময় তাঁহার বন্ধু সম্মুখে উপস্থিত! পরে জানা গেল, ঐ দিবসেই উক্ত বন্ধু সহস্র সহস্র মাইল দূরে ভারতবর্ষেই মারা পড়িয়াছেন।

আমেরিকাবাসী জিম্ নামক এক ব্যক্তি মিস্ বার্ডের নিকট প্রতিজ্ঞা করে যে, মৃত্যুর পর সে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবে। ইহার পর মিস্ বার্ড সুইজারলাণ্ডে চলিয়া যান এবং জিম্ আমেরিকাতেই থাকে। কিছুকাল পরে একদিন হঠাৎ জিম্ সুইজারলাণ্ডে গিয়া বার্ডকে বলিল; "এই আমি আসিয়াছি। আমার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হইল।" এবং তৎক্ষণাৎ অদৃশ্য হইয়া গেল। সংবাদ পাওয়া গেল, কয়েক ঘণ্টা পূর্ব্বেই জিম্ মারা গিয়াছিল।

মৃত সেনাপতি।

স্কটলাণ্ড দেশীয় কাপ্তেন রাসেল কোল্ট ১৮৮২ খৃঃ অব্দে লিখিয়াছেন :——

আমার জীবনের এক অলৌকিক ঘটনা বিবৃত করিতেছি। ইহা অনেক কাল পূর্ব্বে ঘটিয়াছিল। তখন আমার পাঠ্যাবস্থা। ছুটীতে তখন আমি পিতা মাতার সহিত নিজগৃহেই বাস করিতেছিলাম। আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সৈন্যবিভাগে কর্ম্ম করিতেন এবং অল্পকাল মধ্যে লেফ্টেনান্ট পদে উন্নীত হইয়াছিলেন। কয়েক মাস পূর্ব্বে তিনি সিবাস্টোপল নগরে

যুদ্ধ করিতে গিয়াছিলেন। আমাদের দুজনের মধ্যে বড়ই ভালবাসা ছিল, সুতরাং প্রায়ই চিঠিপত্র লেখালিখি হইত। তাঁহার একখানি পত্রে নৈরাশ্য ও নিরুৎসাহের ভাব দেখিয়া, আমি লিখিলাম "সর্ব্বদা প্রফুল্ল থাকিবে। আর যদি তোমার মৃত্যুই ঘটে, তুমি তৎক্ষণাৎ আমার এই ঘরে আসিয়া আমাকে দেখা দিবে।"

এই চিঠিখানি পাইবার পরদিনই তাঁহাকে একটি ঘোরতর যুদ্ধে রত হইতে হইল। ঐ যুদ্ধে প্রধান সেনাপতি নিহত হইলে, তাঁহাকেই সেনাপতিত্ব করিতে হইল। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত হইল। ভ্রূক্ষেপ নাই, তিনি সৈন্যদিগকে চালনা করিতে লাগিলেন। অবশেষে একটি গুলি কপালের দক্ষিণদেশে আঘাত করিয়া মস্তক ভেদ করিল। তিনি হত হইলেন এবং অসংখ্য শব-স্তূপে প্রোথিত হইয়া রহিলেন। ছত্রিশ ঘণ্টা পরে তাঁহার মৃতদেহের উদ্ধার হইয়াছিল। এই ঘটনাটি ৮ই সেপ্টেম্বর (১৮৫৫ খৃঃ অব্দে) বৈকালে বটে।

সে যাহা হউক, উক্ত রাত্রিতে আমার ভাল ঘুম হইল না। এক ঘরে আমি একাকী শয়ন করিতাম। খানিক নিদ্রার পর হঠাৎ জাগরিত হইয়া দেখি, শয্যাপার্শ্বে যেন একটা আলোক-স্তম্ভ রহিয়াছে এবং তন্মধ্যে ভ্রাতা জানু পাতিয়া উপবিষ্ট! প্রথমে মনে হইল, আমি স্বপ্ন দেখিতেছি, অথবা ইহা একটা কল্পনা। কিন্তু যতই দেখিতে লাগিলাম, ততই মূর্ত্তিটি স্পষ্ট হইতে লাগিল। তাঁহার দৃষ্টি বড়ই বিষাদযুক্ত, কিন্তু স্নেহব্যঞ্জক ও অনুনয়-সূচক বলিয়া বোধ হইল। আমি কথা কহিতে চেষ্টা করিলাম; কিন্তু কি বলিব, ভাবিয়া পাইলাম না। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহাকে সাক্ষাৎ করিতে লিখিয়াছিলাম, সে কথা একবারেই ভুলিয়া গিয়াছিলাম। আবার মনে হইল, হয়ত জানালা দিয়া চাঁদের আলো কোন কাপড়ের উপর পড়িয়া এই ভ্রম উৎপাদন করিতেছে। এই ভাবিয়া জানালা খুলিলাম।

কিন্তু কোথায় চাঁদ? গভীর অন্ধকার এবং মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতেছে! পুনরায় তাঁহার দিকে চাহিলাম। তিনি ঠিক সেই ভাবেই বসিয়া আছেন।

তখন বাহিরে আসিবার ইচ্ছা করিলাম। কিন্তু তিনি এরূপ স্থানে বসিয়াছিলেন যে, দরজার নিকট আসিতে গেলে তাঁহার গায়ের উপর দিয়া আসিতে হয়। অগত্যা আমি চক্ষু মুদিত করিয়া তাঁহার ভিতর দিয়া চলিয়া আসিলাম এবং দ্বারের নিকটে আসিয়া পশ্চাতে চাহিলাম। দেখিলাম, মূর্ত্তিটি তখনও সেইভাবে বসিয়া আমার দিকে আস্তে আস্তে মুখ ফিরাইল। এখন আমার প্রথম নজর হইল যে, তাঁহার দক্ষিণ কপালে একটা ভীষণ-আঘাত-চিহ্ন রহিয়াছে এবং উহা হইতে রক্তধারা বহিতেছে! আমি তাড়াতাড়ি ঐ ঘর ছাড়িয়া আর এক ঘরে আসিলাম এবং অবশিষ্ট রাত্রি সেই খানেই অতিবাহিত করিলাম।

পর দিবস প্রাতে এই বৃত্তান্ত পিতার নিকট ব্যক্ত করাতে তিনি ধমকাইয়া বলিলেন "দূর, নির্ব্বোধ! একটা স্বপ্ন দেখিয়া বৃথা গণ্ডগোল করিও না। তোমার মাতা শুনিলে অধীর হইবেন, তাঁ'র কানে যেন না যায়।" সুতরাং আমি চুপ করিয়া রহিলাম। পনর দিবস পরে সংবাদ আসিল, ৮ই সেপ্টেম্বর বৈকালে ভ্রাতা যুদ্ধে নিহত হইয়াছেন। ইহার বিবরণ পূর্ব্বেই দিয়াছি।

ক্রমশঃ

শ্রীমাখনলাল রায়চৌধুরী।

প্রেতাত্মার পতিভক্তি।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

কলিকাতার বাসা উঠাইয়া এখন আমি বাটী হইতেই প্রত্যহ আফিস্ যাতায়াত করি। গ্রামের যতগুলি লোক কলিকাতায় চাকরী করেন, সকলেই এখন ডেলি প্যাসেঞ্জার; প্রায় ১৫।১৬ জন প্রত্যহ একত্র যাতায়াত করি। উপরোক্ত ঘটনার পর দিন প্রাতঃকালে আহারাদি করিয়া সকলে মিলিয়া আফিসে গেলাম। যাইবার সময়ে সকলেই ট্রেন ধরিবার জন্ম ব্যস্ত, সুতরাং কথাবার্ত্তার বড় অবসর হয় নাই। বৈকালে যথাসময়ে আফিস হইতে আসিয়া ট্রেনে বসিয়া আছি; একে একে আরও ৫।৭টি প্রতিবাসী বন্ধু জুটিল, ট্রেনও ছাড়িয়া দিল। গাড়ি ছাড়িবার প্রায় ১০।১২ মিনিট পরে সুরেন্দ্র (আমাদের একটি প্রতিবাসী) জিজ্ঞাসা করিল "প্রিয় দাদা! কেনারাম কাকার বাটীতে নাকি বড় ভূতের উপদ্রব হইয়াছে?"

আমি। ভূতের উপদ্রব? কে বলিল? আমি ত কিছু শুনি নাই।

সুরেন। ন্যাকা, কিছু শুনেন নাই? কাল সন্ধ্যার সময় রামলাল দাদা আর তুমি কেনারাম কাকাকে কত উপদেশ দিতেছিলে, রামায়ণ মহাভারত পড়্তে বল্ছিলে,—গয়ায় পিণ্ড দিবার পরামর্শ হচ্ছিল, আর কিছু জান না!

আমি। তা বলেছিলাম বটে, কিন্তু সে ভয়ের জন্য নয়। স্ত্রী-বিয়োগের পর থেকে কেনারাম কাকার মন অত্যন্ত অস্থির হইয়াছে।

দিন রাত্রি বসিয়া ভাবেন, রাত্রে স্বপ্ন দেখেন—যেন খুড়ি মা আসিয়া তাঁহার সহিত কথা কহিতেছেন, নানা বিষয়ের উপদেশ দিতেছেন। সেই জন্যই বলা হইয়াছিল যে, রামায়ণ মহাভারত পড়িলে মন স্থির হইতে পারে।

সুরেন। তবে শুনিলাম যে, তাঁ'র বাটীতে দিন রাত্রি ইট পড়ে, সেজ খুড়ি এসে দিনের বেলা কাকার সঙ্গে নাকি-সুরে কথা কয়। দুই তিন দিন রাত্রে আহার করিবার সময় বৃহৎ এক স্ত্রীমূর্ত্তি কাকার পশ্চাতে দাঁড়াইয়া বাতাস করিতেছিল, কাকা পশ্চাতে দেখিয়াই অজ্ঞান হইয়া পড়েন। এই জন্য তোমাদিগকে ডাকিয়া পরামর্শ করিতেছিলেন যে, কি করিলে অত্যাচার নিবৃত্ত হয়।

আমি আর হাস্য সম্বরণ করিতে পারিলাম না। হো হো করিয়া হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম "এসকল গুলিখুরি কথা তুমি কোথায় শুন্‌লে?"

সুরেন। কাল সন্ধ্যার সময় রামদাসের দোকানে একটা হিসাবের গোল মিটাতে গিয়া দেখি ঐ কথা লইয়া মহা আন্দোলন হচ্চে। ৭।৮ জন শ্রোতা আর স্বয়ং রামদাস বক্তা। মধ্যে চক্রবর্ত্তীদের পার্ব্বতী বলিল "একথা বিশ্বাস-যোগ্য নয়, স্বচক্ষে না দেখিলে বিশ্বাস হয় না।" রামদাস মহা বিরক্ত হইয়া উত্তর করিল "বিশ্বাস করা না করা আপনাদের ইচ্ছা! আপনারা ইংরাজি-নবিশ, আপনারা সহজে কোন কথা বিশ্বাস করেন না জানি। আমরা মূর্খ মানুষ; এরূপ আশ্চর্য্য কাণ্ড স্বচক্ষে দেখে কেমন ক'রে বিশ্বাস না করি। রামলাল বাবুদের সমস্ত কথা স্বকর্ণে শুনে আমার বড় ভয় হচ্ছে, টাকার জন্য আর অপেক্ষা না করিয়া তাড়াতাড়ি চ'লে আস্‌ছি, সদরের উঠানে পৌঁছিবামাত্র হুড় হুড় ক'রে প্রায় এক কলসী জল আমার সাম্‌নে

প'ড়্‌ল। কোথা হ'তে পড়্‌ল. চারিদিকে চেয়ে দেখ্‌ছি, এমন সময় হি হি করিয়া বিকট হাসি। সেখান হ'তে ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড় দিলাম। এতেও যদি আপনারা বিশ্বাস না করেন, তা'হ'লে নাচার।"

আমি ত শুনিয়া অবাক্। লোকে যে অনর্থক এতদূর মিথ্যা বলিতে পারে, ইহা আমার বিশ্বাস ছিল না। এ সকল কথায় প্রতিবাদ করা অনাবশ্যক বিবেচনায় আমি চুপ করিয়া রহিলাম। ক্রমে গাড়ি ষ্টেসনে পৌঁছিল এবং আমরা নামিয়া স্ব স্ব গৃহে গমন করিলাম।

সন্ধ্যার পর রামলাল দাদাকে সঙ্গে লইয়া কেনারাম কাকার বাটীতে গেলাম। পথে সুরেনের কাছে যাহা শুনিয়াছিলাম, সমস্তই রামলাল দাদাকে বলিলাম। তিনি শুনিয়া বলিলেন, এরূপ হইবে, পূর্ব্বেই বোঝা গিয়াছিল।

কেনারাম কাকার বাটীতে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, বড় গোল। কাকা অর্দ্ধনগ্নাবস্থায় কম্পিত কলেবরে রকে দাঁড়াইয়া আছেন। বৃদ্ধা পরিচারিকা ও পাচিকা "কি হয়েছে, কি হয়েছে" বলিতে বলিতে রন্ধনশালা হইতে দৌড়িয়া আসিতেছে। আমরা তাড়াতাড়ি কাকাকে একখানি মাদুরে বসাইয়া বাতাস করিতে লাগিলাম এবং কিছুক্ষণ পরে মুখে হাতে জল দিয়া তাঁহাকে একটু সুস্থ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম "কি হ'য়েছে?" তিনি আস্তে আস্তে উত্তর করিলেন "বড় অত্যাচার করিতে লাগিল, বাড়ীতে আর থাকিতে পারিতেছি না।"

আমি। কেন, বাটীতে থাকিতে পারিবেন না কেন? আপনি এত অস্থির হইলে আমরা কেমন করিয়া স্থির থাকিব? কি হ'য়েছে বলুন, স্থির হইয়া তাহার প্রতিকার করুন। অস্থির হইলে কি হইবে?

কে, কা। একটু আগে সন্ধ্যা আহ্নিক করিতে বসিয়াছিলাম।

সায়ং সন্ধ্যা প্রায় শেষ হ'য়েছে, এমন সময়ে মস্ত এক গোহাড় সাম্‌নে এসে প'ড়্‌ল। কোথা হ'তে এল, কিছু বুঝিতে পারিলাম না। প্রায় সংজ্ঞাহীন অবস্থায় চীৎকার করিতে করিতে বাহিরে আসিলাম। এমন সময়ে তোমরা এসে উপস্থিত হ'লে।

সমস্ত শুনিয়া রামলাল দাদা ও আমি উভয়েই বিস্মিত হইলাম। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "হাড়খানি যেখানে পড়িয়াছিল, এখন সেইখানে আছে?"

কে, কা। হ্যা, সেইখানেই আছে। সন্ধ্যার সময় এখন কে গোহাড় ছুঁইবে?

আমি রামলাল দাদাকে বলিলাম "চল, আমরা একবার ভাল করিয়া দেখিয়া আসি।"

কে, কা। আর দেখ্‌বে কি, সমস্তই ভৌতিক ব্যাপার, তা'র আর কোন সন্দেহ নাই।

আমি। "তা' হ'ক, দেখিতে দোষ কি?" এই বলিয়া একটা আলো লইয়া রামলাল দাদার সহিত ভিতরে প্রবেশ করিলাম। দেখিলাম, সন্ধ্যা আহ্নিক করিবার জন্য কোশাকুশি, আসন প্রভৃতি যে ভাবে রক্ষিত হইয়াছিল, সেই ভাবেই আছে। কোশার প্রায় দুই হাত দূরে একখানি হাড়। তাহার ৪।৫ হাত দূরে উত্তরদিকে একটি মুক্ত বাতায়ন। বাতায়নটি ঘরের মেজে হইতে ৩।৪ হাত উচ্চ। রামলাল দাদা ডাক্তার, সুতরাং সন্ধ্যার সময় গোহাড় স্পর্শ করিতে তাঁহার আপত্তি ছিল না। হাড়খানি ভাল করিয়া নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিয়া বলিলেন "অনেক দিনের পুরাতন হাড়। ভাগাড় হ'তে কুড়িয়ে এনেছে, সন্দেহ নাই। হাড়ের একদিক মাটিতে ব'সে গিয়েছিল, নিশ্চয় মাটিতে দাগ আছে। গ্রামে যে কয়টি ভাগাড় আছে, কাল প্রাতঃকালে একবার

ঘুরিয়া দেখা যাইবে কোথা হইতে আনিয়াছে। এখন চল, জানালার বাহির দিক্‌টা একবার ভাল করিয়া দেখিয়া আসি।" উভয়েই লণ্ঠন লইয়া বাহিরে গেলাম। বাহিরে কাকার খিড়কির বাগান। উক্ত গবাক্ষের ঠিক নীচে বার্ত্তাকু ও শাক ইত্যাদি রোপণ করিবার জন্য জমি কর্ষণ করা হইয়াছে, সুতরাং মাটি অত্যন্ত নরম। আলো লইয়া ভাল করিয়া দেখিতে দেখিতে মনুষ্য পদচিহ্ন দৃষ্টিগোচর হইল। কর্ষিত জমি ত্যাগ করিয়া অপেক্ষাকৃত কঠিন মাটিতে জুতার চিহ্ন পর্য্যন্ত দেখা গেল। তখন আর বুঝিতে বাকি রহিল না যে, কোন দুষ্ট লোকের দ্বারা এই কার্য্য হইতেছে। ভূতে এত দূর সভ্য আজও হয় নাই যে, চর্ম্ম-পাদুকা ব্যবহার করিবে। আর সেই দুষ্ট লোক যে রামদাস পরামাণিকের পরিচিত, সে বিষয়েও সন্দেহ নাই। তবে কেমন করিয়া তাহাকে ধরা যায়, সেইটি শক্ত সমস্যা। অনেকক্ষণ ধরিয়া রামলাল দাদা সেই জুতার দাগ দেখিতে লাগিলেন, পরে কাগজ ও পেন্সিল বাহির করিয়া সেই সকল দাগের মাপ লইতে লাগিলেন। শেষে কতকগুলি শুষ্ক কলা-পাতা সংগ্রহ করিয়া তাহার উপর চাপা দিলেন, যাহাতে ঐ সকল দাগ নষ্ট না হয়। সে দিন রাত্রি হইয়াছিল, আর কোন কার্য্য হইল না। কিন্তু রামলাল দাদা বড়ই চিন্তিত, মুখে কথা নাই, মাথা নীচু করিয়া আস্তে আস্তে চলিয়াছেন। দুই তিন বার জিজ্ঞাসা করিলাম "কি ভাবি-তেছ?" কোন উত্তর নাই। কাকার বাটীর পশ্চাৎ হইতে সদর দরজার নিকট আসিতে প্রায় ১০।১২ মিনিট সময় লাগে; এ সময়ের মধ্যে রামলাল দাদা কোন কথা কহিলেন না। দরজার নিকট আসিয়া বাটীতে প্রবেশ করিতে যাইতেছি, এমন সময়ে আমার হস্তধারণ করিয়া বলিলেন "দাঁড়াও একটা কথা আছে।" ক্রমশঃ।

শ্রীরাখালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

মুস্তফী মহাশয়ের প্রথম সাক্ষাৎ।

আমাদের মধ্যে প্রবাদ আছে যে, মানুষ মরিয়াই অন্য গর্ভ আশ্রয় করে, অর্থাৎ জলৌকার ন্যায়, এক দেহ পরিত্যাগ করিয়া অন্য দেহে আশ্রয় লয়। কথাটা প্রথমতঃ আমাদের মত মানবের পক্ষে অযৌক্তিক বলিয়াই বোধ হয়, বস্তুতঃ তাহা নহে। কোটি কোটি বৎসর যাঁহার নিকট তিলার্দ্ধ বলিয়া উপমিত হয়, তাঁহার পক্ষে ঐ কথাটা অতীব সত্য। উপনিষদে মানব-জীবনকে জলবিম্ব স্বরূপ ক্ষণে উদয় ক্ষণে লয় হয় বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে;—উপনিষৎ-কারের ন্যায় জ্ঞান-বিজ্ঞান-সম্পন্ন তত্ত্বদর্শী মানবের মরণ-জনমের ব্যবহিত কালকেও—তাহা যতই দীর্ঘ হউক, নিমেষ বলিয়া গণ্য করিতে পারেন; কিন্তু আমাদের ন্যায় সংসারে ব্যাসক্ত ব্যক্তির পক্ষে তাহা অতি সুদীর্ঘ, সন্দেহ নাই।

তাই বলিতেছিলাম, মরণের পরই মানুষ জন্মগ্রহণ করে না। তাহাকে (আত্মাকে) কৃতকর্ম্মের ফলভোগ করিতে হয়। সে জন্য মরণের পর আত্মা যে লোকে যায়, তাহাকে পরলোক বলে। পরলোকে গিয়া মানুষের আত্মা কেমন থাকে, এখন তাহাই বলিব।

আমরা মনে করি, মরিলে মানুষের না জানি কতই কষ্ট হয়। কিন্তু কোন কোন আত্মার মুখে শুনিয়াছি, মরণের চেয়ে সুখ নাই। তাই বলিয়া কি আত্মহত্যা করিবে? তাহা নহে, তাহাতে বরং দুঃখ, কষ্ট ও যন্ত্রণার এক শেষ হয়।

মিডিয়ম বা মাধ্যমিক বা দেহীর দেহে পর পর দুইটী আত্মার আবি-র্ভাব হইল, তাঁহারা তাঁহাদের বক্তব্য বলিয়া ও পৃষ্ট কথার উত্তর দিয়া

চলিয়া গেলেন। অনন্তর মুহূর্ত্ত মধ্যে একটী আত্মা দেহে প্রবিষ্ট হইয়া বলিলেন "কে আমায় ডাক্‌চ?"

উঃ। আমি।

তিনি হাঃ হাঃ করিয়া হাসিতে লাগিলেন। সে কি মধুর হাসি—সে কি সরল আনন্দ-ময় হাসি! পরে বলিলেন "কেন বাবা! আমায় ডাক্‌চ কেন?"

প্রঃ। আপনি কে?

আবার অত্যুচ্চ মধুর হাসি হাসিয়া বলিলেন "হাসি দেখিয়া বুঝিতে পারিতেছ না, আমি কে?"

আমি—মুস্তফী মহাশয় বুঝি?

আবার রঙ্গ ভঙ্গ করিয়া অত্যুচ্চ মধুর হাসি হাসিয়া বলিলেন "বুঝ্‌তে পেরেচ বাবা—আমি সেই অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী। হাঃ হাঃ হাঃ। বেশ—দিব্বি তোফা আছি; এমন সুখ তোমরা কখন মনেও চিন্তা কর্ত্তে পার্‌বে না—হাঃ হাঃ হাঃ!

"তোমরা ব'লে থাক "ফূর্ত্তির প্রাণ গড়ের মাঠ!' কিন্তু বাবা এখানে যেমন স্ফূর্ত্তি, অমন কত গড়ের মাঠ এই অতি বিস্তৃত প্রকাণ্ড শূন্য স্থানের মধ্যে ঢুকে যায়—হাঃ হাঃ হাঃ!

"এখানে যে কি সুখ, তা' টের পেলে তোমরা এখনই এখানে আস্‌বার জন্য ছক্‌ ফট্‌ ক'র্‌বে! এ সুখ অকথ্য—অনির্ব্বচনীয়—অতুল্য—অসীম! ইহার কোটী কোটী অংশের এক অংশও ভাষায় প্রকাশ হয় না। আমার দেহ এখন বায়ুময় ও অতি আনন্দময় উপাদানে নির্ম্মিত! কি দিয়া যে দেহ প্রস্তুত, তাহা বলিতে পারিতেছি না; কিন্তু নশ্বর দেহের সঙ্গে যখনই তুলনা করি, তখনই বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া যাই। ভাবি যে, এমন করিয়া কেমন করিয়া আমার দেহ গঠিত হইল? কে এমন

করিয়া গঠিয়া দিল? দেহের এত পরিবর্ত্তন! মনেরও যে পরিবর্ত্তন না হইয়াছে, তাহা নহে; কিন্তু মনের ভাব প্রায় তদ্রূপই বর্ত্তমান আছে। আমি বেশ মনন ও চিন্তন করিতে পারি। নশ্বর শরীরের মরণ চিন্তায় আর এ অবস্থার মনন চিন্তায় অনেক তফাৎ! এ শরীরে ঐ সমুদায়ের উন্নতি অপরিসীম! দৃষ্টিশক্তিও কম বাড়ে নাই! আমি এখান হইতে আমেরিকার কোথায় কি হইতেছে, জানিতে ও দেখিতে পাইতেছি। পলকমাত্রে তথায় উপস্থিত হইতেও পারি। তাই বলিতেছি, এখানে যে কি সুখ, তাহা ধারণা করা মনুষ্য-চিন্তার অতীত।”

কথার সঙ্গে সঙ্গে মুস্তফী মহাশয়ের রঙ্গ ভঙ্গ করিয়া তাল মান লয়ে হাসি দেখিলে হাসিতে হাসিতে পেটের নাড়ী ছিঁড়িয়া যায়, তাহা বুঝাইবার উপায় নাই। সে হাসি—এক অপূর্ব্ব—অভূতপূর্ব্ব ব্যাপার!

তিনি অনেক কথা বলিয়াছেন। সে সব কথায় পাঠকের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিতে পারে, তজ্জন্য সংক্ষেপ করিতে বাধ্য হইলাম। তিনি তাঁহার মৃত্যুর পরের কথা যাহা বলিয়াছেন, তাহাই বলিতেছি। তাঁহার মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই তাঁহার সহিত আমাদের আলাপ হয়।

তিনি বলিতে আরম্ভ করিলেন “বড় সুখে আছি; যেখানে ইচ্ছা, সেই খানে উড়ে যাচ্ছি—উঠ্‌চি—নাব্‌চি—পড়্‌চি—দৌড়চ্ছি—হাঃ হাঃ হাঃ! কি আনন্দ বাবা! তোমরা এ আনন্দ টের পেলে এখনই আস্‌তে চাইবে।

“উড়্‌তে উড়্‌তে ঘুরতে ঘুরতে দেখলুম, একটা দেহ খালি প’ড়ে আছে। সাঁ ক’রে তা’ইতে ঢুকে পড়্‌লুম। যেন কি একটা অব্যক্তশক্তি আমাকে এদিকে টেনে নিয়ে এল। যখন—আমি মরি মরি হয়েচি—ওঃ! সে কি কষ্ট! তখনই ইচ্ছে হ’ল, সাঁ ক’রে খাঁচার (মানবদেহের) দরজাটা খুলে ভোঁ ক’রে বেরিয়ে পড়ি। তার পর আর কি, জোরসে ধাক্কা দিয়ে খাঁচার দরজা

খুলে ভোঁ ক'রে বেরিয়ে পড়লুম—ওঃ! সে কি স্ফূর্ত্তি!! তার পর মনে করলুম—না না—একবার মজাটা দেখা যাক্—আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মজা দেখ্‌তে লাগলুম। আমার মেয়ে চীৎকার ক'রে কাঁদ্‌তে লা'গ্‌লো। আরে মর্! তা'কে যত বলি কাঁদিস্ না, তত সে কাঁদে, আমার কথা শুনেনা। আরে মর্। আমার যে কত সুখ! হাঃ হাঃ হাঃ! আমি কেমন দৌড়ে ছুটে স্ফূর্ত্তি ক'রে বেড়াচ্চি! সে চায় কিনা আমায় ধ'রে রাখ্‌তে! কেমন জান্‌লে বাবা, খাঁচার ভিতর পাখী পূরে তার ল্যাজ ধ'রে টান দিলে যেমন তার কষ্ট হয়, আমাকেও তেমনি খাঁচায় পূরে ল্যাজ ধ'রে টান দিচ্ছিল। বাবা খুব বেরিয়েচি—মেয়েটার কান্না দেখে আমার যে রাগ হ'তে লাগলো, ইচ্ছে হ'লো তাকে খুব কতকগুলো ঘুসি লাগিয়ে দি, দেখাই যে তার বাবার গায়ে কত জোর!

"তা'কে যে অত নিষেধ করলাম, সে যে তা' শুন্‌তে পেলে না, তা' কি আমি জানি? আমার মনে হ'ল—এত সাম্‌নে এসে এমন ক'রে বল্‌চি, তবু ও কথা শুন্‌চে না কেন? আমি সবাইকে দেখ্‌তে পাচ্চি, ওরা কি আমাকে দেখ্‌তে পাচ্চে না?—তখন বুঝি নাই যে, এ চোখের সঙ্গে ওদের চোখের কি প্রভেদ!

"তার পর কতক্ষণ পরে চারজন লোক খাঁচাটাকে ব'য়ে নিয়ে নিম-তলায় চল্‌লো। খাঁচাটা এমনি এমনি (ভঙ্গীকরণ) ক'রে নড়্‌তে লাগলো—আমিও তা'র উপর উড়ে উড়ে যেতে লাগলুম। তার পর তা'রা যখন নিমতলার ঘাটে গিয়ে খাঁচাটাকে নামালে, তখন আমি মজা দেখ্‌তে লাগলুম—সবাই কাঁদে, আর আমি গোঁফে মোচড় দিতে লাগলুম—হাঃ হাঃ—গোঁফই নাই, তার আবার মোচড়। আমার কথাটা বুঝ্‌তে পাচ্চ কি?"

উত্তর—না।

"সেই খাঁচাটার গোঁফ্ গো সেই খাঁচাটার গোঁফ্! সেইটাকে আমি মোচড় দিচ্ছিলুম। তার পর কতক্ষণ পরে এক বোঝা কাঠ এসে দমাস্ করে প'ড়্লো—আমি সেই খানে একটা পাথরের ঢিপি সেটা গাঁজার ঢিপি—হাঃ হাঃ হাঃ—সেখানে এক বেটা ব'সে গাঁজা খাচ্চে। আমি সেখানে বসে মজা দেখ্তে লাগলুম—তারপর কাঠ সাজিয়ে তা'র উপর খাঁচাটাকে শোয়ালে—শুইয়ে তার হাত পা মুড়ে দিলে, দিয়ে আবার কাঠ দিলে—হাঃ হাঃ হাঃ!! এত কর্‌বার দরকার কি বাবা? কেটে কুঁচিয়ে আগুন দিলেইত চুকে যায়!—পোড়াবার সুবিধের জন্যেই একথা বল্‌চি।

"হুঁ।—এক বেটা বামুন এলো, বেটাকে দেখেইত আমার গা জ্বল্‌তে লাগ্‌লো। তিনি ছিলেন বেশ্যা বাড়ীতে শুয়ে—সেখান থেকে উঠে এসে মন্ত্র পাঠ করতে লাগ্‌লেন! মন্ত্রগুলো সব অশুদ্ধ গো সব অশুদ্ধ। বেটা সেই অশুচি কাপড়ে খাঁচাটাকে (শব) ছুঁলে।

"খাঁচা বড় পবিত্র! যে তাকে ছুঁয়ে কোন কাজে যায়, তা'র কার্য্য-সিদ্ধি হয়; কিন্তু কি আশ্চর্য্য! কেউ তাকে ছোঁয় না!

"বাবা! বেশ্যাবাড়ী যাও, মদ খাও, হাঃ হাঃ হাঃ!

"মদ আমিও খেতাম—সে সুধা! সুধা! সুধা!! এখন আর খাওয়া টাওয়া নেই, কিন্তু বাবা সেই মৌতাতটা আছে। সেটার জন্যে মাঝে মাঝে বড় কষ্ট হয়।"

প্রঃ। ঈশ্বর—কোথায়?

উঃ। ঈশ্বর টীশ্বর জানিনা বাবা! কেবল স্ফূর্ত্তি স্ফূর্ত্তি! যাই হো'ক বাবা!—কিন্তু কি যেন একটা অবোধ্য—অবশ্য—শক্তি আছে!

"—হাঁ—বেটা সেই কাপড়ে এসে খাঁচাটাকে ছুঁলে। বেটার আস্পর্দ্ধা দেখেছ? বেটাকে আমি জব্দ ক'র্‌বো। বেটার অন্নশূল হ'য়েছে,

তাইতে তা'কে জব্দ কর্‌বো—প্রাণে মার্‌বো না। প্রাণে মার্‌বার আমার সাধ্যই বা কি ?

"যাক্, তার পর খাঁচাটা আগুনে পুড়ে ছাই হ'য়ে গেল। আমি বসে আছি, দেখি যে, বিপ্‌নে শালা এসে হাজির।"

(থিয়েটারে কে একজন বিপিন নামক ব্যক্তি ছিলেন। তিনি মুস্তফী মহাশয়ের অগ্রে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েন।)

"সে আমায় পথ দেখিয়ে নিয়ে চল্লো, আমার অনেক দিন ইচ্ছে ছিল, হিমালয় ভ্রমণ ক'র্‌বো। আচ্ছা বলুন ত, কোন্ পর্ব্বতশৃঙ্গ সকলের চেয়ে উঁচু ?"

আমি—কাঞ্চনজঙ্ঘা বা গৌরীশঙ্কর।

তিনি বলিলেন, "গৌরীশঙ্কর ? কখনও শুনি নাই, আজ আপনার নিকট শুনিলাম। এবার যাইব। একটা মজা করা যাবে—বিপ্‌নে শালাকে সেইখানে বরফের মধ্যে চাপা দিয়ে আস্‌বো ! হাঃ হাঃ হাঃ ! !

"তার পর সে আমায় বিন্ধ্যাচলে নিয়ে চল্‌লো। কিছুদিন সেখানে ছিলাম। তার পর কাঞ্চনজঙ্ঘায় যাই, সেই খানেই থাকি।

"একদিন একটা বড় মজা হ'য়েছিল—একটা বুনো মহিষ দার্জ্জিলিঙ্গে ছোটলাটের বাড়ীর পাশ দিয়ে যাচ্ছিল ; আমি ও বিপ্‌নে মনে কর্‌লুম, একটা মজা করা যাক্।

"অতঃপর আমরা দুজনে সেই মহিষটার দুটো শিঙ্গে গিয়ে বস্‌লুম। সে গিয়া ছোটলাটের বাড়ীর প্রাচীরে ঢু মারতে লাগ্‌লো। মিস্ত্রীরা কাজ কচ্চিল, তা'রা ভয়ে গেট বন্ধ ক'রে দিলে। সে খুব জোরে ঢু মার্‌তে লাগ্‌লো—উঃ। সে কি জোর ! তা'র ক্ষমতা কি যে, সে তত জোরে ঢু মারে ? আমরা তাকে তেমনই জোরে ঢু মার্‌তে লাগালুম। প্রাচীর ভাঙ্গে আর কি ! এমন সময় একটা মেম সাহেব একটা ঢোঙ্গায়

মত—যা'কে তোমরা "পিস্তল" বল—সেইটে নিয়ে জানালার ভিতর দিয়ে তা'কে লক্ষ্য করতে লাগলো, আর আমরা হাস্‌তে লা... পরে মহিষটাকে ছুটিয়ে নিয়ে গেলুম। সে বড় মজা—হাঃ হাঃ হাঃ।"

কয়েকদিন পরে আমরা সংবাদপত্রে এ সংবাদ পাঠ করিয়াছিলাম —লেডি ফ্রেজার বড় ভীত হইয়াছিলেন এবং পিস্তল লইয়া মহিষটাকে গুলি করিতে গিয়াছিলেন।

আত্মা কথা কহিতেছিলেন, এমন সময় প্রশ্ন করা হইলে তিনি খুব ধমক দিয়া উঠিলেন। আমি বলিলাম "আপনি রসিক লোক, তাই বলিতেছিলাম।" অমনই তিনি হাঃ হাঃ করিয়া হাসিয়া বলিলেন, "কেমন একটা ধমক দিলুম। দেখ্‌ছিলুম আপনি রাগ করেন কি না? রাগ করবেন না? আমার মাথার দিব্য রাগ করবেন না। হাঃ হাঃ হাঃ! মাথা নাই, তা'র মাথার দিব্য!"

প্রশ্ন। আচ্ছা, ভূত আছে?

উঃ। ভূত? ভূত আবার কে?

প্রঃ। তালগাছের মত মাথা—শাল গাছের মত পা।

উঃ। যা'রা বলে, তা'দের মাথা। আত্মার আবার তাল গাছের মত মাথা কি? আত্মার কি কোন দেহ আছে?

পরে কথা-প্রসঙ্গে চায়ের কথা উঠে। তাহাতে তিনি বড়ই ঘৃণা সহকারে বলিলেন—"চা ত কুলির রক্ত! তবে আমিও চা খেতুম, আমিও পাপী বটে; কিন্তু চা যেন মানুষে না খায়।"

তাহার পর তিনি চলিয়া গেলেন।

অন্যান্য আত্মা।

অন্য এক আত্মা আসিলেন। তাহার নিবাস ছিল বর্দ্ধমানে, জাতিতে

ব্রাহ্মণ—ভট্টাচার্য্য। তিনি আপনার বাল্যকালের কাহিনী বর্ণনা করিলে পরে নিজ পুত্রের মঙ্গল কামনায় কয়েকটী কথা বলিয়া ।পুত্রকে তাঁহার ভ্রাতা তাঁহার সঞ্চিত ধনের অংশ প্রদান করেন নাই বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করেন ও অভিশাপ দেন। তাঁহার অমঙ্গল হইবে, ইহাও প্রকাশ করেন। পরে অতি গোপনে তাঁহার সংরক্ষিত, মৃত্তিকায় প্রোথিত, স্বর্ণ-রৌপ্য-পূর্ণ এক হাঁড়ি গুপ্ত ধনের কথাও বলিয়া যান, আরও বলেন, তাঁহার পুত্র যেন উক্ত ধন মৃত্তিকা-গর্ভ হইতে তুলিয়া তাহার কাকাকে অর্দ্ধেক প্রদান করে। একথা বলিবার সময় অন্য কাহাকেও সেখানে থাকিতে দেওয়া হয় নাই। আরও কয়েকটী আত্মা আসিলেন। অন্যান্য অনেক কথা হইল। সেদিনকার মত কার্য্য শেষ হইল।

বারান্তরে প্রথমেই পরমানন্দ চক্রবর্ত্তী নামক একজন বর্দ্ধমান-বাসীর আত্মা আসিলেন। তিনি মাধ্যমিকের ঠাকুর-দাদা। তিনি আসিয়াই বলিলেন "আমায় ছাড়িয়া দাও, আমার বড় কষ্ট হইতেছে।" আমরা বলিলাম—"আপনি......কাব্য বিশারদকে চিনেন?" তিনি বলিলেন "হাঁ। সে বড় দুষ্ট। তাহাকে বেশীক্ষণ রাখিও না, আমার নাতির কষ্ট হইবে।" তাঁহাকে ডাকিতে বলিয়া তাঁহার কথায় সম্মতি জ্ঞাপন করিলে তিনি চলিয়া গেলেন।

পরক্ষণেই বিশারদ আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং বলিলেন "কেন বাবা আমায় ডাকচ?"

আমি—আপনাকে কয়েকটী কথা জিজ্ঞাসা করিব।

উঃ—কি কথা?

ইত্যবসরে উপস্থিত দুই এক ব্যক্তি দুই একটী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে তাহার যথাযথ উত্তর দিয়া আত্মা বলিলেন——

"এখন আমার কথা শুনুন হঙ্কঙ গিছ্‌লে ?"

আমি—না।

"সে অতি উত্তম স্থান।"

আমি বলিলাম "আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা কর্‌বো।" তিনি বলিলেন, "তা'র আগে তোমায় একটা কথা জিজ্ঞাসা কর্‌বো, তুমি বল্‌বে ?"

আমি বলিলাম—"বলিব।" তিনি আমায় ত্রিসত্য করাইলেন। তাহার পর বলিলেন "বল দেখি, চীনের কড়াই খেয়েছ ?" আমি প্রথমতঃ কথাটা বুঝিতে পারি নাই, ইতস্ততঃ করিতেছিলাম। তিনি বলিলেন—বল—বল—বল ? (উচ্চ হাস্য !) আমি বলিলাম—"মাঠ কড়াই ?—চীনের বাদাম যা'কে বলে ?" তিনি উচ্চ হাস্য করিয়া বলিলেন "হাঁ—হাঁ—হঙ্কঙে পাওয়া যায়—তা অতি উত্তম। আমি খুব খেতাম। "তেলাং চাং" বলিলে তবে চীনেরা সেই কড়াই দিবে।

"আমার সঙ্গে এক জন ডাক্তার বন্ধু ছিলেন। আমি যখন খাঁচা (দেহ) ছাড়লুম, তখন সে কাঁদ্‌তে লাগলো—আমি হাস্‌তে লাগলুম—মজা দেখতে লাগলুম—দেখলুম আমার ইয়া ভুঁড়ি ছিল—প্রকাণ্ড শরীর ছিল,—সেটা থেকে বেরিয়ে এতটুকু হ'য়ে গেলুম—শরীরটা খুব হাল্কা হ'ল। তখন সেই শরীর দেখে আমার হাসি পেতে লাগলো। সেই ভুঁড়িটার উপর হাত দিয়ে চাপ্‌ড়াতে লাগলুম। তার পর সেই খাঁচাটাকে কি সব জড়িয়ে জড়িয়ে জাহাজের মাঝি মাল্লারা জলের নীচে ফেলে দিলে। আমি মজা দেখ্‌বার জন্যে জলের নীচে সেটার কাছে তিন দিন রইলুম, দেখলুম—সে সেই রকম রইল—আমি জল থেকে বেরিয়ে পড়লুম।"

প্রঃ—আপনারা জলের ভিতর যেতে পারেন ?

উঃ—আমরা জলে—আগুনে—পাতালে—পাহাড়ে—পর্ব্বতে কোথায় না যেতে পারি ?

প্রঃ—আচ্ছা, ঈশ্বর কোথায় ?

উঃ—ওঁ—ওঁ—ওঁ—আকাশ—আকাশ—আকাশই ঈশ্বর।

প্রঃ—গয়ায় পিণ্ড দিলে আত্মাদের ভাল হয় ?

উঃ—গয়া ? গয়া ?—হাঁ ভাল হয়।

প্রঃ—শ্রাদ্ধ করিলে ভাল হয় ?

উঃ—হাঁ।

এই খানে আত্মা দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া যেন কিছু বিষণ্ণ হইলেন। তার পর বলিলেন, "দেখ, আমি বড় পাপী—আমি অনেকের—সতীর সর্ব্বনাশ ক'রেচি—অনেক কুকর্ম্ম ক'রেছি—যা' নয় তা'ই ক'রেছি—তা'ই বড় কষ্ট পাচ্চি। তোমাদের কাছে একথা ব'লে আমার শরীর যেন অনেকটা হাল্কা হ'লো। পাপের প্রায়শ্চিত্ত হ'লো বলে মনে করুচি।

"আমার সঙ্গে অনেকের আলাপ ছিল, তা'রা অনেক উচ্চে থাকে। আমি তা'দিকে বলেছিলুম—আমায় উপরে নিয়ে চল। তা'রা বল্‌লে —তোমার পাপক্ষয় না হ'লে তুমি আস্‌তে পারবে না।"

আমরা দেখিয়াছি, অনেক আত্মা তাঁহাদের পূর্ব্বকৃত পাপের কথা বলিতে বড়ই আগ্রহান্বিত হয়েন এবং সেই সমুদায় কথা বলিয়া তাঁহারা যেন কিছু শান্তি লাভ করেন। তখন আর তাঁহাদের পূর্ব্বকৃত মান সম্ভ্রমে লক্ষ্য থাকে না। কারণ, সে মান সম্ভ্রম ত আর তাঁহাদিগকে রক্ষা করিতে পারিবে না। তাহা তাঁহাদের নিকট অতি তুচ্ছ এবং ঘৃণ্য !

অতি দুঃখে—অতি শোকে মানুষ আপনাদের পাপের কথা প্রকাশ

করে। বলে, পূর্ব্ব জন্মে কত পাপ করিয়াছিলাম—কত সতীর সর্ব্বনাশ করিয়াছিলাম—কত সাধু সজ্জন নিরীহ ব্যক্তির চক্ষে তপ্ত অশ্রুপাতের কারণ হইয়াছিলাম, তাই এজন্মে এত কষ্ট পাইতেছি! তেমনই আত্ম-গণও অতি দুঃখে আপনাদের পূর্ব্বকৃত পাপের কথা বলিতে যেন শত-মুখ হয়েন। সেই সমুদায় কথা বলিবার জন্য যেন তাঁহাদের প্রবল আকাঙ্ক্ষা থাকে।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেব বলিতেন—এক কাঠুরিয়া কাঠ কাটিতে বনে গেল। আরও অগ্রসর হইয়া দেখিল—চন্দনের বন; সুতরাং লাভ যথেষ্ট হইল। আরও অগ্রসর হইয়া দেখিল—তামার খনি। আরও অগ্রসর হইয়া দেখিল—রূপার খনি। আরও অগ্রসর হইয়া দেখিল, সোণার খনি! আরও অগ্রসর হইয়া দেখিল—হীরা মণিমাণিক্যের খনি। পাঠক! অগ্রসর হউন—নিরাশ হইবেন না। তার পর—তার পর আছেই!

ক্রমশঃ।

বিনীত নিবেদক,—

শ্রীমন্মথনাথ নাগ।

মেদিনীপুর হিতৈষী সম্পাদক—মেদিনীপুর।

হিপ্‌নটিক মায়া বা বশীকরণ।

আমরা এই প্রবন্ধে মায়াবিদ্যার একটি লোমহর্ষণ-কর কাহিনী প্রকাশ করিতেছি, ঘটনা প্রতি বর্ণে সত্য। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ এই মায়া বিদ্যার পরিচালনে কতদূর অগ্রসর হইয়াছিলেন, তাহা ইহা হইতে বেশ বুঝা যাইবে। প্রাচ্য মতে মায়াবিষ্ট করিতে যে সকল মন্ত্র আদি ব্যবহার করিবার

রীতি আছে, পাশ্চাত্য মতে তাহা নাই। ইহাতে হস্ত চালন কৌশলে কোন ব্যক্তিকে প্রথমতঃ মোহনিদ্রায় অভিভূত করিতে হয়। এই নিদ্রিতাবস্থায় অথবা নিদ্রাত্যাগের পরই মায়ার বিকাশ উক্ত ব্যক্তিতে দেখা যায়। কিন্তু আমাদের বর্ণিত ঘটনার বিশেষত্ব এই যে, এ স্থলে আবিষ্ট ব্যক্তির মোহনিদ্রা কালে বা নিদ্রান্তে মায়ার কার্য্য কিছুই প্রকাশ পাইবে না। মোহনিদ্রা ভঙ্গান্তে উক্ত ব্যক্তি সাধারণ লোকের মতই থাকিবে,—তাহাকে যে মায়াবিষ্ট করা হইয়াছে, সেও তাহা জানিবে না; কিন্তু ক্রীড়কের উপদেশমতে এক মাস বা এক বর্ষ পরে বা অভিলষিত কালগতে নির্দ্দিষ্ট দিনে সে সেই মায়ায় এতই আবিষ্ট হইয়া পড়িবে যে, তাহার নিজের দায়িত্ব জ্ঞান আর থাকিবে না, মায়াবশে কার্য্য করিতে থাকিবেক। এই উন্নতি প্রাচ্য বৈজ্ঞানিক ডাক্তার চারকটের বিস্তালয়ে আমাদের ডাক্তার শিক্ষা করিয়া পরীক্ষা করিতে মনঃস্থ করায় এই প্রবন্ধের ঘটনাটি ঘটে। এই ডাক্তার ফ্রান্স দেশের লিলে (Lille) নগরে থাকিতেন। জনৈক ব্যারণ জি— এই ঘটনা স্বচক্ষে দেখিয়াছেন, এবং লণ্ডনের ও আমেরিকার অনেক কাগজেও ইহা প্রকাশ হইয়াছিল। সন ১৮৮৪ সালে ইহা ঘটে। তন্ত্রোক্ত বশীকরণ বিস্তার ইহা একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ, সন্দেহ নাই।

ফ্রান্সদেশের এস্—নগরে একটি পুলিস-কর্ম্মচারী বাস করিতেন। তিনি বেশ সুস্থকায়, সরল ও কর্ম্মক্ষম ছিলেন। তাঁহার চেহারা অপেক্ষাকৃত স্থূল ছিল। চাকরীতে তাঁহার বেশ সুনাম ছিল,—কখনও পুলিসের অপবাদ তাঁহার বিরুদ্ধে কেহ দিতে পারে না। সংসারেও তিনি একজন সচ্চরিত্র, শান্ত, মিষ্টভাষী ও ধর্ম্মভীরু ছিলেন। তাঁহার বয়স ৩৫ বর্ষ, এখনও বিবাহ হয় নাই। সংসারে একমাত্র বৃদ্ধা মাতা ছিলেন, তাঁহার উপার্জ্জনের উপরই বৃদ্ধার নির্ভর ছিল।

এই সৎস্বভাবসম্পন্ন কনষ্টেবলকে আমাদের ডাক্তার বাবু মায়ার ক্রীড়া-পুত্তলী করিতে ইচ্ছা করেন। প্রথমতঃ তিনি পরীক্ষা দ্বারা স্থির করিতে লাগিলেন যে, ঐই কনষ্টেবলের উপর নিজশক্তি প্রচার করা চলিবে কি না, অর্থাৎ তাঁহার আধ্যাত্মিক শক্তি কন্‌ষ্টেবলের আধ্যাত্মিক শক্তি অপেক্ষা অধিক কি না। পুনঃ পুনঃ হস্তচালন কৌশলে তাহাকে মোহ নিদ্রাভিভূত করিয়া তাহার দ্বারা নানাপ্রকার সামান্য সামান্য বোকার কাজ করাইয়া ডাক্তার নিঃসন্দেহ হইলেন যে, ইহার উপর মায়া বিস্তার করা বেশ চলিতে পারিবে। কয়েকটি বন্ধুকে দেখাইবার জন্য তাঁহাদের এই কথা বলিয়া কার্য্যস্থলে উপস্থিত থাকিতে বলিলেন, তাঁহারাও এই মায়ার ক্রীড়া দর্শনে কৌতূহলাক্রান্ত হইলেন।

প্রথমতঃ ডাক্তার কনষ্টেবলকে আপন বাটীতে ডাকিয়া তাহাকে হস্তচালন দ্বারা মোহনিদ্রায় নিদ্রিত করিলেন। এই নিদ্রা সাধারণ নিদ্রা নহে ; ইহা এতই গাঢ় যে, তাহার গাত্রে তপ্তলৌহ স্পর্শ করাইলে, নখের নিম্নভাগ কণ্টকবিদ্ধ করিলে, এমন কি কর্ণের নিকট পিস্তলের আওয়াজ করিলেও তাহার নিদ্রা ভাঙ্গিবে না। ডাক্তার এবং তাঁহার কয়েকটি বন্ধু তৎপরে পার্শ্ববর্ত্তী একটি কুঠরীতে যাইয়া এই লোককে যাহা করান হইবে, তাহা একটি কাগজে লিখিলেন। ঐ কাগজ খণ্ড হাতে লইয়া ডাক্তার নিদ্রিত পুলিস-কর্ম্মচারীর নিকট আসিয়া মনে মনে কাগজটি পাঠ করিলেন। পরে মনে মনে তাহাকে আদেশ করিলেন "আজ হইতে তিন সপ্তাহ পরের দিনে বেলা দুইটার সময় বৈকালে তুমি এই কর্ম্মটি করিবে।"

ডাক্তার একটি কাষ্ঠনির্ম্মিত রুলার লইয়া হস্তে করিয়া মনে মনে বলিতেছেন "দেখিতেছ—এই ম্যালেদেশের ছোরা, এই ছোরাটি আমি আমার আলমারির মধ্যে রাখিলাম। অমুক দিন দুইটার সময় বৈকালে,

তুমি আলমারি হইতে এই ছোরাটি লইবে, আলমারি বন্ধ থাকিলে আলমারির চাবি ভাঙ্গিতে হইবে। এই ছোরা লইয়া তুমি অমুক সরকারী বাগানে যাইবে, এই এই রাস্তা দিয়া যাঁইবে। (এইস্থলে সেই বাগানে যাইবার রাস্তার নাম বলিয়া দেওয়া হইল)। বাগানে যাইয়া ছয়টি গাছের পর সপ্তম গাছের তলায় একটি পুষ্পক্ষেত্রে একটি মালীকে জল দিতে দেখিতে পাইবে। অদৃশ্য ভাবে তুমি তাহার পশ্চাৎ দিকে যাইয়া পৃষ্ঠে এই ছোরা দ্বারা তিনবার বিদ্ধ করিয়া তাহাকে হত্যা করিবে। পরে একটি সাবল লইয়া গাছতলায় গর্ত্ত করিয়া মৃত দেহটি পুঁতিয়া ফেলিবে। পরে তুমি পুলিস ষ্টেশনে যাইয়া এই হত্যার কথা প্রকাশ করিবে, এবং যে একটি জার্ম্মান কসাই তোমার গর্ত্ত করা ও মৃতদেহ লুক্কায়িত করা দেখিতে পাইয়া হাসিতেছিল, সেই কসাইয়ের নামে তথায় বলিবে যে, সে-ই এই হত্যাকাণ্ড করিয়াছে।”

মনে মনে এই আদেশ দিয়া ডাক্তার পুলিস-কর্ম্মচারীকে তাহার মোহ নিদ্রা হইতে জাগ্রত করিলেন। নিদ্রিতাবস্থায় পুলিস কর্ম্মচারী যে আদেশ পাইল, তাহা তাহার এই জাগ্রত অবস্থায় কিছুই মনে রহিল না। সে পূর্ব্ববৎ আপন কার্য্য করিতে লাগিল, তাহার মনে কোন গোলোযোগ ছিল না। বেচারার এই আদেশ মনে থাকিলে সে না জানি, কতই স্তম্ভিত ও ভীত হইত! নির্দ্দিষ্ট দিনে এই মায়া-জালের ক্রিয়া দেখিতে ইচ্ছুক হইয়া আমাদের ডাক্তার ও তাঁহার বন্ধুবর্গ, যে ঘরে আলমারির ভিতর কাষ্ঠের ছুরারটি চাবি-বন্ধ আছে, সেই ঘরে সকলে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। আজ তিন সপ্তাহের পর সেইদিন। বেলা ২টার সময় বৈকালে পুলিস-কর্ম্মচারী আপন কর্ম্মে (ডিউটিতে) আছে; কিন্তু কি এক দুর্দ্দমনীয় শক্তিতে চালিত হইয়া সে তাহার কর্ম্মস্থল ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। পুলিসলা ইনের মধ্যে একজন

সচ্চরিত্র কনষ্টেবল্‌, ইহার বেশ সুনাম আছে, সকল কন্‌ষ্টেবল্‌ অপেক্ষা ধর্ম্মভীরু,—এমন লোক আজ সহসা আপন কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল, ইহা তাহার উপরিতন কর্ম্মচারী বর্গ শুনিয়াও বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। তাহার নিজ কর্ম্মত্যাগ করিয়া চলিয়া যাওয়াকে আমরা একটী অপরাধ ধরিলাম, দেখা যাউক, আরও কতগুলি অপরাধ এই ধর্ম্মভীরু লোকটি করিতে পারে। যে রাস্তায় ইহার পাহারা ছিল, সেই রাস্তায় দুইটা বাজিবার পাঁচ মিনিট পূর্ব্বে একটি অবৈধ জনতা হইয়া দাঙ্গা হাঙ্গামা ঘটে। টাউনহলের ঘড়িতে দুইটা বাজিল, তখন আমাদের পুলিস কনষ্টেব্‌ল্‌টি দাঙ্গাকারীদের নাম লিখিয়া লইতে-ছিলেন, অকস্মাৎ তাঁহার নোটবই হাত হইতে পড়িয়া গেল, সে বড় বড় চক্ষু বাহির করিয়া দৌড়িয়া নিজকার্য্য হইতে পলায়ন করিল। রাস্তার মোড় হইতে বাঁকিয়া যাওয়ায় তাহাকে আর দেখা গেল না। রাস্তার জনমণ্ডলী ও দাঙ্গাকারীরা সকলে আশ্চর্য্য হইয়া গেল। তাহারা প্রকৃতিস্থ হইয়া পরে কেহ কেহ কনষ্টেবল্‌টির অনুসন্ধানে যাওয়ায় তাহাকে দেখিতে পাইল না। দাঙ্গাকারীরা জেলে রাত্রি কাটাইতে পূর্ব্ব হইতেই প্রস্তুত ছিল, কাজেই তাহাদের অসন্তোষের কোন কারণ দেখা গেল না। লোকে কন্‌ষ্টেব্‌ল্‌টির কোন সন্ধান না পাইয়া মনে করিল যে, সে পাগল হইয়া পড়িয়াছে।

কনষ্টেবল্‌টি ডাক্তারের বাটীতে আসিয়া প্রবেশ করিল। আমাদের ডাক্তার ইচ্ছা করিয়াই সদর দরজা বন্ধ রাখিয়াছিলেন, কাজেই কনষ্টেব্‌ল্‌ বাগানের দরজা ভাঙ্গিয়া ঢুকিল। এইটি ইহার দ্বিতীয় অপরাধ হইল। সে ডাক্তারের বাটীতে ঢুকিয়া, যে ঘরের আলমারিতে সেই কাষ্ঠের রুলার রক্ষিত ছিল, সেই ঘরে গেল। তাহার মায়াবিষ্ট অবস্থায় সে দেখিতে পাইল না যে, ডাক্তার ও তাঁহার কয়েকজন বন্ধু সেই ঘরে বসিয়া রহিয়াছেন। বরাবর

আলমারির নিকট যাইয়া, উহা তালাবদ্ধ দেখিয়া নিজের পকেট হইতে একটি চিমটা বাহির করিয়া, তদ্দ্বারা তালা ভাঙ্গিয়া, ঐ কাষ্ঠের রুলার— যাহাকে সে মায়াবশে ম্যালেদেশের ছোরা বলিয়া দেখিতেছে, তাহা লইল। এই ছোরাটি তাহার কোটের ভিতর লুক্কায়িত করিয়া চতুর্দ্দিকে চাহিয়া দেখিল,—পাছে কেহ দেখিতে পায়। পরে ডাক্তারের বাটী হইতে পলায়ন করিল। ইহা তৃতীয় অপরাধ। মুহূর্ত্ত মধ্যে এই কার্য্য ঘটিয়া গেল। ডাক্তার বন্ধুবর্গ সহ পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিলেন। কিন্তু কনষ্টে-ব্‌ল্‌টি কাহাকেও দেখিতে পাইল না।

আমাদের কনষ্টেব্‌ল্‌ এইবারে সেই সরকারী বাগানে চলিল। অনেক লোক বাগানে বেড়াইতেছে, ধাত্রীরা শিশুদিগকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গাড়ী করিয়া লইয়া বেড়াইতেছে; কিন্তু বাগানে যে পথে কনষ্টেব্‌ল্‌ যাইল, তথায় কোন লোক নাই। ডাক্তার ইহা দেখিয়া আনন্দিত হইলেন। ডাক্তারের মায়ার ক্রীড়া বড়ই কৌতুকাবহ হইয়া পড়িতেছে।

বাগানের এই নির্জ্জন রাস্তার প্রবেশ-মুখে কনষ্টেব্‌ল্‌টী থামিল ও গাছ গণিতে লাগিল। গণিতে ভুল হইতে লাগিল; ডাক্তার মনে করি-লেন যে, এই গাছের সংখ্যা, বোধ হয় আদেশ দিবার কালে স্পষ্ট করিয়া বলা হয় নাই বলিয়া লোকটির মনে স্পষ্ট ভাবে তাহা উদয় হইতেছে না। বেচারা কনষ্টেব্‌ল্‌ বুঝিতে পারিতেছিল না, রাস্তার কোন্ দিকের গাছ গণিতে হইবে। দক্ষিণ দিকের গাছ গণিয়া সপ্তম গাছের তলায় সেই মালীকে দেখিতে না পাইয়া, বামদিকের গাছ গণিয়া সপ্তম গাছের তলায় গিয়া অকস্মাৎ অতিশয় হেঁট হইল। বোধ হইল, সে মালীকে পাইয়াছে ও তাহাকে হত্যা করিবার উদ্যোগ করিতেছে। বস্তুতঃ গাছের তলায় কেহই ছিল না। মালী যে তথায় আছে, তাহা কেবল সে সেই মায়াবিষ্ট চক্ষে দেখিতেছিল।

এই সময়ে তাহার চেহারার পরিবর্ত্তন দেখা গেল, যেন একটি বন্যজন্তুর মত চাহনি হইল। তাহার স্বাভাবিক মুখের ভাব দয়ার্দ্র ও শান্ত ছিল; কিন্তু এখন সে ভাব আর তাহাতে দেখা গেল না। দাঁতের উপর দাঁত দিয়াছে, চক্ষু ভীষণ ভাব ধরিয়াছে। ডাক্তার বন্ধুসহ হত্যাকারীর এই ভাব তাহার মুখে স্পষ্টভাবে প্রকাশিত দেখিয়া একটু ভীত হইলেন। কন্‌ষ্টেব্‌ল্‌ এইবার সেই হত্যার কার্য্য আরম্ভ করিল। ধীরে ধীরে সতর্ক ভাবে সে সেই মায়াদৃষ্ট মালীর নিকট অগ্রসর হইল। এই মালী কেবল সে-ই দেখিতে পাইতেছে, বস্তুত তথায় কোন মালী ছিল না। একবার সে মাটিতে শুইয়া পড়িল, ও নিঃশব্দে শুইয়া অগ্রসর হইতে লাগিল; পরে উঠিয়া লাফাইয়া পড়িল। নির্দ্দিষ্ট গাছের নিকট এইরূপে পৌঁছাইয়া সে কোটের ভিতর হইতে তাহার লুকায়িত ম্যালে ছোরা (ডাক্তারের কাষ্ঠের রুলার) বাহির করিল। অনন্তর তাহার মায়াদৃষ্ট মালীর উপর লাফাইয়া গিয়া তিনবার তাহাকে ছুরিকাঘাত করিল। এইবার মৃত মালীর দেহের উপর হেঁট হইয়া দেখিতে লাগিল, মধ্যে মধ্যে সেই রুলারটিকে পুঁছিতে লাগিল,—পাছে উহাতে রক্তের দাগ দেখা যায়। তাহার পক্ষে মৃত দেহটি, রক্তের দাগ ও সেই ম্যালে ছোরা প্রকৃতই বোধ হইতেছিল। মায়াবশে এই কাল্পনিক দৃষ্টি!

ডাক্তারের আদেশমত সমুদয় কার্য্যই সে সম্পন্ন করিল। পরে সে মনে করিল, যেন একটি সাবল পাইয়াছে। সাবল লইয়া তখন মাটী খুঁড়িতে লাগিল ও গর্ত্ত খুঁড়িয়া মৃত দেহটি তাহাতে প্রোথিত করিল। সে মনে করিতেছে যে, সে সত্য সত্যই এই সব করিতেছে। পরে বাগান হইতে বাহির হইয়া পুলিশ ষ্টেশনে চলিল। এই খানে একটা বাধা পড়িল। পথিমধ্যে কনেষ্টবলটির উপরিতন কর্ম্মচারী, পুলিস ইন্‌স্পেক্টরের সহিত তাহার দেখা হইল। বেচারা কনেষ্টবল মায়াবিষ্ট অবস্থায় তাঁহাকে চিনিতে

পারিল না ও তাঁহাকে ছাড়াইয়া চলিয়া যাইতে লাগিল। ইন্‌স্পেক্টর তাহাকে ডাকিল, সে গ্রাহ্য করিল না। পরে ইন্‌স্পেক্টর অন্যান্য কনেষ্টবল-দের ডাকিয়া তাহাকে ধরিয়া ফেলিলেন। এই মায়াবিদ্যাকে মেসমেরেজম্, হিপ্‌নটিজম্, যাহাই বলুন, এই মায়াশক্তির এই স্থানে পূর্ণবিকাশ দেখা গেল। যে কয়েকটি কনেষ্টবল আমাদের কনেষ্টবলটিকে ধরিতে আসিয়াছিল, সকলেই প্রত্যেকে ইহার অপেক্ষা অধিক বলবান্ ছিল; কিন্তু এই মায়াবিষ্ট অবস্থায় তাহার শরীরে এত বল কোথা হইতে আসিল যে, সে সকলকেই এক এক ধাক্কা দিয়া দূরে ফেলিয়া দিল ও স্বচ্ছন্দে পুলিস থানা অভিমুখে যাইতে লাগিল, যেন কিছুই ঘটে নাই। পুলিস ইন্‌স্পেক্টর এই অবস্থা দেখিয়া সেই বিদ্রোহী কর্ম্মত্যাগী কনষ্টেবল্‌টিকে গুলি করিতে মনস্থ করিয়া পিস্তল তুলিবামাত্র আমাদের ডাক্তার যাইয়া তাঁহার হাত ধরিয়া ফেলিলেন, এবং পুলিস ইন্‌স্পেক্টরকে কিছুক্ষণ ধৈর্য্য ধরিতে অনুরোধ করিলেন। পরে ঐ মায়াবিষ্ট কনষ্টেবল্‌টির নিকট দ্রুতগতিতে যাইয়া কয়েকটি ক্রিয়া করিয়া তাহার স্বাভাবিক অবস্থায় তাহাকে আনিলেন। তাহার মায়া আপাততঃ কাটিয়া গেল বোধ হইল। এক্ষণে ডাক্তার বড়ই বিপন্ন হইলেন, তাঁহাকে বুঝাইতে হইবে যে, কনষ্টেবল্‌টি এই দুই ঘণ্টা স্বাভাবিক অবস্থায় থাকে নাই, এবং তাহার কর্ত্তব্য-কর্ম্মত্যাগাদি কার্য্যের জন্য সে আদৌ দায়ী হইতে পারে না।

হিপ্‌নটিক মায়ার চূড়ান্ত পরীক্ষা এই খানে হইবে, এই পরীক্ষায় ডাক্তার জয়ী হইলেন। তিনি বেচারা কনষ্টেবল্‌কে যখন স্বাভাবিক অবস্থায় আনিতেছিলেন, সেই সময় মনে মনে তাহাকে আদেশ করেন, আমার পূর্ব্ব আদেশ পালনের যে অংশ অবশিষ্ট আছে, অর্থাৎ পুলিস ষ্টেশনে যাইয়া হত্যার কথা প্রচার করা প্রভৃতি কার্য্য, তাহা তুমি স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হইলেও মনে রাখিয়া তদনুরূপ কার্য্য করিবে। তুমি

হত্যার কথা প্রচার করিবে, কিন্তু সেই জার্ম্মান কসাইকে হত্যাকারী বলিয়া প্রকাশ করিবে, কারণ এই ম্যালে ছোরা দেখাইবে, কসাইএর বন্ধুবর্গ সকলেই জানে যে, এই ছোরাটি ঐ কসাইএর।" এই মানসিক আদেশ আমাদের ডাক্তারবাবু মনে মনে স্পষ্টভাবে কনষ্টেবল্‌টির উপর দিলেন। কনষ্টেবল্ যখন স্বাভাবিক অবস্থায় আসিল, তখনও তাহার এই আদেশ পালনে ইচ্ছা রহিল। ডাক্তারের এই মায়া স্বাভাবিক অবস্থায়ও কনষ্টেবলকে ছাড়িল না।

এই বারের মজা শুনুন। এখন ইন্‌স্পেক্টর প্রভৃতি সকলেই ডাক্তারের কথায় কতক ব্যাপার বুঝিয়াছেন। লোকটির স্বাভাবিক অবস্থা হইলে, সে তাহার উপরিতন কর্ম্মচারীর নিকট অর্থাৎ ইন্‌স্পেক্টরের নিকট আপনা হইতেই আসিল, বলিল "একটি হত্যা কার্য্য নিবারণের জন্য আমাকে বেলা দুইটার সময় আপন কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া যাইতে হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ আমার যাইতে বিলম্ব হওয়ায় হত্যা নিবারণ করিতে পারি নাই। আমি সরকারী বাগানে যাইয়া কসাইকে হতব্যক্তির নিকট দেখিয়া তাহার নিকট হইতে ম্যালে ছোরা কাড়িয়া লইয়াছি, এই সেই ছোরা।" বলিয়া সেই ডাক্তারের কাষ্ঠের রুলার ইন্‌স্পেক্টরের সম্মুখে সসম্ভ্রমে রাখিয়া দিল।

ইন্‌স্পেক্টর ও জনমণ্ডলী তখন কনষ্টেবলকে পাগল হইয়াছে বলিয়া সন্দেহ করিল। সকলেই জানিত, বেচারি কখনও মদ স্পর্শও করে না। সে আজ এরূপ করিতেছে কেন? কাষ্ঠের রুলকে ছোরা বলিতেছে কেন?

এমন সময়ে ডাক্তার ও তাঁহার বন্ধুবর্গ ইন্‌স্পেক্টরের নিকট অগ্রসর হইয়া বলিলেন "আপনার কনষ্টেবল্ যাহা বলিতেছে, তাহা মিথ্যা।" কনষ্টেবলের দিকে ফিরিয়া ডাক্তারবাবু বলিলেন "তুমি কি নির্দ্দোষ লোকের উপর দোষারোপ করিয়া তোমার পাপের মাত্রা বৃদ্ধি করিতে চাও? তুমি

নিজেই ও মালীকে হত্যা করিয়াছ, আমরা সব দেখিয়াছি! আমরা দেখিয়াছি—তুমি এই খালে ছোরা দ্বারা সেই লোকটিকে খুঁড়িতেছ। সত্য বল, নিজের দোষ স্বীকার কর। তোমার দণ্ড লঘু করিবার এইমাত্র উপায় আছে।''

ইনস্পেক্টর ও ক্রমশঃ-বৃদ্ধি-প্রাপ্ত জনমণ্ডলী সকলেই অতিশয় কৌতুকাবিষ্ট হইয়া পড়িলেন। সকলে মনে করিলেন, এই পাঁচজন লোকই পাগল হইয়াছেন। কিন্তু কনষ্টেবল এক্ষণে তাহার উপরিতন কর্ম্মচারী ইনস্পেকটরের পদতলে পড়িয়া নিজের দোষ স্বীকার করিল, সে বলিল "আমিই হত্যা করিয়াছি।" ইনস্পেকটর এই কথা শুনিয়া লজ্জায় মরার মত মলিনমুখ হইলেন। যেস্থানে হত্যাকাণ্ড হইয়াছে, তথায় তাহাদিগকে লইয়া যাইতে অপরাধী কনষ্টেবলের উপর আদেশ করিলেন। বেচারা কনষ্টেবল সকলকে তথায় লইয়া গেল, এবং বলিল যে, গাছের তলায় সে সেই হতব্যক্তিকে পুঁতিয়া রাখিয়াছে,কসাই এই সময়ে তাহাকে দেখিতে পাইয়াছিল বলিয়া কসাইয়ের উপর দোষ চালাইতেছিল মাত্র।

ইনস্পেকটর এই কথায় সন্তুষ্ট হইলেন। পরে ব্যাপারটি যে মায়া, তাহা ডাক্তারবাবু ইনস্পেক্টরকে বুঝাইয়া বলিলেন। লোকটি ডাক্তারবাবুর কথা শুনিয়া রাগান্বিত হইলেন ও বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত হইলেন না। কিন্তু কনষ্টেবল যাইয়া এক স্থানকে গর্ত্ত বলিয়া তাহা খুঁড়িতে ও তাহার ভিতর হত ব্যক্তির দেহ রহিয়াছে বলিয়া পুনঃ পুনঃ দেখাইতে লাগিল। বস্তুতঃ তথায় গর্ত্তও নাই বা কোন মৃত দেহও নাই। অন্যে কেহই তাহা দেখিতে পাইতেছে না, সে স্থান আদৌ কখনও খোঁড়া হয় নাই, খোঁড়ার কোন চিহ্নও সেখানে নাই। কিন্তু তথায় প্রকাশ্য দিবালোকে একটি হত ব্যক্তির দেহ রহিয়াছে বলিয়া কনষ্টেবল দেখাইতেছে। সেই কনষ্টেবল ব্যতীত আর কেহ মৃতদেহ দেখিতে পাইতেছে না বলিয়া কনষ্টেবল

উত্তেজিত হইতেছে ও হতবুদ্ধির মত হইতেছে, পুনঃপুনঃ দর্শকদিগকে মৃতদেহ দেখাইতেছে ও দেখিতে কহিতেছে! তখন ইন্‌স্পেক্টর বুঝিলেন যে, ইহা ডাক্তারের তামাসার কার্য্য নহে, এই ব্যাপার গুরুতর ও ইহা গুপ্তবিদ্যা-ঘটিত ব্যাপার, সন্দেহ নাই।

শেষে ইন্‌স্পেক্টর কনষ্টেবলের মনের ভাব বুঝিবার জন্য, তাহার কথা যেন বিশ্বাস হইয়াছে, এই ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি অতি সচ্চরিত্র লোক, তুমি এই ঘৃণিত কার্য্য কেন করিলে?" কনষ্টেবল লজ্জায় ঘাড় নত করিল ও বলিল "কেন এই কাজ আমি করিলাম, তাহা আমি জানি না। কোন অদম্য শক্তিবলে, এই কাজ আমার করা উচিত, এই ভাব আমার মনোমধ্যে উদয় হয় ও আমার মনে বিশ্বাস জন্মাইয়া দেয় যে, এই কাজ করায় আমার কোন অন্যায় করা হইবে না। আমি এই ভাবে চালিত হইলাম, ইহা মন হইতে দূর করিতে আমার সামর্থ্য হইল না। সুতরাং আমি এই হত্যাকার্য্য মন্দ বলিয়া বুঝিতে পারিলাম না।"

ইন্‌স্পেক্টর বলিলেন, "তোমার বাটীতে বৃদ্ধা মাতা আছেন, তুমি তাঁহার একমাত্র পুত্র। ভাব—আজ তোমার মাতার দশা কি হইবে!" কনষ্টেবল এই কথা শুনিয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিল। কিন্তু সে এখন পর্য্যন্ত ও সেই বাগানে দাঁড়াইয়া পদতলে সেই হত মালীর মৃতদেহ দেখিতে লাগিল, এবং পা দিয়া সেই দেহ স্পর্শ করিতে পারে, এখনও তাহার এইরূপ জ্ঞান রহিয়াছে।

লোকটির স্বাভাবিক জ্ঞান আনিবার জন্য, সেই মালী যাহাকে হত করা হইয়াছে বলিতেছে, তাহাকে কনষ্টেবলের সম্মুখে আনা হইল। মালী আসিয়া বলিল "এই দেখ আমি জীবিত রহিয়াছি। তুমি আমাকে হত্যা করিয়াছ বলিয়া মিথ্যা উক্তি করিতেছ কেন?" এই কথায় বেচারা কনষ্টেবল অচেতন হইয়া পড়িয়া গেল।

ডাক্তার বলিলেন "কোন ভয় নাই। আমি পুনরায় এই ব্যক্তিকে হিপ্‌নটিক মায়ানিদ্রায় আচ্ছন্ন করিয়া ইহাকে এই সমুদয় ব্যাপার ভুলিয়া যাইবার আদেশ দিব। তাহা হইলে ইহার এই সব ঘটনার আর কিছুই মনে থাকিবে না।"

ডাক্তারের এই কথা সত্যে পরিণত হইল না। ডাক্তার তাহাকে নিদ্রিত করিয়া পুনরায় জাগ্রত করিয়া দিলেও লোকটীর "ব্রেণফিবার" জ্বরবিকার হইল, তিনমাস তাহাকে হাসপাতালে থাকিতে হইল। তাহার দেহ কঙ্কালসার হইল, সে সুস্থ শরীর আর রহিল না। পূর্ব্বে যে বেশ সুস্থ ও আনন্দিত ছিল, এখন সে ভীরু, বায়ুগ্রস্ত ও সকলকেই অবিশ্বাসের চক্ষে দেখিতে অভ্যস্ত হইল।

ডাক্তারের উপর সমুদয় পুলিসের লোক রাগিয়া উঠিল। ধর্ম্মযাজকগণও ক্ষেপিয়া উঠিলেন। তাঁহারা বলিলেন যে, একজন লোকের আর একজনের উপর এরূপ শক্তি প্রয়োগ করার বিদ্যা নিশ্চয়ই সয়তান-ঘটিত। ইহা খৃষ্টধর্ম্ম-বিশ্বাসী মাত্রেরই শিক্ষা করা উচিত নয়। অগত্যা ডাক্তারকে লিলে নগর ত্যাগ করিয়া অন্যত্র যাইতে হইল।

ঘটনাটি সম্পূর্ণ সত্য। ইহা ১৮৮৪ সালের "জর্ণাল অফ্ মেডিসিন" নামক পত্রে প্রকাশিত হয়। আমেরিকায় "নিউইয়র্ক হোম জর্ণাল" নামক কাগজে ও অন্যান্য বিলাতী কাগজেও প্রকাশ হইয়াছিল। কিন্তু ফরাসীদেশে সকলে যুক্তি করিয়া এই ব্যাপার চাপিয়া গেলেন, ইহা আর সাধারণের গোচর করিতে দিলেন না।

শ্রীমতী ব্লাভাট্‌স্কি এই ব্যাপার জনৈক দর্শকের মুখে শুনিয়া পত্রস্থ করিয়াছেন। গত আগষ্টের থিয়জফিষ্টে ইহা পুনঃ প্রকাশিত হইয়াছে।

শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

মাননীয় "অলৌকিক রহস্য" সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু—

মহাশয়—

আমার পূর্ব্বলিখিত "প্রেতের উপদেশ" নামক ঘটনাটি আপনার মাসিক পত্রে স্থান দিয়া আমাকে অত্যন্ত বাধিত করিয়াছেন। আর একটি ঘটনা আপনাকে লিখিয়া পাঠাইতেছি, যদি সাধারণের সমক্ষে ধরিবার উপযুক্ত বলিয়া বিবেচনা করেন, তাহা হইলে মুদ্রিত করিবেন। এ ঘটনাটিতে আমি ও আমার নাগপুরস্থ বন্ধুগুলি সকলে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছি। যদিও মেস্‌মেরিজম্ বিশেষ আশ্চর্য্যজনক নহে, তথাপি উহা দ্বারা যে আত্মার আবেশ হয়, তাহার বাক্য শ্রবণে সাতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়, তাহা নিশ্চিত। সেই জন্যই "রমেশের" আত্মার বাক্যগুলি সাধারণে প্রকাশ করিতে ইচ্ছা হইয়াছে।

আশা করি, যে উদ্দেশ্যে আপনার পত্রিকা প্রতিষ্ঠিত, সেই উদ্দেশ্যে সফলকাম হইতে ভগবান সহায়তা করুন। ইতি—

বিনীত—শ্রীমুরারিমোহন মুখোপাধ্যায়।
৩।১২ বাগবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মৃত বন্ধুর কথা।

আমি একসময়ে চাকুরী লইয়া মধ্যপ্রদেশের রাজধানী নাগপুরে গিয়াছিলাম। সেখানে প্রায় তিনমাস আমাকে থাকিতে হইয়াছিল। সেখানে যাইবার দুই এক সপ্তাহের মধ্যে তত্রস্থ সমস্ত বাঙ্গালী ভদ্রলোক-দিগের সহিত আমার বিশেষ পরিচয় হইয়াছিল এবং তন্মধ্যে মহেন্দ্র নামে একটি যুবকের সহিত এত অধিক অনুরাগ জন্মিয়াছিল যে, যদ্যপি কোন কারণে দুই একদিবস তাহাকে দেখিতে না পাইতাম, তাহা হইলে মনটা কিরূপ হইয়া যাইত।

যাহা হউক, বিদেশে এইরূপে তাঁহার সঙ্গ পাইয়া আমার কোনরূপ কষ্ট অনুভূত হইত না। একদিবস সন্ধ্যার প্রাক্কালে আমি অফিস্ হইতে ফিরিয়া আসিয়া কিছু জলযোগের পর বায়ু সেবনার্থ আমার বাসা বাটির নিকটস্থ জুম্মা ট্যাঙ্ক (Jumma tank) নামক অতি বৃহৎ পুষ্করিণীর ধারে বেড়াইতেছি, এমন সময়ে মহেন্দ্রকে শুষ্কমুখে আমার দিকে আসিতে দেখিলাম। তাহাকে সে অবস্থায় দেখিয়া আমি কারণ জিজ্ঞাসা না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। উত্তরে সে বলিল "ভাই, আজ আমি সংসারে আমার একটি প্রকৃত হৃদয়ের বন্ধু হারাইয়াছি! অত বড় দাদার নিকট হইতে পত্র পাইয়াছি যে, আমাদের দেশের বাটীর সন্নিকটস্থ আমার বাল্যবন্ধু রমেশ, দুইদিবস হইল প্রাণত্যাগ করিয়াছে! বলিব কি ভাই, এ সংবাদে আমার মনে কেমন একটা নিরাশার ছায়া আসিয়াছে! আজ সমস্ত দিন ইচ্ছা করিয়াও কোন কার্য্যে কিছুতেই মনোনিবেশ করিতে পারিতেছি না।"

মহেন্দ্রের মুখে রমেশের নাম শুনিয়া কেমন আমি আপনা-আপনি চমকিত হইয়া উঠিলাম। কারণ, আমি পূর্ব্বেই জানিতাম যে, মহেন্দ্রের বাটী জব্বলপুরে, এবং জব্বলপুরের যে অংশে উহাদের বাটী, সেই স্থানের রমেশ নামক একটি যুবকের সহিত আমার আন্তরিক বন্ধুত্ব ছিল। রমেশের নাম শুনিয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"রমেশ কি রাম বাবুর পুত্র?" আমার কথা শুনিয়া মহেন্দ্র বলিল "এই যে, তুমি তাহাকে চেন? তবে আর তাহার বিষয়ে তোমাকে কিছু বলিতে হইবে না।"

আমি বলিলাম—"তাহাকে আমি বিশেষভাবে জানি। তাহার সহিত আমার কয়েক মাস অতিবাহিত হইয়াছে এবং সেই সময়ে বুঝিয়াছি যে, তাহার ন্যায় সরল অন্তঃকরণবিশিষ্ট যুবক আমাদের মধ্যে অতি বিরল।

আরও বুঝিয়াছি, যে, সে শাস্ত্রদর্শী এবং একবার যে তাহার সহিত মিশিয়াছে, সে তাহাকে ভুলিয়া থাকিতে পারিবে না।”

আমরা এইরূপ কথা কহিতেছি, এমন সময়ে আমি যে বাসায় থাকিতাম, সেই বাসাস্থিত আর একটি বন্ধু সেই স্থানে উপস্থিত হইল এবং আমাকে উদ্দেশ করিয়া বলিল “দেখ ভাই, আগামী কল্য আমাদের বাসায় আমার একটি বন্ধুর আসিবার কথা আছে। তোমরা তাঁহার বিষয় অবগত নও। তিনি এক্ষণে ভুসাওয়াল (Bhusaval) হইতে ঝরসাগুডা (Jharsaguda) অভিমুখে যাইতেছেন। পথিমধ্যে আমার বিশেষ অনুরোধে তিনি একদিন মাত্র নাগপুরে থাকিতে সম্মত হইয়াছেন। তিনি একজন খুব ভাল মেস্‌মেরাইজার (Mesmeriser) এবং আমি দুই একবার তাঁহার ক্রিয়া-কলাপও অবলোকন করিয়াছি। বাস্তবিকই সে বিষয় দেখিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়।” এইকথা শুনিয়া মহেন্দ্র আমাকে জিজ্ঞাসা করিল “আচ্ছা দেখ, আমাদের মধ্যে কোন একজনকে মেস্‌মেরাইজ করাইয়া রমেশের আত্মার সম্বন্ধে খবর লইলে হয় না?” ইহাতে সেই আগত বন্ধুটি রমেশের পরিচয় সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করায় ও আমাদের নিকট হইতে পরে সমস্ত বিষয় অবগত হওয়াতে নিতান্ত দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলিল “হাঁ, সে সম্বন্ধে খবর পাওয়া যাইতে পারে।” আমরা তখন সম্মতি প্রকাশ করিয়া বলিলাম “তুমি কল্য প্রত্যূষে তবে ষ্টেশনে যাইও, আমরা অন্যদিকের বন্দোবস্ত করিয়া রাখিব।”

পরদিন রবিবার। আমাদের বলিবার পূর্ব্বেই প্রাতে সেই বন্ধুটি ষ্টেশনে চলিয়া গেল এবং প্রায় এক ঘণ্টার মধ্যেই তাহার পূর্ব্বকথিত বন্ধুর সহিত আসিয়া উপস্থিত হইল। আমরা দেখিলাম যে, লোকটি বেশ অমায়িক এবং তাঁহার বেশভূষার কোন পারিপাট্য নাই। লোকটির মুখে যেন হাসি সদাই বিরাজ করিতেছে; তাঁহার চক্ষু দুটি একটু ভাল করিয়া

দেখিলে স্পষ্টই বোধ হয়, যেন উহা সাধারণ লোকের চক্ষু অপেক্ষা অত্যুজ্জ্বল।

আমাদের আহারের প্রায় দুই ঘণ্টার পরে মহেন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে একটি নির্জ্জন প্রকোষ্ঠে একখানি ইজি চেয়ারে শয়ন করান হইল। মহেন্দ্রের কনিষ্ঠের বয়স প্রায় ১৮।১৯ বৎসর হইবে এবং তাহার শরীরও বেশ বলিষ্ঠ ছিল, অন্ততঃ আমাদের ন্যায় দুইজনের ক্ষমতা তাহার দেহে বর্ত্তমান। তাহার উপর আত্মার আবেশ করাইবার আরও একটি অন্যতম কারণ ছিল,—সে ওই সর্ক্ষবিষয় কিছু বিশ্বাস করিত না। যাহা হউক, শয়ন করাইবার দুই তিন মিনিট পরে সেই আগত ভদ্রলোকটি মহেন্দ্রের ভ্রাতার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন এবং তাহার প্রতি অতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন। পূর্ব্বেই মহেন্দ্রের ভ্রাতাকে তাহার দিকে অনিমেষ নয়নে চাহিতে বলা হইয়াছিল, এক্ষণে আমরা দেখিলাম, ক্রমেই মহেন্দ্রের ভ্রাতার চক্ষু নিমীলিত হইয়া আসিতেছে এবং হস্ত ও পদদ্বয় শিথিল হইয়া পড়িতেছে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীমুরারিমোহন মুখোপাধ্যায়।

অলৌকিক রহস্য।

৯ম সংখ্যা] দ্বিতীয় ভাগ। [পৌষ, ১৩১৭

৺গয়া-মাহাত্ম্য।

পিণ্ডপ্রদানে ভ্রমোৎপত্তি ও তাহার শোচনীয় পরিণাম।

৺গয়া মাহাত্ম্য স্তবকে আর একটি অত্যাশ্চর্য্য অথচ প্রকৃত ঘটনা লিপিবদ্ধ করিতে ইচ্ছা করি। ইহা অলীক বা কল্পনাপ্রসূত নহে—ইহা আমাদের নিজপরিবারের মধ্যে একটি শোচনীয় ব্যাপার। ইহা লিপিবদ্ধ করিবার প্রধান উদ্দেশ্য পাঠকবর্গকে সতর্ক করা। ঈশ্বর করুন, যেন কাহাকেও এরূপ লোমহর্ষণ শোচনীয় ঘটনার মধ্যে কথনও পতিত হইতে না হয়!

শুনিতে পাই, স্বর্ণময়ী ও করুণাময়ী নামে আমার দুইটি পিতৃস্বসা ছিলেন; তাঁহারা উভয়েই আমার পিতার জ্যেষ্ঠ ভগিনী। তন্মধ্যে স্বর্ণময়ী বিবাহের পর ১১।১২ বৎসর বয়সে ইহধাম পরিত্যাগ করেন। কনিষ্ঠার বয়স তখন ৭।৮ বৎসর হইবে।

আমার এক প্রপিতামহ, অর্থাৎ পিতামহের জ্যেষ্ঠতাত, "যকের" বিস্তর অর্থ পাইয়াছিলেন। শুনিতে পাই, আমাদের পুকুরে নাকি বহু দিন হইতে একটি 'যক' বাস করিত। অনেকে নাকি তাহাকে দেখিতে পাইত; কিন্তু সে কাহারও কোন অনিষ্ট করিত না। সেই

'যক' মৃত্যুকালীন আমার প্রপিতামহকে স্বপ্নে বলিয়া যায় যে, অমুক স্থানে অমুক গাছতলায় এক ঘড়া টাকা পোতা আছে; তিনি সেই টাকা লইয়া যথা ইচ্ছা ব্যয় করিতে পারেন! পরদিবস, উক্ত পোমশায় বাড়ীর কাহাকেও কিছু না জানাইয়া নিজে একখানি কোদাল লইয়া পুকুরধারে গেলেন। তাঁহাকে কোদাল লইয়া যাইতে দেখিয়া বাড়ীর লোকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনি কোথায় যাইতেছেন। তাঁহাদের প্রশ্নের স্পষ্ট উত্তর না দিয়া "বিশেষ কাজ আছে" বলিয়া চলিয়া গেলেন এবং যাইবার সময় তিনি বাড়ীর সকলকে নিষেধ করিয়া দিলেন যেন তাঁহার ফিরিয়া না আসা পর্য্যন্ত কেহ পুকুরধারে না যান। তিনি সেকেলে মানুষ, মনটাও সেকালের মতন শাদা ছিল। তাই আর পিছন পানে না তাকাইয়া তাড়াতাড়ি চলিতে আরম্ভ করিলেন। এদিকে বাড়ীর লোকেরা তাঁহার কথায় কিঞ্চিৎ বিস্মিত ও সন্দিগ্ধ হইয়া নিষেধবাক্য লঙ্ঘনপূর্ব্বক তাঁহার পশ্চাৎ অনুধাবন করিয়া একটি গুপ্তস্থানে থাকিয়া তাঁহার গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। অল্প সময়ের মধ্যে নির্দ্দিষ্ট স্থান খননপূর্ব্বক একটি ছোট পিত্তলের ঘড়া বাহির করিয়া একটা পুরাতন থলে ঢাকা দিয়া একবার এদিক ওদিক চাইয়া লইলেন। তারপর, সেই ঘড়াটি বাড়ী আনিয়া নিজের লোহার সিন্দুকের ভিতর রাখিয়া দিলেন। বাড়ীর সকলেই সব দেখিলেন, কিন্তু এ সম্বন্ধে তাঁহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে কাহারও সাহসে কুলাইল না। তিনিও এই যকপ্রদত্ত অর্থ সম্বন্ধে কাহাকেও কিছু বলিলেন না।

উক্ত অর্থপ্রাপ্তির অব্যবহিত কাল মধ্যে তিনি তীর্থপর্য্যটনে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। কোন তীর্থস্থানেই তিনি অধিক দিন যাপন করিতে পারিতেন না,—ভয় হইত পাছে তাঁহার যক্ প্রদত্ত অর্থ অপহৃত হয়!

সেই জন্য তিনি এক একবার করিয়া এক একটি তীর্থ দর্শন করিয়া আসিতেন। এইরূপ করিয়া তিনি প্রায় সকল তীর্থস্থান গুলি পরিভ্রমণ করিয়া আসিয়াছিলেন।

তিনি যেবার পিতৃকার্য্য সাধনোদ্দেশ্যে গয়াধামে যান, সেই সময় আমার পিতামহ তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা পূর্ব্বোক্ত স্বর্ণময়ীর নামে পিণ্ড-প্রদানের কথা বলিয়া দেন। সেই সময় পোমশায়ের সঙ্গে পাড়ার গুটিকতক লোকও গিয়াছিলেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, যেখানেই যাউন না কেন, বৃদ্ধের মন সেই লোহার সিন্দুকের দিকে পড়িয়া থাকিত! কোন স্থানে গিয়া সুস্থ হইয়া থাকিতে পারিতেন না। তাঁহার এবংপ্রকার চিত্তবিক্ষেপ হেতু সেবার পরিবারের মধ্যে তিনি যে একটি শোচনীয় ব্যাপার উপস্থিত করিয়াছিলেন, তাহা বর্ণনাতীত। উক্ত চিত্তবিভ্রমবশতঃ তিনি স্বর্ণ-ময়ীর নামে পিণ্ড না দিয়া কনিষ্ঠা করুণাময়ীর নামে দিয়া ফেলিলেন! তখন তাঁহার সহযাত্রিগণ বলিলেন, "তুমি কল্লে কি? স্বর্ণময়ীর নামে না দিয়া করুণাময়ীর নামে দিয়ে ফেল্লে! করুণা যে বেঁচে আছে!" তাহা শুনিয়া পাণ্ডামহাশয় বলিলেন, "এতক্ষণে সে আর বেঁচে নাই!" বৃদ্ধ তখন, "হায়, কি করিলাম!" বলিয়া মাথায় হাত দিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

পাণ্ডামহাশয়কে জিজ্ঞাসা করা হইল, ইহার কোন উপায়ান্তর আছে কি না? তিনি বলিলেন, "ইহার আর কি উপায় থাকিবে! বিষ্ণু-পাদপদ্মে তাঁহার নামে পিণ্ড প্রদান করা হইয়াছে, তিনি মুক্তিলাভ করিয়া বিষ্ণুলোকে গিয়াছেন—তাঁহার জন্য শোক করা উচিত নয়। এখন, যাঁর নামে পিণ্ড দিবার কথা, তাঁর নামে পুনরায় দেওয়া কর্ত্তব্য।" পাণ্ডামহাশয়ের আদেশানুযায়ী স্বর্ণময়ীর নামে পুনরায় পিণ্ড-

প্রদান করা হইল। সহযাত্রিগণকে বৃদ্ধ মিনতিপূর্ব্বক নিষেধ করিয়া দিলেন যেন, তাঁহার বাড়ীতে এই ভ্রম সম্বন্ধে কেহ কিছু না প্রকাশ করেন।

যথাসময়ে তাঁহারা পিতৃকার্য্য সাধন করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। প্রপিতামহমহাশয় গৃহে পদার্পণ করিবামাত্র করুণ আর্ত্তনাদ উত্থিত হইল। বৃদ্ধ মনোভাব গোপন রাখিতে পারিলেন না—তাঁহাদের সঙ্গে কাঁদিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু বাড়ীর লোকে তাঁহার ভ্রম সম্বন্ধে কিছুই জানিতেন না এবং বৃদ্ধও কাহাকে কিছু বলিলেন না। পরে তিনি শুনিলেন যে, আহারাদির পর করুণাময়ী শুইয়াছিল, হঠাৎ তাহার নিদ্রাভঙ্গ হইল এবং নিজের মাতাকে বলিল যে, মাথাটা যেন ঘুরিতেছে! তৎক্ষণাৎ বার দুই বমি করিয়া অজ্ঞান হইয়া পড়িল, সঙ্গে সঙ্গে সংজ্ঞালোপ হইল! ডাক্তার কবিরাজ ডাকিবার আর অবসর হইল না।

বুঝিতে পারা গেল, যেদিন যে সময় তাহার নামে ভুলক্রমে পিণ্ড প্রদান করা হইয়াছিল, ঠিক সেইদিন সেই সময় তাহার বিয়োগ হইয়াছিল। কিছু দিন পরে পাড়ার যাহারা পোমশায়ের সহিত গয়ায় গিয়াছিল, তাহাদের নিকট শুনা গেল যে, বৃদ্ধের অনবধানতাবশতঃ বালিকার উক্ত প্রকার অকালমৃত্যু সংঘটিত হইয়াছিল। ইহা শুনিয়া বৃদ্ধের উপর সকলেই চটিয়া গেলেন। কিন্তু চটিয়া আর কি করিবেন, কোন উপায় ছিল না—মরা মানুষকে ত আর ফিরাইয়া পাওয়া যায় না। তখন সকলেই নিয়তির দোহাই দিতে লাগিলেন।

বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়, জীবিত ব্যক্তির নামে গয়াতে পিণ্ড প্রদান করিলে মৃত্যু উপস্থিত হইবে! যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে অনেকেই ত শত্রুবিনাশকল্পে এই পথ অবলম্বন করিতে পারে? কিন্তু, এ পর্য্যন্ত

এ সম্বন্ধে ত কিছুই শুনা যায় নাই। জানি না, ইহার মধ্যে কি রহস্য নিহিত আছে! তবে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারা যায় যে, অসদভিপ্রায়ে কোন দেবতার নিকট কিছু প্রার্থনা করিলে কিংবা কোন ক্রিয়াকলাপ করিলে, তাহা সহজে সফল বা সিদ্ধ হয় না। যদি তাহাই হইত, তাহা হইলে, পৃথিবীর মধ্যে আরও কত প্রকার অভিনব পাপের প্রাদুর্ভাব হইত! ইহাও জানা আবশ্যক যে, অবিমৃশ্যকারিতার অবশ্যম্ভাবী ফল হইতে কেহ কখনও পরিত্রাণ পাইতে পারে না!

শ্রীঅমৃতলাল দাস।

কাঁকুড়গাছি।

অলৌকিক স্বপ্নাবলী।

আমার বন্ধু কলিকাতা, শ্যামবাজারনিবাসী শ্রীযুক্ত অপূর্ব্বকৃষ্ণ গুপ্ত বিদ্যানিধি মহাশয় তাঁহার পরলোকগতা সহধর্ম্মিণী সম্বন্ধে কতিপয় স্বপ্নদর্শন করেন। তাঁহার প্রমুখাৎ স্বপ্নবৃত্তান্ত অবগত হইয়া "অলৌকিক-রহস্যের" পাঠকগণকে উপহার দিলাম। এ গুলির মধ্যে সত্য নিহিত আছে বলিয়াই বিদ্যানিধি মহাশয়ের বিশ্বাস। স্বপ্ন-কথিত ভবিষ্যদ্বাণীর সফলতা-সম্বন্ধেও তাঁহার আশা আছে।

(১)

বিদ্যানিধি মহাশয় গত ৩১শে আষাঢ় শুক্রবার গৃহশূন্য হন। তিনি বরাবরই ধীর-প্রকৃতি, বিশেষ এ পরিণতবয়সে বিপত্নীক হইয়া অনেক সময় মৃগ-চর্ম্ম ও গৈরিকবসনেই অঙ্গাভরণ করেন। পুত্র কন্যাগণের পর্য্যবেক্ষণ, রোগীর চিকিৎসা ও অন্যান্য সাংসারিক কাজ কর্ম্মে

রত থাকায় পরলোকগত সহধর্ম্মিণীর অনুধ্যানের অবসর তাঁহার অল্পই ঘটিত। এইরূপে কয়েক মাস অতীত হইল। পরে গত বিজয়াদশমীর পর দিন বেলা সার্দ্ধ দ্বিপ্রহরের সময় যখন তিনি আপন বিশ্রামগৃহে মৃগচর্ম্মাসনে নিদ্রামগ্ন ছিলেন, তখন সহসা তাঁহার একটি স্বপ্নদর্শন ঘটে। তাঁহার বোধ হইল যেন তাঁহার পরলোক গত সহ-ধর্ম্মিণী তাঁহার নিকট আগমনপূর্ব্বক তাঁহাকে প্রণাম করিয়া কিছু-দূরে দণ্ডায়মান রহিলেন। তাঁহার মুখমাত্র দৃষ্টিগোচর হইতেছিল। আর সর্ব্বাঙ্গ একটা বেগুণি রঙ্গের আবরণে আবৃত। চিত্রে পরীর বেশ যেরূপ অঙ্কিত থাকে—ইহাও সেইরূপ। তাঁহার বসন হইতে যেন ঈষৎ জ্যোতিঃ নির্গত হইতেছিল। আর তাহার পদদ্বয় লক্ষিত হইতে-ছিল না, তিনি শূন্যে দণ্ডায়মান ছিলেন কি না, তাহাও ঠিক বোধগম্য হয় নাই।

বিদ্যানিধি মহাশয় আরও দেখিলেন যে, তাঁহার পত্নীর পশ্চাতে একজন দীর্ঘশ্মশ্রুল ঋষিতুল্য ব্যক্তি আগমন করিলেন। ঋষির আগমনে তাঁহার পত্নী অন্তর্হিতা হইলেন। তখন ঋষি যেন বিদ্যানিধি মহাশয়কে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "বৎস, পত্নী-বিরহে কাতর হইও না। তুমি সাধারণ সংসারীর মত নও। শিবশক্তি লইয়া তোমার জন্ম, সেই জন্য তোমার নাম পরেশ নাথ, আর এই শক্তির নাম দাক্ষায়ণী। নবম-বর্ষ বয়সে গৌরীদানে তোমার এই শক্তি লাভ হইয়াছিল। ইনি জীবদ্দশায় অনেক কথা বলিতেন বলিয়া তোমার সংসারে ইঁহাকে অনেক কথা সহিতে হইয়াছিল, তাই ইনি মৌনী হইয়া দেহ রাখিয়াছেন। আবার একাদশ-বর্ষ পরে এই শক্তি তোমার সহিত পুনর্ম্মিলিত হইবেন, কিন্তু এবার আর পত্নীরূপে নয়, ধর্ম্ম সাধনায় সহচরীরূপে। তুমি ব্রহ্মতেজ সাধন কর। সমস্ত স্ত্রীগণকে পূজা করিবে।

এই সময় বিদ্যানিধি মহাশয়ের নিদ্রাভঙ্গ হয়। বাস্তবিক তাঁহার রাশিনাম পরেশ নাথ ও তাঁহার সহধর্ম্মিণীর রাশিনাম দাক্ষায়ণী। আর তাঁহার চতুর্দ্দশ বর্ষ বয়ক্রমে নবম-বর্ষীয়া বালিকার সহিত তাঁহার পরিণয় হইয়াছিল। তিনি তাঁহার মাতৃ-দেবীর নিকট এই সমস্ত বিবরণ সত্য বলিয়া অবগত হইয়া বিশেষ আশ্চর্য্যান্বিত হন। এস্থলে ইহাও বলিয়া রাখা প্রয়োজন যে, বিদ্যানিধি মহাশয়ের পত্নী মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেনের ভ্রাতুষ্কন্যা ছিলেন। তাঁহার পিতাও একজন সাধক ছিলেন ও অল্প-বয়সে দেহত্যাগ করেন। বিদ্যানিধি মহাশয় তাঁহার শ্বশুর মহাশয়কে কখন দেখেন নাই। স্বপ্নের ঋষি যে কে, তাহাও অবশ্য আমরা জানিতে পারি নাই।

(২)

শারদীয়া পূজার পর বিদ্যানিধি মহাশয় পূর্ণিয়া জেলার অন্তর্গত চম্পানগরে বেড়াইতে যান। সেখানেও এক দিন ঐরূপ সময়ে দিবা দ্বিপ্রহর অতীত হইলে, নিদ্রিতাবস্থায় স্বপ্নে তাঁহার পত্নী ও উক্ত ঋষি দেখা দেন। এইরূপ যতবারই বিদ্যানিধি মহাশয় স্বপ্নে তাঁহার স্ত্রীর সন্দর্শন পাইয়াছেন, তাহা দিবা বা রাত্রির দুই হইতে আড়াই প্রহরের মধ্যে। এবার বিদ্যানিধি মহাশয় তাঁহার পত্নীকে দেখিয়া অত্যন্ত কাতরোক্তির সহিত বলেন, "তুমি এখানে থাক। তোমার যাওয়া হইবে না।" তাহাতে তাঁহার পত্নী বলেন, "তুমি ত জান আমি মৃত। মৃত লোক কি থাকিতে পারে।" এ কথা শুনিয়া বিদ্যানিধি মহাশয় অধীর হইয়া উঠেন, তাঁহার চক্ষুঃ অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠে। তখন তিনি তাঁহার পত্নীর সহিত যাইবার জন্য ব্যগ্র হন। তাঁহার ব্যাকুলতা দেখিয়া তাঁহার পত্নী বলেন, "তুমি কি বলিতেছ ? তুমি ত জান, আমি মৃত। মৃতের সঙ্গে কি যাওয়া যায় ?" তথাপি বিদ্যানিধি মহাশয়ের

ব্যগ্রতা কমিল না দেখিয়া, তিনি সস্মিতবদনে বলিলেন, "বেশ, আমি তোমাকে নিয়ে যেতে পারি, তোমার ছেলে-মেয়েদের জিজ্ঞাসা কর, যদি যাইতে দেয়।" বিদ্যানিধি মহাশয় তাঁহার পুত্র কন্যাগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কিন্তু কেহই তাঁহাকে যাইতে দিল না। তখন তিনি তাঁহার পত্নীকে এ বিষয় বলিলে, তিনি বলিলেন, "কি করিব বল, কেহ তোমায় যাইতে দিল না।" ইহা বলিয়া তিনি অন্তর্হিত হইয়া গেলেন। বিদ্যানিধি মহাশয় অত্যন্ত অধীর হইয়া উঠিলেন। তখন ঋষি তাঁহাকে বলিলেন, "তুমি কি উন্মাদ হইলে? তোমাকে পূর্ব্বে যে সমস্ত বলিয়াছি, তাহা স্মরণ কর। এত অধীর হ'লে হবে কেন?" তখন বিদ্যানিধি মহাশয় তাঁহার পত্নীকে একবার দেখিতে চাহেন। ঋষি বলিলেন, "তুমি ত জান তিনি মৃত।" বিদ্যানিধি মহাশয় বলেন, "আমি মৃতকেই দেখিব।" ইহা শুনিয়া ঋষি তাঁহার পত্নীর শ্মশানস্থ আর্দ্রবসনসিক্ত মৃতদেহ স্কন্ধে করিয়া আনয়নপূর্ব্বক ভূতলে রক্ষা করেন। অল্পক্ষণ পরে মৃত-দেহ চক্ষুঃ উন্মীলন করতঃ ঈষৎ হাস্য করে। পরে ঋষি বলেন, "এই ত মৃত-দেহ দেখ্‌লে, এখন নিয়ে যাই।" এই বলিয়া তিনি মৃত-দেহ স্কন্ধে করিয়া লইয়া গেলেন। বিদ্যানিধি মহাশয় তাঁহার পত্নীর ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়ার সময় শ্মশানে উপস্থিত ছিলেন না। পূর্ব্বেও তিনি কখন শ্মশানে যান নাই এবং দাহের পূর্ব্বে শবদেহ কি করা হয়, তাহাও তিনি জানিতেন না। তাঁহার বাটীর জনৈক কর্ম্মচারী তাঁহার পত্নীর অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার সময় শ্মশানে উপস্থিত ছিলেন। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করায়, তিনি পূর্ব্বোক্তরূপ ঘটনার উল্লেখ করেন। বিদ্যানিধি মহাশয় স্বপ্নে এই সত্য ঘটনার দৃশ্য দেখিয়াছিলেন, ইহা অতীব আশ্চর্য্যের বিষয়!

শ্রীখগেন্দ্রভূষণ সেন গুপ্ত বি. এ।

সাক্ষাৎ দেবীদর্শন ও তাঁহার সহিত কথোপকথন।

আমি ইতি :পূর্ব্বে অলৌকিক রহস্যের আশ্বিন মাহার সংখ্যায় এ বিষয় কতকটা লিখিয়াছিলাম। সম্প্রতি অন্য একটী ঘটনা যাহা আমার নিজ বাটীতে ঘটিয়াছিল, এই প্রবন্ধে তাহাই লি।খত হইবে।

প্রায় ৩।৪ বৎসর হইল, আমার বাড়ীতে যে ঘটনা আমি স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিয়াছি, তাহা যথাযথ নিম্নে বিবৃত করিলাম, যাহা এ অঞ্চলের অনেকেই অবগত আছেন।

আমার একটি কন্যাকে তাঁহার শ্বশুর বাড়ী পাঠাইবার উদ্যোগ হয়, জামাতা বাবাজীকে আনান হইল; পাঠাইবার দিনস্থির হইল। ধার্য্য দিনের ২।৩ দিন পূর্ব্ব হইতে প্রত্যহ ৩।৪ বার করিয়া মূর্চ্ছা হইতে লাগিল। জামাতা বাবাজী মেডিকেল কলেজে পড়িতে যাইবেন; তিনি হিষ্ট্রিয়া স্থির করিয়া সে অবস্থায় লইয়া যাওয়া সঙ্গত বিবেচনা না করিয়া স্বয়ং চলিয়া গেলেন। আমি দুই এক দিন ঐরূপ দেখিয়া চিকিৎসার বন্দোবস্ত করিলাম। প্রথম এলোপ্যাথিক ডাক্তার দ্বারা চিকিৎসা আরম্ভ হইল, দুই তিন দিন চিকিৎসায় কোন ফল উপলব্ধি না হওয়ায় তৎপরে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা আরম্ভ করিলাম। ক্রমে রোগের উপশম না হইয়া বরং বৃদ্ধিই হইতে লাগিল।

প্রত্যহ ৩।৪ বার করিয়া মূর্চ্ছা হইত, তাহার সময়ের কোন স্থিরতা ছিল না; মূর্চ্ছাভঙ্গের পর কতকক্ষণ নিস্তব্ধ ভাবে পড়িয়া থাকিত। এইরূপ কএক দিবস হইবার পর এক দিন মূর্চ্ছা ভঙ্গ করান হইয়াছে, তৎপরে মেয়েটা "এত্যা এত্যা" (মাথার দাঁড়িগুলি মাত্র।) করিয়া থাক্ দিয়া কাঁদিতে লাগিল; কিছুক্ষণ এইরূপ করার পর ক্রন্দন বন্ধ

হইল; তখন আপনাকে আপনি প্রশ্নোত্তর করিতে লাগিল। এখানে বলা আবশ্যক যে, ৺ সিদ্ধেশ্বরী দেবীর প্রতি কন্যাটীর প্রগাঢ় ভক্তি ছিল।

প্রশ্ন। হ্যাঁগা! এগুলি যে আপনার কাছে বসে আছেন, এঁরা কে? (প্রশ্ন এমন ভাবে করিল যে, তৎসময়ে তাহার মুখের ভাব দেখিলে স্বতঃই বোধ হয়, যেন সে সমস্ত দেখিয়া সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষে কথোপথন করিতেছে) তৎপরক্ষণেই ঈষদ্ধাস্য বদনে সুললিত মৃদু মধুর স্বর্গীয় ধ্বনিতে প্রশ্নের প্রত্যুত্তর মুখ হইতে বহির্গত হইতে লাগিল।

উত্তর। এটি আমার জ্যেষ্ঠা ভগিনী; ইনি কালীঘাটের কালী। (বলা বাহুল্য যে ৺ সিদ্ধেশ্বরী দেবীর সহিত তাহার প্রশ্নোত্তর হইতেছে)।

প্রঃ। আপনার বড় বোনের কাছে যিনি বসেছেন, উনি কে?

উঃ। উনি শীতলা, উনি আমার কাছেই ত বরাবর থাকেন; তুমি কি ইঁহাকে চিন না?

প্রঃ। হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি এ রকম চেহারা এঁর ত কখন দেখি নাই, সে জন্য চিনিতে পারি না, ওঁর পাশে যিনি দাঁড়িয়ে আছেন, তিনি কে?

উঃ। তাঁহার নাম রক্তাবতী; ইনি সর্ব্বদা আমাদের সেবার কার্য্যে থাকেন; যখন যাহা আবশ্যক, ইনি থাকিলে আমাদের আর কোন অসুবিধা ঘটে না। আরও কয়েকটী কে যে দেখিতেছ; এঁরা সর্ব্বদা আমার মন্দিরে থাকেন।

প্রঃ। আপনার বড় বোন্ কেন আসিয়াছেন গা?

উঃ। আমার জ্যেষ্ঠা ভগিনী বলিতেছেন যে, তোমার বাল্যাবস্থায় যে সময় অত্যন্ত কঠিন পীড়া হয়—বাঁচিবার আশা থাকে না, তৎসময়ে

তোমার মাতা, কালী ঘাটের কালীর নামে মানসিক করিয়া জল ছড়াইয়া দিয়াছিলেন; মানসিক এই করিয়া ছিলেন যে, যদি আমার এ মেয়েটী বাঁচে, ইহাকে লইয়া আপনার স্থানে পূজা দিয়া আসিব। তৎপরেই তুমি ক্রমে আরোগ্য হইলে, তোমার বিবাহ হইল, এখন শ্বশুর বাড়ী যাইতে বসিয়াছ; কোথায়? তাঁহার ত পূজা দেওয়া হইল না! তোমার মাতা উহা বিস্মরণ হইয়া গিয়াছেন। এই কারণে ইনি তোমার মূর্চ্ছা রোগ দিয়াছেন। আমায় মানসিক করিলে কি হইবে, তাঁহার পূজা দাও, আরাম হইয়া যাইবে।—

প্রঃ। তবে আমি কি করিব?

উঃ। তোমার পিতাকে বল, যে আপনি যে সব ঔষধাদি প্রয়োগ দ্বারা চিকিৎসা করিতেছেন, তাহাতে কোন ফল হইবে না; মূর্চ্ছার কারণ তাঁহার নিকট বলিয়া তৎপ্রতিবিধানের চেষ্টা করিতে বলিবে। তুমি এখন যাও, অনেক বেলা হয়েছে, তোমার ঘরে খুজবে।

প্রঃ। হ্যাঁ, যাই, বেলা হলে বাবা রাগ্‌বেন, আমি চারিপা গেলেই ঘরে পঁহুছে যাব; এই নাপিত ঘরের কাছে একপা, বামুন ঘরের কাছে এক পা, ও পুখুর আড়ায় এক পা, তার পরেই ঘরে পঁহুছে যাব। (সিদ্ধেশ্বরীর স্থান হইতে আমাদের বাড়ী ৪।৫ বিঘা অন্তর হইবে)। বলেই দাঁড়িয়ে উঠে লম্বা লম্বা পদ বিক্ষেপে ৪।৫ পা যেয়েই সামনে কপাট বন্ধ থাকায় আর যেতে না পেরে চমকিতের ন্যায় ঊর্দ্ধে ও পার্শ্বে চাহিয়া দেখিতে লাগিল, যেন ঘুমের ঘোর ভাঙ্গিয়া গেল, এইরূপ বোধ হইল। তখন আমি সঙ্গে ছিলাম, জিজ্ঞাসা করিলাম, কি গা, কোথায় গিয়েছিলি; দেখি না যে; তখন উত্তর করিল কোথা, আমিত বারেন্দার উপরে বসেছিলাম।—

আমি এ সমস্ত কথা বার্ত্তা শুনিতেছি বটে, কিন্তু কি কালের গতিক

এত শুনিয়াও তথাপি বিশ্বাস করিতে গিয়া সাত পাঁচ ভাবিতে লাগিলাম, এবং ঔষধ প্রয়োগেও ক্ষান্ত হইতে পারিলাম না। কুশিক্ষার ফলে বিধর্ম্মীর ভাব মনকে এরূপ অধিকার করিয়া লইয়াছে যে, প্রত্যক্ষ প্রমাণ-কেও অবিশ্বাস করিতে কুণ্ঠিত করিতেছে না। মনটী ঠিক স্প্রীং-এর মত হইয়াছে বিবেচনা করিলাম; কার্য্য দেখিয়া মনটীকে ধাপাইয়া লইয়া আসি; *কিন্তু স্প্রীং-এর বল বহির্দ্দিকে থাকায় উহা অল্প ঢিলা পাইলেই ঠিক* পাইলেই ঠিক সোজা হইয়া যায়। পুনঃ ঔষধ দিতে লাগিলাম। কোন ফল হইল না। তিন চারি ঘণ্টা সুস্থ থাকিয়া পুনরায় মূর্চ্ছিত হইল। মূর্চ্ছা ছাড়াইবার পর পূর্ব্ববৎ "এত্যা...এত্যা করিয়া থাক্ দিয়া কাঁদিতে লাগিল তৎপরে নিস্তব্ধ ভাবে খানিক পড়িয়া থাকিয়া কথা বার্ত্তা আরম্ভ হইল।—

প্রঃ। আমি আপনাদিগকে দেখিবার জন্য পলাইয়া আসিয়াছি।

উঃ। হ্যাঁ—আমিও তোমার দেখা পেলে বড় সন্তুষ্ট হই। আহা! মেয়ে ছেলেটী বড় ভক্ত। হ্যাঁগা জিজ্ঞাসা করি, বাবার কি বিশ্বাস হলোনা! তুমি ভাল ক'রে বুঝিয়ে বল্‌বে, কখনই ঔষধে ভাল হবেনা; বুঝেছি, আরও দুই চারি দিন দেখান্, তবে বাবার বিশ্বাস হবে।

প্রঃ। একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, আজ আপনাদের এত সাজ বেশ কেন গা?

উঃ। আমাদের (অমুক জায়গায়) পূজা আছে যাইতে হইবে, তুমি আজ বাড়ী যাও, কল্য আসিও; আমি তোমায় বড় ভাল বাসি।

ক্ষণিক নিদ্রাবেশের ন্যায় নিস্তব্ধ ভাবে পড়িয়া থাকিয়া পরে জাগিয়া উঠিল। মূর্চ্ছা ভঙ্গের পর এবং জাগৃত হইবার সময় একটী সুদীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিত।

পর দিবস আমি সদর প্রস্থে বসিয়া আছি, এমন সময়ে আমাদের

বাড়ীর নিকটবর্ত্তী গ্রামের একটী শিক্ষিত ভদ্রলোক আমার নিকট কোন কারণে আসিয়াছিলেন। তিনি আমায় বিমর্ষ দেখিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করায় তাঁহাকে আনুপূর্ব্বিক সমস্ত কথা বলিলাম। তিনি নব্য শিক্ষার পক্ষপাতী; এজন্য আমায় সঙ্গে লইয়া ৺ সিদ্ধেশ্বরীর হাটের দিকে চলিলেন এবং বলিলেন, মহাশয়! আমি এইরূপ হিষ্ট্রীয়া রোগী হোমিওপ্যাথিক ঔষধে ৩।৪টী আরোগ্য করিয়াছি। একটী ঔষধ খাওয়াইতে হইবে, একটী ঘাড়ে মালিস করিতে হইবে অন্যটী মস্তকোপরি দিতে হইবে। আমার কন্যাটী আরোগ্য করিবার চেষ্টা প্রবল হেতু তাঁহার কথাকেই শিরোধার্য্য করিলাম এবং বলিলাম আপনি কল্য প্রাতে ঔষধ পাঠাইয়া দিবেন। এই বলিয়া তাঁহাকে বিদায় দিয়া আমি বাটী প্রত্যাগত হইলাম, হাটে যাইবার সময় আমরা উভয় ভিন্ন আমাদের সহিত আর কেহ ছিল না। আমি বাটীতে উপস্থিত, সংবাদ পাইলাম কন্যাটীর মূর্চ্ছা হইয়াছে, তাড়াতাড়ি ভিতরে গেলাম এবং আমার জোষ্ঠা কন্যাকে তাহার মূর্চ্ছা ছাড়াইতে বলিলাম; সে মূর্চ্ছা সহজে অপনোদন করিবার একটা সূত্র জানিত। কটি পার্শ্বে মুঠা করিয়া ধরিলেই মূর্চ্ছা ছাড়িয়া যাইত।— মূর্চ্ছা ভঙ্গের পর পূর্ব্ববৎ কিয়ৎক্ষণ কাঁদিয়া নিস্তব্ধ হইল এবং কথাবার্ত্তা আরম্ভ হইল। আমি স্বয়ং কথার প্রত্যুত্তর দিতে লাগিলাম।

প্রঃ। আমি এসেছি গো মা।

উঃ। আচ্ছা আচ্ছা বোসো। দেখ্‌লে গা, বাবার তথাপি বিশ্বাস নাই, মেয়েছেলেটা কষ্ট পাচ্ছে। তখন আমি স্বয়ং বলিলাম কেন নাই।—

উঃ। বাবা! এইত আপনি অন্য একটী ভদ্রলোকের সহিত হাটের দিকে যাইতেছিলেন, সে ৩টা ঔষধ কল্য পাঠাইয়া দিবে, তাহার একটা খাইতে হইবে, একটা ঘাড়ে মালিস করিতে হইবে এবং অন্যটী

মস্তকোপরি দিতে হইবে, আপনি তথাপি ঔষধ ছাড়িতেছেন না। কি হইবে উহাতে কিছুই হইবে না বরং বৃদ্ধিই হইবে।

প্রঃ। তখন আমি বলিলাম, আমি নিশ্চয় বলিতেছি, আজ হ'তে আর কোন ঔষধ ব্যবহার করিব না, আপনি যাহা বলিবেন, তাহাই করিব।—(কারণ এই যে, যে সকল কথা আমরা উভয়ে বলিয়াছিলাম, তাহা উহার জানিবার কোন উপায় নাই, তখন মনে হইল যদি অজ্ঞাত বিষয় বলিতে পারে, তবে এইবার ভাল করিয়া পরীক্ষা করিব)।—

পর দিবস আমি বাহির প্রস্থে বসিয়া, বালেশ্বরের রাজা শ্রীযুক্ত রাজা বৈকুণ্ঠনাথ দের নিকট কোন আবশ্যক জন্য একখানি দরখাস্ত লিখিতেছি, প্রায় লেখা শেষ হইয়া আসিয়াছে,—এমন সময়ে বাড়ী হইতে একটী ছেলে আসিয়া বলিল, 'দিদির মূর্চ্ছা হইয়াছে, আপনি শীঘ্র আসুন।' আমি সমস্ত তদবস্থ ফেলিয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া গেলাম, আমার জ্যেষ্ঠা কন্যা তাহার মূর্চ্ছা ছাড়াইয়া দিল। পূর্ব্ববৎ কিয়ৎক্ষণ ক্রন্দন করিয়া নিস্তব্ধ হইল এবং কথাবার্ত্তা চলিতে লাগিল।

প্রঃ। আমার ঘরে অনেক কাজ প'ড়ে আছে, ঠাকুরমা সে সব কাজ কর্ত্তে বলেছিলেন, আপনাদের দেখ্‌বার জন্য আমার মন কেমন কর্ত্তে লাগ্‌লো ; তজ্জন্য সব ছেড়ে পালিয়ে এসেছি। সর্ব্বদাই আপনাদের দেখ্‌তে ইচ্ছা করে, ছেড়ে যেতে ইচ্ছা হয় না।

উঃ। আহা ! কত কষ্ট পাচ্ছিস, বাবার বোধ হয়, একটুকু বিশ্বাস হয়েছে।

প্রঃ। বাবার এই জন্য একটুকু বিশ্বাস হয়েছে যে, আমাদের কথা বার্ত্তা ও কি করে জানতে পাল্লে। ওগো আমি যে সব জান্‌তে পার্চ্ছি। তখন আমি বলিলাম, "আচ্ছা, বল দেখি আমি সদরে কি কর্ত্তেছিলাম।

উঃ। দরখাস্ত লিখ্‌তেছিলে।

প্রঃ। কাহাকে লিখিতেছিলাম বলিতে পার কি ?

উঃ। হ্যাঁ, যাহাকে লিখিতেছিলে, তাহার প্রথম অক্ষর "বৈ"; কি ? এবার হয়েছে ত ?

প্রঃ। আমি ও সব বুঝি না, গোটা নামটা বলিতে হইবে।

উঃ। রাজা বৈকুণ্ঠ নাথ দে। কেমন ?

প্রঃ। কি লিখিতেছিলাম ?

উঃ। একখানি দরখাস্ত।

প্রঃ। কোন্ বিষয় লিখিয়াছিলাম।

উঃ। এই এই বিষয় লিখিয়াছিলে।

তখন আমি বলিলাম, আমি যে অবিশ্বাস করিয়াছি, তজ্জন্য আমায় ক্ষমা করিবেন। এক্ষণে কি উপায়ে ভাল হইবে বলুন, আমি তাহাই করিব।

উঃ। কালীঘাটে গিয়া যথাসাধ্য পূজা দিয়া আসিতে হইবে। তজ্জন্য প্রথম একটী দিনস্থির কর, তৎপরে আমি সমস্ত বলিব। আমি পঞ্জিকা বাহির করিয়া মনে ভাবিতে লাগিলাম, যদি শীঘ্র মধ্যে দিনস্থির করি, তাহা হইলে অর্থাদি সংগ্রহ করা কঠিন হইয়া উঠিবে, আর যদি বিলম্বে দিনস্থির করি, তাহা হইলে ছেলে কষ্ট পায়। ইতস্ততঃ করিয়া শীঘ্রমধ্যেই দিনস্থির করিলাম।

আর মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম এইরূপ অবস্থায় কেমন করিয়াই বা লইয়া যাইব, পাল্কীতে বা রেলে যাইবার সময় মূর্চ্ছা হইলে কি করিব। এই রূপ ভাবিতেছি এমন সময়ে পুনরায় মূর্চ্ছা হইল; মূর্চ্ছা ভঙ্গের পর যখন দেবীর সহিত কথোপকথন হইতে লাগিল, তখন আমি প্রশ্ন করিতে লাগিলাম।

প্রঃ। আপনি যে কালীঘাটে গিয়া পূজা দিবার কথা বলিলেন তাহার ত দিন স্থির করা হইয়াছে, এক্ষণে কয়েকটী কথা জিজ্ঞাস্য এই হইতেছে যে, পাল্‌কী ও রেলে যাইবার সময় যদি এই রূপ মূর্চ্ছা হয়, তখন কি করিব।

উঃ। পাল্‌খী ও রেলে যাইবার সময় মূর্চ্ছা হইবে না। যেদিন ঘর হইতে যাইবে, সেইদিনের একদিন পূর্ব্ব হইতে কলিকাতায় পঁহুছা পর্য্যন্ত মূর্চ্ছা বন্ধ থাকিবে। পুনরায় সেখানে গেলে একবার হইবে মাত্র। কেননা হয়ত সকলে মনে করিবে যে মূর্চ্ছা ভাল হইয়া গিয়াছে, কিন্তু তাহা নহে। তবে যাইবার পূর্ব্বদিন হইতে যে দুইদিন বন্ধ হইবে, সে দুই দিনের যে বাদ গেল, একথা মনে করিবে না, মূর্চ্ছা বন্ধ হইবার পূর্ব্বদিবস—আগামী দুইদিনের, দুইবার করিয়া চারিবার মূর্চ্ছা অধিক দিয়া লইব।

প্রঃ। সঙ্গে কাহাকে লওয়া যাইবে ?

উঃ। সঙ্গে বেশী লোকের আবশ্যক নাই, তুমি যাইবে এবং একজন মেয়ে মানুষ যাইবে, আর তোমার শ্বশ্রূ ঠাকুরাণীকে বলিয়া পাঠাও ; তিনি অমুক (বালিচক) ষ্টেশনে উঠিবেন।

প্রঃ। এত শীঘ্র টাকা কড়ির যোগাড় কিরূপে করিব ? অপনি ও জানেন আমার পয়সা কড়ির অবস্থা সচ্ছল নহে।

উঃ। তোমার যে পয়সার অবস্থা স্বচ্ছল নহে, তাহা জানি, তবে চেষ্টা করিলেই সমস্ত জুটিয়া যাইবে, কিছুরই অভাব হইবেনা।

একটুকু পরেই চৈতন্য হইল। আমি কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলাম। বেহারার যোগাড় করিলাম। মেয়ে লোক দুই তিনটী জুটিল। কারণ অন্য গুলি কলিকাতায় কর্ম্ম করিবার উদ্দেশ্যে যেতে চাহিল। আমার শ্বশ্রূ ঠাকুরাণীকে বালিচক ষ্টেশনে উঠিবার জন্য লেখা হইল।

তৎপরে টাকার চেষ্টা করিতে গেলাম। অকস্মাৎ নিকটবর্ত্তী অন্য গ্রামের একটী লোক আমার নিকট উপস্থিত হইল। আমি তাহাকে বলিলাম, বাবু! আমায় গোটা পঁচিশেক টাকা হাওলাত দিতে পার? সে, বলা মাত্রেই বলিল, আপনি কল্য লোক পাঠাইয়া দিবেন, টাকা দিব। পর দিবস তাহার নিকট হইতে পঁচিশটী টাকা আনাইলাম। এত সময় সংক্ষেপ যে, কোন মহলে পাঠাইয়া টাকা আনাইতে সঙ্কুলান হইবে না। এখন যাইবার ভরসা হইল। তখন মনে হইল নির্দ্ধার্য্য দিনের পূর্ব্বদিন ও তৎপূর্ব্বদিন দেখিলেই জানিতে পারিব।

যে দিন যাইতে হইবে, তৎপূর্ব্ব দিবস প্রথম মূর্চ্ছা হইল। মূর্চ্ছা ভঙ্গের পর জিজ্ঞাসা করিতে আরম্ভ করিলাম।

প্রঃ। কিরূপ ভাবে পূজা দেওয়া হইবে?

উঃ। তোমার যেরূপ ইচ্ছা।

প্রঃ। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, মেয়েটীকে যাঁহার বাড়ীতে বিবাহ দেওয়া হইয়াছে, তাঁহারা বিষ্ণুধর্ম্মাবলম্বী, পাঁঠা দিয়া পূজা দেওয়া তাঁহাদের মনন না হইতে পারে।

উঃ। ক্ষতি নাই, যেরূপ অভিপ্রায় হয়, সেই মতই দিবে। তবে সেখানে মন্দাকিনীর ঘাটে ডাব দিয়া স্নান করাইয়া আমার নিকট পূজা দিয়া আমার হেম ঘটের জল খাওয়াইলেই আরোগ্য হইয়া যাইবে, আর হইবেনা।

এই কয়েকদিন এত কথাবার্ত্তা জিজ্ঞাসা হইল; কিন্তু আমি পামর আত্মবিস্মৃত, আমার নিজের সম্বন্ধে কিছুই জিজ্ঞাসা একদিনের জন্য হইল না; যাহা হউক, আজ একটা কথা জিজ্ঞাসা করিব। জিজ্ঞাসা করিলাম, আমি যাহা মনে করিয়া থাকি, তাহা আমার সিদ্ধ হইবে কি না?

উঃ। কেন হইবে না? অবশ্য হইবে।

প্রঃ। কিরূপে হইবে, কি প্রকরণ করিতে হইবে?

উঃ। বিশ্বাস থাকে অবশ্য হইবে, আগে বিশ্বাসটা দেখি, পরে বলিব।

প্রঃ। আমার এবার সম্পূর্ণ বিশ্বাস জন্মিয়াছে; এ বিশ্বাস আর কোন কালে অপনোদন হইবে না।

উঃ। তবে সময়ে হইবে।

এই বলিয়া আবেশ ছাড়িয়া গেল। যাইবার পূর্ব্বদিবস মূর্চ্ছা হইল। কিয়ৎক্ষণ পরে পুনরায় মূর্চ্ছা হইল। এইরূপে চারিবার মূর্চ্ছা হইলে পর বলিতে লাগিল, না দুই দিনের বাধা যে চারিবার মূর্চ্ছা অতিরিক্ত হইবার কথা বলিয়াছিলাম, তাহা দিলে মুখখানি এত বেদনা হইবে যে, কথা কহিতে পারিবে না। ছেলে মানুষ এত সহ্য করিতে পারিবে না, দুইদিনের বাবত দুইবার দিলেই যথেষ্ট হইবে। ফলে তাহাই হইল।

পর দিন যাইবার উদ্যোগ করা হইতেছে; প্রভাত অবধি আর মূর্চ্ছা নাই দেখিয়া পাল্কীতে করিয়া লইয়া চলিলাম। রেল আমাদের বাড়ী হইতে প্রায় ১৮ মাইল, মেয়ে লোকগুলি সঙ্গে সঙ্গে চলিল।

আমি ঘোটকারোহণে গড় খাইএর নিকট উপস্থিত, এমন সময়ে আমার একটী প্রজা, যাহাকে ইতিপূর্ব্বে টাকার জন্য তলব দেওয়া হয় নাই, সে অকস্মাৎ আমার সম্মুখের দিকে ছুটিয়া আসিতে আসিতে দূর হইতে বলিতে লাগিল, আপনি কোথায় চলিলেন? আমার খাজনাটা লইলেন না? আমি টাকা আনিয়াছিলাম। আমি তখন পরম সন্তুষ্ট হইয়া ঈশ্বরকে ধন্যবাদ প্রদান করতঃ তাহাকে আমার বাড়ী হইতে দোয়াত কলম আনিতে বলিলাম, সে তৎক্ষণাৎ লইয়া আসিলে তাহার নিকট হইতে সাতটী টাকা লইয়া রসিদ দিয়া গম্য পথে অগ্রসর হইলাম। পরে রেলে উঠিয়া চারিটী ষ্টেশন যাওয়ার পর শ্বশ্রূ ঠাকুরাণীও

উঠিলেন, তখন হাবড়াতে পঁহুছিলাম। গঙ্গার পশ্চিম পারে জামাতা বাবাজী ছিলেন, তাঁহার বাসা অনুসন্ধান করিয়া সেই বাসার নিকট একটী বাসা করিয়া থাকা হইল। সন্ধ্যায় জামাতা ও বৈবাহিক মহাশয়ের সহিত সাক্ষাত হইল। পর দিন প্রাতে একবার মূর্চ্ছা হইবার কথা। পূজা দিবার জন্য যাইবার উদ্যোগ হইতেছে, আমি মনে করিলাম, প্রায় আর মূর্চ্ছা হইবে না, এমন সময়ে একটী মেয়ে মানুষ আসিয়া বলিল 'আপনি আসুন, মূর্চ্ছা হইয়াছে' তখন গিয়া স্বয়ং মূর্চ্ছা ছাড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনি যে মন্দাকিনী ঘাটে স্নান করাইবার কথা বলিয়াছিলেন, মন্দাকিনী ঘাট কোন্‌টা তাহা ত আমি জানি না। জিজ্ঞাসার পরে যেন একটুকু উষ্মাভরে উত্তর হইল, 'কি? মন্দাকিনী ঘাট জান না? ঐ, মন্দিরের সাম্‌নে যে ঘাট, তাহারই নাম মন্দাকিনী ঘাট; সেইখানে স্নান করাইয়া পূজা দিবে, আর সপ্তাহকাল কলিকাতায় থাকিয়া বাড়ী যাইবে।

আমরা বাসা হইতে বাহির হইয়া গঙ্গা পার হইলাম। পর পারে উঠিয়া ঘোড়ার গাড়িতে কালীঘাটে উপস্থিত হইয়া মন্দাকিনী ঘাটে কথিত মত স্নান করাইয়া মায়ের পূজা দিয়া হেম ঘটের জল খাওয়াইয়া বাসায় লইয়া আসিলাম। সপ্তাহকাল বাসাতে রাখিয়া পরে বাড়ী আনিলাম।

কিছুদিন পরে তাহাকে শ্বশুর বাড়ী পাঠান হয়। তখন পর্য্যন্ত আর মূর্চ্ছাদি কিছুই হয় নাই। কিছুদিন যাওয়ার পর আমার পরিবারের মৃত্যু হয়। এই সংবাদ শ্রবণে একবার মূর্চ্ছা হইয়াছিল। মূর্চ্ছার কথা শুনিয়া আমি এখান হইতে ৺সিদ্ধেশ্বরী দেবীর বিল্বপত্র ও ডুমরা পাঠাই। কিছুদিন পরে ঐ ডুমরাটি কোথায় পড়িয়া যায়। তখন সেখান হইতে আমার কন্যা লিখিল, বাবা! ডুমরাটী কোথায় পড়িয়া

গিয়াছে, আপনি সেখানে মায়ের নিকট বিল্বপত্র দিয়া আমার নিকট পাঠাইবেন, এবং একটী ডুমরাও পাঠাইবেন। অনেক দিন ফুল বেলপাত পাই নাই। তখন আমি দেবীর নিকট বিল্বপত্র ও পূজাদি দিয়া, সেই বিল্বপত্র পাঠাইবার উদ্যোগ দেখিতেছি ও একটী ডুমরার অনুসন্ধান করিতেছি; দুই তিন দিন পরে আমার কন্যার নিকট হইতে যে পত্র পাইলাম, তাহা শুনিলে গাত্র রোমাঞ্চিত হয় এবং তাহার পরা ভক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শনে প্রীত হইয়া পরমানন্দে প্লাবিত হইতে হয়।

অবশ্যই সকলে সংবাদটী শুনিবার জন্য উৎসুক, সন্দেহ নাই। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, জামাতা বাড়ীর সকলে বিষ্ণুভক্ত। তাঁহাদের বাড়ীর সকলেই মনে করিতেন যে, কথিত বিষয়গুলি অসম্ভব; তবে কলিকাতায় যাওয়ার সময় জামাতা জাবাজী ও বৈবাহিক মহাশয় একটী মূর্চ্ছার পর দুই চারিটী কথা যাহা শুনিয়াছিলেন মাত্র, বিশেষ সে দিন কোন বিশেষ কথা হয় নাই। আমি এখানে যে দিন কন্যার জন্য বিল্বপত্র দিয়াছিলাম, সেই দিবস আমার কন্যা যথাসময়ে তাহার শাশুড়ীর সহিত স্নান করিতে গিয়াছিল। স্নান করিয়া উভয়ে বাটীমধ্যে পঁহুছিয়াছেন, এমন সময়ে আমার কন্যা বলিয়া উঠিল, আমায় কেমন করিয়া আনিয়াছে, আমাকে শীঘ্র ধর; এই বলিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল, হস্ত মুষ্টিবদ্ধ হইয়া গেল হস্তপদ কাষ্ঠবৎ শক্ত হইয়া গেল। দুই তিন জন মেয়ে এবং তাহার শাশুড়ী দাঁতের খিল খুলিয়া দিয়া মুখে চোখে জল দিয়া হাতের মুঠা খুলিতে গিয়া দেখেন, হস্তমধ্যে টসটসে কাঁচা বিল্বপত্র ও তাহাতে এমন এক প্রকার সিন্দুর রহিয়াছে, যাহার উপর দৃষ্টিপাত করিলে মনে ভয় জন্মে। এরূপ বিল্বপত্র সেখানে পাইবার কোন আশা নাই। সকলেই দেখিয়া বিস্মিত হইলেন এবং দেবীকে সুবর্ণ বিল্বপত্র দিয়া পূজা দিবার মানসিক করিলেন। আমার কন্যা সেই বিল্বপত্র পাইয়া ধারণের অভিপ্রায়ে,

ডুমরার জন্য আমাকে লিখিবে মনে করিতেছিল, সেই দিবস প্রত্যূষে নিদ্রাভঙ্গের পূর্ব্বেই মনে হইল, যেন কে বলিতেছে, মা, এই নে। ঘুম ভাঙ্গায় দেখিল, উভয় মুখ বন্ধ করা একটী ডুমরা, একটী সরু চুলের দড়ি গলান সেই চুলের দড়িটী উহার অঙ্গুলিতে গলান রহিয়াছে। মুঠার মধ্যে ডুমরা এবং একটী বিল্বপত্রে সরিষার ন্যায় একটী বস্তু রহিয়াছে; অথচ উহা সরিষা নহে। এ বিষয় তাঁহাদের বাড়ী হইতে অনেকে আমাকে লিখি-লেন এবং তাহা যে কি এবং কি করিতে হইবে, তাহা জানিতে চাহিলেন। আমার বামনদাদা জীবিত থাকিলে আর ভাবিতে হইত না। তিনি প্রায় দুই বৎসর ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। আমি পরে লিখিব সম্প্রতি উহা সাবধান করিয়া রাখ বলিয়া লিখিলাম এবং এখানে আনিয়া পূজা দিবার জন্য তাহার শ্বশুর শাশুড়ীকে লিখিলাম। তাঁহারাও এ বিষয়ে সমুৎসুক ছিলেন, স্বীকার পত্রী পাইয়া কন্যাকে বাড়ীতে আনিলাম—এবং মায়ের পূজা দিয়া ঔষধটীর কর্ত্তব্য প্রতিবিধান করতঃ শ্বশুরালয়ে পুনঃ প্রেরণ করিলাম।—

আমার পূর্ব্ব প্রবন্ধ দেখিয়া যে সকল মহাত্মা আমাকে সেই বিষয় লিখিয়াছিলেন, আমি তাঁহাদের উত্তর প্রদানে বিস্মৃত হই নাই। তবে কার্ত্তিক চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় উকীল মহাশয়ের নম্বর অস্পষ্ট থাকায় প্রত্যুত্তর যথাস্থানে পঁহুছিয়াছে কিনা, জানি না। আর পূর্ব্ব প্রবন্ধ দর্শনে আমাকে জ্যোতিষে পারদর্শী বলিয়া বিবেচনা না করেন, ইহাই প্রার্থনা; তবে আবশ্যকমতে যৎসামান্য যাহা জানি; তাহা অকিঞ্চিৎকর বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

শ্রীচৌধুরী ত্রৈলোক্য নাথ মিত্র।
গড়ধুমুন্দা
পোঃ খড়ইগড়,—জেলা মেদিনীপুর।

মারণ।

"প্রাণিনাম্ প্রাণহরণং মারণং তদুদাহৃতং।" ইতি তন্ত্রসার।

অভীষ্ট ব্যক্তির জীবনীশক্তির হীনতা করিয়া তাহার শরীরে রোগোৎপাদন করিয়া মারিয়া ফেলার নাম মারণ। ডাইনি প্রভৃতি অনেক শ্রেণীর মন্ত্র বিস্তাবান্ লোক দ্বারা এইরূপ কার্য্য হওয়া শুনা যায়। আমাদের দেশে বাণ মারিয়া বৃক্ষাদি মারিয়া ফেলিবার শক্তি অনেকের থাকা দেখা যায়। ইহাও এক প্রকার হিপ্নটিজ্ম্, যাঁহারা আজকালকার শিক্ষিত ব্যক্তিদের দ্বারা আলোচিত হিপ্নটিজ্ম্ বিশ্বাস করিতে পারিয়াছেন, তাহাদের এই মারণ শক্তি অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ দেখি না। হিপ্নটিজ্ম্ সাহায্যে রোগ আরোগ্য করা যাইলে রোগ উৎপন্ন করিতেও অবশ্য পারা যায়, যাহা হউক এ সম্বন্ধে পশ্চাৎ আলোচনা করা যাইবেক।

গুপ্তবিস্থার প্রকাশিকা শ্রীমতী ব্ল্যাভাট্স্কি মহোদয়া নীলগিরি উপত্যকার সম্বন্ধে একটি পুস্তক লেখেন, যাহা ইংরাজিতে অনুবাদিত হইয়া ক্রমশঃ থিয়জফিষ্ট নামক পত্রিকায় প্রকাশ হইতেছে। উক্ত পত্রিকা হইতে আমরা এই মারণের ঘটনাটি এই স্থলে প্রকাশ করিলাম।

নীলগিরি উপত্যকায় সাহেবদের গতিবিধির পূর্ব্বে তিন জাতীয় লোকের বাস থাকে। টোডা জাতি, ইহাদের লোকেরা দেবসদৃশ সুদৃশ্য ও সদ্গুণসম্পন্ন, ব্যাডাগা জাতি, ইহারা টোডা জাতির ভৃত্যের ন্যায়, এবং কুরুম্বা জাতি, ইহারা কৃষ্ণবর্ণ, খর্ব্বকায়, বামন সদৃশ, ইহারা আবার দুই শ্রেণীতে বিভক্ত, মধুকুরুম্বা ও মল কুরুম্বা। গুপ্তশক্তি পরিচালনে টোডা ও মল কুরুম্বা বিশেষ পারদর্শী। মল কুরুম্বদের কোন ক্ষতি করিলেই তাহারা সেই ব্যক্তির প্রতি এরূপ দৃষ্টি করিবে যে, দৃষ্ট ব্যক্তির জীবনাশা আর থাকিবে না,

উক্ত ব্যক্তিকে অবিলম্বে দুরারোগ্য রোগাক্রান্ত হইয়া সমন সদনে যাইতে হইবেক। এই রোগের আধুনিক চিকিৎসায় কোন ফল হইবে না। ইহাতে রোগীর জীবনীশক্তি (vitality) বা প্রাণশক্তি কুরুম্বা কর্ত্তৃক শোষিত হইয়াছে, এই প্রাণশক্তি প্রদানের উপায় আধুনিক চিকিৎসাতে নাই। তবে এইরূপ রোগী ঐস্থানের টোডা জাতিদের নিকট যাইয়া পড়িলে তাঁহারা আরোগ্য করিতে পারেন। কিন্তু এই টোডারা মদ্যপায়ী বা ইন্দ্রিয়পরায়ণ ব্যক্তিকে ঐরূপ রোগাক্রান্ত দেখিলেও চিকিৎসায় গ্রহণ করেন না, নিজ ঐশী শক্তিবলে রোগী মদ্যপায়ী বা ইন্দ্রিয়সেবী কি না, জানিতে পারেন। ইঁহাদের চিকিৎসাও সাধারণের জ্ঞানাগম্য, যে প্রাণশক্তি কুরুম্বা কর্ত্তৃক শোষিত হইয়াছে, সেই প্রাণশক্তি রোগিদেহে প্রচুর পরিমাণে চালিয়া দিবার উপায় ইহারা জানেন ও সূর্য্যরশ্মি হইতে যে প্রাণশক্তি উৎপন্ন হইয়া চতুর্দ্দিকে যাইতেছে, তাহাও ইহারা জানেন বলিয়া রোগীকে রৌদ্রে রাখিয়া সূর্য্যরশ্মির মধ্য হইতে প্রাণশক্তি রোগি-দেহে প্রবেশ করাইয়া তাহা রোগিদেহে কার্য্য করিবার উপযোগী করিয়া দেন ও কুরুম্বার শক্তি নষ্ট করিবার জন্য মন্ত্রপূত দুগ্ধ রোগীকে খাইতে দিয়া অবিলম্বে রোগীকে সুস্থ করেন ও তাহার দেহ কুরুম্বার শক্তি হইতে রক্ষা হয় এরূপ কবচ মত করিয়া দেন। এই প্রাণশক্তি সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ হিপ্‌নটিজ্‌ম্‌ সম্বন্ধে আলোচিত হইবে। এক্ষণে পাঠকবর্গ মল কুরুম্বাদের প্রাণশক্তি শোষকদৃষ্টির বিষময় ক্রিয়ার বর্ণনা শুনুন।

মান্দ্রাজের এক বড় সরকারি কর্ম্মচারী, মান্দ্রাজের সাহেব সমাজের সিংহস্বরূপ ছিলেন, আমরা তাঁহাকে মিষ্টার কে বলিয়া তাঁহার নাম প্রকাশ করিলাম না। তিনি কয়েকজনা বন্ধু সহ শীকার করিতে গিয়াছেন, সঙ্গে দেশী শিকারী কয়েকজনা ও বহুসংখ্যক ভৃত্যও আছে। একটি হস্তীশিকারের পর দেখা গেল যে হস্তীটির দাঁত কাটিবার ছুরি

আনিতে ভুল হইয়াছে। হস্তিদেহটি চারিজনা ব্যাডাগা শিকারীর জেম্মায় রাখিয়া সাহেব সদলে একটি স্থানে আহারার্থ চলিয়া গেলেন। দুই ঘণ্টা মধ্যে ছুরি আনিবার ব্যবস্থা হইল।

মিষ্টার কে ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন প্রায় ১২ জন মল কুরুম্ব হাতীর উপর বসিয়া তাহার দাঁত কাটিবার ব্যবস্থা করিতেছে। সাহেবের দিকে না চাহিয়াই তাহারা বলিল "হাতীটি আমাদের জমিতে আসিয়া মরিয়াছে, এ কারণ ইহা আমাদের প্রাপ্য বলিয়া আমরা লইতেছি।" বস্তুতঃ কয়েক পদ অন্তরে ইহাদের ঘর ছিল। মিষ্টার বড়ই ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, 'ইহারা যগুপি না চলিয়া যায়, তবে আমি চাকর দিয়া ইহাদের চাবকাইয়া দিব।' কুরুম্বারা শুনিয়া তাচ্ছিল্যভাবে হাসিতে হাসিতে আপন কাজ করিতে লাগিল, সরিল না। মিষ্টার কে চাকরদের ডাকিয়া তাহাদের এই বামনদের তাড়াইয়া দিতে বলিলেন, কিন্তু কেহই তাঁহার আদেশ পালন করিল না। অনেক ব্যাডাগা ভয়ে সাহেবের নিকট হইতে পলাইয়া গেল। যাহারা রহিল, তাহারা হেঁটমাথায় ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে মড়ার মত মলিন হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। মল কুরুম্বারা হাতীর উপর পোকার ন্যায় বসিয়া আছে, কিছুতেই উঠিবে না। এইবার তাহারা সাহেবের দিকে তাচ্ছিল্যভাবে দৃষ্টি করিল; দাঁত কড়মড় করিয়া সাহেবকে তাহাদের মারিবার জন্য ডাকিতে লাগিল। সাহেব আর সহ্য করিতে পারিলেন না, তিনি বলিলেন "ভীরু চাকরগণ তোমরা এই শত্রুদের তাড়াইয়া দিবে কি না?" একটি বৃদ্ধ শিকারী বলিল "সাহেব ইহা অসম্ভব, উহারা উহাদের জমিতে রহিয়াছে, উহাদের তাড়াইলে আমাদের মৃত্যু নিশ্চয়।" মিষ্টার কে সাহেব ক্রোধে চীৎকার করিতে করিতে ঘোড়া হইতে লাফাইয়া পড়িলেন। এমন সময় কুরুম্বাদের দলপতি হাতীটির মাথার উপর লাফাইয়া উঠিয়া, মুখ বিকৃতি করিতে

করিতে নৃত্য করিতে থাকিল, দাঁত কামড়াইতে ও শৃগালের মত ডাকিতে ডাকিতে মুষ্টিবদ্ধ করিয়া মাথা নাড়িতে লাগিল। লোকটার চেহারা যেন পাপের পূর্ণ মূর্ত্তি, তাহার খর্ব্বকায় দেহ যথাসাধ্য দীর্ঘ করিয়া, উপস্থিত লোকদিগকে সর্পদৃষ্টিতে দেখিতে দেখিতে বলিতে লাগিল "যে প্রথমে আমাদের হাতী স্পর্শ করিবে, তাহাকে শীঘ্রই আমাদের বিষয় ভাবিতে হইবে, তাহার এই পূর্ণিমার পূর্ব্বেই মৃত্যু হইবেক।" তখন শুক্লচতুর্থী ছিল, এই শাসনবাক্যের কোন প্রয়োজন ছিল না, কারণ সাহেবের কোন লোক হাতীর ধারে যাইতে সাহস করে নাই।

মিষ্টার কে যথেষ্ট অপমান বোধ করিলেন, তিনি দোষী নির্দ্দোষী সকলকে একধার হইতে চাবুক মারিতে লাগিলেন। কুরুম্বাদলপতিকে ধরিয়া তাহার চুলের ঝুঁটি ধরিয়া দূরে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিলেন। অন্যান্য কুরুম্বারা যাহারা হাতীর দাঁতে ও কাণে রক্তশোষক বেতালের মত কামড়াইয়া বসিয়াছিল, তাহাদের সাহেব এইবারে বেত্রাঘাত করিতে লাগিলেন। তাহারা পলাইয়া সাহেবের নিকট হইতে দশ পা দূরে দাঁড়াইয়া সাহেব যখন দাঁত কাটিতেছিলেন, তখন সাহেবের উপর দৃষ্টি করিতে লাগিল। মিষ্টার কে সাহেবের ভৃত্যগণ পশ্চাৎ এইরূপ বলিয়াছিল।

নিজের কাজ সারিয়া সাহেব পুনরায় ঘোড়ায় উঠিতে যাইতেছেন, এমন সময়ে সাহেবের দৃষ্টি কুরুম্বাদলপতির দৃষ্টির উপর পড়িল। মিষ্টার কে সন্ধ্যাকালে বন্ধুবর্গের সহিত আহার করিতে করিতে এইরূপ বলিয়াছিলেন "এই রাক্ষসটার দৃষ্টি হইতে আমার ভেকের দৃষ্টির কথা স্মরণ হইল। এই দৃষ্টিতে আমি অসুস্থবোধ করিলাম। আমি স্থির থাকিতে পারিলাম না, তাহাকে পুনরায় ধাক্কা ধুক্কি দিলাম। পূর্ব্বে ইহাকে চুল ধরিয়া যে স্থানে ফেলিয়াছিলাম, সেই স্থানে অচলভাবে এ পর্য্যন্ত পড়িয়া-

ছিল, এক্ষণে তাড়াতাড়ি উঠিল, কিন্তু কি আশ্চর্য্য, পলাইয়া গেল না, এক পদ সরিয়া গিয়া আমাদের দিকে দৃষ্টি করিতে লাগিল।”

সাহেবের একটি বন্ধু বলিলেন “এই শত্রুগণ প্রতিশোধ লইয়া থাকে, তোমার একটু ধৈর্য্য ধরা উচিত ছিল।” সাহেব উচ্চহাস্যে বলিলেন “আমার শীকারীরাও ঐ কথা বলে। শীকারীরা প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত লোকের মত ভীতমনে বাটী আসিল। তাহারা কুরুস্বাদের দৃষ্টিকে বড় ভয় করে, বেচারীরা মূর্খ, অন্ধবিশ্বাসী, আমাদের অনেক পূর্ব্ব হইতেই ইহাদের শিক্ষিত করা উচিত ছিল, ইহাদের দৃষ্টিতে কোন শক্তি নাই, এ কথা বেচারাদের বুঝান উচিত ছিল। আমার ঐ দৃষ্টিতে কিন্তু বেশ ক্ষুধা বাড়িয়াছে।” এই সমস্তক্ষণ মিষ্টার কে সাহেব হিন্দুদের অন্ধ-বিশ্বাসকে বিদ্রূপ করিতে লাগিলেন।

মিষ্টার কে প্রত্যহ প্রত্যূষে উঠিয়া থাকেন। কিন্তু পরদিন তিনি মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত ঘুমাইলেন, বলিলেন কাল বেশী পরিশ্রম হইয়াছে, না ঘুমাইলে শরীর ভাল হইতেছে না। রাত্রে তাঁহার ডান বাহুতে ভয়ানক বেদনা বোধ হইল। সাহেব বলিলেন “আমার পুরাতন বাত আবার দেখা দিয়াছে, কয়েক দিনেই সারিয়া যাইবে।” দ্বিতীয় দিন প্রাতে তিনি এত দুর্ব্বল বোধ করিলেন যে, উঠিতে পারিলেন না। তৃতীয় দিন হইতে শয্যাশায়ী হইলেন। ডাক্তার তাঁহার পীড়ার কারণ নির্ণয় করিতে পারিল না। তাঁহার কোন জ্বর নাই, কেবল দুর্ব্বলতা এক প্রকার যাহার কারণ নাই ও সমস্ত শরীর শিথিল মত বোধ হইতেছে। একটি বন্ধুর কাছে সাহেব বলেন “আমার বোধ হয় শিরা মধ্যে রক্তের পরিবর্ত্তে শীশা রহিয়াছে।”

তিনি বলিয়াছিলেন, কুরুস্বার দৃষ্টিতে ক্ষুধা বাড়িয়াছে, তাহা দুই এক দিনে শেষ হইল, সাহেবের অনিদ্রা আসিল। নিদ্রাকারক কোন

ঔষধে কিছু ফল হইল না। চারি দিন মধ্যে সুস্থ সবল মিষ্টার কে কঙ্কালসার হইলেন। পঞ্চম রাত্রেও তাঁহার নিদ্রা হয় না, অন্য ঘরে ডাক্তার নিদ্রা যাইতেছেন, সাহেবের চীৎকারে সকলে উঠিয়া পড়িলেন "এই রাক্ষসটাকে তাড়াইয়া দেও, কে এ বেটাকে এখানে আসিতে দিল, ইহার কি প্রয়োজন, আমার দিকে এরূপ ভাবে চহিয়া আছে কেন?" সাহেব অতি কষ্টে একটি বাতিদান লইয়া ঐ কাল্পনিক কুরুস্বার দিকে ছুড়িয়া দেওয়ায় ঘরের ভিতরকার একটি আয়না একেবারে গুঁড়া হইয়া গেল।

ডাক্তার বলিলেন ইহা প্রলাপ মাত্র। মিষ্টার কে সমস্ত রাত্রি চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল যে কুরুস্বাকে আমি মারিয়াছিলাম, সে আমার পদতলের দিকে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, প্রাতঃকাল হইবার পূর্ব্বে ঐ কুরুস্বাকে সাহেব আর দেখিতে পাইলেন না এবং সকালেও নিজের দৃষ্টির প্রকৃত কোন ভ্রম নাই এ কথা বলিতে লাগিলেন। পর রাত্রে তিনি কাহাকেও দেখেন নাই। তাঁহার মন্দ হইতে মন্দতর হইতে লাগিল। ডাক্তারগণ রোগ নির্ণয়ে অসমর্থ হইয়া শেষে বলিলেন রোগটা এক প্রকার জঙ্গল জ্বর, ইহা পূর্ব্বে আমরা দেখি নাই। নবম দিনে মিষ্টার কের বাক্‌শক্তি লোপ হইল, এবং ত্রয়োদশ দিনে তিনি মারা পড়িলেন।

শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

যাদুর টাকা।

ফ্রেঞ্চের গ্যাষ্টন লিরো নামক একজনের জীবনীতে এই গল্পটী পড়িয়াছিলাম। গল্পটী সত্য ঘটনা। পড়িয়া আমার নিজেরই প্রায় কতদিন কেবল মনে হইত যে, পিছনদিকে দেখিলে, বুঝি শয়তানের চক্ষু ছুটি দেখিতে পাইতেছি। কত সময় একলা বসিয়া ঈশ্বরের নাম করিয়াছি। লিরোর ভাষায় নীচে গল্পটী অনুবাদিত করিলাম।

"আমরা সমস্ত দিন বন্যশূকর শিকার করিতে বাহির হইয়াছিলাম। তাহার পর তখনও খানিকটা বনের মাঝখানে, সহসা ভয়ানক ঝড় উঠিল। আমরা চারজনে, মেথিয়াস্, এগলান্, ম্যাকো, এবং আমি, আশ্রয়ের জন্য কোন একটা পর্ব্বতগুহা বা কুটীর অনুসন্ধান করিতে লাগিলাম; কিন্তু প্রায় অর্দ্ধঘণ্টার জন্য কিছুই দৃষ্টিগোচর হইল না।

আমরা নিরাশ হইয়া ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ করিয়া রাত্রিযাপন করিব মনে করিতে লাগিলাম, সহসা ম্যাকো বলিয়া উঠিল, "এখনও একটা আশ্রয় আছে" আমরা উৎসাহের সহিত তাহার পশ্চাদ্‌বর্ত্তী হইলাম। কিছুক্ষণ পরে একটা খুব প্রকাণ্ড গাড়িবারাণ্ডা বা ফটকের কাছে আমরা আসিয়া দাঁড়াইলাম। ম্যাকো বলিল, "আশ্রয় ত আছে, কিন্তু বাড়ীর কর্ত্তাটী শুনিয়াছি, শয়তানের দাস, তিনি যে আশ্রয় দিবেন, তা বোধ হয় না; যাহা হউক সবই ঈশ্বরের—

ম্যাকোর মুখের কথা মুখেই রহিয়া গেল, সহসা বড় ফটকটী খুলিয়া গেল, বাটীর কর্ত্তা আসিয়া দ্বারদেশে দেখা দিলেন, ম্যাকো আমার হাত জড়াইয়া বলিল, এই সে।

আমি মোহাবিষ্টের ন্যায় তাহার দিকে চাহিয়া রহিলাম। লোকটার

বয়স, বছর ৪০।৫০এর মধ্যে। এখনও চোখে অস্বাভাবিক দীপ্তি বর্ত্তমান। যৌবনাবস্থায় লোকটা খুব সুন্দর ছিল।

পাশে একটা প্রকাণ্ড ম্যাষ্টিক্ জাতীয় কুকুর দাঁড়াইয়াছিল, কুকুরটা আমাদের দেখিয়া ডাকিতেছিল, কিন্তু কি আশ্চর্য্য! কুকুরটার গলায় কোন আওয়াজ নাই, সম্পূর্ণ বোবা।

হঠাৎ সে আমাদের দিকে ফিরিয়া বলিল, মহাশয়গণ, আজ রাত্রে প্যারিসে ফেরা নিতান্ত অসম্ভব, যদি অনুগ্রহ করিয়া আমার কুটীরে পদার্পণ করেন, আজ রাত্রের জন্য, আমি সন্তুষ্ট হই। তাহার পর কুকুরের দিকে চাহিয়া বলিল "মিষ্টীয়ার থাম, আর ডাকিও না, কুকুরটী হাঁ বন্ধ করিল। আমরা রাস্তায় আসিবার সময় ম্যাকোর মুখে, এই বাটীর কর্ত্তার সম্বন্ধে অনেক রকম গল্প শুনিয়াছিলাম যে, গৃহস্বামী ফষ্টের ন্যায় শয়তান ভজনা করেন, ইত্যাদি ইত্যাদি।

আমরা কিঞ্চিৎ ইতস্ততঃ করিতেছি দেখিয়া গৃহস্বামী বলিলেন, মহাশয়ের কিছু বাধা আছে? আপনারা শুনিয়া থাকিবেন, আমি কখনও কাহাকে আশ্রয় দিই না, তবে আর বছর শীতকালে একজন নিরাশ্রয়ে বরফে মারা গিয়াছিল, বলিয়া আশ্রয় দিতেছি।

ম্যাকো জিজ্ঞাসা করিল, আপনার আশ্রয় না দিবার কোন বিশেষ কারণ আছে? গৃহস্বামী উত্তর করিলেন, আমার বাটীতে যে আসে, সেই দুর্ভাগ্যগ্রস্ত হয়।

আমি হাসিতে হাসিতে উত্তর করিলাম, যে স্বয়ং প্রিন্স্ অব ডার্কনেশ (শয়তান) যদি আসিয়া উপস্থিত হয়েন, তাহাতেও আপত্তি নাই। কারণ এ রকম ঝড় বৃষ্টি সহ্য করা অপেক্ষা সেটী প্রীতিকর।

এইরূপ হাসিতে হাসিতে গল্প করিতে করিতে আমরা সকলে সেই বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করিলাম, সেখানে একটী বৃদ্ধা দাসী কেবলমাত্র

প্রদীপ হস্তে দাঁড়াইয়াছিল। আমরা সকলে বড় নিমন্ত্রিতদিগের হলে উপবেশন করিলাম। আমাদের গৃহস্বামী পোষাক পরিবর্ত্তন করিতে গেলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে তিনি আসিলেন। সঙ্গে বোবা কুকুরটাও আসিল, আমরা আশ্চর্য্যভাবে দেখিলাম, যে গৃহস্বামী যে পোষাক পরিয়াছেন যদিও খুব মূল্যবান ও সৌখিন, তথাপি শত বৎসর পূর্ব্বে ঐরূপ পোষাকের প্রচলন ছিল। উহা এখন আর নাই।

হঠাৎ আমার কেমন কৌতূহল আসিল, আমি জিজ্ঞাসা করিয়া ফেলিলাম যে "আপনার কুকুরটী কি জন্মাবধি বোবা ?"

তার বাপ মাও কি বোবা ছিল ?

গৃহস্বামী কিঞ্চিৎ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া উত্তর দিলেন যে, 'হাঁ এরা তিন পুরুষ বোবা।'

আমি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলাম, যে এর ঠাকুরমাও কি জন্মবোবা ছিল ?

আমাদের গৃহস্বামীর চক্ষু অস্বাভাবিক উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, তাঁহার মুখ যেন কি এক অস্বাভাবিক দীপ্তিতে পূর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি উত্তর করিলেন—"না, এক দিন অত্যন্ত ডাকিয়া, তাহার স্বর বদ্ধ হইয়া যায়। আমাদের খাওয়াদাওয়া শেষ হ'লে, আমি গৃহস্বামীকে বলিলাম যে, "আপনাকে আমার একটি কথা রাখিতে হইবে, আপনার অভিশপ্ত গৃহে আজ আমি রাত্রিবাস করিতে ইচ্ছা করি।

এই কথা বলিবামাত্র আমাদের গৃহস্বামীর মুখ আরও মৃতের মত সাদা হইয়া গেল, তিনি বিরক্তভাব কিছু কষ্টে দমন করিয়া বলিলেন, কে ব'ল্লে আপনাদের ? বুড়ি মাগি বুঝি ?

আমি বলিলাম, না না, আমার নিজের দোষ, আমিই জিজ্ঞাসা

করিয়াছি। আমি একটা ঘরে ঢুকিতেছিলাম, এমন সময় আপনার ঝি বলিল, "ও ঘরে যাবেন না, ওটা ভূতের ঘর।

"আপনি সে ঘরে প্রবেশ করেন নাই ত ?

"না আমি গিয়াছিলাম। ঈশ্বর আমাদের রক্ষা করুন", বলিয়া সেই বৃদ্ধা ঝি ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

আমি পুনরায় বলিলাম, "আজ রাত্রে আমায় ও ঘরে শুইতে দিবেন ? গৃহস্বামী বলিলেন, "না, ও ঘরটা কতদিন থেকে বন্ধ পড়ে আছে" এইরূপ নানা কথার পর গৃহস্বামী বলিলেন যে, আপনারা যদি নিতান্তই ও ঘরের ইতিহাস শুনিতে চান, শুনুন। আমার কিছু দোষ নাই। যাও মিষ্টিয়ার চল উঠানের দিকে তোমায় রাখিয়া আসি।

আমি ও এ্যালেন বলিলাম, এস কয়জনে মিলিয়া একাটি খেলি। রাত্রে ঘুমাইতে ইচ্ছা নাই, আমার পকেটে তাস ছিল, আমি বাহির করিয়া তাস দিতে লাগিলাম। এমন সময়ে গৃহস্বামী আসিলেন, আমাদের হাতে তাস দেখিয়া, তাঁহার রক্তশূন্য মুখ আরো সাদা হইয়া গেল।

এ্যালেন, উঠিয়া তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 'দেখুন আমাদের আত্রে আর ঘুমাইতে ইচ্ছা নাই, তাই তাস খেলিয়া রাত কাটাইব, মনে করিতেছি।

হঠাৎ এ্যালেনের প্রফুল্ল মুখে হাসি শুকাইয়া 'গেল, গৃহস্বামীর আকস্মিক পরিবর্ত্তন দেখিয়া ও তাঁহার চক্ষের চাহনি দেখিয়া আমাদের সমস্ত হৃৎপিণ্ডগুলা যেন স্থির হইয়া গেল।

গৃহস্বামীর চক্ষে এক অস্বাভাবিক উন্মত্তের ন্যায় দীপ্তি, ও সকলে মিলিয়া একটা মানুষকে মারিলে, যেমন তাহার হাত পা নাড়িবার ক্ষমতা থাকেনা ; কিন্তু এক বিজাতীয় ক্রোধে ও ভয়ে সমস্ত হৃদয় পূর্ণ হয়, সেটা শুধু চোখে প্রকাশ পায়, ঠি ক তাহার চোখ ও মুখের ভাব সেইরূপ হইল।

"তাস" ? এখনি আগুনে পোড়াও, ফেলে দাও, বলিয়া আমাদের হাত থেকে তাসগুলা কাড়িয়া লইয়া আগুনে ফেলিতে গেলেন ; কিন্তু কে যেন হাত বাঁধিয়া ধরিল, অস্বাভাবিক চীৎকার করিয়া তিনি চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন, আমরা সকলে তাঁহার নিকটে দৌড়িয়া গিয়া জামার কলার ও বোতাম টানিয়া ছিঁড়িয়া দিলাম।

৩।৪ মিনিট পরে তিনি বলিলেন, "তোমরা নিতান্তই শুনিতে চাও, যদিও শোন ; কিন্তু পরে যেন তোমাদের কিছু ক্ষতি হয় না"।

"সে আজ ৬০ বছর পূর্ব্বের কথা। আমি তখন অষ্টাদশ বর্ষীয় যুবক মাত্র। আমার অতুল রূপ ছিল। অসীম ধন ছিল। লোক বল ছিল, নাম ছিল, সব ছিল। কিন্তু কুসংসর্গে মিলিয়া আটাইশ বৎসর বয়সের মধ্যেই সর্ব্বস্বান্ত হইলাম, তখন হাতে মোট ১৫।২০ হাজার টাকা। সেই সময় একটী সুন্দরীকে দেখিয়া মোহিত হই। কিন্তু তাহার পিতা, আমার অবস্থা খারাপ হইয়া আসিতেছে জানিয়া, আমার সহিত বিবাহ দিতে অসম্মত হন।

আমার অত্যন্ত কষ্ট হয়। পিস্তল লইয়া আত্মহত্যা করিবার মানসে ঐ অভিশপ্ত ঘরে গিয়া বসি। টেবিলের উপর একখানা বই ছিল, হাত দিতে গিয়া হঠাৎ একটা পাতা উল্টাইয়া গেল। সেখানে লেখা আছে, এই এই মন্ত্রে আরাধনা করিলে শয়তানকে পাওয়া যায়। আমি তখন মরিয়া, আমায় যদি তখন কেহ খুন করিতে বলিত, তাহাতেও পশ্চাৎপদ হইতাম কিনা জানি না। কি অশুভক্ষণে সেই মন্ত্র পড়িয়া শয়তানকে আরাধনা করিলাম। এই সময় এই আলমারিটা টলিতে লাগিল, যেন কোন অদৃশ্য হস্তদ্বারা, কেহ ইহাকে ঠেলিতে লাগিল। হঠাৎ আলমারীর দ্বার খুলিয়া গেল, তখন কি দেখিলাম—কে যেন সেই আলমারীর ভিতরে আগুন দিয়া লিখিয়া দিয়া গিয়াছে, যে "সংসার

সংগ্রামে তুমি জয়ী হবে” তার পর যেন ‘দুটা চোখ, আগুনের মত জ্যোতির্ম্ময়—তার পরই সব বিস্মৃতি। আমার বিশ্বাসী চাকর আসিয়া আমায় তুলিল। আমি তাহাকে বলিলাম, আলমারীর ভিতরটা দেখ। সেও দেখিয়া বলিল, যে লেখা রহিয়াছে “তুমি জয়ী হবে”।

এই সময় আমার কুকুর দুটী মিষ্টিয়ারের ঠাকুরমা ও ঠাকুরদাদা, খুব চীৎকার করিয়া হঠাৎ থামিয়া গেল, মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলাম, যে বোবা। আমি উন্মত্তের ন্যায় বাটী থেকে ছুটিয়া বাহির হইয়া গেলাম, গিয়া জুয়া টেবিলে বসিলাম, যেথানে মিনিটে কোটি টাকা হারিয়াছি, সেখানে জিতিতে লাগিলাম। ক্রমাগত যত বেশী বেশী জুয়া খেলার আড্ডায় গেলাম, সেখানেই জিতিতে লাগিলাম। আমার মাথা পাগলের মত হইয়া গেলাম, কে আমায় শাপমুক্ত করিবে?

তার পর দিন সকাল হ’তে না হ’তে, একজন এজেণ্টের দরওয়ান আসিয়া ডাকিল, বলিল আপনি যেথানে হাজার টাকা দিয়াছিলেন, সেখানে লক্ষ টাকা হইয়াছে ইত্যাদি। যেদিকে দেখি, সব দিকে উন্নতি। কিন্তু মানসিক নরকের যন্ত্রণা যে কি রকম সহ্য করিয়াছি, তাহা আমি নিজে ভিন্ন কেহ জানে না।

এই বলিয়া গৃহস্বামী চুপ করিলেন। এ্যালেন্ এমন সময় বলিয়া উঠিলেন, আচ্ছা আমাদের সঙ্গে একদান খেলুন না, দেখাই যাক্, কে হারে বা জেতে। গৃহস্বামী ক্রমাগত বারণ করিয়া শেষে কাতর-স্বরে বলিলেন তোমরা আমায় পাগল মনে করিতেছ? তা করিতে পার; কিন্তু আমার সঙ্গে খেলিয়া দেখ, আমি পাগলও নই, আর কিছুই নই।

এমন সময় তাহার ষ্টেটের ম্যানেজার আসিয়া ২০ হাজার পাউণ্ড দিয়া গেল ও আমাদের গৃহস্বামীও বলিলেন যে, এই বাজি নিয়ে খেলিতে বসি আসুন।

খেলিতে খেলিতে আমরা ২০ হাজার পাউণ্ডই জিতিলাম, কিন্তু কি

আশ্চর্য্য! আমাদের সম্মুখে ম্যানেজার টাকা দিয়া গেল; কিন্তু সে টাকা একটীও পকেটে নাই। আমরা নিজেরা পর্য্যন্ত সমস্ত খুঁজিয়া দেখিলাম, কিন্তু সব শূন্য।

পরমুহূর্ত্তেই পুনরায় দ্বারে করাঘাতের ন্যায় শব্দ হইল, সেই ম্যানেজার ও তার আশ্চর্য্যের চিহ্ন সমস্ত মুখে প্রকটিত হইয়া উঠিয়াছে; বলিল, যে মহাশয়, আপনাদের সুমুখে ২০ হাজার টাকা রাখিয়া গেলাম; কিন্তু রাস্তায় গিয়া দেখিলাম যে, ব্যাগে সমস্ত টাকা ফিরিয়া আসিয়াছে। ইহা কি শয়তানের খেলা? সে টাকা দিয়া চলিয়া গেল। আমাদের গৃহস্বামী পুনরায় খেলিতে আরম্ভ করিলেন, কিন্তু কি আশ্চর্য্য, প্রতি বারেই জিত হইতে লাগিল। আমাদের হাত থেকে সমস্ত তাস কেড়ে নিয়ে তিনি আগুনে ফেলিয়া দিলেন, এমন সময় হঠাৎ কুকুরের গলার ভয়ানক চীৎকার ও ভয়ানক ঝড়ের শব্দ শোনা যাইতে লাগিল। আমাদের অদ্ভুত গৃহস্বামীটী হঠাৎ উঠিয়া বলিলেন, "মিষ্টিয়ার, মিষ্টিয়ার, কি হয়েছে"? একমুহূর্ত্তের মধ্যে ঝড় ও কুকুরের গলা থামিয়া গেল, কুকুর যেমন বোবা, তেমনই আবার পূর্ব্বের মত বোবা হইয়া গেল।

আমরা আমাদের যে যাহার শুইবার ঘরে গেলাম, ইহাকে কি বলিব? ভাগ্যলিপি? না অন্য কিছু? আমার পা আপনা আপনি সেই অভিশপ্ত গৃহের দিকে অগ্রসর হইল।

মধ্যরাত্রি, সোফায় অর্দ্ধশয়নাবস্থায় স্বপ্ন দেখিতেছি, না সত্য, মনে হইল যেন বড় বড় দুটা চোখ আলমারির ভিতর থেকে আমার সমস্ত কার্য্যকলাপ পর্য্যবেক্ষণ করিতেছে। হঠাৎ আপনি কলের পুঁতুলের ন্যায় আলমারীর দ্বারদেশে হাত দিয়া খুলিতে গেলাম, সহসা আমার হাতে বজ্রের ন্যায় কঠিন ভাবে কাহার হাত আসিয়া বেষ্টিত করিল।

তাহার পর আর কিছু স্মরণ নাই। চোক মেলিয়া দেখি, গৃহস্বামী ও বন্ধুগণ পাশে বসিয়া। তাহার পরদিনই প্রত্যূষে সকলে যাত্রা করিলাম।

গৃহস্বামী টাকাগুলি নেওয়াইবার জন্য পিড়াপিড়ি করিতে লাগিলেন, কিন্তু আমরা অস্বীকার করিলাম।

উপক্রমণিকা—আমরা নিরাপদে আসিয়া গন্তব্যস্থলে পৌঁছিয়াছি, তাহার পর দিন ডাকে সেই টাকা ও একখানি পত্র আসিল। পত্রে লেখা আছে। "আমি যদিও শয়তানগ্রস্ত, তথাপি আমার মান আছে। টাকা তোমরা জিতিয়াছিলে, তোমাদেরই প্রাপ্য।

আমরা সেই টাকা ও পত্র লইয়া একজন বিশিষ্ট লোকের নিকটে গেলাম। তিনি বলিলেন, ও টাকা কোন সৎকার্য্যে ব্যয় কর।

একটী চিকিৎসালয় ব্যয়াভাবে ভালরূপে নির্ম্মিত হইতে পারে নাই, তাহাতে আমরা টাকাগুলি দিলাম। কিন্তু একমাস পরে শুনিলাম যে, সে হাঁসপাতালের সমস্ত পুড়িয়া ভস্মাবশেষ হইয়া গিয়াছে। এক পয়সা মূল্যেরও দ্রব্য বাঁচে নাই।

শ্রীমতী শ্রীমতী দেবী।

প্রেত যোনি কি সত্য ?

যে সময়ের কথা লিখিতেছি, তখন এদেশের শিক্ষিত ইয়ং বেঙ্গলীদের নিকট প্রেতযোনির অলৌকিক কার্য্যাবলী বিষম মস্তিষ্ক বিকৃতি বা হৃদয় দৌর্ব্বল্যের পরিচায়ক বলিয়া উপহসিত হইত। বলিতে কি, মাদৃশ জ্ঞানালোকবঞ্চিত ব্যক্তির ও ভূত প্রেতে তাদৃশ আস্থা ছিল না। এখন কালস্রোত বিপরীত দিকে প্রবাহিত। জ্ঞানপিপাসা-প্রণোদিত শিক্ষিত নব্য সমাজ অধুনা প্রেততত্ত্বের আলোচনায় ব্যাপৃত। যাহা একদা অলীক অজ্ঞতাপ্রসূত প্রলাপোক্তি বলিয়া অনুমিত হইত, কালপ্রভাবে তাহাই আজ সরলসত্যরূপে প্রতিভাত হইতেছে। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানবিদ্ জ্ঞানীবিমণ্ডলীর গভীর গবেষণা প্রেতযোনি সম্বন্ধে বিবিধ রহস্যজাল ভেদ

করতঃ নিত্য নব নব তত্ত্বের আবিষ্কার পূর্ব্বক আমাদের সম্মুখে এক অনন্ত জ্ঞানভাণ্ডারের বিশাল তোরণ উদ্‌ঘাটন করিয়া দিয়াছে।

সে আজ অনেক দিনের কথা। তখন আমার বয়স ১৫ বৎসরের অধিক নহে। জীবন-প্রবাহের উপর দিয়া সুদীর্ঘ যুগার্দ্ধ কাল চলিয়া গিয়াছে, এখনও সে অতীত ঘটনার ক্ষীণ স্মৃতি স্মরণপথে উদিত হইলে, সর্ব্বাঙ্গ কদম্ব পুষ্পের ন্যায় আতঙ্কে শিহরিয়া উঠে।

রঙ্গপুর জেলার অধীন লালমণির হাট থানার এলাকায় প্রশান্ত-সলিলা ধবলা নদীর বামতীরে আমাদের এই ক্ষুদ্র গ্রামটী অবস্থিত। গণ্ডগ্রাম হইলেও লাওডাঙ্গা এককালে খুব সমৃদ্ধিশালী বলিয়া সর্ব্বত্র পরিচিত ছিল। স্থানীয় জমিদারগণ তখনও জন্মভূমির সুশীতলক্রোড় পরিত্যাগ করিয়া সহরবাসী হন নাই। স্বদেশের গৌরববর্দ্ধন ও সৌষ্ঠব-সাধনে তাঁহাদের মনোযোগিতারও অভাব ছিল না। আমাদের গ্রাম-খানি আকারে ক্ষুদ্র হইলেও এককালে এখানে বহু ব্রাহ্মণ-কায়স্থ শিক্ষিত ব্যক্তির বাস ছিল। স্থানীয় অন্যতম ভূম্যধিকারী শ্রীযুক্ত প্রমদা-রঞ্জন বকসী মহাশয়ের প্রাসাদোপম বাটীর দক্ষিণ দিকে অনতিদূরে আমার ক্ষুদ্র গৃহখানি অবস্থিত; মধ্যে কয়েক ঘর রাজবংশীর বাস। ইহারা প্রায় সকলেই কৃষিজীবী, কেহ কেহবা জমিদার সরকারে সামান্য চাকুরী করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। উহাদের মধ্যে কোণা দাস নামক এক ব্যক্তির বিধবা ভগ্নী আমাদের বাটীতে ঝিয়ের কার্য্য করিত।

ফাল্গুন মাস, তখনও এদেশে শীতের প্রকোপ পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান। লেপ বা তৎসদৃশ গরম গাত্রবস্ত্র না হইলে, এই সুখময়ী বাসন্তী রজনীতেও নিদ্রাদেবীর দর্শন লাভ দুর্লভ হইয়া উঠে। মাঘের প্রারম্ভে ম্যালেরিয়া রাক্ষসী কিছুদিনের জন্য বঙ্গের বিস্তৃত কর্ম্মক্ষেত্র হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছে, বসন্তের পূর্ণবিভূতি প্রকাশের জন্যই বোধ হয় সে সময় এদেশে

অন্যান্য ব্যাধিরও তাদৃশ প্রকোপ নাই। আমাদের এই নিশ্চিত দিন কয়েকটী উদ্বেগসঙ্কুল করিবার জন্যই বোধ হয় হঠাৎ গ্রামে কলেরার আবির্ভাব হইল। বাটী নিকটে বলিয়া আমাদের ঝি মুচদাস্যা প্রায় প্রতি রাত্রিতেই আহারের পর কাজ কর্ম্ম শেষ করিয়া বাটী চলিয়া যাইত। একদিন প্রত্যূষে আসিয়া সে সংবাদ দিল যে, তাহার মাতার ভেদ বমি আরম্ভ হইয়াছে। আজ আর তাহার কাজে আসা ঘটিবে না। এদেশের লোক কলেরাকে কিরূপ ভয় করিয়া থাকে, তাহা বোধ হয় অনেকেই অবগত নহেন। কলেরা সাধারণতঃ এদেশের অজ্ঞ লোকদের নিকট "উপরি হাওয়া" নামে অভিহিত। কোন কারণে গ্রাম্য দেবতা কুপিত হইলে, এই ভয়ানক ব্যাধির আবির্ভাব হয় বলিয়া তাহাদের বিশ্বাস। এইরূপ কুসংস্কারের ফলে অনেক সময়ে সুচিকিৎসকের আশ্রয় গ্রহণ না করিয়া সাধারণ মূর্খ লোককে রোগোপশমের নিমিত্ত ওঝা ফকির প্রভৃতির শরণাপন্ন হইতে দেখা যায়। এইরূপ মূর্খ বৈদ্যের দৈবানুষ্ঠানে একরূপ বিনা চিকিৎসায় যে প্রতিনিয়ত কত শত সহস্র লোক এই দুরন্ত ব্যাধির করাল কবলে আত্মসমর্পণ করিয়া থাকে, তাহার ইয়ত্তা করা সুকঠিন। শুধু তাহাও নহে, এদেশের ডাক্তার কবিরাজ পর্য্যন্ত কলেরা রোগীর চিকিৎসার্থ তাহার বাটী যাইতে সম্মত হন না। কাহারও বাটীতে কলেরা আরম্ভ হইলে, পাড়াপ্রতিবেশীর কথা দূরে থাকুক, নিতান্ত ঘনিষ্ঠ আত্মীয় স্বজনও তথায় যাইতে সঙ্কোচ বোধ করেন। ঐ বাটীর নিকটে পথ থাকিলে, উক্ত রাস্তা দিয়া লোকগমনাগমন বন্ধ হয়। এমন কি, কলেরায় মৃত ব্যক্তির অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া নির্ব্বাহ হওয়াই সুকঠিন। ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণ ব্যতীত অন্যান্য সকল জাতিকেই প্রায় শবদেহ জলাশয়ে নিক্ষেপ বা সমাধিস্থ করিতে হয়, ফলে কলেরার প্রকোপ উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে থাকে। বলা বাহুল্য মুচর নিকট তাহার মাতার কলেরা হইয়াছে শুনিয়া পীড়ার শান্তি না হওয়া পর্য্যন্ত আমরা

তাহাকে আমাদের বাটীতে আসিতে নিষেধ করিয়া দিলাম। তখন কে জানিত যে, এই বিদায়ই তাহার শেষ বিদায় হইবে।

মুচর বাটীতে সে, তাহার মাতা, ভ্রাতা ও ভ্রাতৃজায়া দুইজন এই মোট পাঁচ ব্যক্তি। ৩।৪ দিনের মধ্যে মুচর ভ্রাতা কোণা ছাড়া আর সকলেই এক এক করিয়া কালের আহ্বানে লোকান্তরে চলিয়া গেল। নির্ভীক কোণা বিপদের ঝঞ্ঝাবাত মস্তকে ধারণপূর্ব্বক আত্মীয় বন্ধু-বান্ধবের অনুরোধ উপেক্ষা করিয়া সেই জনহীন শ্মশানসদৃশ গৃহেই বাস করিতে লাগিল। তাহার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা যাহাদের পবিত্র স্মৃতি মাত্র এখন তাহার অভিশপ্ত জীবনের একমাত্র অবলম্বন, সেই মাতা ভগ্নী স্ত্রী ও ভ্রাতৃজায়ার ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্য সম্পন্ন না করিয়া সে কখনই গৃহ ত্যাগ করিবে না। এইরূপে ৩।৪ দিন অতীত হইল, হঠাৎ এক দিন মধ্যরাত্রিতে আমার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। কোণার বাটীর দিকে নীরব নিশীথে জনকোলাহল শ্রবণে আবার একটা কি নূতন বিপদপাৎ হইয়াছে আশঙ্কায় হৃদয় উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল। কোণার বাড়ী অত রাত্রে লোক পাঠাইয়া সংবাদগ্রহণও সম্ভবপর নহে। আতঙ্ক উদ্বেগে চক্ষে আর ঘুম আসিল না। বিছানায় শুইয়া চিন্তারঙ্গিণীর অনুধ্যানে প্রবৃত্ত হইলাম। অকস্মাৎ রজনীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া কোণার মৃতা জননী শুকালীর ব্যাকুলতাপূর্ণ উচ্চ কণ্ঠধ্বনি শ্রবণবিবরে প্রবেশ করিয়া হৃদয়কে ব্যাকুল করিয়া তুলিল। তন্দ্রাঘোরে হয়তো স্বপ্ন দেখিয়াছি মনে করিয়া হৃদয়কে আশ্বস্ত করিলাম। কিন্তু আবার সেই পরিচিত কণ্ঠের আবেগময়ী চীৎকার "কোণারে", "হাড়িভাঙ্গারে", "কান্দুরারে" ইত্যাদি। এইরূপ উপর্য্যুপরি আহ্বানে সন্দেহ বিশ্বাসে পরিণত হইল। মনে হইতে লাগিল, বুঝি শুকালী পুনর্জীবিতা হইয়া তাহার পুত্র ও পাড়াপ্রতিবেশীগণকে ডাকিতেছে। রজনী প্রভাতের পর আমরা অনেকেই সঠিক তত্ত্বানুসন্ধানের জন্য ঘটনাক্ষেত্রে উপস্থিত হইলাম।

তখনও ডাকের বিরাম নাই, আবার ঐ সঙ্গে মুচ আসিয়া যোগ দিল। মা মেয়ে উভয়ে মিলিত হইয়া পাড়াপ্রতিবেশী প্রত্যেক ব্যক্তির নাম ধরিয়া ডাকিতে লাগিল, যেন কোন মহাবিপদে পতিত হইয়া পরিত্রাণ লাভের জন্য তারস্বরে চীৎকার করিতেছে। কোথা হইতে কে ডাকিতেছে, কিছুতেই তাহা নির্ণয় করা যায় না। কখন নিকটবর্ত্তী বৃক্ষশাখা হইতে কখন বা ঘরের ভিতর হইতে চীৎকার ধ্বনি শুনা যায়। আহূত ব্যক্তিগণ বিপদ নিকটবর্ত্তী মনে করিয়া ভয়ে আকুল হইয়া উঠিল। ভূতের ওঝা আসিল, কত তন্ত্রমন্ত্রের অনুষ্ঠান হইতে লাগিল; কিন্তু কিছুতেই এ উপদ্রবের প্রতিকার হইল না। এই অলৌকিক ঘটনা স্বকর্ণে শুনিয়া কৌতূহল নিবারণার্থ দূর দূরান্তর হইতে যে কত লোক আসিতে লাগিল, তাহার ইয়ত্তা নাই। কুড়িগ্রাম সরকারী দাতব্য চিকিৎসালয়ের ডাক্তার আমার ভ্রাতৃসুহৃদ্ অধুনা লোকান্তরিত ৺হরিনাথ সিংহ মহোদয় তৎকালে আমাদের বাটীতে উপস্থিত ছিলেন। তিনি ব্রাহ্ম ধর্ম্মাবলম্বী; সুতরাং ভূত প্রেতে তাঁহার আদৌ বিশ্বাস ছিল না। তিনিও কিন্তু বহু পর্য্যবেক্ষণ করিয়াও এ অভাবনীয় ঘটনার কোন কারণনির্ণয়ে সমর্থ হইলেন না। অবশেষে তাঁহাকেও ভূতের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হইল। প্রায় দেড় মাস সমভাবে ডাক চলিয়াছিল, পরে ওঝাদের দৈবানুষ্ঠানে উহা নিবৃত্ত হয়। কেহ বলে, গঙ্গায় অস্থি নিক্ষেপের পর হইতে প্রকৃতপক্ষে আর কোন চীৎকারাদি শুনা যায় নাই। কোণা এবং এই ঘটনা স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, এমন অনেকেই অদ্যাপি জীবিত আছেন। তাঁহারা সকলে এখনও একত্র হইলে, এবিষয়ের আলোচনা ও পরস্পর পরস্পরকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, তবে প্রেতযোনি কি সত্য?

শ্রীপূর্ণেন্দুমোহন সেহানবীশ,

নাওডাঙ্গা, রঙ্গপুর।

অদৃশ্য জগৎ ভ্রমণ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)।

এইরূপে আমরা দেবরাজ ইন্দ্রের অমরাবতী পুরী দর্শন করিতে করিতে পূর্ব্বদিক্ হইতে অগ্নিকোণে উপস্থিত হইলাম ও তথায় বহ্নিদেবের পুরী দর্শন করিলাম। দেখিলাম, অগ্নিদেব এই স্থানে নিজবাহন ও দেবগণের সহিত এবং স্বাহা ও স্বধা পত্নীদ্বয়ের সহিত পরমসুখে কালযাপন করিতেছেন।

তদনন্তর পশ্চিমদিকে যাইয়া পুনরায় এক সুন্দর পুরী দর্শন করিলাম। গুরুদেব কহিলেন, বৎস! এই পুরীর নাম বরুণপুরী। ইহাতে বরুণরাজ বারুণী মধুপানে বিহ্বল হইয়া নিজশক্তি বরুণানীর সহিত বাস করিতেছেন। তাঁহাকে দর্শন করিয়া, আমরা বায়ুকোণে উপস্থিত হইলাম ও তথায় বায়ুদেবের পুরী দর্শন করিলাম। দেখিলাম, এইস্থানে পবনদেব নিজ শক্তিসমন্বিত হইয়া প্রাণায়ামসিদ্ধ যোগিগণের সহিত বাস করিতেছেন। তাঁহার হস্তে ধ্বজা, বাহন মৃগ, নেত্র বিশাল এবং ঊনপঞ্চাশৎ বায়ু তাঁহার পরিবারবর্গ।

ক্রমশঃ আমরা উত্তরদিকে যাইয়া যক্ষলোকের বসতি সন্দর্শন করিলাম। দেখিলাম, এইস্থানে যক্ষরাজ কুবের বৃদ্ধি ও ঋদ্ধি প্রভৃতি শক্তির এবং নানাবিধ নিধির সহিত বাস করিতেছেন। তাঁহার মণিভদ্র, মণিমান্, মণিকন্ধর, মণিভূষ ও মণিকার্ম্মুকধারী প্রভৃতি সেনাপতিগণও এইস্থানে বাস করিতেছেন।

তৎপরে আমরা ঈশানকোণে যাইয়া বহুমূল্য রত্নখচিত এক পুরী দর্শন করিলাম। গুরুদেব কহিলেন, এই পুরীর নাম রুদ্রলোক। দেখিলাম, এইস্থানে রুদ্রদেব বাস করিতেছেন। তাঁহার পৃষ্ঠদেশে তূণীর ও বামহস্তে ধনুক দোদুল্যমান। তাঁহাকে দেখিলেই বোধ হয় যেন ক্রোধে তাঁহার চক্ষু ফাটিয়া পড়িতেছে। তাঁহার সদৃশ অপর কতক-

গুলি রুদ্র ধনুক ও শূল প্রভৃতি অস্ত্রধারণ করিয়া তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিয়া আছে। তাঁহাদের মধ্যে কতকগুলির মুখ বিকৃত, কতকগুলি করালবদন এবং কতকগুলির মুখ হইতে অগ্নি নির্গত হইতেছে। তাঁহাদের মধ্যে কাহারও বা দশ হস্ত, কাহার বা শত এবং কাহারও বা সহস্র হস্ত। কাহারও দশটী পাদ, কাহারও দশটী মস্তক এবং কাহারও বা তিনটী নেত্র। কি অন্তরীক্ষচর, কি ভূমিচর, কি রুদ্রাধ্যায়োক্ত রুদ্রগণ সকলেই এইস্থানে বাস করিতেছেন। ঈশানদিক্‌পতি ঈশানের গলে মুণ্ডমালা, হস্তে নাগবলয়, পরিধান ব্যাঘ্রচর্ম্ম, উত্তরীয় হস্তিচর্ম্ম, এবং অঙ্গরাগ চিতাভস্ম। তিনি প্রায়ই ডমরুধ্বনি করিয়া চতুর্দ্দিক্ মুখরিত এবং অট্টহাস্য করিয়া নভস্তল পরিপূর্ণ করিতেছেন। তিনি সর্ব্বদা প্রমথাদিগণ ও ভূত সমূহ দ্বারা বেষ্টিত থাকিয়া এইস্থানে বাস করিতেছেন এবং ভদ্রকালী প্রভৃতি মাতৃগণ, কোটি কোটি রুদ্রাণী এবং নানাশক্তিসমন্বিত ডামরী প্রভৃতি ও বীরভদ্র প্রভৃতি গণসমূহ সর্ব্বদা এইস্থানে বিরাজ করিতেছেন।

যাহা হউক, আমরা এই রুদ্রলোক পার হইয়াই এক হীরক-নির্ম্মিত প্রাকার দর্শন করিলাম। ইহা দশ যোজন উচ্চ। ইহার চতুর্দ্দিকে চারটী দ্বার আছে। যাহা হউক, আমরা ইহার দক্ষিণদিকের দ্বার দিয়া উত্তরাভিমুখে গমন করিতে লাগিলাম এবং দেখিলাম এই স্থানের মধ্যে নানাবিধ নূতন নূতন হীরক-নির্ম্মিত বৃক্ষ সকল বিদ্যমান রহিয়াছে। এই প্রকারের মধ্যস্থ প্রাসাদ সকল, পথ, রাজমার্গ বৃক্ষ ও তাহার আলবাল সকল, দীর্ঘিকা কূপ, তড়াগ ও অন্যান্য বস্তু সকলকে হীরকময় বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। আমি এই সকল দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া গুরুদেবকে জিজ্ঞাসা করিলাম এ কোথায় লইয়া আসিলেন। তিনি কহিলেন, বৎস! এই স্থানে শ্রীভুবনেশ্বরী দেবীর পরিচারিকাগণ বাস করিয়া থাকেন। ইহাদের মধ্যে কেহ বা তালবৃন্ত কেহ বা পানপাত্র,

কেহবা তাম্বূলপাত্র, কেহবা ছত্র, কেহবা চামর, কেহবা নানাবিধ বস্ত্র, কেহবা পুষ্প, কেহবা আদর্শ, কেহবা কুঙ্কুম, কেহবা কজ্জল এবং কেহবা সিন্দূর ধারণ করিয়া আছেন। কেহবা চিত্রকার্য্য করিবার জন্য, কেহবা পাদ সংবাহন করিবার নিমিত্ত, কেহবা অলঙ্কার পরাইবার জন্য এবং কেহবা পুষ্পমালা পরাইবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়া উপস্থিত আছেন। ইঁহারা সকলেই নানা বিলাসপটু ও যুবতী। ইঁহারা দেবীর অনুগ্রহ-কণা লাভহেতু সমস্ত বিশ্বকেই তৃণ সদৃশ বোধ করিয়া থাকেন। বোধ করি, তুমি ইঁহাদের নাম অবগত নহ। এই সকল হাবভাব-বিলাস-গর্ব্বিত দেবী ভগবতীর পরিচারিকাগণের নাম কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। অনঙ্গরূপা, অনঙ্গমদনা, ভুবনবেগা, ভুবনপালিকা, সর্ব্বশিশিরা, মদনাতুরা, অনঙ্গবেদনা, ও অনঙ্গমেখলা নামের দেবীর আটটী সখী। ইহারা প্রত্যেকেই বিদ্যুল্লতার ন্যায় সুন্দরী, নানাবিধ ভূষণে ভূষিত এবং সমস্ত কার্য্যেই দক্ষ। ইঁহারা যখন দেবীকার্য্য করিবার জন্য বেত্রহস্তে ইতস্ততঃ ধাবমান হইয়া থাকেন, তখন ইঁহাদিগকে দেখিলেই বোধ হয় যেন বিদ্যুল্লতা সকল চমকিত হইতেছে।

আমরা এই হীরক-নির্ম্মিত প্রাকার মধ্যস্থিত স্থান দর্শন করিতে করিতে ক্রমে উত্তর দ্বার দিয়া বহির্গত হইয়া পুনরায় এক বৈদূর্য্য মণি-রচিত তৃতীয় প্রাকার দেখিতে পাইলাম। ইহার উচ্চতা দশ যোজন। ইহারও চতুর্দ্দিকে চারটী দ্বার বিদ্যমান আছে। এতন্মধ্যস্থ ভূমি, গৃহ, ক্ষুদ্রপথ রাজপথ, বাপী, কূপ, তড়াগ, নদ, নদী এমন কি বালুকা পর্য্যন্ত বৈদূর্য্য মণি নির্ম্মিত। ইহার আট দিকে ব্রাহ্মী, মাহেশ্বরী, কৌমারী, বৈষ্ণবী, বারাহী, ইন্দ্রাণী, চামুণ্ডা, ও মহালক্ষ্মী নামে অষ্টমাতৃকা নিজ নিজ গণের সহিত বাস করিতেছেন। ইঁহারা সকলেই জগতের শুভ চেষ্টায় নিরত আছেন। এই প্রাকারের চারি দ্বারেই জগজ্জননী ভগবতীর নানাবিধ বাহন সকল সজ্জিত রহিয়াছে। ইহার কোন স্থানে কোটি

কোটি হস্তী, কোন স্থানে কোটি কোটি ঘোটক, কোন স্থানে শিবিকা, কোন স্থানে হংস কোথাও সিংহ, কোথাও গরুড়, কোথাও বা ময়ূর, ও বৃষভাদি নানাবিধ প্রাণিসকল সজ্জিত রহিয়াছে। এইরূপ কোথাও পূর্ব্বকথিত প্রাণিগণ সংযোজিত কোটি কোটি রথ সকল, সুসজ্জিত পাষ্ণি´গ্রাহ (সহিস) ও গগনস্পর্শী ধ্বজা দ্বারা সজ্জিত থাকিয়া শোভা বিস্তার করিতেছে। কোথাও বা নানাবাদিত্র সংযুক্ত, বিপুল ধ্বজবিশিষ্ট, নানাবিধ চিহ্ন সমন্বিত বিমান সকল শ্রেণীবদ্ধ থাকিয়া শোভা পাইতেছে।

আমরা ক্রমশঃ এই বৈদূর্য্য প্রাকার পার হইয়া এক ইন্দ্রনীলমণি-নির্ম্মিত চতুর্থ প্রাকার দর্শন করিলাম। ইহারও উচ্চতা দশ যোজন ব্যাপিয়া রহিয়াছে। ইহার মধ্যস্থ ভূমি, গৃহ, পথ, বাপী, কূপ ও তড়াগ প্রভৃতি সমস্তই ইন্দ্রনীলমণি-নির্ম্মিত। যাহা হউক, আমরা এই স্থানের মধ্য প্রদেশে যাইয়া বহু যোজন বিস্তৃত একটী ষোড়শদল পদ্ম, দ্বিতীয় সুদর্শন চক্রের ন্যায় শোভা পাইতে দেখিলাম।

তাহার ষোড়শ দলে, করালী, বিকারালী, উমা, সরস্বতী, শ্রী, দুর্গা, ঊষা, লক্ষ্মী, শ্রুতি, স্মৃতি, ধৃতি, শ্রদ্ধা, মেধা, কান্তি, মতি ও আর্য্যা নামে ভগবতীর ষোড়শ শক্তিগণ স্বদলবলে বাস করিতেছেন। ইহাঁদের সকলেরই নবীন নীরদের ন্যায় শ্যামবর্ণ এবং হস্তে খেটক ও খড়্গ বিদ্যমান আছে। ইহাঁদিগকে দেখিলেই বোধ হয় যেন ইহাঁরা সর্ব্বদাই যুদ্ধ করিবার জন্য উৎসুক রহিয়াছেন। গুরুদেব কহিলেন, বৎস! "এই সকল শক্তিগণকে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যস্থিত শক্তিগণের নায়িকা এবং জগজ্জননী ভগবতীর সেনানী বলিয়া জানিবে। ইহাঁরা দেবীর প্রসাদে গর্ব্বিত হইয়া এবং সতত নানাবিধ রথ বাহনাদি ও শক্তিগণে পরিবেষ্টিত থাকিয়া বাস করিতেছেন। একমুখে ইহাঁদের পরাক্রমের বিষয় আর কি বলিব, যদি সহস্র বদন হয়, তাহা হইলেও ইহাঁদের পরাক্রমের বিষয় বলিয়া শেষ করিতে পারা যায় না।

এই প্রদেশের পরই আমরা দশ যোজন দীর্ঘ মরকত-নির্ম্মিত পঞ্চম প্রদেশ দর্শন করিলাম। ইহার মধ্যস্থ ভূমি ও গৃহাদি সমস্তই পূর্ব্বের ন্যায় মরকতমণি দ্বারা নির্ম্মিত। ইহার মধ্যে যাবতীয় সৌভাগ্যকর ভোগ্য বস্তু সকল বিদ্যমান আছে। ইহার ছয়টী কোণ, প্রত্যেক কোণেই দেব সকল বিরাজ করিতেছেন। পূর্ব্ব কোণে চতুর্ব্বক্ত্র ব্রহ্মা কুণ্ড, অক্ষমালা, অভয় ও দণ্ডাদি আয়ুধ সকল ধারণ করিয়া গায়ত্রী দেবীর সহিত বাস করিতেছেন। গায়ত্রী দেবীও ঐ সকল আয়ুধনিকর দ্বারা বিভূষিতা আছেন। এই স্থানে সমস্ত বেদ, স্মৃতি, পুরাণ ও নানাবিধ শাস্ত্র সকল মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক বাস করিতেছেন। এই ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে ব্রহ্মা, গায়ত্রী ও ব্যাহৃতিগণের যত অবতার আছেন, তাঁহারা সমস্তই এই স্থানে বাস করিতেছেন।

ইহার নৈঋর্ত কোণে শঙ্খ, চক, গদা, পদ্ম ধারী মহাবিষ্ণু শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্মধারিণী সাবিত্রী দেবীর সহিত বাস করিতেছেন। প্রতি ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে সাবিত্রীর যাবতীয় অবতার, এবং মৎস্য, কূর্ম্ম বরাহ প্রভৃতি যাবতীয় বিষ্ণুর অবতার আছেন, তাঁহারা সকলেই এই স্থানে বাস করিতেছেন।

ইহার বায়ুকোণে, পরশু, অক্ষমালা অভয় ও বরধারী মহারুদ্র ও তাদৃশ রূপধারিণী সরস্বতীর সহিত বিদ্যমান আছেন। সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে দক্ষিণাস্য প্রভৃতি যে সকল রুদ্রাবতার, এবং গৌরী প্রভৃতি যে সকল পার্ব্বতীর অবতার আছেন তাঁহারা সকলেই এই স্থানে অবস্থিতি করিতেছেন। প্রসিদ্ধ চতুঃষষ্টি আগম ও অন্যান্য নিখিল তন্ত্র সকল মূর্ত্তিধারণ পূর্ব্বক এই স্থানে বাস করিতেছেন।

ইহার অগ্নিকোণে ভগবতীর নিধিপতি ধননায়ক কুবের নানাবিধ বীথিকায় পরিবেষ্টিত থাকিয়া একহস্তে রত্নকুম্ভ ও একহস্তে মণিকরণ্ডিকা ধারণ পূর্ব্বক মহালক্ষ্মী ও স্বগণের সহিত অবস্থিতি করিতেছেন।

ইহার পশ্চিমকোণে পাশাঙ্কুশ ধনুর্ব্বাণধারী মদন রতির সহিত নিত্য

বিদ্যমান আছেন, তাঁহার যাবতীয় শৃঙ্গারাদি পারিষদসকলও এই স্থানে মূর্ত্তিমান্ হইয়া অবস্থিতি করিতেছেন।

ইহার ঈশান কোণে পাশাঙ্কুশধারী মহাবীর, বিঘ্ননাশন, গণপতি পুষ্টি দেবীর সহিত নিত্য বিরাজ করিতেছেন। নিখিল ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে বিঘ্নরাজের যে যে বিভূতি সকল বিদ্যমান আছে, তৎসমস্তই এই স্থানে বর্ত্তমান।　　(ক্রমশঃ)

রায় সাহেব শ্রীদুর্গাচরণ চক্রবর্ত্তী।

হিপ্‌টনিক মায়া বা বশীকরণ।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

সেই জন্যই শোক বিশেষভাবে পরিত্যাজ্য; কারণ ইহাতে কোন ফল নাই, বরং মৃত ও মৃতের আত্মীয়েরা যাহারা তাহার জন্য শোকার্ত্ত, এ উভয়েরই ক্ষতি।" তৎপরে আমার দিকে ফিরিয়া বলিল "আমি পূর্ব্ব সম্বন্ধ অনুসারে এখনও তোমাদের সম্বোধন করিতেছি। যদিও এ অবস্থায় কোন সম্বন্ধ নাই এবং এ অবস্থা জীবদ্দশায় কর্ম্মের আসক্তি ভিন্ন সমস্ত বস্তু হইতে সম্পূর্ণ ভাবে পৃথক্‌রূপে গঠিত, তথাপি তোমরা আমার চক্ষে এখনও সেই বন্ধু। সেই জন্যই বলিতেছি এবং অন্ততঃ আমার প্রতি তোমাদের যে আন্তরিক বিশ্বাস ছিল, তাহারই জন্য বলিতেছি যে, যে জীবন এক্ষণে তোমাদের করতলগত বা যাহা এক্ষণে ভোগ করিতেছ, তাহা তোমরা নিজেদের আত্মা হইতে অবিচ্ছিন্ন বলিয়া মনে কর। তোমরা যে বস্তু, সে বস্তু হইতে সে দেহ যে কতদূরে অবস্থিত, তাহা সহজে প্রতীয়মান হয় না। যেমন সমুদ্রতীরে দাঁড়াইয়া অগাধ সলিল-রাশির প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে বোধ হয় অনন্ত আকাশ যেন অনন্ত বারিধির সহিত মিশ্রিত এবং প্রতি অণুতে অণুতে একসূত্রে গাঁথা, সেই

প্রকার মনুষ্যের দেহ আত্মার সহিত একত্র সংযোজিত বলিয়া জীবদ্দশায় ভ্রম জন্মে; কিন্তু মৃত্যুর পর, যে অবস্থায় আমি এক্ষণে নিপতিত, সেই দশায় আসিলে সমস্ত ভ্রম দূরে যায়, তখন বুঝিতে পারা যায় যে, জড়দেহ প্রবৃত্তির যন্ত্র। মৃত্যুর সহিত যন্ত্রের ধ্বংস হয়; কিন্তু প্রবৃত্তি রহিয়া যায়। আসক্তির আগুনে জীবকে ধ্বংস করে, ব্যতিব্যস্ত করে, দুঃখ-সলিলে নিপাতিত করে, কিন্তু তাহার কোন প্রতিকার নাই। যন্ত্রণায় অস্ফুটশব্দ উচ্চারণের ক্ষমতা নাই, সমস্ত আজ্ঞাবহ দাসের ন্যায় নীরবে সহ্য করিতে হয়। মনুষ্য দেহ অতি দুর্ম্মূল্য। মনুষ্যজীবন গ্রহণ করিয়া জীব নিজেকে আসক্তি, কামনা ও ভোগের করাল ছায়া হইতে দূরে রাখিতে সমর্থ হয়, আবার ইচ্ছামত কামনার দাস হইতে আসক্তির পাছে পাছে প্রভুভক্ত কুকুরের ন্যায় ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতে ও ভোগের ক্রীতদাস রূপে গঠিত হইতে পারে।” এই সময়ে মহেন্দ্র রমেশের আত্মার উদ্দেশে বলিয়া উঠিল “আমাদের অপেক্ষা তুমি এক্ষণে উচ্চস্থানীয় এবং তোমার দৃষ্টি এ অবস্থায় আমাদের অপেক্ষা অধিকতর দূরগামী। বলিতে পার কি কি কারণে মনুষ্যের উন্নতি ও অবনতি হইতে দেখা যায়?” উত্তরে রমেশের আত্মা পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর গম্ভীর স্বরে বলিতে লাগিল “এ বিষয়ে উত্তর দিতে আমি যে অবস্থায় জীব, সে অবস্থায় আমার কোন দূরদর্শিতা নাই। তবে যাহা বাস্তবসত্য, যাহা বহুকাল পূর্ব্বে মুনি ঋষি হইতে বর্ত্তমান সময়ে মুদ্রিত ধর্ম্ম পুস্তকাবলীতে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার অধিক কিছু জানা নাই। মনুষ্যজীবনে সে সকল পড়িয়া শুনিয়াও, সেরূপ ভাবে শিক্ষা পাইয়াও প্রতিপদে সে মহাবাক্যগুলির সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ উপস্থিত হয় বা সেগুলিকে সময়ে সময়ে একেবারে ভুলিয়া যাইতে হয়—আর এখানে, এঅবস্থায় সেগুলি যেন মূর্ত্তিমান্ হইয়া সদাসর্ব্বদা মানস-পটে উদিত হইতে থাকে। যেরূপ রাত্রিকালে তোমাদের মনে

হয় যে, পরদিবস প্রাতে সূর্য্যোদয়ে পৃথিবী পুনঃ আলোকিত হইবে এবং সে বিষয়ে যেমন ভুলেও মনে সন্দেহ উপস্থিত হয় না, সেই প্রকার এ লোকের জীবও, উহাদের সত্যতা সম্বন্ধে এক প্রকার নিশ্চিত। এক প্রকার বলি কেন সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিত; কারণ তাহারা বুঝে এবং বুঝে বলিয়াই বোধ হয় নিজেদের কর্ম্মফলরূপ ঘোর মানসিক উত্তেজনা কালে তাহারা নিজেদের অস্তিত্ব হারায় না।

মনুষ্যের চিন্তাই উন্নতির মূল; আবার চিন্তাই ধ্বংসের কারণ। সৃষ্টির ইহাই আশ্চর্য্যজনক ব্যাপার যে, এক অবস্থায় এক বস্তু উপকারক ও সেই বস্তুই অবস্থাভেদে প্রাণহানিকর। তোমরা সকলেই অবগত আছ, চিকিৎসকে বিকারগ্রস্ত রোগীকে ঔষধের সহিত বিষ সেবন করাইয়া তাহাকে সহজ অবস্থায় আনয়ন করে; কিন্তু যদি সহজ অবস্থায় কোনব্যক্তি সে বিষ গলাধঃকরণ করে, তবে তাহার জীবন সঙ্কটাপন্ন হয়। সেই প্রকার চিন্তা যখন স্ত্রী ও অর্থের প্রতি ধাবিত হয়, তখনই তাহা ধ্বংসের কারণ হইয়া থাকে।

সত্য বটে, স্ত্রী সংসারের অবলম্বন, স্ত্রী ভিন্ন সংসার শূন্য, তাহারা না থাকিলে মনুষ্য উদ্যমবিহীন এবং যদিও তাহারা সুখে-দুঃখে সম্পদে, বিপদে, সকল সময়েই অংশ গ্রহণ করিয়া যাতনার ভার লাঘব করিয়া দেয় ও সংসার-মরুতে একমাত্র সুশীতল বারিপূর্ণ মরুদ্বীপ স্বরূপ বর্ত্তমান এবং জীবকুল দুঃখকষ্টে নানারূপে প্রপীড়িত হইয়া একমাত্র তাহাদের ক্রোড়ে আসিয়া শান্তি লাভ করে, তথাপি যদি তাহাদের চিন্তা শয়নে, স্বপনে, নিদ্রায় জাগরণে, অহরহঃ সর্ব্বক্ষণ জীবের মানস-পটে উদিত থাকে, তাহা হইলে তাহাকে অতি শীঘ্র ঘোর লালসার দাস হইতে দেখা যায়। তাহার সে চিন্তা তাহাকে ধ্বংস করে, তাহার মনুষ্যদেহ ধারণের উদ্দেশ্য ব্যর্থ করে এবং নিজেদের অস্তিত্ব ভুলাইয়া দেয়। অর্থ সম্বন্ধের চিন্তাও ঠিক একই ফলপ্রদ; অধিকন্তু ভোগলিপ্সা এতই অধিক হয় যে, কার্য্যকারিতার শক্তিকে

বিশ্বাসঘাতকতায় পরিণত করে। আবার চিন্তাকে যগ্যপি অন্য দিকে নিয়োজিত করা হয়, তাহা হইলে উহা জীবকে এত উর্দ্ধে উত্তোলন করে যে, সংসারের সুখ, দুঃখ, মান, অপমান, লজ্জা, ঘৃণা, ভয়, নিন্দা ও যশ এসকল কিছুই তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। সে এক অনির্ব্বচনীয় সুখে নিমগ্ন থাকে; তাহার মনে তখন শান্তি ভিন্ন অন্য অবস্থার উপলব্ধি হয় না। যে চিন্তা মনুষ্যকে এরূপ পরিবর্ত্তিত করে—যাহার প্রভাবে জীব সেই করুণাময় জগদীশ্বরের গুণরাশিতে ভূষিত হয়—সে চিন্তা মৃত্যু-চিন্তা। মৃত্যু-চিন্তাই জীবকে পাপরাশি হইতে বহুদূরে স্থাপিত করে এবং উহাই একমাত্র শিখাইয়া দেয় যে, এই সুন্দর পৃথিবী হইতে এক মুহূর্ত্তে অস্তিত্বের বিলোপ ঘটে, যাহার ফলে আকাঙ্ক্ষা দমিত থাকে এবং ক্রমে বুঝিবার ক্ষমতা হয় যে, কোন্ বস্তু নিত্য ও কোন্ বস্তু অনিত্য। মৃত্যুর পূর্ব্বে তোমাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আমার অভিলাষ হয় এবং সেই জন্যই মহেন্দ্র তোমার ভ্রাতার উপর আমার এত শীঘ্র আবেশ হইয়াছে; নতুবা অন্য কোন আত্মার আবেশ হইত। আমি এরূপ ভাবে আর বেশীক্ষণ বদ্ধ থাকিতে ইচ্ছা করি না; ইহাতে আমার নিজের কষ্ট; অধিকন্তু তোমার ভ্রাতারও অসুস্থ হইবার সম্ভাবনা।”

তৎপরে আমার দিকে ফিরিয়া বলিল, “তোমাকে এ সময়ে দেখিবার আশা করি নাই। এ সময়ে এরূপভাবে সকলকে এক সঙ্গে দেখিতে পাইয়া আমি যৎপরোনাস্তি প্রীত হইলাম। এক্ষণে বিদায়; এ নগণ্য বন্ধুকে বিস্মৃত হইও না।”

কিয়ৎকাল পরে মহেন্দ্রের ভ্রাতা নিদ্রোত্থিতের ন্যায় উঠিয়া বসিল এবং তাহাকে পূর্ব্বের কথা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল যে, সে কিছুই জানে না, কারণ আগত ভদ্রলোকটির দিকে কয়েক মিনিট চাহিয়া থাকিতেই সে নিজের অনিচ্ছাসত্ত্বেও নিদ্রিত হইয়া পড়িয়াছিল।

শ্রীমুরারিমোহন মুখোপাধ্যায়।

অলৌকিক রহস্য।

১০ম সংখ্যা] দ্বিতীয় ভাগ। [মাঘ, ১৩১৭

প্রতিশোধ।

(১)

প্রিয়বাবুর নিবাস বর্দ্ধমান জেলার এক ক্ষুদ্র পল্লীগ্রামে। তিনি জাতিতে কুলীন ব্রাহ্মণ। তাঁহার দুই বিবাহ। দুই জনই অল্পবয়স্কা। সন্তানাদি কিছুই হয় নাই। এ উহার সপত্নী বলিয়া তাহাদের কাহারও হৃদয়ে কোন রাগ বা দ্বেষ ছিল না,—যেন সহোদরা ভগ্নী; ক্ষণকালের নিমিত্তও কেহ কাহারও সঙ্গ ত্যাগ করিত না। গৃহস্থলীর সমস্ত কর্ম্মই পরস্পরে সৌহার্দ্দের সহিত সম্পন্ন করিত।

প্রিয়বাবু দূরবর্ত্তী কোন স্থানে চাকুরি করিতেন। অল্প মাহিনা বলিয়া তিনি পত্নীদ্বয়কে বাসায় লইয়া যান নাই। পাড়ার সম্পর্কে আত্মীয়া কোন বৃদ্ধাকে তাহাদের অভিভাবকরূপে রাখিয়া গিয়াছিলেন—তাঁহার সংসারে আর কেহ ছিল না,—সেই বৃদ্ধাই তাহাদের সর্ব্বেসর্ব্বা; বধূদ্বয়ও বৃদ্ধাকে আপনার গুরুজনের ন্যায় মান্য করিত। মধ্যে মধ্যে ছুটী পাইলেই প্রিয়বাবু চাকুরি স্থান হইতে বাড়ীতে আসিতেন।

পূজার ছুটি তখনও হয় নাই—পাঁচ ছয় দিন পরেই হইবে,--আফিসে কাজের ভিড় পড়িয়াছে, এমন সময় তিনি বাড়ী হইতে বৃদ্ধার নামাঙ্কিত একখানি পত্র প্রাপ্ত হইলেন। তাহাতে কোন বিশেষ প্রয়োজন বশতঃ বাড়ী যাইতে অনুরোধ করা ছিল;—তবে কি যে প্রয়োজন, তাহার বিন্দু-

বিসর্গও লেখা ছিল না। তিনি পত্র পাইয়াই তৎক্ষণাৎ আফিসের বড় বাবুর নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে সমস্ত বিষয় জানাইয়া সেই দিনই ছুটী লইয়া সন্দিগ্ধমনে বাড়ী রওনা হইলেন। পত্নীদ্বয়ের মধ্যে কাহারও গুরুতর অসুখ হইয়াছে, এই বিশ্বাসই তাঁহার হৃদয়ে দৃঢ়ভাবে বদ্ধ হইয়াছিল।

ষ্টেশন হইতে বাড়ী প্রায় দুই মাইল। মাঠের রাস্তা—বেলা দ্বিপ্রহর অতীত হইয়াছে—তখন পর্য্যন্ত তিনি জলস্পর্শ করেন নাই; তাহার উপর দুর্ভাবনায় সমস্ত রাত্রি চোখের উপর কাটিয়া গিয়াছে; ক্ষুধায়, তৃষ্ণায়—শরীর অবসন্ন—পদদ্বয় আর অগ্রসর হইতে চায় না, তথাচ তিনি মুহূর্ত্তের নিমিত্তও কোন স্থানে বিশ্রাম করিলেন না। ট্রেণ হইতে নামিয়াই দ্রুতপদে শরৎকালের সেই প্রখর রৌদ্র মাথায় পাতিয়া গৃহাভিমুখে গমন করিলেন।

বাড়ী পহুঁছিতে প্রায় দুইটা বাজিয়া গেল। গৃহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়াই তিনি যেরূপ আশ্চর্য্যজনক দৃশ্য দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার হৃদয় কম্পিত হইল। তিনি মনে করিয়াছিলেন, পত্নীদ্বয়ের মধ্যে কাহারও গুরুতর অসুখ হইয়াছে; কিন্তু এ দৃশ্য ত তাহা নয়! এ যে তাহা অপেক্ষা আরও ভয়াবহ! যাহারা স্বামীর বাড়ী আসিবার কথা শুনিলে নির্দ্দিষ্ট দিনে দ্বারে অপেক্ষা করিয়া পথপানে চাহিয়া থাকিত, আজ তাহারা সেই স্বামীকে গৃহে প্রবেশ করিতে দেখিয়া কোন বাক্যালাপ না করিয়া রন্ধনশালায় প্রবেশপূর্ব্বক সন্ত্রস্তভাবে দ্বার বন্ধ করিল! তিনি অনেক চেষ্টা করিলেন—নিজের কষ্টের কথা কাতরস্বরে বলিলেন, কিছুতেই তাহারা দ্বার খুলিল না।

একে ক্ষুৎপিপাসায় শরীর ক্লিষ্ট, তাহার উপর প্রাণ অপেক্ষা যাহারা আদরের, তাহাদের এই শোচনীয় অবস্থা,—ইহা আলোচনা করিয়া তিনি

আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। ভগ্ন হৃদয়েই সেই স্থানে বসিয়া পড়িলেন এবং ক্ষুধাতৃষ্ণার কথা ভুলিয়া পত্নীদ্বয়ের সহসা এইরূপ হইবার কারণ কি, তাহা চিন্তা করিতে লাগিলেন। বৃদ্ধা তখন গৃহে ছিলেন না,—কোন প্রয়োজন বশতঃ বাহিরে গিয়াছিলেন। যখন তিনি ফিরিয়া আসিয়া প্রিয়বাবুকে সেই ভাবে উপবিষ্ট দেখিলেন, তখন আর চক্ষুর জল সম্বরণ করিতে পারিলেন না,—রমণী-স্বভাব-সুলভ কোমলতা বশতঃ কাতর কণ্ঠে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।

প্রিয়বাবু কোন প্রকারে বৃদ্ধাকে সান্ত্বনা করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—সহসা এরূপ হইবার কারণ কি? বৃদ্ধা ক্রন্দন করিতে করিতে বলিলেন,—"আজ দশ পনর দিন হইল, এইরূপ হইয়াছে। কেন যে হইয়াছে, তাহা বলিতে পারি না।" প্রিয়বাবু পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন,—"প্রতিবেশীরা এ সম্বন্ধে কোন আন্দোলন করে না?"

বৃদ্ধা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—"কেহ বলে পাগল হইয়াছে, কেহ বলে ভূতে পাইয়াছে। আমি ইতিমধ্যে অনেক চিকিৎসা করাইয়াছি, কিন্তু ফল হয় নাই।"

বৃদ্ধার কথা শুনিয়া প্রিয়বাবু আর কিছু জিজ্ঞাসা করিলেন না,—নিরাশা-জড়িত দীর্ঘ নিশ্বাসে মনের ব্যথা মনেই লুক্কায়িত রাখিলেন।

(২)

দিন যত অতিবাহিত হইতে লাগিল, প্রিয়বাবুও ততই অধীর হইতে লাগিলেন। কোন ক্রমেই পত্নীদ্বয়ের পীড়ার উপশম হইতেছে না। যে যাহা বলিতেছে, তিনি তাহাই করিতেছেন। নিকটস্থ ডাক্তার, বৈদ্য, হাতুড়ে, ভূতুড়ে সকল চিকিৎসককেই দেখাইলেন; কিন্তু কাহারও ঔষধে তিলমাত্রও ফল হইল না। পীড়ার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতে লাগিল। ক্রমশঃ এরূপ হইল যে, যদিও তাহারা দিনের মধ্যে দুই একবার গৃহের

বাহির হইত, এখন তাহাও হয় না। গৃহের অভ্যন্তরস্থ দুই বিভিন্ন কোণে উপবিষ্ট হইয়া সদাসর্ব্বদাই যেন কি চিন্তা করে এবং মধ্যে মধ্যে যেন কাহার সহিত চুপে চুপে কথা কয়।

পেটের দায় বড় দায়—বিশেষতঃ যাহাদের চাকুরিই সম্বল। এক-দিকে গৃহে এইরূপ বিপদ, অপরদিকে—অবকাশ শেষ হইয়াছে, যথা-সময়ে উপস্থিত না হইলে চাকুরি হইতে বঞ্চিত হইবার সম্ভাবনা। প্রিয়বাবু কোন্ পথে ধাবিত হইবেন, এই চিন্তাতে অধীর হইয়া পড়িলেন। প্রতিবেশীরা কেহ কিছু পরামর্শ দেয় না—দিলেও নানা মুনির নানা মত।

এখন বৃদ্ধাই তাঁহার প্রকৃত পরামর্শ-দাত্রী—প্রকৃত আশ্রয়-স্থান। তাঁহার বাক্যই গ্রহণীয়, এই চিন্তা করিয়া তিনি বৃদ্ধার নিকট আভ্যন্তরীণ অধীরতা প্রকাশ করিলেন এবং অবশেষে তাঁহারই পরামর্শে পুনরায় চাকুরি স্থানে গমনপূর্ব্বক পত্নীদ্বয়ের পীড়ার বিষয় বড়বাবুর নিকট যথাযথ জ্ঞাপন করিয়া আরও কিছুদিনের অবকাশের জন্য কৃতসঙ্কল্প হইলেন ও পরদিন প্রভাতে আহারাদির পর রওনা হইলেন।

যাহাদের প্রতিপালনের জন্য বিদেশে চাকুরি করিতে হয়, তাহারা আজ অতি শোচনীয় অবস্থায় পতিত, তাহাদিগকে বরঞ্চ অসহায় অবস্থায় ত্যাগ করিতে পারা যায়; কিন্তু ধন্য চাকুরির মায়া! চাকুরি কোন প্রকারে ত্যাগ করিতে পারা যায় না!

(৩)

আসানসোল—ই, আই, আর্, ও বি, এন্, আর্, কোম্পানির একটী বড় ষ্টেশন। এখানে অধিকাংশ যাত্রীকেই ট্রেণ বদলাইতে হয়। প্রিয়বাবুকেও হইবে,—অগত্যা এখানে তাঁহাকে নামিতে হইল। গন্তব্য

স্থানের ট্রেণ আসিবার বিলম্ব থাকায় ষ্টেশনের এক পার্শ্বে উপবিষ্ট হইয়া তিনি পত্নীদ্বয়ের কথা ভাবিতেছেন, আর চোখের জল ফেলিতেছেন, জানি না, এমন সময় কোথা হইতে একজন মুসলমান ফকীর সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার পরিধানে—গৈরিক বসন, মস্তক শুভ্র কেশদাম দ্বারা মণ্ডিত, মুখমণ্ডল অতি বিস্তৃত পরিপক্ক শ্মশ্রু গুম্ফ-সমন্বিত, গলদেশ তুষার-ধবলিত স্ফটিকের মালা দ্বারা পরিবেষ্টিত, সমস্ত শরীর কি এক স্বর্গীয়ভাবে পরিপূর্ণ,—দেখিলে আপনা হইতেই ভক্তি বিচ্ছুরিত হয়।

সাধুগণের হৃদয় স্বভাবতই কোমল। কাহারও দুঃখ দেখিলে তাঁহারা স্থির থাকিতে পারেন না,—দুঃখের কারণ নির্দ্দেশের জন্য সর্ব্বদাই ব্যগ্র হন। সেই জন্য তিনি প্রিয়বাবুকে এক পার্শ্বে দুঃখিতান্তঃকরণে উপবিষ্ট দেখিয়া ধীরে ধীরে তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইলেন এবং এরূপভাবে উপবিষ্ট থাকিবার কারণ কি, তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন।

প্রিয়বাবু পত্নীদ্বয়ের চিন্তাতেই আত্মহারা। ফকীর যে কখন তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়াছেন, তাহা তিনি লক্ষ্য করেন নাই।

প্রথমবার জিজ্ঞাসা করিয়া যখন কোন উত্তর পাইলেন না, তখন তিনি নিজের দ্রব্যাদি সমেত প্রিয়বাবুর সম্মুখে উপবিষ্ট হইলেন এবং সস্নেহে তাঁহার অঙ্গে হস্ত স্থাপনপূর্ব্বক পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন— "বাবু, এস্থানে এরূপভাবে থাকিবার কারণ কি? আপনাকে দেখিয়া বোধ হইতেছে, কি যেন ভীষণ কষ্ট হৃদয়ের মধ্যে পোষণ করিতেছেন।"

হস্ত-সংস্পর্শে তাঁহার চমক ভাঙ্গিল; কিন্তু জিজ্ঞাসিত বিষয়ের কি যে উত্তর দিবেন, তাহা খুঁজিয়া পাইলেন না। চক্ষুদ্বয় বাষ্প-পরিপূর্ণ হইল—কণ্ঠ রুদ্ধ হইল। তাঁহার এইরূপ অবস্থা দেখিয়া ফকীরও স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি আরও আগ্রহের সহিত বলিলেন— "আমার নিকট প্রকাশ করিলে আপনার অনিষ্টের কোন আশঙ্কা নাই।

আমাকে বিশ্বাস করিয়া বলুন। যদি আমার আয়ত্তাধীন হয়, তবে তাহার প্রতিকারও করিতে পারি।"

প্রতিকারের কথা শুনিয়া প্রিয়বাবু দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন এবং ফকীরের আগ্রহাতিশয্যে অনুরুদ্ধ হইয়া পত্নীদ্বয়ের পীড়ার বিষয় ও অবকাশ প্রার্থনার জন্য চাকুরি স্থানে গমন প্রভৃতি সমস্তই প্রকাশ করিলেন। তাঁহার কথা শেষ হইলে ফকীর ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন,—"আপনার নিকট যাহা শুনিলাম, তাহাতে আমার মনে হয় আপনার পত্নীদ্বয় বায়ুরোগাক্রান্তা নয়। তাহাদের শরীরে নিশ্চয় কোন ভূত বা ব্রহ্মদৈত্যের আবেশ হইয়াছে। ইহার প্রতীকার আমিই করিব; কিন্তু এসম্বন্ধে আমার আরও জিজ্ঞাস্য আছে।

প্রিয়বাবু বলিলেন,—জিজ্ঞাসা করুন; যদি জানা থাকে, অবশ্যই বলিব।

ফকীর বলিলেন—"আপনার গৃহের অঙ্গনে অথবা পার্শ্বে কোন বৃক্ষ আছে কি?"

প্রিয়বাবু—অঙ্গনে একটী বৃহৎ চম্পক বৃক্ষ আছে।

ফকীর—সেই বৃক্ষ হইতে কোন দিন আপনি কোন প্রকার জন্তু বা অপর কোন মূর্ত্তি আপনার গৃহে প্রবেশ করিতে দেখিয়াছেন; অথবা আপনার পত্নীদ্বয়কে সেই বৃক্ষের দিকে চাহিয়া থাকিতে দেখিয়াছেন?

প্রিয়বাবু—একদিন একটা বিড়াল বৃক্ষ হইতে নামিয়া গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল; কিন্তু তৎক্ষণাৎ সেটা বাহির হইল দেখিলাম। ইহা ভিন্ন আর কিছু দেখি নাই।

ফকীর—আচ্ছা, আপনি বাড়ীতে চলুন, আমি ইহার প্রতীকার করিব। সেই বিড়ালই যত অনিষ্টের মূল।

ফকীরের কথা শুনিয়া প্রিয়বাবু প্রথমে সন্দিগ্ধচিত্ত হইয়াছিলেন; কিন্তু

তাঁহার হাবভাব দেখিয়া ক্রমশঃ তাহাতে বিশ্বাস করিলেন ও চাকুরি স্থানে না যাইয়া পরবর্ত্তী ট্রেণে পুনরায় গ্রামাভিমুখে রওনা হইলেন। তিনি ফকীরের ট্রেণভাড়া দিতে চাহিয়াছিলেন; কিন্তু ফকীর তাহা গ্রহণ করেন নাই—পরোপকারই সাধুগণের জীবনব্রত।

(৪)

গ্রামে পঁহুছিতে রাত্রি নয়টা বাজিয়া গেল। প্রিয়বাবু মনে করিয়াছিলেন, ফকীর বুঝি তাঁহার গৃহেই যাইবেন; কিন্তু তাহা হইল না। ফকীর একটী অশ্বত্থের নিকট আসিয়া বলিলেন,—"আমি এই অশ্বত্থে থাকিতে ইচ্ছা করি; কারণ অদ্য রাত্রেই যদি আপনার গৃহে উপস্থিত হই, তাহা হইলে মহা বিভ্রাটের সম্ভাবনা,—হয় ত, আপনার পত্নীদ্বয়ের প্রাণসংশয় হইতে পারে; অতএব না যাওয়াই যুক্তিযুক্ত। আমি অশ্বত্থেই রহিলাম। অদ্য তাহাদের গতি-বিধির প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিবেন। কল্য প্রাতে যাহা করিতে হইবে, আপনি এই স্থানে আসিলে প্রকাশ করিব।"

প্রিয়বাবু আর কিছু বলিলেন না। সেই রাত্রিকালে আহারাদির ব্যবস্থা করিয়া দিয়া ফকীরের নিকট বিদায় লইয়া স্বগৃহাভিমুখে চলিলেন।

বাড়ীর সম্মুখে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, দ্বার রুদ্ধ। তিনি মনে করিয়াছিলেন, কোন কৌশলে দ্বার অপসৃত করিয়া পত্নীদ্বয়ের অজ্ঞাত-ভাবে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিবেন ও তাহাদের গতিবিধি লক্ষ্য করি-বেন। কিন্তু তাহা হইল না,—দ্বার কোন প্রকারে খুলিল না; সুতরাং বৃদ্ধাকে ডাকিতে হইল। অনেক ডাকাডাকির পর বৃদ্ধা আসিয়া দ্বার খুলিয়া দিলেন। গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়াই তাঁহার দৃষ্টি রন্ধন-শালার গবাক্ষের উপর পতিত হইল। তিনি দেখিলেন, একটা শুভ্রবর্ণের বিড়াল গবাক্ষ হইতে বাহিরে লাফাইয়া পড়িল ও তাঁহার পত্নীদ্বয়

সেই দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া রহিয়াছে। তদ্দর্শনে প্রিয়বাবুর সমস্ত শরীর কম্পিত হইল। তিনি আর সে স্থানে থাকিতে পারিলেন না। তৎক্ষণাৎ নিজের শয়নকক্ষে প্রবেশ করিলেন।—বৃদ্ধা আহারাদির জন্য অনেক পীড়াপীড়ি করিলেন; কিন্তু কোনই উত্তর পাইলেন না।

(৫)

পর দিন প্রাতঃকালে প্রিয়বাবু অস্থলে ফকীরের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং পূর্ব্বরাত্রির ঘটনাটি তাঁহার নিকট প্রকাশ করিলেন। ফকীর তাঁহার কথা শুনিয়া বলিলেন—"আমি এখনই আপনাকে এই বিপদ হইতে উদ্ধার করিব; কিন্তু আপনাকে আর একটী কার্য্য করিতে হইবে।"

প্রিয়বাবু কহিলেন—"বলুন, অবশ্যই করিব।

ফকীর বলিলেন—"একটী নূতন মৃত্তিকা-নির্ম্মিত "সরা" আনয়ন করুন। তাহার কোন অংশই যেন ভগ্ন বা ছিদ্রযুক্ত না হয়।"

প্রিয়বাবু ফকীরের কথা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ এক মুদীর দোকান হইতে উহা ক্রয় করিয়া আনিলেন ও তাহা ফকীরের হস্তে প্রদান করিলেন। ফকারও বিশেষভাবে পরীক্ষা করিয়া তাহা গ্রহণ করিলেন।

প্রাতঃক্রিয়া সমাপন করিয়া খোদার নাম উচ্চারণপূর্ব্বক ফকীর সরাটী নিজের সম্মুখে স্থাপন করিলেন এবং মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক তাহাতে ফুঁ দিতে লাগিলেন। তিনি যত ফুঁ দেন, সরাটীর অঙ্গ হইতে তত খণ্ড ভগ্ন হইয়া ভূমিতে পড়িতে থাকে। এইরূপ করিতে করিতে যখন দেখিলেন, সরাটীর অর্দ্ধেকাংশ ভগ্ন হইয়া আর ভগ্ন হইতেছে না, তখন তিনি মন্ত্রসংযত করিলেন এবং প্রিয়বাবুকে বলিলেন "ইহা হইতেই আপনার কার্য্যোদ্ধার হইবে।" প্রিয়বাবু তাঁহার মন্ত্রের শক্তি দেখিয়া মনে মনে শত সহস্রবার প্রণাম করিলেন। ফকীর ভগ্ন

অংশগুলি লইয়া প্রিয়বাবুকে তাঁহার সহিত গৃহে যাইবার জন্ত ইঙ্গিত করিলেন এবং উভয়েই ভগবানের নাম স্মরণ করিয়া তদভিমুখে চলিলেন।

গৃহদ্বারে উপস্থিত হইয়া প্রিয়বাবু অগ্রে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং দেখিলেন যে, তাঁহার পত্নীদ্বয় শয়নগৃহের সম্মুখস্থিত চালায় আবদ্ধ বংশ খণ্ড ধরিয়া অঙ্গনস্থিত বৃক্ষের প্রতি সতৃষ্ণনয়নে চাহিয়া রহিয়াছে। তদ্দর্শনে তিনি বাহিরে আসিলেন এবং ফকীরের নিকট তাহা বিবৃত করিলেন। ফকীর সুযোগ বুঝিয়া তাঁহার সহিত ধীরে ধীরে প্রবেশ করিলেন—যেন বধূদ্বয় না দেখিতে পায়। প্রবেশ করিয়াই তিনি বৃক্ষের প্রতি তাকাইলেন। বিড়ালটা তখনও বসিয়াছিল। ফকীর মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক একটী সরাখণ্ড তাহার দিকে নিক্ষেপ করিলেন। তাহার আঘাতে বিড়ালটা বিকট চীৎকার করিয়া এক লম্ফে বধূদ্বয়ের কক্ষমধ্যে আসিয়া পতিত হইল। বধূদ্বয় ব্যস্ততার সহিত তাহাকে ধরিয়া আনন্দ-বিহ্বলান্তঃকরণে গৃহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিবার জন্ত যেমন ধাবিত হইল, অমনি তাহাদের দৃষ্টি ফকীরের উপর পতিত হইল। তাঁহাকে দেখিয়া তাহারা চীৎকার করিতে করিতে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া দ্বার বন্ধ করিল। ফকীরও তাহাদের পশ্চাতে ছুটিয়া আসিয়া দ্বারে সজোরে আঘাত করিতে লাগিলেন। দ্বার কিছুতেই খুলিল না। তখন তিনি দ্বার ভগ্ন করিবার জন্য প্রিয় বাবুর অনুমতি চাহিলেন। প্রিয়বাবু অন্তরের সহিত তাহা অনুমোদন করিলেন এবং নিজেও তাঁহার সহিত যোগ দিলেন। ইঁহাদের দেখাদেখি দর্শকরূপে আগত প্রতিবেশীদের মধ্যে ২।৪ জন আসিয়া তাহাতে সাহায্য করিল এবং অল্পক্ষণমধ্যে দ্বার ভগ্ন হইয়া গেল। ফকীর উচ্চৈঃস্বরে মন্ত্রোচ্চারণ করিতে করিতে তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া বধূদ্বয়

চীৎকার করিতে করিতে পুনরায় বাহিরে ছুটিয়া আসিল ও চম্পক-বৃক্ষে উঠিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। ইতিমধ্যে ফকীরও বাহির হইয়া তাহাদের মস্তকের কেশাগ্র ধারণপূর্ব্বক বৃক্ষ হইতে সরাইয়া আনি-লেন এবং হস্তস্থিত সরাখণ্ড মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক তাহাদের পৃষ্ঠদেশে এক একটী করিয়া নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তাহাতে উভয়েই ভয়ানক চীৎকার করিতে লাগিল ও "জ্ব'লে গেলুম" "ক্ষমা কর" বলিয়া অঙ্গনের চতুর্দ্দিকে ছুটিতে লাগিল। ফকীর বলিলেন—"তুই কে?" ইহাতে কেহ কিছু বলিল না দেখিয়া তিনি বারংবার মন্ত্রপূত সরাখণ্ড দ্বারা আঘাত করিতে লাগিলেন। শেষে এরূপ হইল যে, আর্ত্তনাদ করিতে করিতে উভয়েই চৈতন্যশূন্য হইয়া ভূমিতে পড়িয়া গেল। তদ্দর্শনে প্রিয়বাবু বালকের ন্যায় ক্রন্দন করিয়া উঠিলেন। ফকীর বলিলেন—"এমন সময় অধীর হইলে চলিবে না। স্থির হউন।" কোনরূপে তাঁহাকে সান্ত্বনা করিয়া ফকীর বধূদ্বয়ের পার্শ্বে উপবিষ্ট হইলেন এবং উচ্চৈঃস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন—"এবার বল্, তুই কে?"

বধূদ্বয়ের মধ্যে একজনের মুখ হইতে উত্তর হইল—"আমি এই পাড়ার অমুকের ছেলে।"

ফকীর—ইহাদের উপর অত্যাচার কেন?

উত্তর হইল—প্রতিশোধ।

ফকীর—কিসের?

উত্তর—আমার জীবিতাবস্থায় সামান্য কারণে গালাগালি দিয়াছিল, সেই জন্য।

ফকীর—এক্ষণে ইহাদিগকে ত্যাগ কর্।

উত্তর হইল—করিব, কিন্তু যতদিন না——

ফকীর বাধা দিয়া বলিলেন—আমি কোন অনুরোধই শুনিব না।

এখনই ইহাদিগকে পরিত্যাগ করিতে হইবে। যদি অসম্মত হও, তাহা হইলে আবার সরাথণ্ড দ্বারা আঘাত করিব।

উত্তর হইল—'না না, এখনই যাইব। আঘাত করিও না।'

ফকীর—কেমন করিয়া বুঝিব যে, ত্যাগ করিলি ?

উত্তর হইল—কথায় বিশ্বাস কর।

ফকীর—তবে এখনই যা।

এই বলিয়া ফকীর নিস্তব্ধ হইলে, অস্ফুট ক্রন্দনধ্বনি সকলের কর্ণগোচর হইল এবং একটী শাখা তৎক্ষণাৎ চম্পকবৃক্ষ হইতে চ্যুত হইল। ফকীর আনন্দিত হইয়া প্রিয়বাবুকে বলিলেন—আপনার পত্নীদ্বয় এক্ষণে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইয়াছেন। কিন্তু ইঁহাদের চৈতন্যোদয় করিতে হইবে। একটী পাত্রে করিয়া জল আনয়ন করুন। তাহা মন্ত্রপূত করিয়া গাত্রে নিক্ষেপ করিলেই চৈতন্যোদয় হইবে।

প্রিয়বাবু ফকিরের কথানুসারে জল আনয়ন করিলেন। ফকির তাহা মন্ত্রের দ্বারা পূত করিয়া তাঁহার হস্তে দিলেন এবং বধূদ্বয় যেন এ বিষয়ের কিছুই না জানিতে পারে—এই বলিয়া গাত্রে জলনিক্ষেপ করিবার অগ্রেই প্রতিবেশিগণের সহিত সে স্থান হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

সকলে বাড়ী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলে প্রিয়বাবু সেই জল পত্নীদ্বয়ের গাত্রে তিনবার নিক্ষেপ করিলেন। তদ্দণ্ডেই তাহারা সুপ্তোত্থিতের ন্যায় ব্যস্ততার সহিত উঠিল এবং সম্মুখে স্বামীকে দেখিয়া লজ্জাবনতমস্তকে গৃহের কাজকর্ম্মে ব্যাপৃত হইল। প্রিয়বাবু বা বৃদ্ধা পূর্ব্বোক্ত ঘটনার বিন্দুবিসর্গও তাহাদের নিকট প্রকাশ করেন নাই।

সাধু-হৃদয় অপরের উপকারের জন্যই সৃষ্ট হইয়াছে। ফকীর সেই দিন সন্ধ্যার সময় প্রিয়বাবুর নিকট বিদায় লইয়া নিজের গন্তব্য-

স্থানে চলিয়া গেলেন। যাইবার সময় ট্রেণভাড়া পর্য্যন্ত গ্রহণ করেন নাই।

* * * * *

এইরূপে প্রিয়বাবু ফকীরের অনুগ্রহে বিপদ হইতে পরিত্রাণ পাইলেন এবং দিনকতক বাড়ীতে থাকিয়া শেষে পত্নীদ্বয়সমেত চাকুরীস্থানে গমন করিলেন। এখন তিনি সেই আফিসের বড়বাবু—গৃহপ্রাঙ্গণ পুত্রকন্যায় পরিপূর্ণ—সংসার শান্তিতে ভরা।

শ্রীবিজয়কৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য।

শ্রীযুক্ত "অলৌকিক রহস্য" সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু—

সম্প্রতি একটী ঘটনা আমাদের পরিবারে ঘটিয়াছে। যদিও তাহা অধিক কৌতূহলপ্রদ নহে এবং "অলৌকিক রহস্য" প্রকাশের পূর্ব্বে হইলে তাহা ধর্ত্তব্যের মধ্যেই গণ্য হইত না, তথাপি আপনাদের প্রকাশিত রহস্য মধ্যে সামান্য ভাবেও স্থল পাইতে পারে বিবেচনায় ঘটনাটী আনুপূর্ব্বিক লিখিলাম।

পারিবারিক ঘটনা।

আমাদের বাটী কলিকাতার ১৩ মাইল দক্ষিণস্থ একটী ক্ষুদ্র পল্লীগ্রামে। আমার এক ভ্রাতা কর্ম্মোপলক্ষে কলিকাতায় স্ত্রীপুত্র সহ অবস্থান করে। বিগত বৎসরের অগ্রহায়ণ মাসে আমার ভ্রাতৃবধূ কলিকাতাস্থ বাসায় একদিন রাত্রিকালে আবশ্যক হওয়ায় শয়নগৃহের বাহিরে আসেন। বলা বাহুল্য, একাকীই একটী আলোকহস্তে গৃহনিষ্ক্রান্তা হয়েন। গৃহের সম্মুখেই বারান্দা, তাঁহার উদ্দেশ্য এই—বারান্দা পার

হইয়া নীচের সিঁড়িতে নামিয়া যাইবেন। কিন্তু বারান্দার অর্দ্ধেক আন্দাজ গিয়াই হঠাৎ সিঁড়ির ঠিক উপরিস্থলে একটী বিকটাকার দীর্ঘগুম্ফ শ্মশ্রুবহুল মুর্ত্তি নয়নগোচর হইল। ভ্রাতৃবধূ প্রথমে নিদ্রালস্য-জনিত চক্ষুর ভ্রম মনে করেন; কিন্তু আরও অগ্রসর হইয়া যথার্থই স্পষ্টভাবে উক্ত মূর্ত্তি অবলোকন করিয়া ভয়ে মূর্চ্ছিতপ্রায় হইয়া চীৎকার করিয়া উঠেন। তাঁহার অস্বাভাবিক শব্দে আমার ভ্রাতা ও ক্রমে অন্যান্য চাকর দাসীরা জাগরিত হইয়া দেখে—ভ্রাতৃবধূ বারান্দায় পড়িয়া গিয়াছেন। যদিও ঠিক মূর্চ্ছিত নহে—তবে প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা কাল কি এক প্রকার হইয়াছিলেন, ভালরূপ কথা কহিয়াও কিছু বুঝাইতে পারেন নাই। পরে প্রকৃতিস্থ হইয়া ব্যাপারটা বলিতে পারিয়াছিলেন।

উক্ত ঘটনার প্রায় এক মাস পরেই ভ্রাতৃবধূর অন্তঃস্বত্ত্বাবস্থা অনুভূত হইল। সাত আট মাস পরে প্রথামত গত আষাঢ় মাসে আমাদের পল্লীস্থ ভবনে প্রসব হইবার জন্য তাঁহাকে আনা হয়। ইতিমধ্যে আর কোন বিসদৃশ ব্যাপার ঘটে নাই। পরে বিগত ভাদ্র মাহায় বেশ সুস্থ শরীরে বিনাক্লেশে ভ্রাতৃবধূ একটী পুত্র-সন্তান প্রসব করেন। সন্তানটীও বেশ সবল ও পুষ্টাঙ্গ হইয়াছিল। ভূমিষ্ঠের ষষ্ঠ দিবসাবধি প্রসূতি বা নবজাত পুত্রের কোনরূপ অসুখাদি কিছুই থাকে নাই। হঠাৎ সূতিকা পূজার রাত্রি প্রায় ২টার সময় যখন বাটীস্থ সকলে সুষুপ্ত ও নিঃশব্দ এবং প্রসূতিগৃহে এক জন স্ত্রীলোক'ও গৃহের ঠিক বাহিরেই দ্বার-সন্নিকটে আর একজন স্ত্রীলোক, উভয়েই নিদ্রিত; অধিকন্তু গৃহমধ্যে এবং বাহিরে খুব উজ্জ্বল দুইটী আলোক-বর্ত্তিকা জ্বলিতেছিল। এরূপ অবস্থায় ভ্রাতৃবধূ চীৎকার করিয়া উঠেন। তাঁহার অস্বাভাবিক শব্দে সকলে জাগরিত হইয়া দেখেন যে, আমার ভ্রাতৃবধূ শিশুকে একেবারে ক্রোড়মধ্যে লইয়া যেন অঞ্চল দ্বারা লুকাইতেছেন। তাঁহার মুখভাব তখন

অত্যন্ত ভয়-ব্যাকুলতা-মিশ্রিত। তাঁহার মুখ হইতে অস্ফুট শব্দ নির্গত হইতেছে এবং দ্বারের অপরদিকস্থ বন্ধ জানালার দিকে তিনি নিজে চাহিয়া আছেন ও সকলেরই দৃষ্টি সেই দিকে চালনার জন্য ইঙ্গিত করিতেছেন। যাহা হউক, অনেক আশ্বাস-সান্ত্বনাদির পর একটু প্রকৃতিস্থ হইলে তিনি প্রকাশ করিলেন যে, নয় মাস পূর্ব্বে কলিকাতার বাসায় রাত্রিকালে যে ভীষণ মূর্ত্তি দেখিয়াছিলেন, অবিকল সেই মূর্ত্তি আজও এই মাত্র বিকটাকারভাবে তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূত হইয়া হস্ত প্রসারণ পূর্ব্বক পুত্রটীকে লইবার চেষ্টা করিতেছে এবং তাহাতেই হঠাৎ তিনি পুত্রসংরক্ষণার্থ ওরূপভাবে ক্রোড়মধ্যে লুকাইতেছিলেন। সকলে জাগরিত হইলে ও গৃহমধ্যে গোলমাল হইবামাত্র যেন মূর্ত্তিটী অপরদিকস্থ জানালা দিয়া অপসারিত হইয়া গেল। অতঃপর জিজ্ঞাসিতা হইয়া ভ্রাতৃবধূ ঠিক বলিতে পারিলেন না যে,উক্ত ভয়াবহ দৃশ্যটী ঠিক জাগ্রদবস্থায় কিংবা নিদ্রিতাবস্থায় স্বপ্নযোগে দেখিয়াছিলেন। যাহা হউক, সে রাত্রিতে আর কাহারও নিদ্রা হইল না। বাটীস্থ সকল স্ত্রীলোকই কতক সূতিকাগারে, কতক ভ্রাতৃবধূর বিশেষ আগ্রহে তদ্দ্বারদেশেই রাত্রিযাপন করিলেন।

পর দিবস প্রত্যূষে অর্থাৎ উক্ত ঘটনার ঘণ্টা দুই পরে সন্তানটী হঠাৎ কাঁদিয়া উঠিল। কিন্তু সে ক্রন্দনের আর নিবৃত্তি হয় না। প্রথমতঃ ক্ষুধিত ভ্রমে তাহাকে স্তন্য বা দুগ্ধপান করান হইয়াছিল এবং পরে পুত্রের পেট কামড়াইতেছে, এইরূপ মনে করিয়া তাহাকে নানারূপ হোমিওপ্যাথি ঔষধ ও স্ত্রীলোকদিগের টোটকাও সেবন করান হইল; কিন্তু কিছুতেই সে ক্রন্দন নিবারণ করা গেল না। প্রথম ঘণ্টাদ্বয় কাল উক্ত ক্রন্দনের উপরেই দুগ্ধ ও স্তন্য পান করান গিয়াছিল; কিন্তু তৎপরে তাহার 'চোয়াল ধরিয়া' যাওয়ায় আর কিছুই খাওয়ান গেল না। বেলা বৃদ্ধির সঙ্গে কান্নাও বাড়িয়া ক্রমশঃ ক্ষীণতর হইয়া "গলা ধরার" মত

আওয়াজ হইয়া পড়িল। অপরাহ্ণ তিন ঘটিকা হইতে কেবল বায়ুস্বরে ক্রন্দন করতঃ বেলা ৪টার সময় পুত্রটী ইহলীলা সংবরণ করিল।

ইহার পর ভ্রাতৃবধূ কয়েকদিন শোকমগ্না থাকিয়া এক্ষণে পুনরায় কলিকাতার বাসায় আগমন করিয়াছেন এবং এ যাবৎ আর কোনরূপ কিছু বিভীষিকা দর্শন করেন নাই।

শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ মৈত্র।

মান্যবর শ্রীযুক্ত অলৌকিক-রহস্য সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

সবিনয় নিবেদনমিদং। মহাশয়! নিম্নলিখিত বৃত্তান্তটী একটী সম্পূর্ণ সত্য ঘটনা। আমার পিতৃদেব স্বচক্ষে ইহা অবলোকন করিয়াছেন। ঘটনাটীও বিস্ময়কর বটে; সেইজন্য আপনাকে যথাযথ লিখিয়া পাঠাইতেছি। অনুগ্রহ করিয়া অলৌকিক রহস্যে প্রকাশ করিলে বাধিত হইব। ইতি

শ্রীনারায়ণ চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়
পাশিবাগান।

অদ্ভুত প্রেতিনী দর্শন।

সে আজ অনেক দিনের কথা। আমার পিতা তখন P W Dর অধীনে Overseerএর পদে নিযুক্ত ছিলেন। তখন ইংরাজি ১৮৮৯ সাল; গ্রীষ্মকাল। কোনকারণ বশতঃ তাঁহাকে শিবগঞ্জে আসিতে হইয়াছিল। নানা কারণে রাত্রি অধিক হওয়াতে, সেই রাত্রি সেইখানেই অতিবাহিত করিতে মনস্থ করিলেন। ঠাকুরদাস পাত্র নামে জনৈক ব্যক্তি তাঁহাকে ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিত। তাঁহারই বাটীতে পিতাঠাকুর আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

ঠাকুরদাসের বাটীর বাহিরে খানিকটা পতিত ভূমি ছিল; তাহাতে দুই একটা মরা গাছপালাও ছিল। তাহার ওদিকে বাগান এবং মাঠ। জ্যোৎস্নালোকে গবাক্ষদ্বার দিয়া সেই গ্রাম্যদৃশ্য দেখিতে দেখিতে ও অন্যান্য বিষয় চিন্তা করিতে করিতে পিতৃদেব নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন।

নিশা দ্বিপ্রহর অতীত হইয়াছে। চারিদিক নিস্তব্ধ; মলয় পবন তরুলতা কাঁপাইয়া ধীরে ধীরে বহিয়া যাইতেছে। কখন বা শুষ্ক বৃক্ষ-পত্রের স্খলন শব্দে, কখন বা নিশাচর বনবিহঙ্গমের সুদূর কলরবে, কখন বা পেচকের তীব্র চীৎকারে নৈশ নিস্তব্ধতা থাকিয়া থাকিয়া ভঙ্গ হইতেছে। আকাশে চাঁদ হাসিতেছে। রজতকিরণে প্লাবিত হইয়া মেদিনী আপনভাবে বিভোর। শুভ্র জ্যোৎস্না নীল চন্দ্রাতপ ভেদ করিয়া, বৃক্ষপত্ররাজির অন্তরাল দিয়া উদ্যানের চারিদিকে বিক্ষিপ্ত হইয়াছে। সহসা পিতার নিদ্রাভঙ্গ হইল এবং সাতিশয় ঘর্ম্মাক্ত হওয়াতে গৃহ হইতে বাহিরে আসিলেন। কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইতেছেন, এমন সময় অদূরে একটী রমণীমূর্ত্তি তাঁহার নয়নপথে পতিত হইল। ভাবিলেন, বুঝি কোন গ্রাম্যমহিলা প্রয়োজনবশতঃ বাহিরে আসিয়াছে। তিনি আর সেদিকে দৃষ্টিক্ষেপ করিলেন না; কিন্তু রমণী তাঁহার দিকে ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে লাগিল। তিনি একটু বিস্মিত হইলেন। গৃহস্থের বধূ এমন নিশীথ সময়ে এমন নির্জ্জন স্থানে একজন পরপুরুষকে দেখিয়া, কুণ্ঠিত বা ভীত না হইয়া বরং তাঁহার দিকে অগ্রসর হইতেছে।—ইহা বিস্ময়ের কথা বটে!

সহসা রমণী নিকটস্থ এক মরা বৃক্ষের উপর গিয়া দাঁড়াইল। স্পষ্ট চন্দ্রালোকে সে অপূর্ব্ব রূপের জ্যোতি চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল; কিন্তু অধিকক্ষণ এরূপভাবে যাইল না। সহসা সে এক বিকট হাস্য করিয়া এরূপ ভাবে মুখব্যাদন করিল যে, তাহার মধ্যদিয়া অনায়াসে

একটী মানুষ যাইতে পারে। পিতার সর্ব্বশরীর কম্পিত হইল; তিনি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইলেন। কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় প্রেতিনী তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিতা হইল; এবং বৃক্ষটী তম্মুহূর্ত্তেই ভূমিসাৎ হইল।

পিতা গৃহে আসিয়া ঠাকুরদাসকে সমস্ত বিষয় খুলিয়া বলিলেন। সে বলিল, "হাঁ, এখানে সে যে আছে, তা' আমরা অনেক দিন ধরিয়া জানি। তবে বড় কাহারও অনিষ্ট করে না।"

এই ঘটনাটী সম্পূর্ণ সত্য। ঠাকুরদাসের পুত্রেরা এখনও জীবিত এবং পিতাও বর্ত্তমান; সুতরাং প্রমাণাভাব বশতঃ যে অবিশ্বাসযোগ্য—তাহা নহে।

শ্রীনারায়ণ চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়।

উচ্চাটন।

"উচ্চাটনং স্বদেশাদের্ভ্রংশনং পরিকীর্ত্তিতম্।"

ইতি তন্ত্রসার।

উচ্চাটন তন্ত্রোক্ত ষট্‌কর্ম্মের মধ্যে একটি অভিচার কর্ম্ম-বিশেষ। ইহাতে উদ্দিষ্ট ব্যক্তির গৃহাদি নষ্ট করিয়া তাহাকে দেশ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়া ও নানাপ্রকারে তাহার শান্তি নষ্ট করা বুঝায়। শারদা তন্ত্রে, ষট্‌কর্ম্মদীপিকায়, দত্তাত্রেয় প্রভৃতি গ্রন্থে ইহার মন্ত্র ও ঔষধি বিস্তারিত ভাবে লিখিত আছে। এই কার্য্যের দেবতা দুর্গা, কৃষ্ণাষ্টমী ও চতুর্দ্দশী তিথি ইহাতে প্রশস্ত, বারের মধ্যে শনিবার। উদ্দিষ্ট ব্যক্তির কেশ লইয়া তাহাকে সূত্রাকার করিয়া সেই সূত্র দ্বারা ঘোড়ার দাঁতের মালা করিয়া ঐ মালায় মন্ত্র জপ করিতে হয়। কার্য্যও যেরূপ হেয়, তাহার ব্যবস্থাও

সেইরূপ দুষ্কর। আশা করি পাঠকদের মধ্যে কাহারও এই কার্য্যে প্রবৃত্তি হইবে না।

মন্ত্রবলে বাস্তুভিটা ত্যাগ করিবার কোন ঘটনার সন্ধান না পাইয়া, অন্যান্য প্রকারে, লোককে উৎখাৎ করার ও কষ্ট দেওয়ার তিনটি ঘটনা আমরা এস্থলে সংক্ষেপে বর্ণনা করিলাম।

আমার কোন আত্মীয়ের বাটীর নিকট একটি তান্ত্রিক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে দেখিয়াছিলাম। ব্রাহ্মণটীকে আমার আত্মীয়েরা সকলে বিশেষ ভয় করিতেন এবং মধ্যে মধ্যে নানাপ্রকার খাদ্য দিয়া তাঁহার সন্তোষ সাধন করিতেন। তত্রাচ তিনি লোভ সম্বরণ করিতে পারিলেন না। উক্ত আত্মীয়ের একটি গাভী পাঁচ সাত বৎসর কাল প্রত্যহ প্রাতে একটানে পাঁচ সের দুগ্ধ দিত। উক্ত গরুর দুগ্ধ অকস্মাৎ একেবারে বন্ধ হইল এবং গরুটির আর আট বৎসর কাল আদৌ গর্ভ পর্য্যন্ত হইল না। শেষে একটি মুসলমান ওঝা ঐ গরুটি পাইয়া গত বৎসর হইতে পূর্ব্ববৎ দুগ্ধ পাইতেছে। ঐ ব্রাহ্মণটির নাম তারক বাবু, তিনি পশ্চাৎ দুঃখ প্রকাশ করিয়া গরুটি নষ্ট করার কথা নিজেই এক সময়ে প্রকাশ করিয়াছিলেন।

উক্ত আত্মীয়ের জ্যেষ্ঠপুত্র সর্ব্বাঙ্গে পাঁচড়া হইয়া, ভুগিতেছে। এমন সময় একদিন উক্ত তারক বাবুর বাটীতে তাহার জ্যেষ্ঠা ভগ্নী নিজ মাতাকে খুঁজিতে গিয়াছে। দূর হইতে বালককে দেখিয়া তিনি বলিলেন কুঞ্জ পালা তোর মা এখানে নাই। তোর ঘা দেখিয়া আমার খাইতে ইচ্ছা করিতেছে।

কুঞ্জের জ্যেষ্ঠা ভগিনী ব্যাপার বুঝিয়া উহাকে টানিয়া লইয়া পলাইয়া আসে। অপর এক সময়ে উক্ত আত্মীয়ের একটি কন্যা তারক বাবুর সহিত একটু ঝগড়া করিয়াছিল। পরে এক সময়ে তাহার পদদেশে একটু ক্ষত হওয়ায় তিনি ঐ ক্ষত খাইয়া ফেলেন। ইহাতে ক্ষত আর

কিছুতেই বৎসরকাল সারিল না, পচা ঘায়ে পরিণত হইয়া মেয়েটি বড়ই কষ্ট পাইতে লাগিল। একদিন তারক বাবু আমার উক্ত আত্মীয়ের নিকট হইতে যথারীতি অনেক প্রকার খাদ্যদ্রব্য উপঢৌকন প্রাপ্ত হইলেন, এবং নিজেই উক্ত ক্ষত খাওয়া স্বীকার করিলেন। প্রত্যহ প্রত্যূষে যে প্রথম প্রস্রাব হইবে, তাহা দ্বারা তিন দিন ঐ ক্ষত ধৌত করিতে তিনি তখন ব্যবস্থা করিলেন। তাহাতেই কন্যাটির ক্ষত সারিয়া গেল।

পিটার ব্যারাট নামক জনৈক ব্যক্তি অনেক প্রকার মন্ত্র-বিদ্যায় পারগ ছিল। তাহার নানাপ্রকার পীড়া হইয়া নাসিকা খসিয়া গিয়া মুখশ্রী অতি বীভৎস হয়। পথিমধ্যে দুইটি বালিকা উহাকে দেখিয়া বিদ্রূপ করায় পিটার তাহার হস্ত উহাদের দুজনার মুখে বুলাইয়া দিয়া বলিলেন যে, তোমাদেরও আজ হইতে তিন মাসমধ্যে এইরূপ নাসিকাহীন হইতে হইবে এবং তোমাদের দেখিয়া লোকে এইরূপ বিদ্রূপ করিবে।', এই কথা যথাসময়ে সত্যে পরিণত হইল। ডাক্তার ক্যাসিনেরাই তাহার গ্রন্থে এই ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন এবং তিনি নিজে এই নাসিকাহীন দুইটী স্ত্রীলোকদের মধ্যে একটিকে দেখিয়াছেন।

শ্রীকার্ত্তিক চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

মাষ্টার জনবনেলের প্রেতাত্মা।

রেভারেণ্ড মিঃ মুর একজন পণ্ডিত লোক; তিনি অক্সফোর্ডের কুইন্স কলেজে বিদ্যালাভ করিয়া এসেক্সের লিটননগরে কার্য্য করিতেন। ১৭৭৮ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। তিনি নিম্নলিখিত ঘটনাটি লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। আমরা নিম্নে তাহার সারাংশ উদ্ধৃত করিলাম।

অক্সফোর্ডের কুইন্স কলেজে জন বনেল নামে একজন অধ্যাপক ছিলেন। তাঁহার বেশভূষার এমন বিশেষত্ব ছিল যে, যে তাঁহাকে একবার দেখিত, সে তাঁহাকে কখনও ভুলিত না। ১৭৫০ সালের ১৮ই নবেম্বর রবিবার দ্বিপ্রহরের সময় আমি মডলেন কলেজের ব্যালার্ড সাহেবের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতেছি, এমন সময় উক্ত ব্যালার্ড সাহেব ভয়-বিহ্বল কণ্ঠে আমাকে বলিলেন, "দেখ, দেখ কেমন একটি ভয়ানক চেহারার লোক তোমাদের কলেজ হইতে বাহিরে আসিতেছে।" আমি ফিরিয়া দেখিয়া বলিলাম, "উনি আমাদের একজন অধ্যাপক, উঁহার নাম জন বনেল।" আমার বন্ধুটী কহিলেন, "কি আশ্চর্য্য! আমি এমন ভয়ানক চেহারার লোক আর কখনও দেখি নাই।" আমি বলিলাম, "বোধ হয় মিষ্টার বনেল তাঁহার কোমর-বন্ধ আঁটিয়া পরাতে তাঁহার মুখমণ্ডল স্ফীত হইয়া ঐরূপ দেখাইতেছে," কিন্তু আমিও তাঁহার চেহারা কখনও ঐরূপ দেখি নাই। ব্যালার্ড ভীতচকিত কণ্ঠে বলিলেন, "যা হোক ভাই, আমি কখনও এ জীবনে ঐ চেহারা ভুলিব না।"

আমি কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া মিষ্টার বনেল কোন্ দিকে যান, তাহাই দেখিতে লাগিলাম তিনি প্রাঙ্গণে পৌছিয়া দ্বার পার হইয়া হাইষ্ট্রীট দিয়া ক্যাথারিন ষ্ট্রীটে প্রবেশ করিলেন। এমন সময় আহারের জন্য ঘণ্টাধ্বনি হইল। আমি বন্ধুর নিকট বিদায় লইয়া কলেজের ভোজনগৃহে প্রবেশ করিলাম। মিষ্টার বনেলের কথা আর কিছুই মনে রহিল না।

সান্ধ্য উপাসনার সময় সকলে কোন এক মুমূর্ষু ব্যক্তির জন্য ঈশ্বরের নিকট কাতরভাবে প্রার্থনা করিল। উপাসনা শেষ হইলে আমি বাহিরে আসিয়া জেম্‌স হ্যারিসন নাম জনৈক সমপাঠীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, আজ কাহার নিমিত্ত প্রার্থনা করা হইল। প্রত্যুত্তরে জানি-

লাম, মিষ্টার বনেলের জন্য। আমি বলিলাম, "কি আশ্চর্য্য। আজ দুই প্রহরের পর আমি তাঁহাকে সুস্থ শরীরে বাহিরে যাইতে দেখিয়াছি, এত অল্প সময়ের মধ্যে কি প্রকারে তিনি এরূপ সাংঘাতিক পীড়ায় আক্রান্ত হইলেন?" হ্যারিসন বলিল "ভাই সেটি তোমার ভ্রম, কেন না তিনি তো অনেক দিন থেকে শয্যাগত।" আমি কিন্তু তাহাকে বিশ্বাস করাইবার জন্য বলিলাম "ভাই! শুধু আমি নহি, আর একটী ভদ্রলোকও আমার সহিত মিষ্টার বনেলকে দেখিয়াছেন।" আমাদের এই বাদানুবাদের কথা আমাদের শিক্ষক ডাক্তার ফদার্জ্জিন শুনিয়া রাত্রি-ভোজের পর আমাকে ডাকাইয়া বলিলেন "এই গুরুতর পীড়ার সময় তুমি এই ঘটনা সর্ব্বসমক্ষে প্রকাশ করিয়া ভাল কর নাই।" পর দিবস বনেল সাহেবের মৃত্যু হইল। তাহার পর সকলে মিষ্টার বালার্ডের নিকট আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ঘটনা শুনিয়া, আমি যে বাস্তবিকই বনেল সাহেবের ছায়াশরীর দেখিয়াছিলাম, তাহা বিশ্বাস করিল।

শ্রীআশুতোষ রায়
সোণারপুরা, ৺কাশীধাম।

শ্রীশ্রীদুর্গা।

শরণং। কাশীপুর।

অলৌকিক রহস্যের সম্পাদক মহাশয়
সমীপেষু।—

মহাশয়,

আমার জীবনে কয়েকটী অলৌকিক ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়াছি এবং দুই একটি বিশ্বস্ত সূত্রেও অবগত আছি। সেই ঘটনাগুলি ক্রমে ক্রমে লিখিবার বাসনা করিয়াছি।

কয়েকটী অদ্য লিখিয়া পাঠাইলাম। যদ্যপি তাহা অলৌকিক রহস্য মধ্যে স্থান দিবার যোগ্য মনে করেন, তাহা হইলে দিবেন। আমার বাক্‌চাতুর্য্য নাই। এবং রচনা নৈপুণ্যও নাই, সেজন্ত মোটামুটি ঘটনাগুলি বিবৃত করিয়া দিলাম, ইতি—

বশম্বদ

শ্রীরামগোপাল ভট্টাচার্য্য।

ভৌতিক ঘটনাবলী।

(১) পূর্ব্বজন্মের স্মৃতি।

প্রায় বাইশ বৎসরের কথা। তখন আমার পাঠ্যাবস্থা। আমি যে বিদ্যালয়ে পাঠ করিতাম, তাহার হেডপণ্ডিত মহাশয় ৺গয়াধাম যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। আমার খুল্লতাতপুত্র ৺সতীশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য ৺গয়াধামে যাজকতা করিতেন; সেই জন্য যাহাতে উক্ত স্থানে যাইয়া তাঁহার কোন কষ্ট না হয় এবং গয়া কার্য্যাদি সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়, সে জন্ত আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা উক্ত সতীশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্যের নামে এক পত্র দেন। পণ্ডিত মহাশয়ের সঙ্গে বিদ্যালয়ের সুপারিণ্টেন্‌ডেণ্ট'ও গমন করেন। ইঁহারা গয়াকার্য্য সম্পন্ন করিয়া বুদ্ধ গয়া দর্শন করিতে উক্ত ভট্টাচার্য্যের সহিত গমন করেন। বুদ্ধগয়ায় গমন করিয়া মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিয়াই পণ্ডিত মহাশয়ের বিশেষ ভাবান্তর উপস্থিত হয়, তিনি যেন কেমন হইয়া যান ও উক্ত মন্দিরের সম্মুখভাগে বসিয়া পড়েন। সকলে কারণ জিজ্ঞাসু হইলে, তিনি বলেন, "আমি জীবনে কখনও এসকল স্থানে আসি নাই; কিন্তু আমার বোধ হইতেছে এসকল স্থানই আমার পূর্ব্বদৃষ্ট। সেই জন্য আমার এরূপ ভাবান্তর উপস্থিত হইতেছে' এবং আমি অতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছি!" পরে যখন

সকলে তাঁহাকে অন্য স্থান সকল দেখিতে লইয়া গেলেন, তখন প্রত্যেক স্থানেই কোথায় কি আছে সকলই তিনি বলিতে লাগিলেন। ইহাতে সকলেই বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। কিন্তু কেহ কোন কারণ স্থির করিতে না পারায় স্থির হইল যে, ইহা পূর্ব্ব জন্মের স্মৃতি ব্যতীত আর কিছুই নহে।

বালিকার পূর্ব্বস্মৃতি।

(২)

আমার এক কন্যা আছে, তাহার বয়স প্রায় তিন বৎসর। কন্যাটীকে ভালরূপে পোষাক পরাইয়া অলঙ্কার গায়ে দিয়া দিলে নানারূপ কথা বলে এবং আপন মনে খেলা করে। তাহার মুখে যে সকল কথা বাহির হয়, তাহা তিন বৎসরের শিশুর মুখে বাহির হওয়া আশ্চর্য্যজনক। সে বলে "আমার ঐখানে (কোন দিকে নির্দ্দেশ করিয়া) বাড়ী আছে। আমার বাক্স আছে তাতে কত ভাল ভাল কাপড় আছে, কত গহনা আছে। আমার কান আছে, গলার হার আছে, আমার অনন্ত, বালা, কত কি আছে। আমার বর আছে, একটী ছেলে আছে, একটী ছোট মেয়ে আছে। আমি গাড়ী ক'রে আমার বাড়ীতে যাব, আর আমার সেই মেয়েটীকে আন্‌বো। আমি সিঁড়ি হ'তে প'ড়ে গিয়াছিলাম তাতে আমার পেটে কত ব্যথা হয়েছিল! উঃ কত রক্ত পড়েছিল"। "উঃ কত রক্ত পড়েছিল" এই কথাটী যখন বলে, তখন বোধ হয় যেন সে সেই বেদনা অনুভব করিতেছে; আর সেই সঙ্গে একটী ভয়ানক দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে। যখন ঐরূপ কথা বলিতে আরম্ভ করে, তখন প্রশ্ন করিলে অনেক কথার উত্তর দেয়; কিন্তু সকলগুলি সম্বন্ধ হয় না। আবার যখন তখন বলিলে বড় একটা উত্তর দেয় না। আমরা সকলে অনুমান করিয়াছি যে, ইহা তাহার পূর্ব্ব জন্মের স্মৃতি ব্যতীত আর কিছুই নহে।

যিনি এ বিষয় শোনেন, তিনিই বলেন ইহা পূর্ব্ব জন্মের স্মৃতি। যাহাই হউক, ব্যাপার বেশ কৌতূহলোদ্দীপক বটে।

ভৌতিক মূর্ত্তি।

(৩)

আমার নিবাস বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত পূর্ব্বস্থলী গ্রামে। পণ্ডিত মণ্ডলীর মধ্যে সকলেই পূর্ব্বস্থলীর নাম অবগত আছেন, কারণ এই স্থানে সংস্কৃতের চর্চ্চা এখনও যথেষ্ট আছে এবং পণ্ডিত সমাজের শিরোভূষণ মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত কৃষ্ণনাথ ন্যায় পঞ্চানন মহাশয়ের নিবাস এই স্থলে।

১৮৮৯ খৃঃ অব্দে (আমি তখন এফ, এ, ক্লাশে পড়ি) বড়দিনের ছুটীতে আমি কলিকাতা হইতে বাটী গমন করি। এই সময় একদিন আমার এক খুল্লপিতামহী সন্ধ্যার সময় আমাদের বাড়ীতে আসেন। সে দিন শুক্লা একাদশী। কথায় বার্ত্তায় রাত্রি প্রায় সাড়ে নয়টা বাজিয়া যায়। তখন তিনি আমাকে তাঁহার বাটীতে তাঁহাকে পৌঁছাইয়া দিতে বলেন। আমি এক গাছি লাঠি হাতে লইয়া তাঁহাকে পঁহুছাইয়া দিতে যাই। আমাদের বাড়ী হইতে তাঁহার বাড়ী যাইতে হইলে বেজা নামক এক পুষ্করিণীর পার্শ্ব দিয়া পশ্চিম মুখে যাইতে হয়। ঐ পুষ্করিণীর ধারে একটী প্রকাণ্ড বহু পুরাতন বটবৃক্ষ আছে। প্রবাদ ঐ বৃক্ষে ভূত আছে। বট বৃক্ষের নিম্ন দিয়া যাইবার পথ। ঐ পথ বাহিয়া যাইয়া পুষ্করিণীর দক্ষিণ পশ্চিম কোণে শ্রীযুত যদুনাথ বিদ্যারত্ন মহাশয়ের চতুষ্পাঠী। তাঁহার চতুষ্পাঠীর পার্শ্ব দিয়া পথটী উত্তর মুখে গমন করিয়াছে। উক্ত পুষ্করিণীর উত্তর পশ্চিম কোণে পণ্ডিতাগ্রণী মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুত কৃষ্ণনাথ ন্যায় পঞ্চানন মহাশয়ের বাটী। তাঁহার

চতুষ্পাঠীর সম্মুখ হইয়া পথ আবার পশ্চিম মুখে চলিয়াছে। এই পথ ধরিয়া যাইয়া গ্রামের পশ্চিমপ্রান্তে আমার খুল্লপিতামহীর বাটী।

খুল্লপিতামহীকে পঁহুছাইয়া দিয়া যখন বাটী প্রত্যাগমন করি, তখন বিদ্যারত্ন মহাশয়ের ছাত্রগণের সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায় তাঁহারা আমায় ডাকিয়া টোলে লইয়া যান। আমার কণ্ঠস্বর অতি সুমিষ্ট ছিল এবং গায়ক না হইলেও অনেকে আগ্রহ করিয়া আমার গান শ্রবণ করেন। সেই জন্য ছাত্রেরা আগ্রহ সহকারে আমাকে টোলে লইয়া যান। সেখানে গান বাজনায় বহুক্ষণ কাটাইয়া প্রায় রাত্রি সাড়ে বারটা কি একটার সময় বাটী যাইবার জন্য প্রস্তুত হই। ছাত্রেরা আমাকে পঁহুছাইয়া দিতে চাহিলে, আমি জ্যোৎস্না রাত্রি থাকায় তাহাদিগকে বারণ করি। একজন ছাত্র অন্ততঃ বট গাছ পার করিয়া দিবার প্রস্তাব করে। আমি তাহাতে রাজি না হইয়া বলি "ভূতের ভয় আমার নাই তোমাদের কাহারও কষ্ট করিতে হইবে না।" শীতকালে আমাদের গ্রামে নেকড়ে বাঘের দৌরাত্ম্য খুব আছে। সে সময় আমাদের গ্রামের উত্তরাংশে স্থিত পদ্ম বিলের নিকটে ফেউ ডাকিতেছিল, ছাত্রগণ আমাকে সে ভয়ও দেখায়। আমি আমার হাতের লাঠি দেখাইয়া তাহাদিগকে নিরস্ত করি। মোট কথা শেষে আমি একাকী বাড়ী আসিতে আরম্ভ করি। বরাবরঃবেজা পুষ্করিণীর ধার দিয়া বট গাছের তল দিয়া চলিতে লাগিলাম। মনে কোন ভয় নাই এক মনেই চলিতেছি। বেজা পুষ্করিণীর পূর্ব্বধারে একটি কাঁঠাল বাগান আছে। তাহার পূর্ব্বে আমার শ্বশুর মহাশয়ের নূতন পুষ্করিণী, তাহার পাহাড়ের উপর কাঁঠাল বাগান। পুষ্করিণীর পাহাড়ের উপর কাঁঠাল বাগান থাকাতে তাহা পথ হইতে তিন চারি হাত উচ্চ এবং পাহাড়ের ধারে ধারে কোঁয়া গাছের ঘন সন্নিবিষ্ট বেড়া। তাহার মধ্য দিয়া শেয়াল কুকুর আসিবার স্থান পর্য্যন্ত ছিল না। সুতরাং

পুষ্করিণীর পাহাড় হইতে পথে নামিবার কোন উপায়ই ছিল না। উপরোক্ত বাগান ও পুষ্করিণী আসিবার কালীন পথের বাম পার্শ্বে পড়ে। পথের দক্ষিণ দিকে বাঁশ বাগান আছে। আমি যখন এই স্থানে আসিয়াছি, তখন আমার বোধ হইল বাগানের ভিতর কেহ চলিতেছে, কারণ শীতকালে পাতা ঝরিয়া পড়ায় পাতার মচ মচ শব্দ হইতেছিল। এত রাত্রিতে বাগানে কেহ চলিবার সম্ভাবনা না থাকায় শৃগাল কুকুরের পদ শব্দ হইবে বলিয়া অনুমান করিলাম। কিন্তু পরক্ষণেই শব্দটি আমার পশ্চাতে হইতে লাগিল। পথে অনেক বাঁশ পত্র পড়িয়াছিল, তাহারই শব্দ শ্রুতিগোচর হইল। আমি অনুমান করিলাম যে, শৃগাল কুকুর যাহাই হউক না কেন, তিন চারি হাত উচ্চ হইতে নামিলে নিশ্চয় একটা শব্দ হইত; কিন্তু তাহা না হইয়া হঠাৎ আমার পশ্চাতে শব্দ হইবার কারণ কি? এই মনে করিয়া যেমন আমি পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিলাম, অমনি আমার বোধ হইল একটী মনুষ্যমূর্ত্তি আমার পশ্চাতে রহিয়াছে। কিন্তু পরক্ষণেই মূর্ত্তি অদৃশ্য হইয়া গেল। এই ঘটনা দেখিয়াও আমার মনে তখন কোন ভয়ের সঞ্চার হয় নাই। পরে বাটী আসিয়া ঘরে প্রবেশ করার পরে আমার মনে আশঙ্কার উদয় হয়। ইহার পর কত দিন সেই স্থান দিয়া গমনাগমন করিয়াছি; কিন্তু আর কখনও ভয় পাই নাই, অথবা কোন মূর্ত্তি দর্শন করি নাই। পূর্ব্ব কথিত বট বৃক্ষে ভূত বাস করে এইরূপ নানা কিম্বদন্তী শুনিতে পাওয়া যায় বটে; কিন্তু এ পর্য্যন্ত তাহাদের অস্তিত্বের একটীও প্রমাণ পাই নাই।

ক্রমশঃ

শ্রীরামগোপাল ভট্টাচার্য্য।
কাশীপুর (মানভূম)

অপঘাত মৃত্যুর পরিণাম।

হেরম্ববাবু * * * * জেলার অন্তর্গত কোন স্থানে বাস করেন। তিনি সেই স্থানের গণ্যমান্য ও ধার্ম্মিক ব্যক্তি। তিনি ভূত প্রেত বিশ্বাস করিতেন না, হাসিয়া উড়াইয়া দিতেন। তাঁহার গৃহে তিনজন মাত্র লোক—তিনি স্বয়ং, তাহার বৃদ্ধা মাতা ও তাঁহার স্ত্রী। এতদ্ভিন্ন বাড়ীতে একটি ভৃত্য ও একটি চাকরাণী থাকে। তাঁহার বৃদ্ধা মাতা অত্যন্ত ধার্ম্মিকা স্ত্রীলোক। তিনি সদাই দান ধ্যানাদি কার্য্যে রত থাকিতেন।

জমীদারবাটী হইতে তাহাকে ৺কালী পূজা উপলক্ষে নিমন্ত্রণ করিয়া গেল। তিনি একজন বলিষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন, তাই তিনি এক ক্রোশ পথ হাঁটিয়া যাইতে সঙ্কল্প করিলেন। তিনি বৃদ্ধা মাতা ও তাহার স্ত্রীকে রক্ষণাবেক্ষণ করিবার জন্য ভৃত্যকে বাড়ীতে রাখিয়া যাইলেন; ভৃত্যকে সঙ্গে লইলেন না।

যে পথে যাইতে হইবে, সেই পথের মধ্যভাগে একটি শিবের মন্দির ছিল। শিবের মন্দিরের অনতিদূরে একটি 'পড়োবাড়ী' ছিল।

অমাবস্যার রাত্রি বলিয়া চতুর্দ্দিক অন্ধকার। হেরম্ববাবু শিবমন্দিরের নিকটস্থ হইয়া শিবলিঙ্গকে ভক্তিভাবে প্রণাম করিয়া আবার চলিতে লাগিলেন। তখন তিনি মন্দিরের নিকট কিছুই দেখিতে পাইলেন না। জমিদারবাটী পৌঁছিয়া তথায় আহারাদি করিয়া বাহির হইতে রাত্রি ১১॥• টা হইল। জমীদারবাটীর লোকেরা "পথে ভূতের ভয়" বলিয়া সঙ্গে দুইটি লোক লইতে অনুরোধ করিল। তিনি হাসিয়া উড়াইয়া দিলেন, লোক লইতে কিছুতেই সম্মত হইলেন না। তিনি পুনরায় শিবমন্দিরের নিকটস্থ হইয়া, শিবলিঙ্গকে প্রণাম করিয়া চলিতে লাগি-

লেন। খানিকদূর অগ্রসর হইয়া দেখিলেন, সেই 'পড়োবাড়ী' হইতে একটি স্ত্রীলোক বাহির হইল ও তাহার গলায় একটি দড়ি ঝুলিতেছে। এত রাত্রিতে কি নিমিত্ত স্ত্রীলোকটি বাটীর বাহির হইল, তাহাই দেখিবার জন্য তাঁহার কৌতূহল হইল।

তিনি স্ত্রীলোকটির অনুসরণ করিয়া চলিলেন ক্রমে স্ত্রীলোকটি একটি পুষ্করিণীর পাড়ে আসিয়া উপস্থিত হইল ও বরাবর পুষ্করিণীর ভিতর নামিয়া গেল। কিয়ৎক্ষণ পরে তিনি দেখিলেন, পূর্ব্বের স্ত্রীলোকটি পুষ্করিণীর ভিতর হইতে আর একটি স্ত্রীলোককে আনিয়াছে,—এই স্ত্রীলোকটির গলায় কলসী বাঁধা। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় ইহাদের গাত্রে এক বিন্দুও জল লাগে নাই। তখন হেরম্ব বাবুর মনে একটু ভয় হইল ও আর তিনি তাহাদের অনুসরণ করিলেন না। যত শীঘ্র পারেন, তিনি তাঁহার বাটী অভিমুখে দ্রুত গমন করিতে লাগিলেন। এবার তিনি দেখিলেন, স্ত্রীলোক দুইটি তাঁহারই অনুসরণ করিতেছে। তিনি আরও দ্রুতপদে চলিতে লাগিলেন। তিনি বাটীতে আসিয়া দ্বার নাড়িবা মাত্র ভৃত্য আসিয়া দ্বার খুলিয়া দিল। তিনি ভিতরেও আসিয়া দেখিলেন যে, সেই দুইটি স্ত্রীলোক ছাদের উপর দাঁড়াইয়া আছে। তখন ভয়ে পড়িয়া গিয়া মূর্চ্ছিত হইলেন। তাঁহার মাতা ও স্ত্রী চোখে মুখে জল দিয়া শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। কে যেন এই সময়ে বলিল, "তুমি তোমার মাতার পুণ্যবলে বাঁচিলে, তাহা না হইলে আমাদের হস্তে কিছুতেই পরিত্রাণ পাইতে না।" অনেকক্ষণ পরে সুস্থ হইয়া হেরম্ববাবু রাত্রিতে আর ঘুমাইতে পারিলেন না।

প্রাতঃকালে উঠিয়া তিনি কারণ অনুসন্ধান করিয়া জানিলেন, ঐ বাড়ীতে কোন গৃহস্থের বধূ গলায় দড়ি দিয়া মরিয়াছিল। সেই পুষ্করিণীতেও ঐ গৃহস্থের বধূর কোন আত্মীয়া স্ত্রীলোক গলায় কলসী বাঁধিয়া ডুবিয়া মরিয়া গিয়াছিল।

তারপর সেই 'পড়োবাড়ী'কে ভাঙ্গিয়া ফেলা হইল ও সেই পুষ্করিণীকে বুজাইয়া দেওয়া হইল। অতঃপর আর ভূতের উপদ্রব হয় নাই।

শ্রীহীরেন্দ্র চন্দ্র মিত্র।

ভূতাবেশ।

মহাশয়,

আপনার অলৌকিক রহস্য একখণ্ড পাঠ করিলাম। আমার নিজের জীবনের একটী বিস্ময়কর ঘটনা, যাহার অর্থ আমি এখন পর্য্যন্তও উদ্‌ঘাটিত করিতে পারি নাই, তাহার বিবরণ আমি এখানে বিবৃত করিলাম। যদি উপযুক্ত বোধ করেন, তবে আপনার পত্রিকায় স্থান দান করিয়া বাধিত করিবেন। ঘটনাটী এই—

সে আজ প্রায় ২৫ পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বের কথা। আমি তখন ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলে ৩য় কি ২য় শ্রেণীতে অধ্যয়ন করি। আরমানী টোলায় আমাদের বাসা ছিল। বাসাটী একটু বড়গোছেরই ছিল। শ্রীযুক্ত দক্ষিণারঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, যিনি এখন ৺কাশীধামে সপরিবারে বাস করিতেছেন, তিনি আমাদের অভিভাবক ছিলেন। তিনি সপরিবারে তথায় বাস করিতেন। তৎসঙ্গে আমরা ১০।১২ জন স্কুলের ছাত্রও একত্রে ছাত্রাবাস ভাবে খরচ পত্রাদি দিয়া থাকিতাম। আমি যে কক্ষে থাকিতাম, তাহা একটী লম্বা 'হল' গোছের। মাঝখানে কাঠের পার্টিসন দেওয়া। পার্টিসনের গায়ে কবাট ছিল। ঐ কবাট দ্বারা কক্ষের অন্য বিভক্ত অংশে যাওয়া যাইত। বোধ হয় বাসাটির অবস্থা এখনও তদ্রূপ আছে। তখন উহা রাহেদ্ বক্‌স নামক একটি সম্ভ্রান্ত মুসলমানের

সম্পত্তি ছিল। এখন উহা কাহার অধিকারে আছে, আমি তাহা অবগত নহি। কক্ষের যে অংশে আমি ছিলাম, ঐ অংশে দুইখানা তক্তপোষ ছিল। একখানাতে আমি ও আমার খুল্লতাত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ৺কালীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় থাকিতাম। অন্য তক্তপোষে শ্রীযুক্ত শশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ মহাশয় থাকিতেন। ইনি এখন ময়মনসিংহ গৌরীপুরের শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বরী চৌধুরাণী মহাশয়ার নিজের জমিদারীর ম্যানেজার আছেন। নিজের জমিদারীর অর্থাৎ গৌরীপুরের জমীদারীর বার আনা অংশ তাঁহার পুত্র শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্র চন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয়ের অধীনে আছে। চারি আনা অংশ তাঁহার নিজের অধীনে আছে। শশীবাবু সেবার এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় কলিকাতা ইউনিভার্সিটির মধ্যে ৩য় স্থান অধিকার করিয়া ২০৲ বিশটাকা বৃত্তি পান। কক্ষের অন্য অংশে ৺সীতানাথ চট্টোপাধ্যায় বি, এ, মহাশয়, তাঁহার পিসতুত ভ্রাতা শ্রীযুক্ত পুলীন চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে এক তক্তপোষে থাকিতেন। উক্ত বাড়ীটীর সকল ঘরই 'হল' সদৃশ ছিল। কম্পাউণ্ডের চারিদিকেই আম, জাম, লিচু প্রভৃতির বড় বড় গাছ ছিল। আমাদের কক্ষটি বাড়ীর সর্ব্ব দক্ষিণভাগে ছিল এবং আমাদের কক্ষের পর খুব লম্বা ও চওড়া গোছের রোয়াক ছিল। ঘটনাটী যাহাতে ভালরূপ বুঝিতে পারেন, তজ্জন্য বাড়ীটীর অবস্থা বিস্তৃতভাবে লিখা হইল। যাহা হউক এক্ষণ প্রকৃত ঘটনাটী বিবৃত করা যাউক।

আমাদের দেশীয় ছাত্রবৃত্তি স্কুলের ৬টী আটেক ছাত্র ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা দিতে ঢাকা আসে ও আমাদের বাসায় থাকিয়া পরীক্ষা দিতে থাকে? প্রথম দিন সাহিত্য ব্যাকরণের পরীক্ষা হইয়া যায়। পরদিন অঙ্ক ও জ্যামিতির পরীক্ষা হইবে। কিন্তু ছেলেরা জ্যামিতি ভালরূপ জানিত না। সাহিত্যের পরীক্ষার পর, ঐ দিন রাত্রে তাহারা আমাকে বলে "মহাশয়,

জ্যামিতির যে প্রতিজ্ঞাগুলি আসিবার সম্ভাবনা খুব বেশী, এইরূপ কয়েকটা প্রতিজ্ঞা বাছিয়া বাছিয়া আমাদিগকে অনুগ্রহ পূর্ব্বক বুঝাইয়া দিন।” তখন বোধ হয় ফাল্গুন মাস ছিল। রাত্রিতে পরিষ্কার জ্যোৎস্না উঠিয়াছিল। আমি আমার তক্তপোষের মাঝখানে প্রদীপ রাখিয়া প্রদীপের চারিদিকে ছাত্রদিগকে লইয়া জ্যামিতি বুঝাইতে থাকি। একটীর পর একটী এইরূপ করিতে করিতে ১টা বাজিয়া গিয়াছিল। অবশ্য আমার ভ্রাতা ৺কালীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় শশীবাবুর তক্তাপোষে গিয়া তাহার সঙ্গে ঘুমাইতেছিলেন। ১টা বাজিলে পর আমি উঠিয়া তক্তাপোষ হইতে নীচে নামিলাম ও ছেলেদিগকে শয়ন করিতে আদেশ করিলাম। ছেলেরা আর একটী প্রতিজ্ঞা বুঝাইবার জন্য জেদ করিতে লাগিল। অগত্যা আমি নীচে দাঁড়াইয়া উপুড় হইয়া প্রতিজ্ঞাটী বুঝাইতে লাগিলাম। আমার পৃষ্ঠদেশ বাহিরের রোয়াকের সম্মুখস্থ দরজার দিকে ছিল। আমি অত্যন্ত মনোযোগের সহিত প্রতিজ্ঞাটী বুঝাইতেছিলাম। বাহিরে বা অন্য কোথায় কি হইতেছে বা না হইতেছে আমার জ্ঞান ছিল না। প্রতিজ্ঞাটী যখন প্রায় অর্দ্ধেক করা হইয়াছে, এমন সময় ৩।৪ জন ছেলে সমস্বরে বলিয়া উঠিল যে “আপনার, পিছনে অতি ভয়ানক “হা, হা” শব্দ হইতেছে।” আমি একটী ছেলের গণ্ডদেশে এক চপেটাঘাত করিয়া ভর্ৎসনা করিলাম ও যেরূপ বুঝাইতেছিলাম সেইরূপ সেইরূপ বুঝাইতে লাগিলাম। একটু পরে সকলেই সমস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল যে “মহাশয়, ভয়ানক হা হা শব্দ হইতেছে, মহাশয়, আপনার পিছনেই শব্দ আসিয়াছে।” আমিও সেবার শব্দ শুনিলাম এবং যেমন পিছনের দিকে ফিরিয়া চাহিলাম, তখন আমার বোধ হইল যেন একটা আগুনের গোলা আমার বাম বক্ষ ও পার্শ্ব দগ্ধ করিয়া রান্না ঘরের দিকে চলিয়া গেল। আমি প্রায় মূর্চ্ছিত হইয়া মাটীতে পড়িয়া গেলাম।

আমার মুখ হইতে অনবরত "হা, হা", শব্দ হইতে লাগিল। কথা কহিবার জন্য যতদূর মুখ হা করিতে পারা যায় করিলাম, বোধ হইল যেন মুখের দুই পার্শ্ব ফাটিয়া যাইবার উপক্রম হইল। কিন্তু হা হা শব্দ ব্যতীত কোন শব্দ বাহির হইল না। ছেলেরা আমার অবস্থা দেখিয়া পার্টিশনের অপর পার্শ্বে গিয়া কবাট বন্ধ করিয়া, চীৎকার করিয়া আমাদের অভিভাবক দক্ষিণাবাবুকে ডাকিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু ছেলেদের, সীতানাথ বা পুলীন বাবুর কাহারও মুখ হইতে কোন প্রকার শব্দ বাহির হইল না। সকলেই হা হা, করিতে লাগিল। আমার ভ্রাতা ও শশী-বাবু দৌড়িয়া আমার নিকট আসিলেন। শশীবাবু আমাকে ধরিয়া ফেলিলেন। তাঁহার ধারণা হইল আমি হাঁ করিয়া তাঁহাকে কামড়াইবার চেষ্টা করিতেছি। তিনি সবলে আমাকে ধরিলেন। আমার দাদা ও শশীবাবু উভয়ে চীৎকার করিয়া দক্ষিণাবাবুকে ডাকিবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু হা হা শব্দ ব্যতীত কাহারও মুখ হইতে কোন শব্দ বাহির হইল না। এই সময়ে দক্ষিণা বাবু স্বপ্ন দেখিয়া বাহিরে আসিলেন ও হা হা শব্দ শুনিয়া আমাদের কক্ষে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি স্বপ্ন দেখিতে ছিলেন যেন একটা বাড়ী অগ্নিদগ্ধ হইতেছে ও বাটীর লোকগুলি হা হা করিতেছে। যাহা হউক তিনি আসিলে পর সকলেরই বাক্য স্ফূর্ত্তি হইল। আমারও তখন কতকটা জ্ঞান হইল। কিন্তু তখনও আমি ভয়ে কাঁপিতেছিলাম ও বারে বারে আমার বাম পার্শ্বে যথার্থই পুড়িয়া গিয়াছে কি না হাত দ্বারা দেখিতে ছিলাম। তৎপরে সকলেই আমাকে ঠাট্টা বিদ্রূপ আরম্ভ করিলেন। আমাকে ঘুম পাড়ার জন্য সকলেই চেষ্টা করিলেন। বলা বাহুল্য সকলে আমাকে ঘিরিয়া সমস্ত কক্ষ ও বাড়ী প্রদক্ষিণ করাইয়া আনিলেন। তখন আমার তক্তপোষে আমি বসিলাম ও সকলে আমাকে ঘিরিয়া গল্প গুজব আরম্ভ করিলেন। কিছু পরে

আমার চক্ষু হইতে জোয়ারের মত অনবরত জল পড়িতে আরম্ভ করিল এবং আমার বোধ হইল যেন প্রত্যেকের ৪।৫টা করিয়া মাথা আমি দেখিতে পাইতেছি। অবশ্য পরের দিন আমি সম্পূর্ণ সুস্থ হইলাম এবং অতিরিক্ত মানসিক পরিশ্রম ও প্রদীপের নিকট থাকাই মস্তিষ্কের বিকৃতির কারণ বলিয়া নির্দ্ধারণ করিলাম। কিন্তু বাসার সকলগুলি লোকই কেন হা হা করিল এবং দক্ষিণাবাবুই বা কেন ঐরূপ সময়ে ঐরূপ স্বপ্ন দেখিয়া জাগ্রত হইলেন, তাহা আজ পর্য্যন্তও বুঝিতে পারি নাই। এখানে বলা আবশ্যক যে দক্ষিণাবাবুর কোঠা আমাদের কোঠা হইতে অনেক দূরে অবস্থিত। চীৎকার করিয়া না বলিলে ঘর খোলা থাকিলেও তাঁহার কোঠা হইতে কথাবার্ত্তা শুনা যায় না।

বশংবদ—

কবিরাজ শ্রীচিন্তাহরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

কবিরঞ্জন।

জনৈক মহিলার পূর্ব্বজন্মের বিবরণ।

(সত্য ঘটনা)

অখিলপতি লীলাময়। তাঁহার সৃষ্টি-বৈচিত্র্য হৃদয়ঙ্গম করিবার সাধ্য কাহারও নাই। যক্ষ, রক্ষ, কিন্নর এমন কি দেবগণও যাঁহার সৃষ্টি-চাতুর্য্যের কণিকা মাত্র হৃদয়পটে ধারণা করিতে সমর্থ নহেন, তাঁহার বিষয়ের সমালোচনা করিতে মানব জ্ঞান যে পরাজিত হইবে,

তাহাতে আর সন্দেহ কি? পরন্তু আমরা নিজ সামর্থ্য বিস্মৃত হইয়া ধরাকে 'সরা' জ্ঞান করি এবং "বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের কাণ্ড দেখিয়া বকাণ্ড প্রত্যাশার ন্যায় "লণ্ড ভণ্ড" হইয়াও কাণ্ড-জ্ঞান প্রাপ্ত হই না। ইহা আমাদের অহমিকা এবং তামসিকতার ফল। এই অহমিকা যাবৎকাল পর্য্যন্ত হৃদয়-মন্দিরে অবস্থান করিতে থাকে, তাবৎ আমাদের সকলই অশিব স্থির করিয়া লইতে হইবে। বর্ত্তমান অসৎ প্রবৃত্তি বিতাড়ন প্রকল্পে সৎশিক্ষা এবং সৎ সহবাসের আবশ্যক। তাই ভগবান শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন,—

"নলিনীদলগতজলমতিতরলম্
তদ্বৎ জীবিতমতিশয়চপলম্।
ক্ষণমিহ সজ্জনসঙ্গতিরেকা
ভবতি ভবার্ণব-তরণে নৌকা॥"

ক্ষণস্থায়ী জীবনে স্বল্পকালের জন্যও সজ্জনের সহবাসে পরকালের মুক্তির উপায় হইয়া থাকে। অপিচ, সকলেরই সর্ব্বাগ্রে অবিসংবাদিত চিত্তে সজ্জন-সঙ্গতির আবশ্যক। উহাতে হৃদয়-বৃত্তিগুলিরও সমতা লাভ করে এবং ধর্ম্মভাবে আর্দ্র হইয়া হৃদয় হইতে আনন্দ-ধারা নিঃসৃত হইয়া সন্নিকটস্থ ব্যক্তিবৃন্দের হৃদয় ভক্তিরসে আপ্লুত করিয়া দেয়। এবম্প্রকারেই মানব সুখী হইতে পারে। এই আনন্দই জীবগণকে সদানন্দময়ের অভিমুখে প্রধাবিত করে। ইহা এক জন্মের চেষ্টায় প্রাপ্ত হওয়া অসম্ভব। অতএব কোন প্রকারেই জন্মান্তর ব্যাপার অস্বীকার করিবার উপায় নাই। আমরা অলৌকিক রহস্যের পূর্ব্বের সংখ্যাদ্বয়ে 'ভূতের মনুষ্যোচিত আহার' নামক প্রবন্ধে মনুষ্যের মৃত্যুর পর পুনরায় জন্ম পরিগ্রহ করিতে হয়, তাহা প্রেতাত্মার মুখনির্গত বচনাবলী হইতে সপ্রমাণ করিয়াছি, তাহা পাঠক পাঠিকাগণ বোধ হয় অবগত আছেন।

অদ্য আমরা তদপেক্ষা অধিক জ্বলন্ত ঘটনা দ্বারা জন্মান্তর বিবরণ সাধারণ সকাশে সমুপস্থিত করিব। পাঠকগণের মধ্যে যাঁহারা পূর্ব্ব জন্ম বিশ্বাস করেন না, তাঁহাদিগকে নিম্নের প্রদত্ত ঘটনাটি অবগত হইয়া ঘটনাস্থলে আগমন করিয়া প্রকৃত তথ্য জ্ঞাত হইতে অনুরোধ করি।

নীচবংশেও ধার্ম্মিক ব্যক্তিগণ জন্ম পরিগ্রহ করিয়া সেই বংশ পাবন করিয়া তুলেন। গুহক চণ্ডাল অতি হেয় বংশে জন্মগ্রহণ করেন; কিন্তু তিনিও ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের সখারূপে বরিত হইয়া আলিঙ্গন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং ভগবান সহবাস সুখলাভে কৃতার্থ হইয়াছিলেন। কালকেতুও অতি নীচ কিরাত কুলে জন্মগ্রহণ করেন। তিনিও অম্বালিকার চরণ-রেণু প্রাপ্ত হইয়া তৎকালীন প্রধান ভক্ত বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিলেন। তবে ইঁহারা সকলেই ভক্তের গৃহে জন্ম লইয়াছিলেন। ইঁহারা সকলেই যোগভ্রষ্ট পুরুষ ইহা ধ্রুব সত্য। গীতা সেইজন্য বলিয়াছেন—

শ্রীভগবান্ উবাচ।

পার্থ নৈবেহ নামুত্র বিনাশস্তস্য বিদ্যতে।
ন হি কল্যাণকৃৎ কশ্চিদ্দুর্গতিং তাত গচ্ছতি॥ ৪০।৬ অঃ।
প্রাপ্য পুণ্যকৃতাং লোকানুষিত্বা শাশ্বতীঃ সমাঃ।
শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোঽভিজায়তে॥ ৪১।৬ অঃ।
অথবা যোগিনামেব কুলে ভবতি ধীমতাম্।
এতদ্ধি দুর্লভতরং লোকে জন্ম যদীদৃশম্॥ ৪২।৬ অঃ।

অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন,—হে পৃথিনন্দন! যোগভ্রষ্টজন কি ঐহিকে কি পারত্রিকে কোথাও তাহার বিনাশ নাই; (যে হেতু) কোন শুভানুষায়ী ব্যক্তিই কদাচ দুর্গত হয় না॥ ৪০। যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি পুণ্যানুষ্ঠাত্রীদিগের প্রাপ্য লোকে বহুসংখ্যা বৎসর বাস করিয়া সদাচারী ও

ধনীদিগের গৃহে জন্মলাভ করিয়া থাকে ॥ ৪১। অথবা প্রাজ্ঞ যোগিগণের কুলে জন্মিয়া থাকে এবং মোক্ষপ্রাপ্তির নিমিত্ত পূর্ব্ব জন্মাপেক্ষা অধিকতর চেষ্টা পাইয়া থাকে ॥ ৪২।

তাই বলিতেছিলাম, গভীর বনস্থলীতেও গোলাপ পুষ্প প্রস্ফুটিত হয়, ধনীর পুষ্পোদ্যানেও স্নেহপালিত পুষ্পমধ্যে তদ্রূপ পুষ্প লক্ষিত হয় না। ইহা নিরঞ্জনেরই করুণার পরিচায়ক। আমরা অদ্য যে বংশের কথা বলিতে যাইব, তাহা নীচ হইলেও অবহেলনীয় নহে। সেই কথা প্রমাণ করিবার জন্যই বহু বিষয়ের তর্ক বিতর্ক করিলাম। যাহা হউক অধুনা আলোচ্য বিষয় বর্ণনা করিব।

সে আজ বহুদিনের কথা। তখন খোসাল মোড়লের বংশ দেশ-পূজ্য। মোড়ল শব্দ মণ্ডলের অপভ্রংশ তাহা সকলেই অবগত আছেন। বহুদিন হইতে 'মণ্ডল' এই উপনামটি শুনা গিয়া থাকে। তখন এই মণ্ডলগণই বেষ্টনী বা গ্রামের অধিনায়ক ছিল। সমস্ত গ্রামবাসীর ন্যায়ান্যায় বিচারের ভার কতিপয় গ্রামবাসীর উপর ন্যস্ত হইত। তাহারা সুবিচার দ্বারা গ্রামবাসিগণকে শান্তিসুখের অধিকারী করিত। এখন আর সে দিন নাই। খোসাল মোড়লের বংশের দৈন্যদশা উপস্থিত। আর কেহ তাহাদিগকে গ্রাহ্য করে না। তাই সে এক্ষণে নীচ, হেয় জাতি মধ্যে পরিগণিত। কয়েক শত বৎসর চলিয়া গিয়াছে। খোসাল মোড়ল হীনাবস্থার চরমসীমায় সমুপস্থিত হইয়াছে। তাহার বাড়ী বাল-গোড় গ্রামে। উহা চব্বিশপরগণার অন্তর্গত দমদমার উত্তর বিষ্ণুপুর পোষ্ট আফিসের অধীন। খোসাল মোড়লের প্রথম পুত্রের নাম পাঁচু মোড়ল। সেই এখন বর্ত্তমান আছে। ইহারা ব্রাত্যক্ষত্রিয়। ইহার দশ বৎসর বয়স্ক একটি কন্যারত্ন আছে। তাহার নাম পোদি বা পদ্মমণি। ঐ কন্যাটির বর্ত্তমান বয়স ১০ বৎসরের অধিক নহে, তাহার সহিত কথা-

বার্ত্তায় তাহাকে সরল এবং বুদ্ধিমতী বলিয়া উপলব্ধি হয়। সে এখন বালিকা। তাহার বাল্যস্বভাব চপলতা এখনও দূর হয় নাই। পদ্মমণি গৃহের কার্য্য কর্ম্মও করে এবং খেলাধূলায়ও কখন কখনও সময় ক্ষেপণ করে। তাহার বাড়ীর লোকজন এবং গ্রামবাসিগণ তাহাকে পোদি বলিয়া ডাকে। আমরাও এখন হইতে তাহাকে পোদি বলিয়াই ডাকিব। পাঠকপাঠিকাগণ তাহাকে পোদি বলিয়াই বুঝিয়া লইবেন।

পোদি এক্ষণে দশবর্ষে পদার্পণ করিয়াছে, কিন্তু সে আত্মীয় স্বজনগণ সহ কখনও গ্রামান্তরে গমন করে নাই। হঠাৎ কোন পর্ব্বোপলক্ষে—(বোধ হয় চড়ক পূজায়) পোদি আত্মীয়গণ পরিবেষ্টিতা হইয়া নিজ গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে যাইতেছিল। পথিমধ্যে পোদির মাসীর বাড়ী থাকায় তথায় যাইয়া তাহারা সদলবলে উপস্থিত হইবে স্থির করিয়াছিল। গ্রামের নিয়ম এই, কোন মেলা বা পর্ব্বোপলক্ষে কোথাও যাইতে হইলে পথিমধ্যে আত্মীয়স্বজনের গৃহাদি থাকিলে তথায় যাইবার বা ফিরিবার কালে তাহাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ এবং আহার ভোজনাদি করিয়া থাকে। ইহারাও সে নিয়মের ব্যত্যয় ঘটাইবে না, স্থির হইয়া গেল। পোদি কিয়দ্দূর গমন করিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল। সে কান্নার সুর যেন ক্রমশই বাড়িয়া উঠিল। তাহার সমভিব্যাহারিণী মহিলাগণ তাহাকে কান্নার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়াও কোন প্রকার সদুত্তর পাইতেছে না, অথচ কান্না কেবল উত্তরোত্তর বাড়িয়া চলিতে লাগিল। তাহারা তখন তাহাকে নিরস্ত করিবার মানসে সন্নিকটস্থ এক বৃক্ষ মূলে উপবেশন করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "পোদি, তোর্ কি হইয়াছে? আমাদের বল্। যদি আমাদের ক্ষমতায় কুলায়, তবে তাহার প্রতিবিধান করিব, প্রতিজ্ঞা করিতেছি। কিন্তু আমাদের কাছে সে কথা না বলিলে, আমরা কেমন করিয়া, বুঝিব? "সে তখন সজল-নয়নে বলিল, "আচ্ছা, তবে শুন। ঐ যে

সম্মুখে একখানি গ্রাম দেখিতে পাইতেছ, ঐ গ্রামে আমাকে লইয়া যাইতে পার?" এইখানে একজন আত্মীয়ার সঙ্গে পোদির যে প্রকার কথাবার্ত্তা হইতেছিল, তাহাই এইস্থলে বলিব। পোদির একজন আত্মীয়া বলিল, "ঐ গ্রামে যাইয়া কি হইবে?"

পোদি। আমার দরকার আছে।

আঃ। কি দরকার?

পো। আমার কোন এক বাড়ীতে যাইতে হইবে।

আঃ। কেন?

পো। সেই বাড়ী আমার।

আঃ। তোর্ বাড়ীতো বালগোড় গ্রামে।

পো। নাগো না। ওতো আমার এইবারকার বাপের বাড়ী।

আঃ। তোর্ আবার আগেকার বাড়ী কি? তোর্ ক'খানা বাড়ী? তুই কি পাগল হ'য়েছিস্?

পো। আমি পাগল হ'ব কেন। তোমরাই পাগল, দেখ্ছি। আমার কথা বুঝ্তে পাচ্ছনা?

আঃ। হ্যাঁলা, কথাটা ভাল করিয়া বল্ দিখিনি?

পো। তবে শোনো—আমি যাহা ব'লে যাই, তাই ভাল ক'রে শোনো।

আঃ। আচ্ছা, বল্ শুন্ছি।

পো। ঐ যে গ্রাম দেখ্ছো, ওখানে আমার শ্বশুর বাড়ী। (আত্মীয়া তখন বাধা দিয়া বলিল)

আঃ। সে কি লা? তুই যে এখনও ছেলে মানুষ। তোর এখনও বিয়ে হয়নি। তবে তুই ওরূপ বল্ছিস্ কেন?

পো। তোমরা এখনও বুঝ্তে পারনি। তবে ভাল ক'রে বল্ছি

শোনো। আমার ঐ গ্রামখানি দেখে পূর্ব্বজন্মের সকল কথা মনে পড়িয়া গেল। আমি সেই জন্য অস্থির হইয়া কাঁদিতেছিলাম।

আঃ। হ্যাঁলা, হাঁদা, পূর্ব্বজন্মের কথা কি কখন কেহ বল্‌তে পারে?

পো। না পারে ত না পারে। বেশ, তোমরা শোনই না।

আঃ। আচ্ছা, বল্।

পো। আমার শ্বশুর বাড়ী যে গ্রামে, তাহার নাম ক্রোলবেড়ীয়া। উহা আমার পূর্ব্বজন্মের শ্বশুর বাড়ী। আমার শ্বশুরের কাল হইয়াছে। কিন্তু আমার পূর্ব্বজন্মের স্বামী এখনও জীবিত আছেন। তাঁহার নাম রামসাধন গায়েন। তিনি আমাকে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন। সেই কথা মনে পড়ায় আমার অত্যন্ত কষ্ট হইতেছে। এখন আমি পূর্ব্বজন্মের সকল কথা বলিতে পারি।

আঃ। আচ্ছা, পোদি, তোর্ পূর্ব্বজন্মে কে বাবা ছিল এবং কোথায় তাহার বাড়ী বল্ দিখিনি? তোর নামই বা কি ছিল?

পো। আমার নাম ছিল "মনো"। আমার পিতার নাম দীপচাঁদ মণ্ডল। তাহার বসত বাড়ী বেঁওতায় ছিল।

এই কথাগুলি শুনিয়া পদ্মমণির আত্মীয়গণ বিস্মিত হইয়া রহিল। তখন স্থির হইল তাহাকে (পোদিকে) লইয়া তাহার পূর্ব্বজন্মের স্বামী-বাড়ী অর্থাৎ শ্রীরামসাধন গায়েনের বাড়ী যাইতে হইবে এবং তথায় সকল কথা জিজ্ঞাসা করিয়া জন্মান্তরের একটি চরম সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইবে। আজকাল যেমন কোন ঐতিহাসিক গবেষণা করিতে করিতে কোন রহস্যমূলক দ্রব্য এবং ঘটনা আবিষ্কৃত হইলে জগৎ স্তম্ভিত হইয়া সেই সকল বিষয় অবগত হইবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া থাকে ও বিষয় গুলি অবগত হইয়া আনন্দ প্রকাশ করে, তদ্রূপ তাহারাও বর্ত্তমান ঘটনা পরিজ্ঞাত হইয়া বিমুগ্ধ হইয়া রহিল।

যাহা হউক যথাসময়ে পূর্ব্বোক্ত ক্ষুদ্র স্ত্রী-বাহিনী উৎফুল্লান্তঃকরণে ক্রোলবেড়িয়া রামসাধন গায়েনের গৃহের প্রাঙ্গণ যুদ্ধক্ষেত্রের কেন্দ্রস্থল স্থিরীকৃত করিয়া তথায় উপনীত হইল। পূর্ব্বে পদ্মমণি সেই বাড়ী দর্শন করিয়া প্রোৎসাহিত হইয়া কহিতে লাগিল, "ঐ আমার শ্বশুর বাড়ী দেখা যাচ্ছে। চল আমরা ঐ বাড়ীর ভিতরে যাই।" সেই দশ বৎসরের বালিকা পদ্মমণির যেন ঐ বাড়ীখানি বহুদিনের পরিচিত। তাহার ভাব দেখিয়া যেন মনে হইল, সেই ঐ বাড়ীর গিন্নী। বস্তুতঃ তাহা নহে। যেন পূর্ব্বজন্মের স্মৃতি হৃদয়পটে উদিত হইয়া তাহার সকল মায়া-কালিমা হৃদয়ে পরিপূরিত করিয়া দিল। সে (পদ্মমণি) তখন বলিতে লাগিল, "আমি স্বামীকে গত দশবৎসর ধরিয়া দেখি নাই। আজ আমার অদৃষ্ট প্রসন্ন, সেই জন্য আমি স্বামি-মুখ দেখিতে পাইব।" এই কথা বলিতে বলিতে সে অগ্রবর্ত্তিনী হইয়া সেই পূর্ব্বজন্মের স্বামি-গৃহে প্রবেশ করিল। রামসাধন গায়েন তখন বাড়ীতেই ছিল। সে নবাগতা স্ত্রীলোকগণকে বহু প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে আরম্ভ করিল। রামসাধনকে দেখিয়া পোদি বলিল, ইঁনিই আমার স্বামী ছিলেন। রামসাধন কথা শুনিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেল। যখন সে (রামসাধন) সকল কথা শুনিল, তখন তাহার সন্দেহ আরও বাড়িয়া গেল। সে প্রশ্নের উপর প্রশ্ন করিতে লাগিল। তখন পোদি তাহার স্বামীকে সকল কথা বুঝাইবার জন্য বলিয়া উঠিল, "আমার বোম্বাই সাড়ীখানা আমি যে বাক্সের মধ্যে বেশ করিয়া পাট করিয়া রাখিয়াছিলাম, তাহা ঠিক আছে তো?" সে পূর্ব্ব স্ত্রীর বাক্য শ্রবণ করিয়া বাষ্প গদগদ কণ্ঠে উত্তর করিল, "সে সাড়ীখানা তুমি যেমন রাখিয়া গিয়াছ, তেমনিই আছে। দশ বৎসর যাবৎ সেই বাক্সে ঐ সাড়ী রাখিয়া আসিতেছি। তবে প্রতি বৎসর বেশ করিয়া ভাদ্রমাসে রৌদ্রে দিয়া উহার দোষ কাটাইয়া রাখিতেছি।"

পোদির সঙ্গে যে সকল বামাগণ আসিয়াছিল, তাহারা সকলে সমস্বরে বলিল, "আচ্ছা, বলতো তোমার পূর্ব্বজন্মের পরিহিত সাড়ীতে কি চিহ্ন আছে, যাহা দেখিলেই বুঝিতে পারা যাইবে। "এই কথা শুনিয়া পোদি উত্তর করিল, হাঁ, তাহা আমার বেশ চেনা আছে। তাহার আঁচলার (প্রান্তভাগে) দিকে তিনটি ছিদ্র আছে এই বলিয়া উক্ত সাড়ীর আকৃতি প্রকৃতি যথাযথ বর্ণনা করিল। তখন তাহার স্বামী সেই কথা শুনিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেল এবং সকলের অনুরোধে তাহার পূর্ব্বোক্ত বাক্স খুলিয়া সেই চিহ্নগুলি যেখানে যেরূপ বলিয়াছিল, তাহা প্রত্যক্ষ করিল। পরে পোদি বাষ্পাকুললোচনে বলিতে আরম্ভ করিল, "আমার পুত্রবধূটিকে আমার ব্যবহৃত যে গহনা গুলি দিব বলিয়া ঠিক করিয়াছিলাম, তাহাকি তাহাকে (বৌকে) দেওয়া হইয়াছে?" (এইস্থলে কি কি গহনা দিতে চাহিয়াছিল তাহারও নাম করিল) তখন তাহার স্বামী বলিল, "আমি আমার স্ত্রীর কথানুযায়ী কার্য্য করিয়াছি। যখন তাহার (পোদির) কথাগুলি বর্ণে বর্ণে মিলিয়া যাইতেছে, তখন সকলের আর অবিশ্বাসের কোনই কারণ রহিল না। এই প্রসঙ্গে পোদি পূর্ব্বজন্মের কি ব্যারামে মৃত্যু হইয়াছিল, তাহাও বলিল। তখন তাহার পূর্ব্বজন্মের স্বামী রামসাধন ভেউ ভেউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। স্বামীর কান্না শুনিয়া পোদিও চক্ষের জল সম্বরণ করিতে পারিল না। তাহাদের পুত্র ও পুত্রবধূ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া কার্য্যে যোগ দিল। তখন একটি মহা কান্না-কাটির রোল পড়িয়া গেল। সমাগতা স্ত্রীলোকগণ পর্য্যন্ত দুই চারি ফোঁটা চক্ষের জল ফেলিতে লাগিল। এইরূপে কিছুক্ষণ কাটিল। পুত্র আসিয়া বালিকা-মাতার নিকট উপবেশন করিয়া সকল কথা শুনিতেছিল। পুত্রকে দেখিয়া মাতা তখন অপত্যস্নেহে পুত্রের গাত্রে হস্ত প্রদান করিয়া তাহার কুশল জিজ্ঞাসা করিল ও পুত্রবধূকে নিকটে ডাকিয়া

গুরুজনদিগকে ভক্তি করিতে বলিল এবং সংসারের সকল কার্য্য তাহাকেই দেখিয়া করিতে হইবে এইরূপ আভাষ প্রদান করিল। পাড়ার একটি বৌকে সে প্রায়ই সাহায্য করিত। সে তথায় আসিয়া পৌঁছিলে তাহার নাম ধরিয়া ডাকিয়া আদর করিয়া তাহাকে নিকটে বসাইল ও পূর্ব্বজন্মের বহু কথা বলিতে লাগিল। সেই সকল কথা ঠিক মিলিয়া যাইতেছে দেখিয়া তাহার আর বিন্দুমাত্রও বিস্ময়ের কারণ রহিল না। ঐ গ্রামে একজন ভিক্ষুক বাস করিত। তাহাকে সে মধ্যে মধ্যে /১ সের /১॥ সের পর্য্যন্ত চাউল প্রদান করিত। তাহার নিকট এই কথার সত্যতা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করায় সে 'সকল কথাই সত্য' বলিয়া স্বীকার করিল।

এই প্রকার কথাবার্ত্তা শেষ হইলে বিজয়ী স্ত্রী-বাহিনী ক্রোলবেড়িয়া ত্যাগ করিয়া চলিল। পথিমধ্যে তাহারা স্থির করিল, বেঁওতা গ্রামাভিমুখে যাত্রা করিয়া বর্ত্তমান রহস্যের মর্ম্মোদ্‌ঘাটন করিতে হইবেক। অতএব তাহারা কালবিলম্ব না করিয়া বেঁওতায় রওনা হইল। তাহারা যথাসময়ে দীপচাঁদ মণ্ডলের বাটিতে যাইয়া উপস্থিত হইল।

পাঠকপাঠিকাগণ বোধ হয় অবগত নহেন, এই স্ত্রীবাহিনী আবার কোন্ যুদ্ধে অগ্রসর হইতেছেন। পদ্মমণি ওরফে পোদি পূর্ব্বজন্মে কাহার কন্যারূপে ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছিল, তাহাই এক্ষণে বর্ণনা করিব। পোদির পূর্ব্বজন্মের স্বামী এবং স্বামিগৃহের বিবরণ যথাসময় লিপিবদ্ধ করিয়াছি; কিন্তু তাহার পূর্ব্বজন্মের নাম, পিতার নাম, গ্রাম, পোষ্ট আফিস এবং জেলার বিষয় এক্ষণে বলিব।

পোদির নাম—পূর্ব্বজন্মে মনো ও তাহার পিতার নাম দীপচাঁদ মণ্ডল ছিল। গ্রাম বেঁওতা, পোষ্ট আফিস ভাঙ্গর। উহাও চব্বিশ পরগণার অন্তর্গত। বেঁওতা নাকি পোদির মাসীবাড়ী।

যদ্যপি কেহ ইচ্ছা করেন, তবে তিনি পদ্মমণির সকল বৃত্তান্ত অবগত

হইতে পারেন। আজ আমরা পাঠকপাঠিকাগণের অবগতির জন্য পোদির ঠিকানা প্রভৃতি আবশ্যকীয় বিষয়গুলি প্রদান করিলাম। পোদির বর্ত্তমান জন্মের পরিচয় :—মেয়েটির নাম পদ্মমণি ওরফে পোদি।

তাহার বয়স দশবৎসর। তাহার পিতার নাম ৺খোশাল মোড়ল। গ্রামের নাম বালগোড়, পোষ্ট আফিস উত্তরবিষ্ণুপুর, দমদমা, ২৪ পরগণা। পূর্ব্বজন্মের পরিচয় :—

মেয়েটির নাম মনো। পিতার নাম দীপচাঁদ মণ্ডল। গ্রাম বেঁওতা, পোষ্ট আফিস ভাঙ্গর, ২৪ পরগণা।

পূর্ব্বজন্মের স্বামীর নাম শ্রীরামসাধন গায়েন।

গ্রামের নাম—ক্রোলবেড়ীয়া, পোষ্ট আফিস ভাঙ্গর। ২৪ পরগণা।

যাঁহারা পূর্ব্বজন্ম মানেন না, বা পূর্ব্বজন্মের স্মৃতি কখনও কাহারও হৃদয়পটে উদিত হইতে পারে না, ইত্যাকার ধারণা যাঁহাদের রহিয়াছে, তাঁহারা মৎপ্রদত্ত ঠিকানায় গমন করিয়া মনের সন্দেহ দূর করিতে পারেন। পূর্ব্বজন্ম আছে এবং পূর্ব্বজন্মের স্মৃতি মনে জাগরূক হইতে পারে, তাহারই প্রমাণ দর্শাইবার জন্য অদ্য আমরা আমূল এই সত্যঘটনাটী সাধারণের অবগতির জন্য লিপিবদ্ধ করিলাম। কাহারও কাহারও পূর্ব্ব জন্মের স্মৃতি হৃদয়ে জাগরূক হইয়া থাকে, শুনিতে পাওয়া যায়। ৺বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহোদয়ের পূর্ব্ব স্মৃতি জাগরূক হইয়াছিল। তাহা বোধ হয় অনেকে অবগত আছেন। জন্মার্জ্জিত পাপ পুণ্যের ফলভোগ করিতে হইবেক। ইহা অবগত হইয়াও আমাদের সৎপ্রসঙ্গে, সদালাপে এবং সৎচিন্তায় বা ভগবৎচিন্তায় জীবনের কিয়দংশ কর্ত্তন করা কর্ত্তব্য। আমরা কিন্তু কার্য্যকালে পুনর্জ্জন্মের কথা বিস্মৃত হইয়া যাই বলিয়াই আমাদের এতাদৃশ দুর্গতি উপভোগ করিতে হয়। শ্রীগণপতি রায়।

লাইব্রেরীয়ান, বেঙ্গল ন্যাশনেল কলেজ, কলিকাতা।

স্বপ্ন-রাজ্য।

শান্তিহীন প্রাণ সর্ব্বদাই চঞ্চল। অতৃপ্ত হৃদয়ে "শান্তি কোথায়", "শান্তি কোথায়" বলিয়া পৃথিবীর নানা স্থান পরিভ্রমণ করিয়াছি,—অশান্তির কারণ কি অথবা কি পাইলে শান্তি হয় কখন স্থির করিতে পারি নাই—বহুতর ধর্ম্মগ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়াছি, অনেক সাধু সন্ন্যাসীর সহিত বেড়াইয়াছি; কিন্তু কিছুতেই বিন্দুমাত্র শান্তি পাই নাই। একদা ধবলগিরির মনোরম শোভা অবলোকন করিবার জন্য দার্জ্জিলিং হইতে প্রায় দুই ক্রোশ উত্তরে এক গিরিশৃঙ্গে গিয়াছিলাম। সেদিন পূর্ণিমা। তত্রস্থ সন্ন্যাসিগণ পূর্ণিমা উপলক্ষে অতিথিসৎকারের নিমিত্ত বিশিষ্ট আয়োজন করিয়াছিলেন; সুতরাং সেই অপরিচিত জনশূন্য দেশে কোন কষ্ট পাইতে হয় নাই। ধূম-ধূসর মেঘমালা যেন সমস্ত দিন শিখরে, তরুশিরে ও গহ্বরে কৌতুকপ্রিয় বালকের ন্যায় খেলা করিয়া পরিশ্রান্ত হইয়া সন্ধ্যাগমে নানা দিক্ দেশাভিমুখে ছুটিতেছে; অমনি দিননাথ অবকাশ পাইয়া রক্তিমচ্ছটায় পশ্চিম গগন উদ্ভাসিত করিয়া অস্তাচলশিখর অবলম্বন করিতেছেন। ধবলাঙ্গে সূর্য্যরশ্মি পতিত হওয়ায় অদূরে ভীষণ অগ্নিকাণ্ডের সম্ভাবনায় আশ্রমপালিত মৃগশাবকগণ শিখর ও গহ্বর লঙ্ঘন করিয়া চকিতনেত্রে, ঊর্দ্ধশ্বাসে স্ব স্ব কুটিরাভিমুখে দৌড়িয়া আসিতেছে। আমি অবাক হইয়া অদ্রিশোভা দেখিতেছি। দেখিতে দেখিতে নভোমণ্ডল উজ্জ্বল করিয়া স্বচ্ছ সান্ধ্য গগনভালে চন্দ্র উদিত হইল। চতুর্দ্দিকে বিপিনমধ্যে আশ্রমনিবাসী ঋষিগণের ধূনী প্রজ্বলিত হইয়া শ্যামাদ্রিকণ্ঠ শোভিত করিল। অনতিদূরস্থিত আশ্রমের সুললিত সন্ধ্যা-গীতি ও শঙ্খধ্বনি বহন করিয়া স্নিগ্ধ নৈশ সমীরণ তাপিতের প্রাণ জুড়াইতে লাগিল।

আমি এই অপূর্ব্ব শোভায় মুগ্ধ হইয়া ভাবিতেছি—"আহা! প্রকৃতি কি সুন্দর। এখন আমি কত সুখী, এই সময় যদি আমার মৃত্যু হয় তাহা হইলেও কতকটা সুখে মরিতে পারি।" কিন্তু পরক্ষণেই ভাবিলাম "মরিলে কি যাতনার শেষ হইবে? কে বলিতে পারে মরণের শেষ কোথায়, মরণের পরে কি আছে?" অবসন্নপ্রায় শরীর চিন্তার আবেশে কখন নিদ্রার শান্তিময় ক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে; কিন্তু নিদ্রাতেই বা শান্তি কোথায়? এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখিয়া হঠাৎ নিদ্রাভঙ্গ হইল, ভয়ে চারিদিকে চাহিলাম, কিন্তু কিছুই দেখিতে পাইলাম না। স্বপ্নে যাহা দেখিয়াছি তাহা পুনরায় স্মরণ করিয়া দেখিলাম স্বপ্নের বিষয় যদিও অতি প্রাচীন ঐতিহাসিক ঘটনামূলক কিন্তু সম্পূর্ণ নূতন। স্বপ্নটি এই:—

"এক রম্য উপবন। এখানে মাধবীকুঞ্জতলে এক প্রেমিক যুগল সুখসেব্য মলয়মারুত উপভোগে রত। যুবতী অনন্যমনে একগাছি ফুলহার গাঁথিতেছে, তাহার সম্মুখে নানা রঙের সুন্দর সুন্দর ফুল স্তরে স্তরে সাজান রহিয়াছে এবং যুবক অনিমিষে সেই সুন্দরীর মুখের দিকে চাহিয়া আছে। নিকটস্থ এক বৃক্ষান্তরাল হইতে প্রশান্তমূর্ত্তি প্রণয়ীযুগলের এই পবিত্র, অনির্ব্বচনীয় শোভা দেখিয়া পাছে তাহাদের নির্ম্মল প্রেমালাপনে ব্যাঘাত জন্মাই, এই আশঙ্কায় আমি অপেক্ষাকৃত একটু সুগুপ্তস্থানে দাঁড়াইয়া নিষ্পন্দভাবে তাহাদের কথোপকথনের প্রতীক্ষায় রহিলাম। ইহাদের যদিও কখন দেখি নাই, কিন্তু সম্পূর্ণ অপরিচিত বলিয়া বোধ হইল না। মহাভারতে সাবিত্রী ও সত্যবানের যেরূপ রূপ বর্ণনা আছে, শান্তমূর্ত্তি এই মিথুন তাহার জীবন্ত প্রতিমা বলিয়া প্রতীয়মান হইল। কিয়ৎক্ষণ পরে মালা শেষ করিয়া যুবতী সহাস্যবদনে কহিল—প্রিয়তম, আজ এ আনন্দের দিনে তোমাকে এমন

বিমর্ষ দেখে আমার বড় কষ্ট হ'চ্চে। গত বৎসর এই দিনে, এই মাধবীতলে কত সুখে তোমার গলায় বরমালা দিয়াছিলাম। আজ এক বৎসর পূর্ণ হইয়াছে, তাই আজ সেইরূপ আনন্দে তোমার সহিত ফুল-খেলা করিবার জন্য এই মালা গাঁথিয়াছি ও সুন্দর সুন্দর এই কুসুমগুলি সংগ্রহ করিয়াছি। আমার বড় সাধ আজ তোমাকে ফুল-সাজে সাজাইয়া তোমার চরণবন্দনা করিব। যুবক দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিল —না সাবিত্রি, সত্যই আজ আমার প্রাণ হঠাৎ কেমন অস্থির হইয়াছে। জীবন জাগ্রত-স্বপ্ন বলিয়া বোধ হইতেছে, সময় সময় ভয়ানক বিভীষিকা দেখিয়া প্রাণ আতঙ্কে কাঁপিয়া উঠিতেছে; কানে কানে কে যেন বলিতেছে 'আজ তোর জীবনের শেষ দিন।' সাবিত্রি, এই বোধ হয় শেষ দেখা। আমাকে ভুলিয়া যাও, এই পুষ্প লইয়া সন্নিহিত মন্দিরে গিয়া দেবার্চ্চনা কর; এবং তোমার পবিত্র প্রেমরাশি ভগবৎপদে অর্পণ করিবার সংকল্প কর। হৃদয়ের যেস্থান এখন এই অধম অধিকার করিয়া আছে, তাহা সেই প্রেমময়ের জন্য উৎসর্গ কর। জগতের কাহারও নিকট আমার নাম করিও না; পিতামাতা তোমার বিবাহের প্রস্তাব করিতেছেন, বিবাহ করিয়া তাঁহাদের প্রীতি উৎপাদন কর। ভগবানের নিকট আমার শেষ প্রার্থনা তুমি চিরসুখী হও; সাবিত্রি, আমার আর অন্য সাধ নাই। সাবিত্রী বাষ্পাকুল নয়নে কিয়ৎক্ষণ সত্যবানের দিকে চাহিয়া রহিল, পরে কি যেন বলিবার চেষ্টা করিল; কিন্তু প্রবল অশ্রুবেগ সম্বরণ করিতে না পারিয়া সত্যবানের ক্রোড়ে মুখ লুকাইয়া রুদ্ধকণ্ঠে কাঁদিতে লাগিল। সত্যবান পুনরায় গম্ভীর ভাবে বলিতে লাগিল— প্রিয়তমে, বলিতে প্রাণ ফাটিয়া যাইতেছে কিন্তু আজ আমি পাষাণ। তুমি আমাকে ভালবাস ইহা পিতামাতা বা সমাজের অজ্ঞাত। আমরা যে একবৎসর পূর্ব্বে মালাবিনিময় করিয়া পরস্পর প্রণয়াবদ্ধ হইয়াছি,

তাহাও জগতে কেহ জানে না, জানিলেও আমাকে নির্গুণ ও অল্পায়ু জানিয়া পিতামাতা কোন্ প্রাণে তোমাকে আমার হস্তে সম্প্রদান করিবেন। জগৎ অবিচ্ছিন্ন দুঃখময় প্রেমের পক্ষপাতী নহে। সাবিত্রি, জানিয়া শুনিয়া জীবন্ময় জলন্ত চিতা হৃদয়ে জ্বালিও না। তুমি আমাকে ভুলিতে প্রতিজ্ঞা কর, আমি তোমাকে দেখিতে দেখিতে হৃষ্টচিত্তে জন্মের মত বিদায় গ্রহণ করি। সাবিত্রী আর থাকিতে পারিল না, চক্ষের জল মুছিয়া কাতরভাবে বলিয়া উঠিল—হায়! পরমেশ্বর অভাগীর কপালে কি এই লিখেছিলে। তবে কি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের গণনা সত্যে পরিণত হইল। ব্রাহ্মণকে কেন বিশ্বাস করি নাই, তা' হ'লে ত বিষ খাইয়া মরিতে পারিতাম, এ অসহ্য যাতনা ভোগ করিতে হইত না। উহু, প্রাণ কি কঠিন। সত্যবান,—সত্যবান আমাকে ফেলে যাবে?—না না, এ প্রলাপ। প্রাণনাথ, আজ কেন নির্দ্দয়ের মত কথা কহিতেছ। কখন স্বপ্নেও ভাবি নাই যে তোমার মুখে এরূপ কথা শুনিতে হইবে। তোমাকে ভুলিব। তুমি হৃদয়-সর্ব্বস্ব,--তোমাকে ভুলিব। এদেহে তুমিই জীবন, তুমি ছাড়া আমি যে শূন্যময়। জগৎ ভুলিতে পারি কিন্তু তোমাকে ভোলা অসম্ভব। যদি তোমা ছাড়া হইয়া এ পৃথিবীতে থাকিতে হয়, যতদিন থাকিব, তোমার পুণ্যময় স্মৃতিই আমার জীবনস্বরূপ হইবে; নতুবা একমুহূর্ত্তও বাঁচিব না। আমি তোমার প্রেমে মুগ্ধ, তোমার সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ, জগৎ ইহা না জানিলে ক্ষতি নাই; কিন্তু তুমি আমার হৃদয়-জগতের একমাত্র অধীশ্বর, জীবনে মরণে তুমিই আমার স্বামী। ইহা সর্ব্বময়, সর্ব্বান্তর্যামী পরমেশ্বর জানেন। যদি ইহ-জীবনের সুখ সাধ দুর্ভাগ্যক্রমে এই খানেই শেষ হয় তাহা হইলে পর জীবনে ভগবান আমাদের আশা পূর্ণ করিবেন ইহা নিশ্চয়। সত্যবান, মরণে ভয় করি না, যদি মরিতে হয় দুজনে একত্রে মরিব, একত্রে অনন্তে

বিচরণ করিব, কখন তোমা ছাড়া হ'য়ে থাকিতে পারিব না।—সাবি... আরও কি বলিতে যাইতেছিল ; কিন্তু সত্যবান বাধা দিয়া বলি... প্রিয়তমে, মরণের পর পারে কি আছে কে বলিতে পারে ? প্রাণ স... নিরাশার প্রতিধ্বনিতে ফাটিয়া যাইতেছে ; কিন্তু যতক্ষণ বাঁচিয়া ... তোমার চিন্তাই আমার জীবন মধুময় করিয়া তুলিতেছে।—

"পাব কি না পাব, কোথায় যাইব ?
কি আছে মরণ পার ?
তোমারি ভাবনা তোমায় কামনা
এ অতি সুখ আমার।"

ক্রমশঃ.

শ্রীপঞ্চানন মজুমদার।